আমি ভালো নেই,

তুমি ভালো থেকো প্রিয় দেশ

তসলিমা নাসরিন

সাত খণ্ডে আত্মজীবনী

আমার মেয়েবেলা

উতল হাওয়া

দ্বিখণ্ডিত

সেই সব অন্ধকার

আমি ভালো নেই, তুমি ভালো থেকো প্রিয় দেশ

নেই কিছু নেই

বাকি জীবন

আর যেন কাউকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হতে না হয়

শিকল

নিজ দেশে পরবাসি,
আবার পরবাসেও পরবাসি।
দেশ তবে কোথায় আমার?
সুজলা সুফলা দেশ!
আমি জানি, দেশ জানে, আমার অন্তরে সে দেশ।

ব্যাংকক বিমান বন্দরে নেমেই আমি মাথার কাপড়টি ফেলে দিই। কাপড়টি মাথার ওপর খুব ভারি হয়ে চেপে বসেছিল। কাপড়টি ফেলে দিয়ে নিজেকে আমার খুব হালকা লাগে। অনেকদিন পর যেন আমি *আমি* হয়েছি। একটি অশ্লীল আবরণে আমাকে ঢেকে রাখা হয়েছিল সেটি সরিয়ে সত্যিকার আমি বেরিয়ে আসি পৃথিবীর আলো হাওয়ায়, আমি মুক্তির শ্বাস নিই। যে আমি ছোটবেলা থেকেই বোরখা পরে বা মাথায় ওড়না চাপিয়ে পর্দা করার ঘোর বিরোধী ছিলাম, সেই আমাকেই দিনের পর দিন আবৃত থাকতে হয়েছে। এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কী আছে! অবশ্য একটিই সান্ত্বনা যে সে আবৃত হওয়া কোনও ধর্মীয় কারণে ছিল না, ছিল মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য। আমার নিজের মাথা থেকেও মাথা ঢাকার সিদ্ধান্তটি নামেনি, নেমেছে অন্যের মাথা থেকে। কেবল আমাকে বাঁচানোই নয়, আমাকে বাঁচাতে যে মানুষগুলো এগিয়ে এসেছে, তাদেরও বাঁচানোর দায়িত্ব আমার কাঁধেই ছিল। কাঁধে না বলে আসলে মাথায় বলাই ভালো। মাথা ঢেকে নিজের মাথা শুধু নয়, অনেকের মাথাই নাকি রক্ষা করেছি।

মাথার কাপড় সরিয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন একজন অচেনা ভদ্রলোক। লার্স এণ্ডারসন বা এই জাতীয় নাম। বললেন, তিনি সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এসেছেন। তাঁর পাশে আরও একজন অচেনা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনিও হাত বাড়ালেন। তিনি উল্ফ কিছু একটা, সুইডেনের পুলিশ বাহিনীর প্রধান। দুজনই সাদা, দুজনেরই সোনালি চুল। দুজনই একইসঙ্গে ফ্যাকাসে, ভয়ে এবং ভাবনায়। দুর্ভাবনায় বলাই ভালো। দুজনেরই কাঁধে বা মাথায় গুরুদায়িত্ব, তা দুজনের চোখ দেখলেই বোঝা যায়। ভদ্রলোকদুজন ঙর সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে নিজেদের পরিচয় দিলেন, গলার স্বর অনেকটাই নিচু। ঙ এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। ঠোঁটে স্মিত হাসি। চোখে একই সঙ্গে আশংকা আর আয়েশ। লার্স আর উল্ফ আমাদের নিয়ে গেলেন আড়ালে, বিমান বন্দরের ভেতরেই দুজনের জন্য দুটি ঘর ভাড়া করেই রেখেছিলেন, ঢুকিয়ে দিলেন। এশিয়া থেকে ইউরোপের দিকে যাওয়ার জন্য যে বিমানে চড়তে হবে, সেটির অনেক দেরি। সুতরাং বিশ্রাম করো। বিশ্রাম করো বললেই কি করা যায়। কোত্থেকে ঘুম নামবে চোখে! চোখ তো ঘুম ভুলে গেছে। শরীরের পেশিতে রক্তে ত্বকে রোমকূপে অনিশ্চিতি আর নিশ্চিতির দোদুল দোলা। বিশ্রাম কে দেবে আমাকে! নিজের ঘরটি রেখে ঙ চলে এলেন আমার ঘরে। এ সময় ঙরও বিশ্রামের কোনও প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কথা বলার। কোথায় যাচ্ছি, কী হচ্ছে, ওঁরা কারা, ওঁরা কেন এ নিয়ে আমাকে অল্প অল্প কিছু বললেন। আমার, লক্ষ করেছি, খুব জানার ইচ্ছে হচ্ছে না কোনও কিছুরই নাড়ি নক্ষত্র। মনে আচমকা আশ্চর্য এক প্রশান্তি আমার, যেন জীবন্ত আমাকে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল, সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার থেকে প্রাণপণে আমি উঠে এসেছি। এ আমার নতুন জীবন। এ জীবন জগতের সকল দুশ্চিন্তা থেকে আপাতত মুক্ত। মুক্ত বটে, কিন্তু চিনচিন করে একটি চিন্তা আমার জানালায় চড়ুই পাখির মতো চকিতে বসছে।

ভদ্রলোকদুজন আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করছেন, নিজেদের বিশ্রামের জন্য আদৌ কি কিছু করছেন, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। না ওঁরা কিছুই করছেন না। ওঁরা আমাকে পাহারা দিচ্ছেন এবং পায়চারি করছেন। পাহারা এবং পায়চারির বাইরে আপাতত ওঁদের আর

কোনও পরিকল্পনা নেই। কিন্তু আমি না হয় স্থির বসে আছি, ঘড়ির কাঁটার তো আমার মত বসে থাকার সময় নেই। কাঁটা, যতই আমার মনে হোক না কেন যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, আসলে নেই, দৌড়োচ্ছে, না দৌড়োলেও অন্তত হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে কোথাও না কোথাও পৌঁছোচ্ছে। যখন পৌঁছোচ্ছে, ভদ্রলোক দুজন সন্তর্পনে আমাকে বিদেশি বিমানের প্রথম শ্রেণীর এক কী দু নম্বর আসনে বসিয়ে দেন, নিজেরা একদু-হাত দূরত্বের মধ্যেই থাকেন। বিমান যাচ্ছে আমস্টারডামের দিকে। ঢাকা থেকে সুইডেনে কি ব্যাংকক আর আমস্টারডাম ঘুরে যেতে হয়? না তা হয় না। তবে নিরাপত্তা নিয়ে নিশিদিন নেশা করলে তা হয়। আমি ঠিক কী করব বুঝে পাই না, ওর সঙ্গে গল্প করব, জানালার মেঘের ওড়াউড়ি দেখব, কিছু পড়ব, নাকি চোখ বুজে শুয়ে থাকব বা ঘুমোবো! এক এক করে সবই করতে ইচ্ছে করে, আবার কিছুই করতে ইচ্ছে হয় না। ভেতরে স্থিরতা এবং একই সঙ্গে একধরনের অস্থিরতা মেঘের মত ভাসতে থাকে । বিমান যেন অনন্তকাল চলবে বলে পণ করেছে। অনেক সময় মনে হয়, বিমান স্থবির হয়ে আছে, সামনে পিছনে এক ইঞ্চি নড়ছে না। কোনও মাটির আভাস পেতে বারবার জানালা দিয়ে নিচে তাকাই। পা আমার নিশপিশ করে মাটি স্পর্শ করার জন্য। যে কোনও মাটি কি! হয়ত যে কোনও মাটিই।

আমস্টারডাম বিমান বন্দরে নেমেই তড়িঘড়ি আমাকে ভিআইপি লাউঞ্জে নেওয়া হল। লাউঞ্জ প্রায় ফাঁকা। দুজন লোক ছিল বসে। এমন ভাবে আমাকে বসতে বলা হল, যেন কেউ না দেখতে পারে। কেউ যেন বুঝতে না পারে, কে আমি, কী আমার নাম পরিচয়, আমাকে এমন ভাবে আগলে রাখেন লার্স এন্ডারসন এবং উল্ফ বেইরন। বিপদের কেন্দ্র থেকে যত দূরে যাচ্ছি, ততই প্রশান্ত হচ্ছে ভদ্রলোকদুজনের মুখ। হঠাৎ ভয় কেটে যাওয়া প্রশান্ত মুখে কুঞ্চন বাড়ে। মাথার ওপর টেলিভিশন চলছে সশব্দে, ওদিকে   লার্স আর উল্ফ-এর ভীত, বিস্মিত, বিস্ফারিত চোখ। ওর ইঙ্গিতে আমার চোখ চলে যায় টেলিভিশনে, খবরে, শিরোনামে, ছবিতে। পর্দা জুড়ে আমার ছবি, আর মুর্হুর্মুহু খবর -- *তসলিমা দেশ ছেড়েছে, সুইডেনের পথে রওনা হয়েছে।* কোথায় যাচ্ছি আমি, কেন যাচ্ছি   তা বিশ্বের জন্য জরুরি

কোনও খবর হতে পারে না, তা বিশ্বাস করেও আমার অদ্ভুত এক শিহরণ জাগে। মৃত্যুকুঠুরির অন্ধকার থেকে নিজেকে বের করে এনে যদি দেখি আলোয় ঝলমল করছে চারদিক, আর আমি তো মরিইনি, বরং খুব বেশি জীবন্ত আমি, তবে আমার হয়ত স্পন্দন বাড়ে, কিন্তু নিরাপত্তার জন্য যাঁদের ন্যাস্ত করা হয়েছে, স্পন্দন ফুরিয়ে গিয়ে তাঁদের কিন্তু আপাদমস্তক ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ভিআইপি লাউঞ্জ থেকে আমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বন্দরের নিচতলায় কোনও এক জনশূন্য নিরাপদ কুঠুরিতে বসিয়ে রাখেন কুলকুল করে ঘামতে থাকা, তিরতির করে কাঁপতে থাকা ভিনদেশি ভদ্রলোকেরা। ঙ ভাবলেশহীন তাকিয়ে থাকেন। আমি উত্তেজিত। বোঝাতে চাইছি, এখানে কেউ আমাকে খুন করবে না। এখানে এই বিদেশি বিমান বন্দরে বাংলাদেশের মোল্লারা কেউ ধেয়ে আসেনি। সুতরাং তোমরা সুতো ঢিলে করো, আমাকে যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দাও। না, সুতো ঢিলে কিছুতেই করতে রাজি নন ওঁরা। শক্ত করে লাটাই হাতে বসে ওঁদের থাকতেই হবে, ওঁরা না চাইলেও।

কিন্তু ওঁরা যা চাইছিলেন প্রচণ্ড, তা ঘটে একসময়, সময় হয় বিমানে চড়ার। আমস্টারডাম থেকে স্টকহোমের পথে যাত্রা শুরু হয়। স্টকহোম শহরটি সম্পর্কে আমার জ্ঞান সত্যি বলতে কিছুই নেই। শহরটি যে কোনও শহর। যদি আমাকে বলা হয়, যে, তোমাকে এখন কসুলুকু বা কভিকাইরে শহরে যেতে হবে, মাথা নেড়ে আমাকে সায় দিতে হবে যে ঠিক আছে, যাবো। নিজের জন্য দেশ বা শহর পছন্দ করার স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হয়নি। নিজের পছন্দে ঢোঁক এবং অন্যের পছন্দে ঢেঁকি গেলা ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। প্রাণ বাঁচানোর জন্যই সব আয়োজন। আপাতত আমি হন্তারকদের নাগাল থেকে প্রাণদায়ীর আশ্রয়ে। এ কথা ভুলে যায় মন, মনকে মনে মনে ধমকে স্মরণ করিয়ে দিই। স্টকহোম শহরে থামার পর বিমানের পেট থেকে আমাকে সবার আগে বের করে নিয়ে আলাদা সিঁড়ি দিয়ে খোলা আকাশের নিচে নামিয়ে আনা হল। আমস্টারডাম বিমান বন্দরের নিরাপত্তা-রক্ষীদের যোগসাজসে ওখানেও তাই করা হয়েছিল। যে পথে যাত্রীরা যাওয়া আসা

করবে সে পথ আমার জন্য নয়। কারণ কী? কারণ আমি সাধারণ কোনও যাত্রী নই। এ মুহূর্তে বিশ্বের শীর্ষ সংবাদ আমি, শিরোনাম আমি।

বিমানের পাদদেশে একটি লোক দাঁড়িয়ে ছিল আমাকে অভিবাদন জানাতে। লোকটি হাত বাড়িয়ে হাত মিলিয়ে নিজের নাম জানালো গ্যাবি গ্লেইসম্যান, সুইডিশ পেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। পাদদেশে এক ঝাঁক পুলিশের গাড়িও দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে কোনও একটিতে তোলার সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্দেশের দিকে ছুটতে লাগল, সামনে পিছনে অনেকগুলো গাড়ি তখন বিপদঘন্টির মত প্যাঁ পুঁ বাজাচ্ছে। আমি হতচকিত। এরকম অভিবাদন অপেক্ষা করে থাকে বড় কোনও দেশের রাজা-রানি বা রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্য। আমি নিতান্তই সাধারণ মানুষ, আমার জন্য এই আয়োজন আমাকে কেমন ভয় ধরিয়ে দেয়। বন্দরেই কোথাও নামানো হল আমাকে, কোথায়, তা আমার সাধ্য নেই বুঝি। মার্গারেটা উগলাস, সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে, অদূরে কয়েকশ সাংবাদিকের থিকথিকে ভিড়, ফটোসাংবাদিকরা হাতের ক্যামেরা তাক করে আছে আমার দিকে, আলোয় বিদ্ধ হওয়ার আগেই, ঝলসে ওঠার আগেই কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আমাকে বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে সুইডেনে নিয়ে আসার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত কয়েকমাস ধরে পরিশ্রম করছেন, তাঁর উদ্যোগ সার্থক, খুব স্বাভাবিকভাবেই মুখে তাঁর তৃপ্তির হাসি। ঙ এগিয়ে এসে মার্গারেটাকে নিজের পরিচয় দিলেন। মার্গারেটার দেখি সবই নখদর্পণে কে আমার ছায়াসঙ্গী হয়ে কোন দেশ পাড়ি দিয়েছে, কেন দিয়েছে। সঙ্গে যে কাউকে না কাউকে থাকতেই হবে, যে অবস্থা থেকে আমাকে উঠিয়ে আনা হয়েছে, সে অবস্থায়। এই জানাটুকুর ওপর ঙ আরও জানা চাপিয়ে দিলেন। বললেন, ইংরেজি ভাষায় যেহেতু আমার ভালো দখল নেই, তাই তিনি সঙ্গে এসেছেন আমাকে সাহায্য করতে। এও বললেন যে তাঁকেও ভীষণ রকম সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে, এমনকী তাঁর স্ত্রী, যিনি এখন দেশের বাইরে আছেন, তাঁকেও তিনি জানাননি যে তিনি আমার সঙ্গে এসেছেন। মার্গারেটা উগলাসের মুখোমুখি ঙ আর আমি বসে, কাছেই কথা বলা দূরত্বে গ্যাবি গ্লেইসম্যান। মন্ত্রী মূলত যা জানতে চাইলেন, তা হল, পথে কোনও

অসুবিধে হয়েছে কি না। এখন ক্লান্ত বোধ করছি কি না। আমার হয়ে যাবতীয় উত্তর ঙ দিলেন। এখন আমার কী পরিকল্পনা, ভবিষ্যত সম্পর্কে কী ভাবছি তারও উত্তর কিছুটা ঙ এবং কিছুটা গ্যাবি। ঙ কদ্দিন আছেন? সুইডিশ পেন ক্লাব আমাকে কুর্ট টুখোলস্কি পুরস্কার দেবে, সেদিনই জনসম্মুখে আমার আনুষ্ঠানিক উপস্থিতি, ঠিক হল অন্তত সেদিন অবদি ঙ থাকবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর স্মিত হেসে ঙর সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেন। এবার? সারাদিন ধরে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের সঙ্গে আমি কি কথা বলব নাকি বলব না, মার্গারেটার প্রশ্ন। সেটির সিদ্ধান্তও এল গ্যাবি এবং ঙর কাছ থেকে। না, এ মুহূর্তে কোনও সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দেব না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আমার ধারণা, নিশ্চিতই ভেবেছেন, আমি অবলা অসহায় নারী, এবং আমার যাবতীয় ভাবনাচিন্তা এবং কর্মকাণ্ড আমার আশেপাশের পুরুষ-সুহৃদ দ্বারা পরিচালিত হয়। বন্দরে বাকরুদ্ধ পড়ে থাকে উৎসাহী সাংবাদিকের দল। ওঁদের মুখোমুখে হলেন মার্গারেটা উগলাস নিজে। আমাকে পিছনের পথ দিয়ে বের করে নিয়ে আসা হয়, যেন টিকিটি কেউ ছুঁতে না পারে।

এরপর গাড়ির বহর আমার গাড়ির সামনে পিছনে ছোটে। প্যাঁ পুঁ করে শহর প্রকম্পিত করে আমাকে নিয়ে ছোটে কিসের দিকে কোন দিকে আমি কিচ্ছু জানি না। খুব অস্বস্তি হয় আমার। কেবল আমার জন্য এই বিশাল ব্যবস্থার আমি কোনও কারণ খুঁজে পাই না। প্যারিস দেখা চোখ আমার, এই চোখ চমকিত হয় না স্টকহোম শহরে। ঙ দুচোখে কৌতূহল নিয়ে জানালায় যতটুকু দেখা যায় শহর, দেখেন। মনে আমার কাঁটা ফোটাতে থাকে ঙর একটি বাক্য, *এমনকী আমি আমার স্ত্রীকেও জানাইনি যে আমি এখানে এসেছি।* কেন ঙ তাঁর স্ত্রীকে জানাননি? আমার সঙ্গে দেশ থেকে সুইডেন অবদি তাঁর আসার ব্যবস্থাটি তাঁর জন্য কে করল, কেন করল! সুইডেনের রাষ্ট্রদূত, যতদূর কানে আসে খবর, ওদিক থেকে ব্যবস্থাটি করেছেন। সুইডিশ সরকারের কাছ থেকে দুটো বিমান টিকিট গেছে। এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা নিশ্চয়ই। কিন্তু এ ঘটনা পরিবারের ঘণিষ্ঠজনের কাছে গোপন রাখার কি কারণ থাকতে পারে ঙর! তবে কি ঙ ভাবছেন তিনি প্রমোদবিহারে এসেছেন আমার সঙ্গে। যদি কারওর একজনের

আসতেই হত আমার সঙ্গে, আমার বাবা আসতে পারতেন। এসময় আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো যদি বাবা কাছে থাকতেন। ঢাকা বিমানবন্দরে বাবার অমন অসহায় দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটি হু হু করে ধুলো হাওয়া ছড়িয়ে দিয়ে যায়। ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করার জ্ঞান আমার নেই। ইংরেজি ভাষা চিরকালই আমার কাছে বিদেশি ভাষা, এটি আমার মাতৃভাষাও নয়, মুখের ভাষাও নয়। এটি দিয়ে আর যা ফোটাতে পারি, খই ফোটাতে পারি না। কিন্তু দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাজকর্ম চালিয়ে নিতে পারি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। খুব প্রয়োজন হলে দোভাষীর ব্যবস্থা হবে। ফ্রান্সে দেখেছি খুব কম লোকই ইংরেজি বলতে জানে। নামকরা লোকেরাও দিব্যি শির উঁচু করে জানিয়ে দেয় তারা ইংরেজি জানে না। এ নিয়ে কারও কোনও সংকোচ নেই। প্রয়োজন হলে দোভাষীকে ডেকে আনে, কিন্তু ইংরেজি জানতেই হবে, শিখতেই হবে এমন তাগিদ কেউ অনুভব করে না। এরকম যখন ভাবছি, গাড়ির সামনে থেকে একজন পুলিশ অফিসার পিছনে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, *আপনারা কি এক বাড়িতেই থাকছেন?* আমি কিছু বলার আগেই ঙ দ্রুত উত্তর দিলেন, *হ্যাঁ নিশ্চয়ই।* আমার সন্দেহ হয় পুলিশ অফিসারটি ভাবছেন, কোনও গোপন সম্পর্ক আমাদের মধ্যে আছে। ঙর উপস্থিতি হঠাৎই আমার কাছে অতিরিক্ত মনে হতে থাকে।

গাড়ি থামে একটি বাড়িতে। বাড়ি ভর্তি পুলিশ। এ বাড়িতে আমাকে আপাতত থাকতে হবে, গ্যাবি বলল। বাড়িটি এক সুইডিশ লেখকের বাড়ি। লেখকের নাম ইয়ান হেনরিক সুয়ান। নামগুলো আমার কানে ঢোকে ঠিকই, কিন্তু ঢুকেই বেরিয়ে যায়। নামগুলো যেহেতু মাথা অবদি পৌঁছোয় না, তাই মনে রাখাও সম্ভব হয় না। বিমানের পেট থেকে নিরাপত্তার জাল ফেলে ধরে আনা সুটকেস পুলিশের উদ্যোগে নামানোর ব্যবস্থা হয়। গাড়ি থেকে বাড়ি। আমার এবং ঙর দুটো সুটকেসই একটি শোবার ঘরে ঢুকিয়ে গ্যাবি বলে দিল, *এটাই আপাতত আপনাদের শোবার ঘর।*

আপনাদের মানে? আমি চমকে উঠি।

আপনাদের মানে আপনাদের। আপনার আর ঙর।

আমি আর ঙ এক ঘরে থাকব কেন?

স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থাকি। সারা শরীরে, মনে প্রশ্ন। গ্যাবি, জানি না, ঠোঁটে কেন ঝুলিয়ে রাখে এমন একটি হাসি, যেটির অনুবাদ করলে দুইই হয়, অপ্রস্তুত এবং চতুর। প্রশ্নের কোনও উত্তর না পেয়ে এই বাক্যগুলো বলতে বলতে লক্ষ করি ক্রোধ ছলকে ছলকে উঠছে কণ্ঠ থেকে। *আমাদের তো এক ঘরে থাকার কোনও সম্পর্ক নেই। দেশ থেকে একসঙ্গে এসেছে বলে কি এরকম অদ্ভুত কিছু ভাবতে হবে!*

ঙকে খেলনার স্তূপের মধ্যে যে ঘরটিতে দোতলা বিছানা পাতা, ইয়ান হেনরিকের বাচ্চাদের ঘর, সেটি দেখিয়ে দিল গ্যাবি। ঙ বিদেশে আগেও এসেছেন, থেকেছেন। তাঁর কাছে, এদের ঘরদোর, এদের আচার ব্যবহার কিছুই নিশ্চয়ই দূরের বলে মনে হচ্ছে না। লক্ষ করি, ঙ দোতলা-বিছানার ঘরে গেলেন, গ্যাবির ধারণাকে না ঘুচিয়েই গেলেন। সে ঘোচানোর ভার কি কেবল আমার! গ্যাবির ঠোঁটের কোণের হাসি মুহূর্মুহূ পাল্টাচ্ছে। এমন ভঙ্গিতে কথা বলে, হাত রাখে কাঁধে, ছুটে আসে, জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খায়, মনে হয় বহু বছর সে আমাকে চেনে, শুধু চেনেই না, যেন আমরা অনেককালের বন্ধু বা আত্মীয়। এসবে আমার আড়ষ্টতা প্রচুর, কিছুতেই কাউকে চুমু খাওয়া তো দূরের কথা, জড়িয়ে ধরাও ঠিক সম্ভব নয়। গ্যাবির এখন প্রচণ্ড ব্যস্ততা। রেডিও টেলিভশনে এখন ক্রমাগতই সাক্ষাৎকার দিচ্ছে সে। সাক্ষাৎকারের ফাঁকে ফাঁকে এবাড়িতে ঢুঁ দিয়ে যাচ্ছে। টুকরো টুকরো কথা বলছে। পুলিশের সঙ্গে, মাঝে মাঝে আমার আর ঙর সঙ্গে।

তুমি কি লিখছো কিছু? লেখক মানুষ, লেখা ছাড়া থাকতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হচ্ছে।

গ্যাবি বলতে থাকে, *চাইলে এখানেও তো লেখালেখি করতে পারো!*

কী করে!

উঠে গিয়ে অন্য কোনও ঘর থেকে একগাদা কাগজ কলম নিয়ে এসে আমার সামনে রেখে গ্যাবি বলল, *আশা করি আপাতত এতেই হবে। কালই আমি প্রচুর কাগজ কলম নিয়ে আসবো।* আন্তরিক লোক গ্যাবি, সন্দেহ নেই। কিন্তু লিখতে বললেই তো লেখা হয় না।

তাছাড়া আমি যে অনেককাল আর হাতে লিখতে পারি না, কমপিউটারে লিখে অভ্যেস হয়ে গেছে! আমার এই অপরাগতা নিয়ে গ্লানি কম নয় আমার। লেখক হলে যে কোনও পরিবেশেই লেখার ক্ষমতা থাকা চাই।

তাহলে শুরু করে দাও।

গ্যাবির এই *শুরু করে দাও*-এর মধ্যে কোনও গা ঝলমল করা কিছু আছে। একটা আনন্দের ঘ্রাণ পাই।

ঠিকই তো, বাড়িতে বসে কিছু লেখালেখি করতেই তো পারে। গ্যাবি এবং ঙ দুজনই আমার লেখা বিষয়ে এমন গম্ভীর সুরে কথা বলতে শুরু করে যে মনে হয় আমার প্রতিটি অক্ষর শব্দ বাক্যের দিকে তাকিয়ে আছে গোটা বিশ্ব। বিশ্বকে যেন করুণা করে হলেও কিছু দান করি। আহ, কী ক্ষমতাবতী সরস্বতী আমি!

হাতে লিখতে পারি না এখন। মিনমিন করি।

কেন? গ্যাবির চোখে একগাদা বিস্ময়।

কমপিউটারে লিখে অভ্যেস। শুনলো সে, শুনে একটু না শোনার মতো করে তাকালো। কান এগিয়ে নিয়ে এসে আরেকবার শুনতে গিয়েও শুনলো না। বরং চকিতে কিছু একটা মনে পড়ায় সেই কিছু একটা নিয়ে পড়লো।

শোনো। একটা কথা তোমাকে আগেই বলে রাখা দরকার। এদিক ওদিক তাকিয়ে গলাটা খাটো করে গ্যাবি বলল, *কখনও নিজেকে কমিউনিস্ট বলো না। কখনও নিজেকে নারীবাদী বলো না।*

বলো কি, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করলে কী ক্ষতি?

পশ্চিমে কমিউনিজম বাজে শব্দ।

কিন্তু নারীবাদী বলব না কেন? আমি তো নারীবাদীই।

গ্যাবি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে, আগের মত গলা নিচু করে বলে, *সাবধান, আর উচ্চারণ কোরো না। নারীবাদীদের এখানে কেউ পছন্দ করে না।*

কারণ কি?

ওরা সব পুরুষবিদ্বেষী, সমকামী।

ধত। বাজে কথা।

বাজে কথা নয়। আমার কথা শোনো। তোমার জন্য ভালো হবে।

গ্যাবি চলে যায়। আমার মন তিতিবিরক্ত হয়ে থাকে।

বাড়ির ভিতরে পুলিশ, বাইরে পুলিশ। পুলিশে একাকার। এ আমাদের দেশি পুলিশের মত নয়। কেউ দেখলে বুঝবেও না যে এরা পুলিশ। সকলেরই ধোপ দুরস্ত জামা কাপড়। জ্যাকেটে পিস্তল। যোগাযোগের জন্য কানে পেঁচানো তার। ঘড়িতে মাইক্রোফোন। থেকে থেকেই কথা শুনছে, কথা বলছে। সকলের সঙ্গে এক এক করে হাত মেলাতে হয়েছে আমার, এক এক করে সব পুলিশই তাদের নাম বলে গেছে আমাকে, সেগুলো মুহূর্তেই মাথায় ঢোকার আগেই উবে গেছে। পুলিশেরা সোফায় বসে টেলিভিশন দেখতে শুরু করে। টেলিভিশনে সারাক্ষণই আমার ছবি, আমার খবর। যে কোনও চ্যানেলেই এখন এই এক ব্যাপার। এখন আমি দেশে নেই। বহুদূর দেশের একটি গোপন জায়গায় আছি, আমি ক্লান্ত, বিশ্রাম নিচ্ছি, যেখানেই আছি, নিরাপদে আছি, এখনও কোথাও কোনও সাক্ষাৎকার দিইনি, তবে অনুমান করা হচ্ছে খুব শীঘ্র আমার নিজমুখ থেকে কিছু শোনা যাবে। টেলিভিশনের খবরে আমার কোনও উচ্ছ্বাস নেই। পেটে আমার বাঘের ক্ষিধে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কেউ খাওয়া দাওয়ার কথা তুলছে না! ক্ষিধে ওরও পেয়েছে। মুখ শুকনো। আমার অভিমান হতে থাকে। ঘুম আমাকে রক্ষা করে। ঘুমে গা নরম হয়ে আসছে। দেশে তখন রাত্তির, বিদেশে না হয় অমল রোদ্দুর। রোদ্দুর দেখতে ভারী বয়েই গেল চোখের, চোখ বুজে আসে।

আমার অসময়ের ঘুম ভাঙিয়ে হঠাৎ লেনা নামের এক মেয়ে, লিকলিকে, দাঁত উঁচু, স্তনহীন, লাল চুলো, এসে রোবটের মত চিকন গলায় কথা বলতে শুরু করল। সুইডেন নামের দেশটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি। দেশটি ভাল, দেশটির তুলনা হয় না। দেশটিতে এখন

সন্তান উৎপাদনের হার ইওরোপের দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। লেনা জানালো সে গ্যাবির স্ত্রী। বিছানায় বসে ছিলাম আমি, আর সে দাঁড়িয়ে নাগাড়ে রেলগাড়ি চালিয়ে হঠাৎই বলল সে যাচ্ছে, তার একটি পুত্রসন্তান আছে, তাকে ডে-কেয়ার থেকে তুলে নিয়ে শীঘ্র ঘরে ফিরতে হবে। বাড়ি তার কাছেই, হাঁটা দূরত্বে। সাইকেলে করে এসেছিল লেনা, ওতে করেই চলে গেল। সাইকেলের পিছনে বাচ্চার বসার একটি আসন। সারি সারি সাইকেল রাখা বাড়ির ধারেই।

ঘড়িতে রাত্তির দশটা, অথচ বাইরে ঝকঝকে দিন। এ কী করে সম্ভব! আসলেই কি রাত দশটা এখন? নাকি, সকাল! আমারই সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে! পুলিশদের একজনকে জিজ্ঞেস করি। বলে দেয় হ্যাঁ দশটাই। আমি অপেক্ষা করে ছিলাম যে গ্যাবি বা অন্য কেউ সম্ভবত আমাদের কোনও রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাবে। কিন্তু গ্যাবি এসে শুভরাত বলে চলে গেছে। আমিও লজ্জায় ক্ষিধে এবং খাবার প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। অতিথি আগ বাড়িয়ে ক্ষিধের কথা বলবে, অন্তত এরকম শিক্ষা ছোটবেলা থেকে কখনও পাইনি। অতএব অতিথির মুখে খিল। লক্ষ্য করি, পুলিশেরা রান্নাঘর থেকে কফি বানিয়ে আনছে। খাচ্ছে। রান্নাঘরে ঢুকে নিজেও কিছু বানানোর জন্য, নিদেনপক্ষে চা, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। না, চা নেই। একটি কৌটোয় কফি পড়ে আছে। আচ্ছা জল পাওয়া যাবে কোথাও? খুজে কোনও বোতল পেলাম না জলের। পুলিশদের এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করি, আপনারা ঘুমোবেন কোথায়? না, ওঁরা কেউ ঘুমোবেন না। ওঁরা ডিউটি করছেন, ডিউটির সময় ঘুমোতে নেই। সারারাত পুলিশ পাশের ঘরে বসে থেকেছে আর উঠে উঠে ঘর বারান্দা দেখেছে । জানালা দরজা কিছু নড়ছে কিনা দেখেছে। বাড়ির বাইরে সাদা আর পুলিশ-পোশাকের পুলিশ টহল দিচ্ছে। ভেতরেও পুলিশ বসা, ওদের চোখের সামনে হয় শূন্যতা নয় টেলিভিশন। আমি ঘরের দরজা ভালো করে ভিতর থেকে বন্ধ করে বসে থেকেছি ঘরে। সারারাত। ঘুম না হওয়ার কারণ অনেক, সময়ের হেরফের, ক্ষিধে, ঙ নিয়ে অস্বস্তি, সুইডিশ পেন ক্লাবের রহস্যময়তা -- যাকে নিয়ে সারা বিশ্বে এত হৈ চৈ -- তাকে ভাল কোনও হোটেলে রাখার সাধ্য কারও হয়নি,

তার খাওয়া দাওয়ার কোনও ব্যবস্থার কথা কেউই ভাবেনি! অথচ সারা বিশ্বে নাম হচ্ছে সুইডিশ পেন ক্লাব আমাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, সারা বিশ্বে নাম হচ্ছে সুইডেন নামক উদার দেশটির অতিথি আমি। দ্বিধান্বিত আমি, কিন্তু আবার স্বভাবের সৎগুণে দ্বিধাগুলো ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে তাবৎ কিছুর মধ্যে তন্ন তন্ন করে আন্তরিকতা এবং সততা খুঁজতে চেষ্টা করি। সুইডিশ পেন ক্লাব মানেই গ্যাবি গ্লেইসম্যান আর তার স্ত্রী নয়, আরও অন্য কেউ আছে, নিশ্চয়ই আছে। প্রথম দিন হয়ত সব এলোমেলো হয়ে আছে, দিন গেলেই ঠিক হবে সব।

দিন যায়, পরদিন আমার বোঝার আগেই আমার শিয়রের কাছে বসে থাকে। রোদ্দুরে ঘর ভেসে যাচ্ছে, অথচ ঘড়িতে তখন সবে ভোর। রাত্তির বলে কিছু সুইডেনে নামছে না। এ দেশ মধ্যরাত্রির সূর্যের দেশ। গরমকালের মধ্যরাতে মাথার ওপর সূর্য জ্বলজ্বল করবে। রাত দুটো না কি দিন দুটো বোঝার উপায় কারওর থাকবে না। পৃথিবীর উত্তর মেরুতে এসে নোঙর ফেলেছো মেয়ে, একটু দম নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করো চালচিত্র আর অবশ্যই সবকিছুর স্বভাবচরিত্র। শুকনো মুখে বসে আছি, ঙ এসে বিছানায় আমার পাশে বসলেন। আমাদের টুকিটাকি আলোচনায় আসে খাওয়া, ক্ষিধে, গ্যাবি। কোনওকিছুর সমাধান আমাদের হাতে নেই। অসহায় আমরা, কিন্তু অসহায় এ কথা বিশ্বাস করতে আমার যেমন অসুবিধে হয়, ঙরও হয়। ঙ মাঝে মাঝে কিছুই-বুঝতে-না-পারা চোখে তাকিয়ে থাকেন চারদিকে। আবার সম্বিত ফিরে পেয়ে ভিষণ রকম বুঝতে-পারা-চোখে চোখ বুলোন, যেখানে বুলোবার। ঙ আমার পাশে বসে বুঝতে পারা চোখে, ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি হাসি নিয়ে বললেন, জানো, *শামসুর রাহমানের অনেকের সঙ্গে প্রেম করেছেন। অত বয়স হয়েছে, কিন্তু ভেতরের প্রেমিক মনটি এখনও মরেনি। আমার হয়ত শামসুর রাহমানের মত অত প্রেমিকা নেই, কিন্তু প্রেমিকা যে আমার ছিল না তা নয়।*   প্রেম এবং প্রেমিকা নিয়ে ঙ আরও কিছু বলতে থাকেন। আমার শোনার রুচি হয় না। ঙর ওপর আমার খুব রাগ হতে থাকে। মনে হতে থাকে, তিনি আমার গা ঘেষতে চাইছেন। বুড়ো বয়সে তাঁর প্রেম করার শখ হয়েছে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই   আমার সঙ্গে এতদূর অবদি ঢাকা থেকে স্টকহোম এসেছেন।   ভিতরে ভিতরে আমি পাথর হয়ে উঠতে

থাকি। রাগী পাথর। স্পর্শ করলেই আগুন হয়ে উঠব। ঙ, ভালো হয় যদি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।

সকালে আমি ঘোষণা করে দিই আমাকে বেরোতে হবে। তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নিই। আমি তৈরি হলে তো আর পুলিশ বাহিনী তৈরি হচ্ছে না। পুলিশের দল ভাবলেশহীন মুখে কেবল শুনে গেল যে আমি বাইরে বেরোচ্ছি। আমার বেরোনো নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যাথা নেই। তারা বেরোবে না আমার সঙ্গে। বাড়ির পুলিশ বাড়ি পাহারা দেবে। কেউ এসে   বাড়ির কোথাও একটা বোমা পুঁতে গেল কী না বা পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ে কোনও ঘরে ওত পেতে থাকলো কী না মারবে বলে, লক্ষ্য রাখবে। আমার মিঠে কথায় এই পুলিশের চিড়ে ভিজবে না।   হ্যাঁ যেতেই হবে আমাকে, ডলার ভাঙাতে হবে। কিন্তু মুশকিল হল আমি কোথায় যাবো না যাবো তা নির্ধারণ করবে গ্যাবি। গ্যাবি আদেশ করলে পুলিশ আসবে। আমি আদেশ তো দূরের কথা অনুরোধ করলেও পুলিশ বাহিনীতে কোনও নড়চড় হবে না। আমার অভিভাবক সুইডিশ পেন ক্লাব, আর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট যেহেতু গ্যাবি গ্লেইসম্যান, তাই আমি যতটা না আমার সম্পর্কে বুঝবো, আমার চেয়েও বেশি বুঝবে সে। আমার রাগ হয় শুনে। কে না কে এই গ্যাবি, যাকে আি, অতি সামান্যই চিনি আর সে কী না আমার মাতব্বর সেজে বসে গেল। বিদেশ বিভুঁই। রকম সকম বুঝতেই বোধহয় আরও সময় লাগবে, কেউ কেউ বলে।   পুলিশেরা গ্যাবি গ্লেইসম্যানকে জানায়   বাইরে বেরোতে চাইছি আমি। বেরোতে আমি চাইলেই তো হবে না, গ্যাবির অনুমতি ছাড়া আমার এক পা কোথাও বেরোনো সম্ভব নয়। অভিভাবক আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন।   *অভিভাবক* বস্তুটিকে অত্যন্ত নিরানন্দ কণ্ঠে বলি, যে, বাইরে বেরোতে হবে আমার।

গ্যাবি জিজ্ঞেস করে, *বাইরে কেন?*

বাইরে কাজ।

কী কাজ?

ডলার ভাঙাতে হবে।

কেন?

খেতে হবে।

খাওয়া তো আছেই ফ্রিজে।

সে খাওয়া সম্ভব নয়।

ঠিক আছে। টাকা পয়সার দরকার তো হতেই পারে। আমি বলে দিচ্ছি পুলিশকে।

কথা শেষ হওয়ার পর গ্যাবি হাওয়ার মতো ছুটে আসে বাড়িতে। কুমীরের বাচ্চাটি কেন বেরোবে, কী কারণে বেরোবে, সম্ভবত তা আরও কাছ থেকে দেখতে বুঝতে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পুলিশের অনেকগুলো গাড়ি এসে দাঁড়ালো বাড়ির সামনের রাস্তায়। পুলিশ-পাশাক পরা পুলিশ সারাক্ষণই বাড়ির বাইরে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে গা কাঁপে। গাড়ি ভর্তি পুলিশ চলে আসা মানে সাজ সাজ রব পড়ে গেল বাহিনীতে। পুলিশের বড়কর্তাদের তার পাঠানো হয়ে গেছে, যে, আমি ঘরবার হচ্ছি। অবশেষে বেরোলাম। শহর কাঁপিয়ে পুলিশ বাহিনী এগোয়। রাস্তার মানুষ হাঁ করে চেয়ে থাকে বহরের দিকে। লজ্জায় মাথা নিচু করে রাখি আমি। এই সামান্য আমার জন্য কী হূলস্থূল কাণ্ড বাঁধানো হচ্ছে।রাস্তায়, দোকানে যে মানুষই দেখে আমাকে, চিনে ফেলে। মিষ্টি হেসে অভিনন্দন জানায়, হাত নাড়ে। পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতায় আমার ছবিসহ খবর। পত্রিকার পোস্টার সাঁটা দেয়ালে দেয়ালে, বড় করে খবর আর ছবি। অদ্ভুত ভাষাটি পড়তে পারি না, কেবল নিজের ছবিটি চিনতে পারি। ছবি ছাপিয়ে একে ধরিয়ে দিন বা একে স্বাগতম বা অভিনন্দন --ভাষা না বুঝলে, অনেকটা একই রকম। টাকা ভাঙিয়ে প্রথম যে কাজটি করতে ইচ্ছে করি এখন, সেটি কোনও রেস্তোরাঁয় যাওয়া এবং খাওয়া। পুলিশ জিজ্ঞেস করল, এখন তো বাড়ি যাবে! না বাড়ি আমি যাবো না। কোথাও খেতে যাবো। খেতে যাবো? খেতে যাবার কথা তো ছিল না আমার। আবার হৈ হৈ পড়ে গেল। প্রোগ্রাম বদলে গেছে। কিছু যোগ হয়েছে। রেস্তোরাঁ যোগ হয়েছে। পুলিশের বড়কর্তাকে জানিয়ে দেওয়া হল। এখন বাহিনী নিয়ে খেতে যাও। ম্যাগডোনাল্ডস নামের স্যাণ্ডউইচের দোকানে আমাকে নিয়ে ঢুকলো পুলিশ বাহিনী। পিছনে

জড়সড় ঙ। ঙর সঙ্গে সম্পর্কটি লক্ষ্য করি দ্রুত শীতল হচ্ছে। তিনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন। খুব প্রয়োজন ছাড়া আমি তাঁর সঙ্গে কোনও কথা বলছি না। বললেও স্বরটি আগের মত নেই আর, স্বরটি উত্তাপহীন। স্বরে বিরক্তি, স্বরে ক্লান্তি। ঙর, স্পষ্ট বুঝি যে দ্বিধা হচ্ছে আমার অনুগ্রহে দিন কাটাতে। কিন্তু উপায় নেই, উপোস করে মরতে হবে এদেশে। ক্ষিধের প্রাবল্যে গোগ্রাসে বার্গারের রুটিতে কামড় দিচ্ছে -- বাঙালির এই করুণ দৃশ্যটি যে মনে মনে দূর থেকে দেখব, তারও ফুরসত নেই। আগে যে করেই হোক পেটে কিছু দিতে হবে। গরিব দেশের মানুষ আমরা, খেতে চাইলে লোকে ভাববে বড় *খাই খাই* আমাদের। সে ভাবুক! আমার চোয়াল শক্ত হতে থাকে। একটি জিনিস আমাকে শান্ত করে আপাতত, বাড়ির টেলিফোনটি। কোথাও ফোন করা আমার নিষেধ, কারণ আমি এখন *গোপন জায়গায়* অবস্থান করছি, আমার ঠিকানা নিরাপত্তার কারণে ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন না জানে -- এই হল নিয়ম। আমার পক্ষে এত কঠিন নিয়ম মানা সম্ভব নয়। নিয়ম ভেঙে আমি প্রথম ফোনটি করি নিখিল সরকারকে। কী করে রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়েছে, বিদেশ বিভুঁইএর কোথায় এসে কত দূরে পৌঁছেছি, এক নিঃশ্বাসে জানাই। নিখিল সরকারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, গুরু শিষ্যের। আমি গুরু শিষ্যের সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। কখনও নিখিলদাকে আমি প্রণাম তো দূরের কথা, নমস্কারও করিনি। কিন্তু সম্পর্কটির মধ্যে অগাধ স্নেহ আর শ্রদ্ধা আছে। তাই বলে এটি পিতা পুত্রীর সম্পর্কের মত নয়। সম্পর্কটি নারী পুরুষের, কিন্তু এটি কোনও প্রেম বা যৌনতার সম্পর্কও নয়। এটিকে সাধারণ বন্ধুত্বও বলা কাতারেও ফেলা যায় না। তার উর্ধে এটি, অবশ্য অনেককিছুরই উর্ধে। সত্যিকার মানুষে মানুষে সম্পর্ক। এ বাড়ি থেকে ফোন করা করা যায়, বা যাবে খবরটি পেয়ে ফোনের ওপর ঝাঁপিয়ে ঙও পড়েছেন। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন স্বরে তিনি কথা বলছেন তাঁর পরিবারের কারও সঙ্গে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কি? সম্ভবত।

এই রাতেও কোথাও কেউ এসে রেস্তোরাঁয় নেবে, আশা করে ঠকে গেলাম। কেউ আসেনি। এখন বাইরে কোথাও যেতে চাইলে পুলিশ বাহিনীতে সাইরেন পড়ে যাবে। বাড়িতে যে পুলিশ

থাকে, তারা বাড়িতেই থাকে। একদল যায়, একদল আসে। এরকম ডিউটি। আর বাড়ির বাইরে যখন যাবো, তখন প্যাঁ পুঁ বাজিয়ে দশটি পুলিশের গাড়ি আসে। মাঝখানেরটিতে আমাকে চড়ানো হয়। যেহেতু গ্যাবি কিছু জানায়নি পুলিশবাহিনীকে, ওরা নিতেও আসবে না আমাকে। আর পুলিশ ছাড়া আমাকে কোথাও যেতেও দেওয়া হবে না। বাড়ির পুলিশের নজর রাখতে হচ্ছে, বাইরে থেকে যেন কোনও আততায়ী না ঢোকে ভেতরে, এবং ভেতরের বস্তুটি যেন বাইরে না পা বাড়ায়। আমাকে ওরা সুইডিশ পুলিশি ভাষায় *বস্তু* বা অবজেক্ট বলে ডাকে। নাম নেওয়াও নাকি নিরাপত্তার জন্য হুমকি। অতএব জীবন বাঁচানোর জন্য যে কোনও পরিস্থিতির মধ্যেই বাস করা শুভবুদ্ধির লক্ষণ। রান্নাঘরে ঢুকে বসে থাকি। ফোনটি রান্নাঘরের টেবিলেই। এই রান্নাঘর আমরা ব্যবহার করতে পারবো কী পারবো না কিছু জানানো হয়নি। পুলিশেরা নিজেদের মত কফি বানিয়ে খায়। কিন্তু রান্নাঘরের আনাচ কানাচ খুঁজে খাদ্য-বস্তু যা পাওয়া গেল, তার বেশির ভাগই চিনি না। চেনা জিনিসের মধ্যে মাছ, তবে মাছ প্যাকেটে। লাল হয়ে থাকা মাছের প্যাকেট। এটি কি মাছের শুটকি, রান্না করা নাকি শুধু সেদ্ধ বোঝার কোনও উপায় নেই। কী করে খেতে হবে এই মাছ, তা সোজা কথা, জানি না। । এটিকে কি কাচা খাবো। নাকি তেল মশলায় রান্না করে খাবো, তা হতে গেলে তেল মশলাও নেই। প্যাকেটটি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে যেখানে ছিল ফ্রিজের দ্বিতীয় তাকে, সেখানে সেই তাকেই রেখে দিই।। দুটো ডিম পড়ে আছে ফ্রিজে। রান্না যে কিছু করব, তারও উপায় নেই। কোনও তেল মশলা নেই। পাগলের মত চাল খুঁজি, নেই। ফুটিয়ে অন্তত ভাত হলেই অন্তত যদি সেদ্ধ করা যায়। কৌটোগুলো নিঃশব্দে সতর্কতায় খুলে দেখি, নেই। শাক সবজি কিছুই নেই। থাকলে তো লবণসেদ্ধ করে খাওয়া যেত। হাতড়াতে হাতড়াতে সাদা একটি ঠোঙায় সাদা গুঁড়ো পাওয়া গেল। গুঁড়ো কি গমের গুঁড়ো নাকি অন্য কিছু! এখন কিছু একটা করে যদি বাঁচা যায়। যে কাজটি কখনও করিনি, সে কাজটি করি। জল দিয়ে গুলে সেই অচেনা সাদা গুঁড়োর গোলা হাতের তেলোয় পাতলা করে সসপেনে ফেলে গরম করে নিই। যে খাবার খাইনি কখনও, সে খাবারটি খাই। ডিম সেদ্ধ আর অচেনা কিছু একটার সেদ্ধ। ঙও খেলেন ওসব।

খুব ম্লান স্বরে বললেন, *মনে হয় আমার প্রয়োজন নেই তোমার ওই অনুষ্ঠান অবদি থাকা। ভেবেছিলাম ভাষার ব্যাপারে একটু সাহায্য করব। এখন দেখছি, তুমি ভালই চালিয়ে নিতে পারো।*

আমি মাথা নেড়ে বললাম, *না না তার কোনও অসুবিধে নেই।*

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঙ বললেন, *তাহলে আমি চলে যাই। কী বল।*

নিরুত্তাপ চোখে আমি জানালার দিকে তাকিয়ে থাকি। মনে মনে আমি চাইছি ঙ চলে যান। আমার ভিতরে ঙ নিয়ে যে সংশয় জন্মেছে, তা ক্রমে গভীরে গিয়ে শিকড় গাড়ছে।

রাতগুলো অদ্ভুত কাটে। ঙ এক ঘরে। আমি আরেকঘরে। শব্দহীন। মাঝখানে নিরাপত্তা-পুলিশের সশব্দ ভিড়। পুলিশ আমার ভালো লাগে না। আমার কোনও রকম প্রয়োজন নেই এত পুলিশ নিয়ে চলাফেরা করার। গ্যাবিকে বলেছিলাম। পুলিশ অফিসারদের জানিয়েছে। তারা অফিসে এই ব্যাপারটি জানিয়েছে। উত্তর এসেছে, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমার পুলিশ প্রহরার মধ্যে থাকতেই হবে। অর্থাৎ বাড়তি একটি অর্থহীন উপদ্রপ আমার গায়ে সেঁটে থাকবে। মনে প্রশ্ন জাগে, কতদিন?

সকালে গ্যাবি এল হাতে একটি চিঠি নিয়ে। কার্ল বিল্টএর চিঠি। কার্ল বিল্ট সুইডেনের প্রেসিডেন্ট। চিঠিটিতে লেখা, *প্রিয় তসলিমা, আপনাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পেরে আমরা আনন্দিত। সুইডেনে আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আশা করি, এই দেশে আপনার নিরাপত্তার কোনও অভাব হবে না। এবং আপনি নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে আপনার কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। আপনার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা করার ইচ্ছে আমার।*..ইত্যাদি ইত্যাদি।

চিঠিটি আমার কাছে যে কোনও চিঠির মতই। সমর্থন বা সমমর্মিতার চিঠি। এরকম চিঠি পেয়ে আমি খুবই অভ্যস্ত। দেশের প্রেসিডেন্টের চিঠি, প্রেসিডেন্ট কি জানেন আমি কোথায় কার বাড়িতে পড়ে আছি! ইয়ান হেনরিক বউ বাচ্চা নিয়ে ছুটতে গেছে কোথাও, ও ফিরে আসার আগেই আমাকে এ বাড়ি ছাড়তে হবে, এবং তখন কোথায় যাবো আমি, কোথায় থাকবো, তা দেখার দায়িত্বটি কার, আমি এখনও কিছু জানি না। প্রেসিডেন্ট কি জানেন?

নিজেকে সব কিছুর মধ্যে খুব বোকা লাগে। অসহায় লাগে। চিঠিটি টেবিলে রেখে এখানে থাকার এবং খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটি কী! গ্যাবির কাছে জানতে চাইলাম। এসবকে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে সে মনে করছে না। সে নাকি আমাদের জন্য খাবার কিনে রান্নাঘরে রেখেছে। কোন খাবার? ওই প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখা ভাপে সেদ্ধ মাছ, আর ওই টিনের কৌটোয় প্রিজারভেটিভে ডোবানো গাজর আর বর্বটি আর সামুদ্রিক দুর্গন্ধ-মাছ! দুবছর আগে প্রিজারভেটিভের জলে ভাসিয়ে রাখা। ওয়াক লাগে। আমার রখেছে না মনে করে আজ বিকেলে তার বাড়িতে যাওয়ার গুরুত্বটি বেশি করে দিল। বলল, ওখানে রাতের খাবারের ব্যবস্থা সে করবে। ঙ যেহেতু সুইডেন ছেড়ে যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁর যে তারিখে যাবার কথা ছিল তার আগেই তিনি যাচ্ছেন, এবং এখান থেকে সোজাসুজি ঢাকায় না ফিরে তিনি লণ্ডন যাবেন আপাতত, তাঁকে টিকিট করতে যেতে হবে বাইরে। বাইরে ঙ একা গেলেন না কোনও একজন পুলিশ তাঁকে নিয়ে গেল, সে আমি জানি না। আমি দরজা ভিজিয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকি। আমার ভাবনার মধ্যে সত্যি বলতে কী, কিছুই নেই। ফাঁকা।

বিকেলে গ্যাবি গ্লেইসম্যানের কাটারিনা বাঙ্গাটার অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে আর ঙকে নেওয়া হল। ওখানে এক্সপ্রেশন পত্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক মারিয়া সত্যেনিয়ুস আমার সাক্ষাৎকার নেবে। একজন ফটোসাংবাদিক ফটো তুলবে। গ্যাবি গ্লেইসম্যান নিজে লেখক না কবি তার কিছুই আমি জানি না। জিজ্ঞেস করি, তুমি কটা বই লিখেছো। গ্যাবি বলে, লিখেছি বেশ কিছু। প্রবল উৎসাহে গ্যাবির বই দেখতে চাই। গ্যাবি মিষ্টি হেসে এড়িয়ে যায় বই দেখানোর ব্যাপারটি। গ্যাবি বলল, সে এক্সপ্রেশন পত্রিকার সাংবাদিক। সাহিত্য বিভাগের। গ্যাবি নিজের কথা খুব বেশি বলে না। জানতে চাইলে খুব সামান্যই বলে। তাঁর গায়ের রং সাদা ইওরোপীদের মত নয়। কিরকম হলদেটে। এই সে হল। গ্যাবির বাড়িতে সারাক্ষণই ফোন আসছে, সারাক্ষণই ফ্যাক্স চলছে। ফোন ফ্যাক্স যা আসছে, সবই আমার বিষয়ে। পৃথিবীর এমন কোনও সংবাদ মাধ্যমের লোক নেই যে ফোন না করছে, ফ্যাক্স পাঠাচ্ছে। তাদের সবারই এক অনুরোধ, তসলিমার সাক্ষাৎকার চাই। গ্যাবির এক উত্তর, হবে

না। হ্যাঁ গ্যাবি এই নিয়ে ব্যস্ত। সাক্ষাৎকার যা দেওয়ার সবই গ্যাবি দিচ্ছে। কি করে তসলিমা এল, কোথায় এখন, কী করছে, কী ভাবছে, তার সঙ্গে কি দেখা হতে পারে, তার উত্তর দেবে গ্যাবি গ্লেইসম্যান। অন্য কেউ নয়। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে সে অনেকদিনের, এটি বিশাল কাজ। মারিয়া সতেনিয়ুস চলে গেল সাক্ষাৎকার নিয়ে। আমি গ্যাবির ফোন ফ্যাক্সের বিরামহীন উৎসবের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকি।

গ্যাবি হেসে বলল, *পুরো বিশ্ব পাগল হয়ে উঠেছে তোমার জন্য। এসব নিয়েই আমাকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। নিজের জন্য কোনও সময়ই পাচ্ছি না। তারপরও নির্বাচন করে করে বলে দিচ্ছি সবাইকে যে পেন ক্লাবের পুরস্কারের অনুষ্ঠানে আসতে। কিন্তু কেউ আলাদা করে সাক্ষাৎকার পাবে না। তাছাড়া তোমার প্রচুর আমন্ত্রণ এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে।*

কিসের আমন্ত্রণ?

নানান দেশে তোমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ডাকছে। এবং আরও একটি জিনিস, হা হা।

কী হা হা?

প্রচুর প্রকাশক তোমার বই ছাপাতে চাইছে।

তাই নাকি?

হা হা।

কোন দেশের? সুইডেনের?

শুধু সুইডেন? ইওরোপের সব দেশ। জার্মানি, ইটালি, স্পেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক..

বলো কী! বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলায় দোলা কণ্ঠ।

যা বলছি ঠিক বলছি।

--ধুত আমার মনে হয় না, আমার বই ছাপাতে এখানে কেউ চাইবে?

গ্যাবি হাসে। *বলে, এর মধ্যে তোমার কাছে ইওরোপের নটা দেশের প্রকাশক বই চাইছে।*

--কোথায়? চিঠি কোথায়?

--পাগল হয়েছে। একটারও উত্তর দিও না।

--কেন দেব না?

--অপেক্ষা কর। আজই নরওয়ে থেকে চিঠি এল। নরওয়ে থেকে দুজন প্রকাশক চেয়েছে। যারা বেশি টাকার কথা বলবে, শুধু তাদের দেবে। প্রথমে কোনও উত্তর দেওয়াই ঠিক নয়।

গ্যাবি গ্লেইসম্যানের ঠিকানায় বা তার ফ্যাক্সে আমার সব চিঠিপত্র আসছে। আমি অনুমান করতে পারি যে এদেশে সুইডিশ পেন ক্লাব আমার ঠিকানা। গ্যাবি ছাড়া পেন ক্লাবের আর কাউকে না চিনলেও, গ্যাবি কি কোনও লেখক বা কোনও কবি তা না জানলেও, এক্সপ্রেশন নামক ট্যাবলয়েড পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবেই সে পেন ক্লাবের সদস্য এবং আপাতত প্রেসিডেন্ট, এবং আমার অভিভাকত্ব আপাতত তার হাতেই। একথা অস্বীকার আমি শত চাইলেও করতে পারবো না। কোন পত্রিকা সবচেয়ে বড় পত্রিকা, এবং সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়। জানতে চাইলে গ্যাবি উত্তর দেয়, এক্সপ্রেশন। যদিও ডগেনস নেইহেটার নামের পত্রিকাটি দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে ওটিই বড় । গ্যাবিই ঠিক করেছে, সুইডেনের কোনও পত্রিকায় নয়, শুধু এক্সপ্রেশনে আমার এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ যাবে। অন্য পত্রিকা, অন্য মিডিয়া আমার পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্সের দিন দূর থেকে আমাকে দেখবে।

কেন, অন্য পত্রিকা কী দোষ করেছে শুনি।

অন্য পত্রিকার জন্য তোমার সময় নেই।

সময় নেই কে বলল! আমি তো খামোকা বাড়িতে বসে আছি!

গ্যাবি উঠে যায় আমার সামনে থেকে।

দুনিয়ার তাবৎ পত্রিকা থেকেই আমার কাছে সাক্ষাৎকার প্রার্থণা করে ফোন ফ্যাক্স আসছেই। গ্যাবি উত্তর দিচ্ছে যে আমার নাকি সময় নেই। জীবনে এত অঢেল *সময়* আমি আগে কখনও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। এখানে এই বিদেশ বিঁভুইয়ে ঠায় বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার।

তুমি যে মিডিয়ার লোকদের ক্ষেপিয়ে দিচ্ছ গ্যাবি। পরিণতি কি ভালো হবে?

কী হবে? কী করবে ওরা? কিছুই করতে পারবে না।

সাক্ষাৎকার দেওয়া না দেওয়া বিষয়ে, বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে, হতেই পারে কথা শুভাকাঙ্খীদের সঙ্গে। তবে এ কথা ঠিক যে, আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আমি না নিয়ে অন্যে নিচ্ছে বলে। আমি সাক্ষাৎকার দেব কী দেব না, তার সিদ্ধান্ত আমাকে নিতে দেওয়া হবে না কেন? আমার স্বাধীনতাকে ধরে বেঁধে বাক্স বন্দি করা হল।

গ্যাবি একটি বিশাল স্তূপের ওপর থেকে একটি পত্রিকা তুলে নিয়ে দেখালো আমাকে। আমাকে নিয়ে তার লেখা, আজই ছাপা হয়েছে। কী লিখলে? প্রশ্নটি বোকার মতো পড়ে থাকে এককোণে। গ্যাবি মোটেও আমার কৌতূহলের দিকে ফিরে তাকায় না, জানায় না কী লিখেছে সে। কিছুক্ষণ পর কৌতূহল যখন প্রায় মরে পচে চিতায় উঠেছে, তখনই বলল, *তোমার লেখালেখি হচ্ছে না এখানে, সে খবরটা লিখেছি।*

লেখালেখি যে হচ্ছে না, তা বুঝলে কী করে? আমার প্রশ্ন।

--*তোমার টাইপরাইটার তো তুমি নিয়ে আসেনি, লেখালেখি শুরু করতে পারছো না, সে কথা লিখেছি।*

--*তোমাকে কে বলল, আমি টাইপরাইটারে লিখি?*

--*তাই তো বললে।*

--*কখনও বলিনি। কারণ জীবনে আমি কখনও টাইপরাইটারে লিখিনি। লিখতে জানি না। আমি কমপিউটারে লিখি।*

--*কমপিউটারে?* গ্যাবির চোখ ছোট হয়ে আসে। ঠোঁটের কোনে চিলতে হাসি।

--*হ্যাঁ কমপিউটারে।*

--*মানে আমরা যেরকম কমপিউটার ব্যবহার করি, সেরকম?*

--*হ্যাঁ সেরকম।*

--তোমাদের দেশে মানুষ কমপিউটার ব্যবহার করে? গ্যাবির চোখে তার চিকচিক করে সংশয়।

--নিশ্চয়ই করে।

--তুমি কবে থেকে ওতে লিখছো?

--ওতে মানে কি? কমপিউটারে?

--হ্যাঁ। ওতে।

--বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই লিখছি। কমপিউটার ছাড়া এখন আমার অসুবিধে হয় লিখতে। গ্যাবির চোখ ছোটই থেকে যায়। না, একটি গরিব দেশের মেয়ে কম্পিউটারে লেখালেখি করে, এটি ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। তাই কমপিউটারের বদলে টাইপ রাইটার লিখে সে মানানসই বা গ্রহণযোগ্য করেছে ব্যাপারটি।

গ্যাবি উত্তেজিত। সারাক্ষণই। ভুলেই গেছে যে আমরা রাতের খাবার খেতে এসেছি এখানে। হঠাৎ মনে পড়ায় অথবা মনে করিয়ে দেওয়ার ফলে দ্রুত পাস্তা সেদ্ধ বসিয়ে দেয় উনুনে। ফ্রিজে যা আছে, তা-ই পাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হবে, এই হল তার ডিনারের মেনু। ফ্রিজে আছে কাঁচা সালমন মাছ। সাধারণ দিন হলে আমি কায়দা করে রাতের খাবার এড়িয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ক্ষিধে-পেটে যে কোনও খাবারকেই সুস্বাদু বলে মনে হয়। খাবো, থালায় পাস্তা ঢেলে দেওয়ার বদলে গ্যাবি উপুড় করে ঢেলে দিল কলতলায়। কী? না, পাস্তা সেদ্ধ একটু বেশি হয়ে গেছে। এ কোনও কারণ হল। আমি সিঙ্কে ফেলা পাস্তা আঙুলে টিপে বললাম, সেদ্ধ তো ঠিকই ছিল। আমার কথা কে শোনে! ইতিমধ্যেই নতুন পাস্তা সেদ্ধ হতে বসে গেছে।

রান্নায় মন নেই গ্যাবির। তার কথা, *তোমার একজন লিটারেরি এজেন্ট প্রয়োজন।*

--লিটারেরি এজেন্ট আবার কী জিনিস?

--লিটারেরি এজেন্ট তোমার বইয়ের ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলবে। পৃথিবীর সব দেশ থেকে এখন তোমার বই বেরোবে। রয়েলটির ব্যাপারে দরদাম করা সব বুঝবে এজেন্ট। তোমার কাজ লেখালেখি করা।

--এখন দরকার লিটারেরি এজেন্ট। তোমার কোনও চিন্তা নেই। এখন যে কোনও লিটারেরি এজেন্ট তুমি নেবে না। তোমার জন্য বড় বড় সব লিটারেরি এজেন্টরা লাইন দেবে। তুমি খুব বেছে সবচেয়ে ভালোটাকে নেবে।

গ্যাবি দ্রুত কয়েক তাড়া ফ্যাক্সের চিঠি নিয়ে আসে। মেরেডিথ ট্যাক্স লিটারেরি এজেন্টের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে চিঠি। গ্যাবি নাকচ করে দিয়ে বলল, ওতে হবে না। এ ছোট এজেন্ট। এখন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট লিটারেরি এজেন্ট লাগবে।

আমি মাথা নাড়ি। না গ্যাবি না। আমি কোনও বড় লেখক নই যে আমার জন্য অত সব দরকার হবে। বাদ দাও।

--আরে তসলিমা তুমি বোঝো না তুমি কী। এখন তুমি বিশ্ব জয় করছো। সমগ্র বিশ্ব তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

--আমার বিশ্বাস হয় না এসব। মৌলবাদিরা আক্রমণ করেছে, এ খবর চারদিকে ছাপা হয়েছে বলে এমন শুরু হয়েছে।.. কী বই ওরা চাইছে ছাপাতে?

--লজ্জা।

আমি দুহাত পিছিয়ে গিয়ে বললাম *--লজ্জা? এ বই ছাপাবার তো প্রশ্নই ওঠে না।*

--কেন?

--এ বই ইওরোপের পাঠকরা বুঝবে না। এটা তথ্যভিত্তিক উপন্যাস। বাংলাদেশের আনাচে কানাচে কার বাড়ি ভাঙল কে কেমন করে   মার খেল, এসবের বৃত্তান্ত। এটা উপমহাদেশের জন্য উপকারী, ইওরোপের জন্য নয়। এ বই আমি ছাপাতে দেব না।

--তুমি পাগল হয়েছো।

গ্যাবি দ্রুত হাত পা ছুড়তে ছুড়তে বলে,   *আমি পড়েছি লজ্জা। ইংরেজি অনুবাদ খুব খারাপ। আজকেই এটা খবর করে দেব যে লজ্জার ইংরেজি অনুবাদ খুব বাজে। তুমি তোমার প্রকাশককে এক্ষুনি বলে দাও যে যেন ভালো অনুবাদ করিয়ে তোমাকে পাঠিয়ে দেয় ম্যানুস্কিপ্ট।*

নাহ..

নাহ মানে।

--যা হয়েছে, হয়েছে। এর আবার নতুন করে কে অনুবাদ করতে যাবে।

--তুমি বুঝতে পারছো না, কী হারে তোমার লজ্জা বইটি প্রকাশ করার অনুরোধ আসবে। একটি ভালো অনুবাদ তুমি কাছে রাখো। দেরি কোরো না।

--আমি চাইনা এ বইটা ছাপা হোক ইওরোপে। কারণ এটা উপন্যাস হিসেবে খুব বাজে। লোকে এ বই পড়লে ভাববে আমি বুঝি খুব খারাপ লিখি।

--মোটেই না। মোটেই না।

এইসব কথোপকথনের মধ্যে ছিলেন ঙ। লেখালেখি নিয়ে আমার বিনয়, এবং কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর প্রতি আমার রুক্ষ ব্যবহার -- দুটোকে তিনি নিশ্চয়ই মেলাতে পারছেন না। আমি যা কথা বলছি তা গ্যাবির সঙ্গেই, ঙ যা কথা বলছেন, তাও গ্যাবির সঙ্গে। রাতের খাবারে বসার আগে আগেই এল গ্যাবির স্ত্রী পুত্র। গ্যাবি আর তার স্ত্রী লিকলিকে লেনা দরজার মুখে চকাস করে চুমু খেয়ে নেয়। এই চুমু নিয়মের চুমু। নিয়মটি বেশ আমাকে আমোদিত করে। ভালোবাসার প্রকাশ সভ্য সমাজেই হতে পারে নিয়ম। অসভ্য সমাজে প্রেম ভালোবাসার প্রকাশ অপরাধ বলে গণ্য হয়। খুন করা, ছুরি বসিয়ে দেওয়া, পিটিয়ে ভর্তা বানিয়ে দেওয়া এসবে অত ছি ছি হয় না যত হয় চুমু খেলে।

আজ রাতের রান্না সে যেমনই সাদামাটা হোক, রেঁধেছে গ্যাবি। এ দেশে এ এত স্বাভাবিক যে এ নিয়ে তারা দুজন কোনও কথা বলে না। লেনা এসে টেবিলে বসে। চারজনের বসার জন্য ছোট্ট খাবার টেবিল সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলের গ্লাস। ওয়াইনের গ্লাস। কাটা চামচ, ছুরি। ন্যাপকিন। কিন্তু আসল যে জিনিসটি, যার নাম খাদ্য, ওতেই সমস্যা। ও দেখে মনে হয় না আমি খুব তৃপ্তি করে খেতে পারবো। জলে ফোটানো পাস্তা আর সঙ্গে কাচা মাছ। গলায় ঢুকতে চায় না। না ঢুকলে কতক্ষণ জোর করে ঢোকানো যায়। এদিকে ক্ষিধেও বেঁচে থাকে, পাশাপাশি আমার বিষণ্নতাও থাকে।

ঙ চলে গেলেন পরদিন। খুব বিষণ্ন লাগছিল ঙকে, যখন পুলিশদের জিজ্ঞেস করছেন, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে কি না, কারণ তাঁকে বিমান বন্দরে যেতে হবে। কোনও একজন পুলিশ বলল, *ট্যাক্সি কেন, আমি আপনাকে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো।* শুনে কৃতজ্ঞতা থইথই করলো কণ্ঠে। যাবার আগে আমার দিকে চেয়ে, জানি না সেই চাওয়ায় কী ছিল, বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, *ভালো থেকো।* ঙ একবারও আমাকে বললেন না বিমান বন্দরে যেতে। আমি যে যাব না, তা তিনিই সম্ভবত জানতেন।

না, আমার মুখাবয়বে কিছু ছিল না। একটা পাথুরে থমথমে ভাব ছাড়া। ঙ চলে যাবার পর দীর্ঘশ্বাস আমারও পড়ে। কেন পড়ে, জানি না। কার জন্য পড়ে, কার জন্য মায়া হয়, আমার জন্য নাকি ঙর জন্য ! ঙর জন্য তো মায়া হওয়ার কথা নয়। ঙকে আমি চাইছিলামই চলে যান। আমার কাছে আসতে গেলে যাকে গোপনে আসতে হয়, তার আসার কোনও প্রয়োজন ছিল না। থাকার তো মোটেও নয়। আমি এতই কি অস্পৃশ্য যে সবাইকে জানানো যায় না যে আমাকে তিনি স্নেহ করেন বা সমর্থন করেন! কত কিছু ঘটে গেল, সেখানে ব্যাক্তি আমির চেয়ে অনেক বড় নয় কি রাজনৈতিক ঘটনাবলি! সেখানে আমার পাশে দাঁড়ানো, যেমন তিনি, লুকিয়ে থাকা সময়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যত যুক্তিই আমি দিই না কেন। সেদিনের সেই যুক্তি আমার কাছে খুব সংগত মনে হয়েছিল। কিন্তু কদিন পরই আমি যখন একা, খুব একা, চারদিকে কেউ নেই --- আমি চমকে উঠি। আমি তো ভুল করেছি। জীবনে অনেক ভুল আমি করেছি। ঙর সঙ্গে অশোভন ব্যবহার আমার সবচেয়ে বড় ভুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। জীবনে কিছু ভুল আমার শোধরানোর কোনও উপায় ছিল না, এই ভুলটি তার মধ্যে একটি।

.. আরও পরে আমার মনে হবে যে বিপদের কথা ভেবে গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন ঙ । সে ব্যক্তিগত কারণে নয়। রাজনৈতিক কারণেই। তিনি স্ত্রীকে জানাননি বলেছেন, কারণ স্ত্রীর বাইরে অন্য কোনও রমণীর সঙ্গে প্রেম করতে বেরিয়েছেন এই ভেবে নয়। তিনি জানাননি, কারণ স্ত্রী যদি অসাবধানে এ কথা বলাবলি করে, তবে সব্বনাশ। ঙর সঙ্গে আমি বুঝি যে আমি অন্যায় করেছি। যে অন্যায়ের ক্ষমা আমি কোনওদিন কারও কাছে চেয়েও পাবো না।

সংশয়ের মন আমার। কিছুতেই ওকে আমি আর সইতে পারছিলাম না। আমার ব্যবহার নিশ্চয়ই তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে, জগতের জঘন্যতম অকৃতজ্ঞ তো বটেই, কুৎসিত কৃতঘ্ন মানুষ আমি। আমি কি নিজেকে কোনওদিন ক্ষমা করেছি? না করিনি। ও সম্পর্কে সংশয়, আমার আজ মনে হয়, সম্পূর্ণই ভুল ছিল। কিন্তু অতীতে ফেরা যায় না, জীবনকে পিছনে নেওয়া যায় না। যদি যেত, তাহলে ওকে উজার করে শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানাতাম। আমার সঙ্গে দেশ থেকে অত দূর অবদি আসাকে আমি মাথায় তুলে রাখতাম। চলে যাবার তিন চার সপ্তাহ পর আমি ফোন করি ওকে। ফোনে টাকা খরচ হচ্ছে, একবারও ভাবিনি। যতক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে করে ওর, বলেছি। একসময় ওই ছেড়েছেন ফোন। তাঁর ব্যস্ততা আছে বলে। ওকে বলেছি, সুইডেনে নামার পর থেকে আমার মানসিক চাপ এত বেশি বেড়ে যায় যে, আমার পক্ষে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু ভাবার আর উপায় ছিল না। ও আমাকে ক্ষমা হয়তো করতে পারেননি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমা পাওয়ার আশাও করা উচিত নয়। জীবনে মোট দুজনের কাছে আমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছি। ও একজন। ও সত্যি সত্যি যখন চলে গেল, তখন আমি যে একা। আমি যে কোনও সঙ্গী নিয়ে সুইডেন ভ্রমণে আসিনি। তা ভেবে ভালো লাগল। কিন্তু তাতে কার কী এসে যায়। এ দেশ বাংলাদেশ নয়। এ দেশ সুইডেন। এখানে তুমি কার সঙ্গে প্রেম করছ, শুচ্ছো, এসব কোনও বিষয় নয়। তুমি একা কী দোকা তা কোনও ব্যাপার নয়। তুমি তুমিই। তুমি কী ভাবছো তুমি কী কাজ করছো সেটিই সবচেয়ে বড়।

কেবল প্রকাশক আর সাংবাদিকের আকুতি মিনতি নয়। আরও মানুষ দেখা করার জন্য গ্যাবির দ্বারে মাথা কুটছে। এর মধ্যে জিল। ক্রিশ্চান বেস। জিলকে কয়েকদিন থামিয়ে রেখে স্টকহোমে আসার সবুজ সংকেত দিল গ্যাবি। অনুমতি পেয়ে জিল প্রথম ফ্লাইটেই চলে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্স কত যে কাণ্ড করেছে আমার পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে, তার বর্ণণা দেয় জিল, গ্যাবির বাড়িতে বসেই।

জিলের যাওয়া চলবে না আমার আস্তানায়। খুব ইচ্ছে করেছিল নিয়ে যাই, যেখানে থাকি। গ্যাবি সে অনুমতি জিলকে দেয়নি। চোয়াল আমার শক্ত হতে থাকে। জিল মাথা পেতে

মেনে নেয় গ্যাবির নিষেধাজ্ঞা। মেনে নেয় কারণ মনে করে গ্যাবির সাহায্য ছাড়া আমার খুব সমস্যা হবে, যেহেতু সবদিক সামলাচ্ছে গ্যাবি, তাই সে যেভাবে বলে সেভাবেই চলা উচিত। আমার মত তা নয়। গ্যাবি, আমার ধারণা আমাকে যতটা সাহায্য করতে চাইছে, নিজেকে চাইছে তার চেয়ে বেশি। ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব রাইটার্স আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবারের কংগ্রেসে। গ্যাবি জানিয়ে দিয়েছে যে একা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে কি অন্য কারও সঙ্গে যেতে হবে? হ্যাঁ তা হবে। আমাকে যেতে হলে, সোজা কথা গ্যাবিকেও সঙ্গে যেতে হবে। এসব বলে নিজের জন্য গ্যাবি টিকিট নিয়েছে। আমার মতো সেও বিজনেস ক্লাসে লিসবন যাচ্ছে। জিল যাবে। লিসবনে ইওরোপের লেখক দার্শনিকদের সম্মেলন হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব রাইটার্স জিলের সংগঠন রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্সএর সহযোগিতায় ইওরোপের কুড়িটি দেশের কুড়িটি পত্রিকায় প্রতিদিন ছাপিয়েছে আমার পক্ষে কুড়িজন পশ্চিমের বিখ্যাত লেখকের চিঠি। আমার পক্ষে আন্দোলনে এরা অনেক বড় ভমিকা রেখেছে পশ্চিমে।

গ্যাবি ইহুদি ছেলে। হাঙ্গেরীতে জন্ম, ছোটবেলাতেই সুইডেনে চলে এসেছে। সেই থেকে এখানে। গায়ের রং ঠিক সাদা ইওরোপীয়দের মত দেখতে নয়। একটু হলদেটে। সুইডিশ মেয়েকে বিয়ে করেছে। ইহুদিরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যপার যে এই ইহুদিরাই সময় সময় নিজেরাই বর্ণবাদী হয়। গ্যাবি কি বর্ণবাদী নাকি গরিব দেশ সম্পর্কে তার ধারণা কম? গরিব দেশেও সবাই না খেয়ে থাকে না, ওখানেও ইওরোপের মতই মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণী আছে, এ তো যে কোনও শিক্ষিত লোকেরই জানার কথা। তার ওপর গ্যাবি সাংবাদিক। তার জানার পরিধি আরও বিস্তৃত হওয়াই তো উচিত। নাকি আমাকে তার মনে হচ্ছে না সত্যি বলা মেয়ে!

গ্যাবির স্তূপের কাগজগুলোর প্রথম পাতায় কেবল আমার ছবি, আমার খবর। বেশ অনেকদিন থেকেই জমেছে। কাগজগুলোয় হাত দিয়ে কিছু কি আমি নিতে পারি বলতেই গ্যাবি বলল, *বল কী, এসব দিয়ে কি করবে? আর তাছাড়া, এসব ভাষায় তুমি তো পড়তে পারবে না!*

ন পারি। সংগ্রহের জন্য তো রাখা যায়।

তুমি কত সংগ্রহ করবে। এসব হাজার হাজার।

না সংগ্রহ করা আমাকে মানায় না। এসব তুচ্ছ জিনিস। আমার থাকবে বড় অফিস। থাকবে সেক্রেটারি। থাকবে লিটারেরি এজেন্ট।

গ্যাবি যে চিত্র দেয় আমার, সেই আমাকে আমি চিনতে পারি না। অদ্ভুত সব স্বপ্ন আমার থাকলেও এরকম   নেই। আমি কদিনই বা থাকবো এখানে। দেশের অবস্থা ভালো হলেই ফিরবো দেশে। কদিন লাগবে মৌলবাদীদের আমার ফাঁসি দেওয়ার আবেগ কমতে। পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে, গ্যাবিকে, ওকে সবাইকে বলেই দিয়েছি প্রথম দিন যে দুতিন মাসেই সম্ভবত ঠিক হয়ে যাবে দেশের পরিস্থিতি।

যেহেতু সুইডিশ পেন ক্লাব তোমার অভিভাবক?

অভিভাবক মানি না আমি। হেসে বলি।

এখানে কেন, ব্যক্তিগত ঠিকানা ব্যবহার করছো কেন? কোনও অফিস নেই? সুইডিশ পেন ক্লাবের কোনও অফিস নেই। আমি গ্যাবির   বাড়ির সোফায় আরাম করে বসে

তুমি কাগজগুলো দিয়ে দাও আমাকে। আমি দেখব।

এগুলো নিয়ে তুমি কি করবে? সব আমার কাছে থাক। তুমি বিশ্রাম নাও।

জিলও একই কথা বলে। বলে যে আমি এসব কিছু বুঝবো না। গ্যাবি বুঝবে। সুতরাং গ্যাবি যে আমার জন্য এত কিছু করছে তার তুলনা হয় না। গ্যাবি যেরকম বলে আমার সেরকমভাবেই চলা উচিত।

ক্রিশ্চান বেসও এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। খবর পেয়েছি হোটেলে এসেছে। পুলিশকে বলে রেখেছে ঠিক ছটায় রেস্তোরাঁয় পৌঁছোতে। গ্যাবি এবং তার স্ত্রী আমার সঙ্গে যায় রেস্তোরাঁয়। ক্রিশ্চান আর ফরাসি লেখিকা ইরেন ফ্রেইন বসে ছিলেন আমার জন্য। যেন আমি   সারাদিন কত ব্যস্ত যে ক্রিশ্চানের সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে না। ছাইয়ের ব্যস্ত। অহেতুক বসে থেকেছি। ক্রিশ্চান আমাকে চমকে দিয়ে আমার জন্মদিন পালন করে। বিশাল

কেক আসে। *অপারশ্যালন* স্টকহোমের সবচেয়ে দামি রেস্তোরাঁ। এখানে যে সে লোক খেতে পারে না। খুব ধনী মানুষেরা এখানে আসে। ক্রিশ্চান ফ্রান্স থেকে এখানে আমার জন্মদিনের জন্য এসেছে। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সে ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলেন হোটেলের দিকে। আমার জন্য অনেক উপহার এনেছে। কার্তিয়ের কলম। শ্যানেলের শ্যানেল ফাইভ। ক্রিশ্চান ডিওরের ক্রিশ্চানের সঙ্গে এটুকু দেখাই মঞ্জুর করেছে গ্যাবি। আমার কোনও বিষয়ে ক্রিশ্চান সরাসরি আমার সঙ্গে কথা বলে না, বলে গ্যাবির সঙ্গে। ক্রিশ্চান আরও দুদিন ছিল। রেস্তোরাঁর বাইরে আর দেখা হয়নি। ভেবেছিলাম গাড়িতে করে পৌঁছে দেব ক্রিশ্চানকে হোটেলে। তা হল না। গ্যাবি বলল, না, ক্রিশ্চান বেস ট্যাক্সি করেই যেতে পারবেন।

কেন? আমি তো পৌঁছে দিতে পারি।

না।

কেন?

অসুবিধে আছে।

কী অসুবিধে।

গ্যাবি আমাকে অসুবিধের কথা গলা নিচু করে বলে। ওদিকে ক্রিশ্চানের দিকে হাত নেড়ে হেসে বিদায় জানায়। এই ব্যাবহার গুলোর আমি কোনও অনুবাদ জানি না।

অপারশ্যালনে খেতে গ্যাবি আর তার স্ত্রী খুব সেজেগুজে এসেছিল। এই রেস্তোরাঁয় গ্যাবি আরও এসেছে। আমার সঙ্গে যারাই দেখা করতে এসেছে, যাদের দেখা করতে অনুমতি সে দিয়েছে, দেখেছি দেখা হয়েছে এই রেস্তোরাঁয়।

ইয়ান হেনরিকের বাড়ি থেকে সাতদিন পর চলে যেতে হয়েছিল। কুমীরের বাচ্চা তখন ডগেনস নিহেটোরের অতিথিশালায়। গাছপালা ঘেরা ছোটখাটো একটি বাড়ি। ওখানের একটি ঘরে আমি, আরেকটি ঘরে পুলিশ। থাকার পুলিশ। বাইরে নিয়ে যাওয়া বাড়ি দিয়ে যাওয়ার পুলিশ। বাড়িতে রান্নাঘর আছে। সেই রান্নাঘরে সকালেই গ্যাবি গ্লেইসম্যান একটি সবুজ কেক নিয়ে এসে শুভ জন্মদিন জানিয়েছিল। এই রান্নাঘরে আমার খাওয়া প্রায় অসম্ভব। টিনের

কৌটোয় বছর বছর আগে যে মাছ ভেজানো ছিল। হেয়ারিং নামের একটি মাছের কৌটো খুলে দুর্গন্ধে আমি ভেসে গিয়েছি। আজকাল বাইরেই খাওয়া হয়। মারিয়া সতেনিয়ুসের বাড়িতে হলো একদিন, গ্যাবি যার সরকারি সহকারি। একদিন হল লেখক ইউজেন শুলগিনের বিশাল বাড়িতে খাওয়া। ইউজিন একা থাকে। একাই সব রেঁধেছে। খাওয়ার সময় সকলে ওয়াইন খায়। আমি ওয়াইনে অভ্যস্ত নই বলে ওসব থেকে দূরে থাকি। কাঁটা চামচ আর ছুরিতেই ভালো করে খেতে পারি না। কিছু একটা কাটতে গেলে সেই কিছু একটা ছিটকে ছিটকে যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই আমাকে অসভ্য দেশের অসভ্য মানুষ ভেবে বসে থাকে সম্ভবত সকলে। নেমন্তন্ন আসে সুয়ান্তে ভেলরের বাড়িতে যাওয়ার। নরস্টেড নামের বড় প্রকাশনী সংস্থার কর্ণধার এখন সুয়ান্তে। গ্যাবি আমাকে পাহারা দিয়ে রাখে, যেন অন্য কোনও প্রকাশনী আমার কাছে বইএর চুক্তি না করে ফেলে। সুয়ান্তে গ্যাবির বন্ধু। সুতরাং আমার সকল বই এখন নরস্টেডই ছাপাবে। গ্যাবি যত কথাই বলুক, আমি জানি আমার বইয়ের জন্য এখনে কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়বে না। এখন বই ছাপাতে চাইছে, ভাবছে বিস্ফোরক কিছু একটা লিখেছি বোধহয়। কিন্তু বাংলা থেকে অনুবাদের ব্যবস্থা কী করে হবে! লজ্জার ইংরেজি অনুবাদ খুব পাওয়া যাচ্ছে চারদিকে। কিন্তু আমি তো চাইছি না লজ্জা বের হোক। ফ্রান্সে বের হবে, সে আগেই দেওয়া হয়ে গেছে বলে। ফ্রান্সকে নিরস্ত করার আর কোনও পথ জানা ছিল না তখন। নতুন করে কাউকে আমি এ বইটি দিতে চাই না। চাই না কোনও দেশে বইটির অনুবাদ হোক। গ্যাবি জানিয়ে দিচ্ছে, যে, লজ্জার অনুবাদ ভালো হয়নি বলে আমি খুব মর্মাহত। এই প্রথম আমি ইংরেজি অনুবাদটি নিয়ে বসি। ইংরেজি বিদ্যে আমার সামান্য, কিন্তু বইটি তো ছি ছি করার মত অনুবাদ হয়নি। ওদিকে ক্রিশ্চান বেসও বলে গেলেন পেঙ্গুইনের লজ্জার অনুবাদ নাকি পড়া যায় না। আমি বলেছি, আমার বইটিই ওরকম। কে বলেছে, আসল বইটি আমি খুব ভালো লিখেছি, কেবল অনুবাদটি খারাপ? বইটি যেমন, অনুবাদটি তেমন। আর লজ্জা যে মূলত তথ্যভিত্তিক উপন্যাস, তা বারবারই স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। এই বইয়ে পশ্চিমের উন্নতমানের উপন্যাসের গুণাবলি পাওয়ার চেষ্টা করলে ভুল করা হবে।

একদিন আয়োজন হয় সুইডেনের লেখক লেখিকাদের সঙ্গে পরিচয়ের অনুষ্ঠান। নরস্টেডের প্রকাশক যেহেতু সুইডিশ পেন ক্লাবের সদস্য, তার ওখানেই হয়। এক এক করে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হল। ওয়াইন আর স্ন্যাকসএর ব্যবস্থ্যা ছিল। সবাই খাচ্ছিল আর গল্প করছিল আমার সঙ্গে। এমন সময় গ্যাবি এসে বলল, *চল, যেতে হবে।* কোথায় যেতে হবে! আসলে কোথাও যেতে হবে না। আমার বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাড়ি ফিরে কী করবো আমি? কিছুই না। চুপচাপ বসে থাকবো। আমাকে কুমীর ছানার মত একটুখানি দেখানোর ব্যবস্থা করলো গ্যাবি। সম্ভবত এসব করে নাক-উঁচু ধরনের লোকেরা। নিজের মূল্য বাড়ানোর আর কোনও উপায় না পেয়ে অনুষ্ঠানে দেরিতে ঢুকে এবং তাড়াতাড়ি ওখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তারা তা দেখায়। সত্যিকার কাজ থাকলে আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু না থাকলে মানবো কেন! গ্যাবিকে বলি, কেন বাড়ি যাবো? আমার ওখানে কাজ নেই কোনও। বরং লেখকদের সঙ্গে আলাপ করছি, ভালো লাগছে। গ্যাবি কৃত্রিম হাসিতে মুখ রাঙিয়ে বললো, এদের এত সময় দেওয়া ঠিক না। যথেষ্ট হয়েছে। হ্যাঁ গ্যাবির এই সমস্যাটি আছেই। সকলে এরপর গ্যাবিকে ধরবে, আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দাও, কথা বলিয়ে দাও। তখন সার্টের কলারের ধুলো ঝেড়ে নিয়ে হয়তো বলবে, না দেখা হওয়া সম্ভব নয়। লেখিকা এখন লেখায় ব্যস্ত বা এরকম কিছু। আমাকে ডুবিয়ে রাখা, এবং নিজের পছন্দমতো সামান্য সামান্য ভাসানোর উদ্দেশ্য আসলে আমার দাম বাড়ানো নয়, উদ্দেশ্য তার নিজের দাম বাড়ানো।

গ্যাবির বাড়িতে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে থাকা হচ্ছে কদিন। না, ভাষণ তৈরি করতে হবে। এই প্রথম ইংরেজিতে কোনও সভায় ভাষণ দেবার জন্য আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। না ঙ নেই এখন। যে মানুষটি আমাকে এই সময়ে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারতেন, তিনি ঙ। এখন নিখিলদা ভরসা। কিছু বলুন, কী বলব। নিখিলদা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন -- *সামান্য কিছু বলবে। মৌলবাদীদের আক্রমণ, তোমার লুকিয়ে থাকার দিন দেশে, কী ঘটেছে না ঘটেছে, এসব কিছু বলবে না।*

--তাহলে বলবো কী?

--বলবে যে সুইডিশ পেন ক্লাবের অনুষ্ঠানে এসেছো। নরওয়েতে অনুষ্ঠান আছে, ওখানেও যেতে হবে। ব্যস।

--ব্যস মানে? এরা তো জানে সবাই যে দেশে আমার ফাঁসির দাবি হচ্ছিল। ফতোয়ার কথা জানে। দেশ থেকে যে বেরিয়ে আসতে হয়েছে তা জানে বলেই তো পাগলের মত আমার কথা শুনতে চাইছে।

--শুনতে চাক। তুমি বলবে না। বলবে যে তুমি নারীদের জন্য লেকালেখি কর। নারীদের অধিকারের জন্য সামান্য কিছু লেখ। তোমার লেখা ইসলামি মৌলবাদিদের পছন্দ হয়নি। তাতে কী, তোমার পক্ষে প্রচুর লোক দেশে আছে। তাই তুমি নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকারের পক্ষে লিখে যাবে। ব্যাস।

--ব্যস মানে? আমার পক্ষে প্রচুর লোক দেশে আছে? এ তো মিথ্যে কথা।

--শোনো, মিথ্যে কথাই বলবে। তোমাকে তো দেশে ফিরতে হবে নাকি? দেশ সম্পর্কে একটাও মন্দ কথা বলবে না।

--দেশ সম্পর্কে বলতে যাবো কেন? যা ঘটেছে তাই বলতে যাবো।

--বলবে যে বিশ্রাম নেবে। ইওরোপটা দেখবে। তোমার দেশের নারীদের জীবন যে দেখেছো তা নিয়ে বিভিন্ন দেশে কথা বলার আমন্ত্রণ পেয়েছো. তা রক্ষা করবে। এইসব।

--যদি জিজ্ঞেস করে কবে দেশে ফিরবো?

--বলবে এখনও ঠিক হয়নি। তবে শীঘ্র ফিরবে এরকম কিছু একটা বলে দেবে।

--নাহ। সবাই বুঝবে যে এড়িয়ে চলছি। মিথ্যে বলছি। কী করে আমি বলব যে আমি ইওরোপ ভ্রমণ করতে এসেছো!! এ কোনও কথা হল!

--তুমি উল্টোপাল্টা বললে দেশে আর ফিরতে হবে না তোমার।

--সত্যি কথা বললে দেশে ফেরা হবে না?

--না। আর শোনো ফতোয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে যে ফতোয়া খুব ছোট একটা দল দিয়েছে। ফতোয়া ব্যাপারটা বাংলাদেশের আইনে অবৈধ। সরকারই অবৈধকাজকরনেওয়ালাদের শাস্তির ব্যবস্থা করবেন।

--বলছেন কী! সরকার তো করেনি, করবে না। আমার কি গুনগান গাইতে হবে সরকারের?

--হ্যাঁ।

--এই যে আমার বিরুদ্ধে সরকার মামলা করেছে, এসব উল্লেখ করব না?

--না।

--এই যে পুরো দেশ পাগল হয়ে গিয়েছিল আমাকে হত্যা করার জন্য। এসব বলব না?

--না।

--কী ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে আমাকে যে কাটাতে হয়েছে..দিনের পর দিন, রাতের পর রাত..লুকিয়ে.. !

--কিচ্ছু না। কিছু না।

--এই যে পুলিশ আমাকে রাতের অন্ধকারে বিমানে তুলে দিল। কিচ্ছু না?

--না।

অনেকক্ষণ আমি হতবাক বসে থাকি। রহস্যে মোড়া একটি জগত আমার সামনে। রহস্যের জাল আমাকে ক্রমশ ঢেকে দিচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না কেন ঢেকে দিচ্ছে। গ্যাবির কমপিউটারে লেখাটি তৈরি করে নিলাম। কমপিউটারে আমি বাংলা লেখায় চালু। ইংরেজি ধীরে লিখি। দেখে গ্যাবি বারবারই বলছে, কী ব্যাপার, তোমার লিখতে এত দেরি হচ্ছে কেন! ও কি দেরি দেখে মনে করছে যে আসলে কমপিউটারে আমি প্রথম হাত দিয়েছি। মনে মনে ভাবি, মনে করুক সে, তাতে আমার কী! তাকে শুধরে দেওয়ারই বা কী দরকার। গ্যাবি বলল, *সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার সাংবাদিক আসতে চাইছে। কিন্তু সবাইকে অনুমতি দিলে চলবে না। পাঁচশ জন ম্যাক্সিমাম। অনুষ্ঠানটি যেখানে হবে সেই সরকারি বাড়ি রাসবাড়ে*

জায়গা বিশাল নয়। ইচ্ছে করেই ও জায়গায় অনুষ্ঠান করা হচ্ছে নিরাপত্তার কারণে। নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিরাপত্তা শুনতে শুনতে আমি অতিষ্ঠ।

এখন ঙ বা ঙর মতো কেউই হাতের কাছে না থাকায় আমার সারা গায়ে *ইংরেজি না জানাটি* একটি নাছোরবান্দা মশার মত হুল ফোটাতে লাগলো। ওই হুল ফোটানোর মধ্যেই দেখি গ্যাবির কাছে আমাকে দেবার জন্য, বা আমার খবর নেবার জন্য যে চিঠিপত্র আসে সেই চিঠিপত্রের স্তূপের মধ্যে উত্তর পুরুষ নাকি উত্তর বঙ্গ নামে একটি বাংলা ম্যাগাজিন উঁকি দিচ্ছে। এটি আমাকে বিস্ময়ে বিভোর করে রেখে জানান দিল যে বের হয় বঙ্গ থেকে নয়, দূর দূরান্তের এই প্রায় উত্তর গোলার্ধের অজানা অচেনা বিভুঁই সুইডেন থেকে। সম্পাদক লোকটি নাকি গ্যাবিকে বেশ কবার ফোনও করেছে, আমার কোনওরকম দেখা পাওয়া যাবে কী না জানতে। গ্যাবি স্বভাবতই না বলে দিয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্নোত্তর গ্যাবি যতই বলছে ইংরেজিতে করো, আমি ততই বলছি অসম্ভব। আমার এই ইংরেজি দিয়ে ঘরে কাজ চালানো যায়, মঞ্চে যাবে না। আমি বাংলায় বলব, কাউকে ঠিক করো অনুবাদ করার জন্য। ফ্রান্সে তা-ই হয়েছে। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষাতে কথা বলা ফরাসিরা পছন্দ করে না। এমনকী ইংরেজি খুব ভালো জানা থাকলেও টিভিতে রেডিওতে মঞ্চে অনুষ্ঠানে ওরা দোভাষী যোগাড় করে আনবে তবু তোমার নিজের ভাষাতই কথা বলতে হবে। এর কারণ যে কেবল ইংরেজদের সঙ্গে ওদের দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলেছিল বলে ইংরেজি ভাষাকে ওরা ঘৃণা করে তা নয়, আমি দেখি এর মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি সম্মান।

গ্যাবি গম্ভীর কিছুক্ষণ। গলগল করে যা বললো তা সংক্ষেপ করলে দাঁড়ায়, এখানে ইংরেজি ভাষাতেই প্রশ্নোত্তর চালাতে হবে, কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে সাংবাদিকরা আসছে। সুইডেনের সাংবাদিক থাকবে হাতে গোনা। বিদেশি সাংবাদিকই বেশি। ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, ব্রিটেন, অষ্ট্রিয়া, সুইৎজারল্যাণ্ড, পর্তৃগাল আমেরিকা, কানাডা,অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান সব দূর দূর দেশ থেকে টেলিভিশন এবং সব চেয়ে বড় পত্রিকার সাংবাদিকরা উপস্থিত। তারা

আগেই থেকেই এসে আমন্ত্রণ পত্র যোগাড় করছে। অনুমতির কাগজ ছাড়া কোনও পোকারও ঢোকা চলবে না।

পোকারও ঢোকা চলবে না?

গ্যাবি মাথা নেড়ে বললো, *চলবে না।*

গ্যাবি সেই বাঙালি-সম্পাদক গজেন্দ্র না নরেন্দ্রকে ফোন করে আমাকে দিল। আমার জিজ্ঞাসা, আপনি কি অনুবাদ করতে পারবেন? বাংলা থেকে সুইডিশ? গ্যাবি গ্যা গ্যা করে তেড়ে এল, সুইডিশ হলে চলবে না। বাংলা থেকে ইংরেজি? না, তা তিনি পারছেন না। তবে পারছেন কী? পারছেন স্টকহোমবাসী কুষ্ণা দত্তের ফোন নম্বর দিতে, তিনি নাকি বেশ ভালো। ভালো শুনে লাফিয়ে উঠলাম, ভরা নদীতে ভাসতে ভাসতে কিনারার খোঁজ পেয়ে যেমন লাফিয়ে ওঠে ডিঙিনৌকো, তেমন। কৃষ্ণা দত্তের সঙ্গে ফোনে কথা বলে ঠিক করে নিলাম কখন কোথায়। ওপারের মানুষটিকে না দেখেই দেবী দেবী বলে মনে হচ্ছিল। আপাতত সমস্যার সমাধান তো হল। নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

সেদিন শাড়ি পড়লাম আমি। হলুদ বালুচরি। এর মধ্যে আবার অল্প সিগারেট খাওয়া শুরু করেছি। যেখানে সেখানে সিগারেট খাচ্ছি। যে জায়গায় খাওয়ার নিয়ম নেই আমার জন্য সেই জায়গাতেই জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের গাড়িতে সিগারেটের নিয়ম নেই। কিন্তু আমার জন্য নিয়ম ভাঙা যায়। ভিআইপিরা নাকি নিয়ম ভাঙলে ক্ষতি নেই। আমি ভিআইপি। আমি সেলিব্রিটি। আমি স্টার। সুপারস্টার। আহ। আমি যে কত কী! তা আমার চেয়ে বেশি জানে আমার আশেপাশের মানুষ। অনুষ্ঠানে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা। কোনও তৃতীয় বিশ্ব বা কোনও মুসলিম দেশের সাংবাদিককে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। অনেকক্ষণ ধরে তল্লাশি করার পরই তাদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে, যাদের ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বড় বড় সাংবাদিক, তাতে কী! সকলকেই মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে আপাদমস্তক পরীক্ষা করে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। বিকেলে অনুষ্ঠান, সকাল থেকেই দীর্ঘ লাইন। ক্রিশ্চান বেসও চলে এসেছেন প্যারিস থেকে। সঙ্গে লজ্জা। বই বেরিয়ে গেছে ফরাসি ভাষায়। বইটি হাতে নিয়ে   মলাটের

ছবি দেখি, ভিতরে একটু উল্টে পাল্টে রেখে দিই। পড়ার জো নেই। বাংলা বই হলে লুফে নিয়ে তক্ষুনি পড়তে শুরু করে দিতাম, কোথায় কোনও ভুল হয়েছে কী না দেখতে। কোনও বানান ভুল, কোনও বাক্যে গোলমাল। প্রকাশকের সঙ্গে হয়ে যেত একচোট। ভুল নেই, এমন বই আজ অব্দি আমার ভাগ্যে জোটেনি। ক্রিশ্চান বেস মরিয়া হয়ে উঠেছেন নতুন বই ছাপানোর জন্য। এসে অবদি বারবারই বলছেন, নেক্সট বইয়ের ম্যানুস্ক্রিপ্টটা দিয়ে দাও। দিয়ে দাও। ধনীর ধনী তিনি। প্যারিসের অতিআধুনিক রুচিশীলা মননশীলা রমণীর সাজপোশাক ঠিক কেমন হতে পারে, ক্রিশ্চান ডিওর, শ্যানেল,   ইভ সাঁ লঁরও- ঠিক কী, ক্রিশ্চান বেসকে না দেখলে আমার ধারণা হত না।

মঞ্চে গ্যাবি, পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্গারেটা উগলাস, সংস্কৃতিমন্ত্রী বির্গিত ফ্রিগেবো, আমি, আমার পাশে কৃষ্ণা দত্ত, আমার অনুবাদক।   অশান্তির শেষ ছিল না সত্য লুকিয়ে রাখতে। যেন কিছুই হয়নি, আমি নাচতে নাচতে হাসতে হাসতে বগল বাজাতে বাজাতে সুইডেনের আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি। যেন আমি ইহজনমে ইসলাম নিয়ে কোনও কটু বাক্য উচ্চারণ করিনি। যেন কেউ কখনও মামলা করেনি আমার বিরুদ্ধে। আমাকে রাতের অন্ধকারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দৌড়োতে হয়নি। যেন আমার মত সুখী এবং স্বস্তিকর জীবন কেউ যাপন করে না। এসব বলতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কিন্তু একটি আশংকাই আমাকে দিয়ে এসব বলিয়েছে -- এসব না বললে দেশে যাওয়ার পথ আমার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আর যে পথই আমার বন্ধ হোক, দেশের পথ যেন বন্ধ না হয়। আমি তা কিছুতেই, কোনও কিছুর বিনিময়েই চাই না। আমি ফিরতে চাই দেশে, এই মুহূর্তে হলে এই মুহূর্তেই। সাংবাদিকরা টগবগ করছে উত্তেজনায়।

দেশে কী কী ঘটেছিল?

তেমন কিছু না।

মৌলবাদীদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

বলার কিছু নেই।

হঠাৎ দেশ ছেড়ে এখানে এলেন কেন?

এলাম অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বলে। নরওয়েতেও যেতে হবে, ওখানেও আমন্ত্রিত।

কদিন থাকব, কবে যাবো। অ্যাসাইলাম কি এই দেশেই? সঙ্গে সঙ্গেই আমার জবাব, এ কোনও নিখিল সরকারের আদেশ অনুরোধ অনুয়ায়ী নয়, *আশ্রয় আমি কোনও দেশেই চাইব না, কোনও দেশেই আমি বাস করতে যাচ্ছি না। আমি নিজের দেশে ফিরে যাবো।*

যেতে কি পারবেন?

নিশ্চয়ই পারবো। নিজের দেশে না যেতে পারার তো কিছু নেই।

কিছু নেই বলেছি। কিছু নেই তা বিশ্বাসও করি বলেই বলেছি। অমনই তো জানতাম। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কি জানতাম আর যা কিছুই পারা হোক, দেশে যেতে পারাটি আমার হবে না!

আপাতত দেখা যাক আমার অনুবাদক কী করছেন। আমি বলি সাতটি বাক্য, উনি বলেন একটি। আমি বলি, *যে মেয়েরা নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে আদৌ সচেতন নয়, তাদের ভেতর আমি সচেতনতা জাগাতে চাই। সচেতন এবং স্বনির্ভর মেয়েদেরই দরকার এই সমাজে। মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার (ধর্মীয় ব্যবস্থাকে উহ্য রাখতে হয়েছে।) নির্মম শিকার। এই পুরুষতন্ত্রই মেয়েদের হাজার বছর ধরে শেখাচ্ছে যে তারা পুরুষের দাসি, শেখাচ্ছে তারা ভোগের সামগ্রি, শেখাচ্ছে নত হতে, নম্র হতে, লজ্জাশীলা হতে। শেখাচ্ছে সতীত্ব বজায় রাখতে, শেখাচ্ছে মাতৃত্বেই নারী জন্মের সার্থকতা। সুস্থ ও সচেতন মানুষের কাজ রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।* ...... এরকম আরও চারটে বাক্যের পর সাকুল্যে অনুবাদ যা জুটবে তা হল *দ্য উইম্যান আর আনপ্রিভিলেজড।* এই বাক্যটি উচ্চারিত হওয়ার সময় কণ্ঠ কাঁপবে। কাঁপা কণ্ঠটির দিকে আমি বড় বিস্ময়ে বড় ভয়ে তাকিয়ে থাকবো। বলবো, *কী ব্যাপার, আরও বলুন। অনুবাদ তো হল না আমি যা বলেছি তার!*

আমি যেন এই ভাষাটির কিছুই জানি না এমন ভঙ্গীতে কৃত্রিম হেসে মাথা নেড়ে বলবেন, *হয়ে*

গেছে।

কী হয়ে গেছে?

অনুবাদ।

আমার কাছে তো মনে হল না।

হায়! এ আমারই ভুল। আমারই রচিত ফ্রাঙ্কেনস্টাইন আমাকেই ছিঁড়ে খাচ্ছে। তুমি বিদেশে থাকো বলে তুমি ইংরেজি জানবে তার তো কোনও কারণ নেই। আমি বিস্তর কথা বলি, উনি একটি সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ বাক্যে তা সারেন। কী সারেন তা তিনি নিজেই জানেন। আমি বাংলায় যা বলছি, আপনি পুরোটা অনুবাদ করছেন না কেন! পাথর হয়ে থাকেন উত্তরে। তিনি কি এত বড় জনতার সামনে পড়েছেন আগে! না। মঞ্চে উঠেছেন অনুবাদ করতে আগে! এমন মঞ্চে, যে মঞ্চের দিকে চেয়ে আছে লক্ষ লোক! যে মঞ্চের সবকিছু সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে সরাসরি ইওরোপের কয়েকটি টেলিভিশনে, সুইডেনের জাতীয় চ্যানেলে! না। অনুবাদ জীবনে যা করেছেন, তা বাংলা থেকে সুইডিশ, কিন্তু বাংলা থেকে ইংরেজি? না। সুতরাং গোল বাঁধবেই। কৃষ্ণা দত্তর হাতে শাখা এবং পলাই শুধু নয়, লোহাও পরা। স্বামীর অমঙ্গল তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। তার সঙ্গে সেদিনই আমার শেষ দেখা হতে পারতো। কিন্তু আমার কারণেই সম্পর্কের আঠাটি তখনও রয়ে গেল। বই বের করবে নরস্টেড। নরস্টেড বই অনুবাদ করবে ফরাসি ভাষার বই থেকে। ইংরেজি থেকে নয়। এলিজাবেথ উলে নামের এক সুইডিশ লেখিকা ফরাসি ভাষা জানে সুতরাং ও থেকেই হবে অনুবাদ। বাহ বেশ ভালো কথা। ফরাসি ভাষার বই বেরিয়ে গেছে। ফ্রান্সে বেস্ট সেলার লিস্টে বই। আমি অত দিকে তাকাই না। আমার কথা হচ্ছে, ফরাসি ভাষায় ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। এরকম তো কথা ছিল না। লজ্জার বাংলা বইটি তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল ওপরের প্রচ্ছদ খুলে, অন্য প্রচ্ছদে মুড়ে। যেন বাংলাদেশ পোস্টাপিসের কেউ না বুঝতে পারে তলে লজ্জা আছে। বাংলা বইয়ে লাভ কী হল। ফরাসি প্রকাশক নাকি বাংলা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করার কাউকে পায়নি, তাই ইংরেজি থেকেই করেছে অনুবাদ। এর মধ্যে

ইংরেজি এবং বাংলা লজ্জা আমি মিলিয়ে দেখেছি কিছু ভুল টুটুল বসু করেছে, যেগুলো খুব মারাত্মক। আমি সুয়ান্তে ভেইলরকে বললাম, তোমরা বাংলা থেকে অনুবাদ করো। ফরাসি ভাষায় ভুল আছে। বাংলা থেকে করতে হলে কাকে দিয়ে করাতে হবে? কোনও সুইড কি জানে বাংলা ভাষা? দেখা গেল কেউ জানে না। অতএব কৃষ্ণা দত্ত। ঠিক আছে মহিলা বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ না হয় না জানতে পারলেন, বাংলা থেকে সুইডিশ ব্যাপারটি তো বুঝতে পারবেন। ঠিক হল এলিজাবেথ অনুবাদ করবে ফরাসি থেকে। কিন্তু এলিজাবেথের কোনও ভুল হচ্ছে কি না তা বাংলা বই থেকে মিলিয়ে দেখবে কৃষ্ণা। সুতরাং অনুবাদের কাজটি দেখা গেল আমার অনুরোধে বা দাবিতে দুজন করছে। কৃষ্ণা মোটা অংকের টাকা পাচ্ছে। পাক। অন্তত বইটি যদি ভালো হয়। সুয়ান্তেকে বলেছিলাম *লজ্জা* না করে বরং আমার অন্য কোনও বই প্রকাশ করতে পারতেন। সুয়ান্তে বলেছে আগে তিনি লজ্জা করবেন, তারপর বাকিগুলো। আমি ঠিক বুঝি লজ্জা বইটির নাম হয়েছে বলে লজ্জা বইটিই সব প্রকাশক চাইছে। কেন নাম হয়েছে? কিছু সাংবাদিক ভেবেছিল সালমান রুশদির ফতোয়ার পিছনে যেমন একটি বই আছে, আমার ফতোয়ার পিছনেও নিশ্চয়ই কোনও একটি বই আছে। কী বই, কোন বই খুজতে খুঁজতে যেই দেখলো আমার একটি বই কিছুদিন আগে সরকার নিষিদ্ধ করেছে, ধরে নিল মোল্লারা আমার মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে, নিশ্চয়ই লজ্জা নামের বইটির জন্য। ব্যাস। হই হই। রই রই। লজ্জা লজ্জা লজ্জা। লজ্জা ভারতে বিক্রি হয়েছে, বিজেপি এটিকে ছাপিয়ে বিক্রি করেছে, সেটির কারণ আছে। সেটি ফতোয়া বা মোল্লাদের ফাঁসি চাওয়া ব্যপার নয়। সেটি তাদের রাজনৈতিক কারণে করেছে। দেখ বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন কেমন হচ্ছে। উপমহাদেশে, যেহেতু হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা এখানে একটি বড় বিষয়, এই বইটির একটি গুরুত্ব আছে, থাকা স্বাভাবিক। আমি বলছি না বইটি উপন্যাস হিসেবে খুব বড় কিছু বিশাল কিছু। গুরুত্ব এইজন্য যে বইটিতে তথ্য আছে। ধর্মের কারণে কিভাবে কখন মানুষকে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে, তার তথ্য খুঁজলে লজ্জার দরকার হতে পারে। কিন্তু পশ্চিমের পাঠক হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা সম্পর্কে কী জানে? কিছুই জানে না। ভারত বলতে তারা বোঝে হিন্দি।

হিন্দি বলতেই হিন্দু। কোনটি ভাষা, কোনটি ধর্ম -- তাই আলাদা করতে জানে না। সেই হিন্দু কি, কী তাদের রাজনীতি, বেশির ভাগই কিছু জানে না। গান্ধির নাম শুনেছে অনেকেই। ভারতে যাদের যাওয়া আসা আছে, তারা সাধারণের চেয়ে সামান্য বেশি জানে, দিল্লি বোম্বে জানে, সকলেই। বাংলাদেশ দেশটি কোথায় বেশির ভাগই সে খবর জানে না। কেউ কেউ শুনেছে দেশটির নাম, তবে ঠিক কোথায় তা জানে না। যারা দেশটির নাম জানে, তারা জানে জর্জ হ্যারিসন বাংলাদেশ নামে গান গেয়েছিল বলে। কেউ জানে কোনও বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্টের সঙ্গে কখনও কথা হয়েছিল হয়ত, তাই। এখানে তবে লজ্জা বইটি প্রকাশের কী অর্থ? লোকে এখন আমাকে চেনে জানে মানে। আমি কী করেছি? নারী আন্দোলন করেছি। ইসলামের সমালোচনা করেছি। এখন বই ছাপা হলে লোকে ঝাঁপিয়ে পড়বে এ দুটো খোঁজার জন্য। এ দুটোর সামান্যও কিছু কি পাবে বইয়ে? এককথায় সাদা কথায়, সোজা কথায়, পাবে না। তবে কী পাবে? পাবে একগাদা তথ্য। যে তথ্য দিয়ে তাদের করার কিছু নেই। সুতরাং লজ্জা বইটি পড়ে আমাকে গালি গালাজ ছাড়া আর কিছুই করবে না। আমি ফরাসি প্রকাশক ক্রিশ্চান বেসকে, সুয়ান্তে ভেইলরকে এবং আরও প্রকাশকদের একই কথা জানিয়ে দিয়েছি। এবং এ কথা জোর দিয়ে বলেছি, দেখ এই তোমরা যারা আমার বই প্রকাশের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছো, এই তোমরাই আমার থেকে মুখ ফেরাবে একদিন। তোমাদের উচিত প্রথম বই হিসেবে আমার এমন একটি বই নির্বাচন করা যেটি পড়লে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হবে, এবং তারা অন্তত অনুধাবন করতে পারবে আমি মূলত কী বিষয়ে লিখছি, এবং কেন লিখছি। আমাকে আমার লড়াইকে তারা সামান্য হলেও জানতে পারবে। সে যদি ইচ্ছে হয় তোমাদের, আমার যে লেখাগুলোর জন্য মোল্লারা ক্ষিপ্ত হয়ে ফতোয়া দিয়েছে, যে কারণে লক্ষ লক্ষ লোক ফাঁসি দাবি করছে, সেই কলামগুলো ছাপাও।

না, তাঁরা তা করবেন না। আমি গ্যাবিকে জানিয়ে দিই যে আমার সাহিত্য-দূত-এর কোনও প্রয়োজন নেই, অত বড় লেখক আমি নই, ঝামেলায় গিয়ে কাজ নেই। আমিই এদের এক এক করে চিঠি লিখে দিচ্ছি। গ্যাবি আমাকে প্রকাশকদের চিঠিগুলো দিয়ে দেয় মন খারাপ

করে। জার্মানির প্রকাশক হফম্যান এণ্ড কাম্পে, খুব বড় প্রকাশক, বলছে অগ্রীম টাকা দেবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। এত টাকা ঠিক দেখতে কেমন, এত টাকার কথা ভাবতে কেমন তা আমি জানি না। আমি লক্ষ করলাম টাকার অংক আমাকে মোটেও কাতর করছে না। যে প্রকাশক পাঁচ হাজার ডলার অগ্রীম দেবে বলছে, তার সঙ্গেও আমি একই ব্যবহার করছি, পঞ্চাশ হাজারের সঙ্গে যেমন করেছি। নরওয়ে থেকে তিনজন প্রকাশক চিঠি লিখেছিলো, একজনকে বেছে নিয়েছি, যাকে গুলিতে জখম করেছিল মুসলমান মৌলবাদীরা। তাঁর দোষ, তিনি সালমান রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস বইটি প্রকাশ করেছিলেন। মৌলবাদীদের গুলিতে রুশদির জাপানের প্রকাশক মরেছেন, নরওয়ের প্রকাশক উইলিয়াম নিগর বেচেঁছেন।

ওই প্রেস কনফারেন্সেই আমাকে দেওয়া হয় একশ পঞ্চাশ হাজার সুইডিশ ক্রোনার। সংস্কৃতি মন্ত্রী বির্গিত ফ্রিগেব আমার হাতে তুলে দিলেন কুর্ট টুখোলস্কি পুরস্কার। আগের বছর এই পুরস্কারটি পেয়েছেন সালমান রুশদি। দেড়লক্ষ ক্রোনার। যদি ছ টাকা করে ধরা হয় এক ক্রোনার, তাহলেও তো ন লক্ষ টাকা। পুলিশ পরিবেষ্টিত আমি ড্রটনিঙ্গ গতানের নরডিয়া নামের একটি ব্যাংকে একাউন্ট খুলে এলাম। ব্যাংকেও সকলে আমাকে চিনলো। অফিসে দোকানে রাস্তা ঘাটে ঘরে বাইরে যেখানেই যাই, সকলে চিনে ফেলে আমাকে। সকলের সম্ভাষন পাই। অভিনন্দন পাই। দেড়লক্ষ ক্রোনারের চেয়েও মূল্যবান মনে হয় মানুষের ভালোবাসা। টাকা উড়তে থাকে হাওয়ায়। হেলায় খেলায়।

শীতের দেশ, শীতকাল না হলেও শীত। গ্যাবির বউ লেনা দোকানে নিয়ে বিশাল এক ওভারকোট আর বুটজুতো কিনে দিয়েছিল। ব্যাংকের টাকা জমা হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই লেনার টাকা মিটিয়ে দিই। বুট জুতো। এরকম জুতো আমার পরার অভ্যেস নেই। দেশে স্যাণ্ডেল পরেছি। জুতো পরলেও অন্যরকম জুতো। এরকম তো ঢাউস মিলিটারি বুট নয়। এখন, লেনা বলল, শীত আসছে, তুমি এ জুতো না পরলে মরবে। মরবো? মনে মনে হাসি, আমাকে আর তোমরা মৃত্যুর ভয় দেখিও না। এই যে শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট স্টকহোম, চারদিকে সুনসান নিরবতা, ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই ঘটে না যে দেশে, সকলে এত সাবধানে

নিয়ম মেনে জীবন যাপন করে, দুর্ঘটনারও অস্তিত্ব নেই বললেই চলেএখানে আর কিছু এলেও মরণ আসার জো নেই।

স্টকহোম শহরে কিছু ঘুরে বেড়ানো হয়েছে। গ্যাবিই নিয়ে গেছে এদিক ওদিক। এই নিরালা নির্জন শহরটিকে যত পারি দেখে নিচ্ছি। ছবির মত সুন্দর দেশ। পোস্টকার্ডের মত সব কিছু। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, নারী পুরুষের অধিকার বিষয়ে আমি একটু একটু করে তথ্য পেতে থাকি। স্টকহোমে খানিকটা ঘোরা হয়েছে আমার। হেঁটে, গাড়িতে, রাস্তায় পার্কে, লেকের ধারে, নদীর ধারে, টিলায়, সমতলে। যেটুকু হয়েছে তাতে আমি বিস্মিত। আমি তো কেবল সৌন্দর্য দেখি না শহর বা শহরতলির গ্রামের। যে পাশে থাকে আমার একটি স্বভাবই হয়ে গেছে প্রশ্ন করা। জনসংখ্যা কত, আট কোটি। আয়তনে কত বড় দেশ? এত। গুনে দেখি বাংলাদেশের প্রায় পাঁচ গুণ বেশি। শিক্ষিতের হার কত? প্রশ্ন শুনে চমকায় মানুষ। এখানে সবাই শিক্ষিত। ন ক্লাস অবদি পড়া সবার জন্য বাধ্যতামূলক। বাবা মা বাচ্চাকে ইস্কুলে না পাঠালে সরকারের লোক এসে বাচ্চাকে ঘরবার করে ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসে। বাচ্চা জন্মানোর পর সেই বাচ্চার দায়িত্ব বাবা মার চেয়ে বেশি সরকারের। রাষ্ট্রের নাগরিককে বাবা মা লালন পালন করছে, সে সরকারি টাকাতেই কিন্তু করছে। ওই তেরো চৌদ্দ বছর বয়স অবদি। এর মধ্যেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই যায় ছেলেমেয়ে। বাপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজেরা সরকারি শিক্ষাভাতা নিয়ে জীবন যাপন শুরু করে দেয়। পৃথিবীর যে কোনও দেশের চেয়ে সুইডেনে ওয়েল ফেয়ারের নিয়মটি সবচেয়ে ভালো। রাষ্ট্রই রাষ্ট্রের নাগরিকের সব রকম দায়িত্ব নেয়। খাওয়া পরা আরাম আয়েশ করার সব রকম ব্যবস্থাদি রাষ্ট্রই বিতরণ করে। তারপর শিক্ষা চিকিৎসা। রাষ্ট্রই ব্যাবস্থা করে প্রত্যেকের জন্য। আরও একটি জিনিস আমাকে তাজ্জব করে দিয়েছে, তা হল গণতন্ত্র। এমন সুন্দর গণতন্ত্র পৃথিবীর আর কোথাও আছে বা থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। জানতে চাই প্রতিদিন নানান জিনিস। জানি যত, জানার আগ্রহ তত বাড়তে থাকে।

বির্গিত ফ্রিগেবো একদিন আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। বির্গিত সংস্কৃতি মন্ত্রী। পোশাক এমন পরেন যে স্তন বেরিয়ে আসে বাইরে। দেখে আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। কই কেউ তো কিছু বলছে না! কেউ তো নিন্দা করছে না। বির্গিতের ইচ্ছে করে ওসব পোশাক পরতে, তাই তিনি পরেছেন। খাওয়ালেন বিশাল প্রাসাদোপম রেস্তোরাঁয়। বিশাল বিশাল জায়গায় বিশাল বিশাল খানাপিনার ব্যবস্থা। মন্ত্রী, ভাবা যায়, দেশের! এরা এত সহজ, আন্তরিক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশছে। অথচ ওদিকে বাংলাদেশে প্যাঁ পুঁ করে মন্ত্রীদের গাড়ি আগে চলে।

সাংবাদিক যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছিল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, অনেকদিন স্টকহোমে বসে ছিল। খালি খালি বসে থাকেনি, গ্যাবির হাত পা ধরতে যা করতে হয় তাই করেছে। আমার একটি সাক্ষাতকার পাবার আবদার। গ্যাবি না বলে দিয়েছে। বিবিসি, সিএনএন, গার্ডিয়ান, লা মন্দ, সুডয়েৎ জাইটুং, সবাইকেই এক বাক্যে না। এর মধ্যে একজন দেখি ম্যানেজ করেছে গ্যাবিকে। নাম তার মেরি অ্যান উইভার। ওকে ম্যানেজ করতে পারলেই আমার নাগাল পাওয়া যাবে। ওকে আয়ত্ত্ব করার পদ্ধতি হল ওর পুরো পরিবারকে বড় রেস্তোরাঁয় খাওয়ানো। গ্রাণ্ড হোটেলের রেস্তোরাঁ হতে পারে, অথবা অপারশেলন। এখানে এসে গ্রাণ্ড হোটেলেই উঠেছেন মেরি অ্যান। গ্রাণ্ডেও খাওয়ানোর আয়োজন হয়েছে। বেশ্যার দালাল আর *সেলিব্রিটির* সেক্রেটারির গতিপ্রকৃতি অনেকটা একই রকম। মেরি অ্যান গ্যাবিকে খাইয়ে দাইয়ে আমার সাক্ষ্যাৎকার নেবেন। নিউ ইয়র্কারের সাংবাদিক মেরি অ্যান কোথায় না ধাওয়া করেছেন আমাকে! বাংলাদেশে গেলেন, আমি তখন অতলে অন্তরীণ। মেরি অ্যান দেশ ময় আমাকে তখন বুঝছেন। বাড়ির লোকেরা বলে দিয়েছে আমি কোথায় তারা কেউ কিছু জানে না, তা তিনি বিশ্বাস করতে চান না। বয়স অনেক, তবু ক্লান্তিহীন তাঁর ভ্রমণ। শুঁকে বেড়াচ্ছেন এদিক ওদিক, যেন আমার গন্ধ পেয়ে গিয়ে কামড়ে তুলবেন আমাকে সাক্ষাৎকারের জন্য। ঢাকা ময়মনসিংহ তন্ন তন্ন করে খুঁজে আমাকে না পেয়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে অগত্যা কথাবার্তা গপ্প সপ্প করে এখন এই সুইডেনে। কী দরকার! *নিউ ইয়র্কার* পশ্চিমের খুব নামকরা সাহিত্য পত্রিকা। বলা যায় এক নম্বর। তাতে কী! তাতে কী

মানে? সাক্ষাৎকার দিতে হবে। গ্যাবির গোঁ। সাক্ষাৎকারের চেয়ে আমার ইচ্ছে সাক্ষাতের। যে মানুষটি মাত্রই আমার দেশ ঘুরে এসেছেন, আমার স্বজনদের সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁকে আমার স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে। যদি সেই স্পর্শ থেকে দেশের ছোঁয়া পাই খানিক। মেরি অ্যানকে স্পর্শ করি। হাতদুটো ধরে রাখি যে হাত স্পর্শ করেছে সম্ভবত আমার মায়ের হাত, আমার বাবার, দাদার, বোনের। সেই হাত। সেই হাত আমার হাতের চেয়ে ভিন্ন বটে। রঙে এবং রেখায় ভিন্ন। কিন্তু সেই হাতের দিকে তাকালে অনুভব করি উষ্ণতা। মেরি অ্যান আমার ভিতরের কিছুই দেখতে পেলেন না, কিন্তু তিনি তুমুল আনন্দিত   এই ভেবে যে আমার ভিতরের সমস্ত খবর তিনি পেয়ে গেলেন এবং নিয়ে গেলেন।

মেরি অ্যানের গা থেকে ভেসে আসতে থাকা দেশের সুগন্ধ নিতে নিতে মনে মনে বলি --

দেশ তুমি কেমন আছো?
কেমন আছো দেশ তুমি?
তুমি দেশ আছো কেমন?
আছো তুমি কেমন, দেশ?

আমার তো পরান পোড়ে তোমার জন্য,
তোমার পোড়ে না?
আমার তো জীবন ফুরোয় তোমাকে ভেবে,
আর তোমার?
আমি তো স্বপ্ন দেখে মরি, তুমি?

আমার ক্ষতগুলো, দুঃখগুলো
চোখের জলগুলো গোপনে সামলে রাখি।
গোপনে সামলে রাখি উড়ো চুল, ফুল, দীর্ঘশ্বাস।

আমি ভালো নেই, তুমি ভালো থেকো প্রিয় দেশ।

দূরদ্বীপবাসিনী

হঠাৎ একদিন আমাকে ডগেনস নিহেটোরের অতিথিশালা থেকে সাত সকালে উঠিয়ে গ্যাবি বলল, *চল অন্য বাড়িতে চল।* সুটকেস গুছিয়ে রওনা দিলাম অন্য বাড়ির উদ্দেশে। যে বাড়ির নাম ঠিকানা কিছুই আমি জানি না। সুইডিশ পেন ক্লাবের এক সদস্যকে রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হল গাড়িতে। সদস্যের নাম লিলিয়ানা। জন্মেছে যুগোশ্লাভিয়ার মন্টেনিগ্রোতে। বহুকাল সুইডেনে আছে। প্রেম করে, প্রেম অবশ্য সম্পূর্ণই চিঠিতে, এক সুইডিশ লোককে বিয়ে করেছিল। অতপর এদেশে এসে বিয়ে করে পাকাপাকি থাকাথাকি। বাচ্চা কাচ্চা আছে। লিলিয়ানা চমৎকার মেয়ে। অনর্গল কথা বলছে আর হাত পা মাথা নাড়ছে। ও বলেই ফেলল, ও জাতে সুইড নয় বলেই এমন উচ্ছল, এমন প্রাণবান। লিলিয়ানাকে মনে হয় দীর্ঘদিন চিনি। সম্ভবত তাকে আপন মনে হওয়ার কারণ সে এদেশি নয়, বড়লোক দেশের মেয়ে নয়। সুইড নয়, এমন মানুষকেই, এখন এমন হয়েছে, যে, যত সে দূরের হোক, যত সে অল্প পরিচিতই হোক, মনে হয় কাছের মানুষ। লিলিয়ানা সাংবাদিক। পেন ক্লাবের সদস্য। গ্রীস্ম কাটানোর জন্য তার একটি বাড়ি আছে একটি দ্বীপে। সেই দ্বীপেই আপাতত

আমাকে নেওয়া হচ্ছে। দ্বীপ শুনে প্রথমেই দেশের টেকনাফ বা মহেশখালি দ্বীপের কথা মনে আসে। রোমাঞ্চ লাগে।

কিন্তু দ্বীপে যাবার কারণটি কী? আমি প্রশ্ন করি।

কারণ আছে। কারণ ছাড়া কী আর যাওয়া হচ্ছে!

কারণটা জানতে চাইছি খুব।

কারণটি ওখানে তোমাকে এখন থাকতে হবে।

হঠাৎ দ্বীপে কেন? শহর কী দোষ করলো।

শহরে খুব গণ্ডগোল।

তার মানে?

স্টকহোম শহরটা অসহ্য। এত শব্দ, এত গাড়ি, এত মানুষ --ও শহরে লেখালেখি করা অসম্ভব। সুতরাং এখানে, এই ইউস্তেরো দ্বীপে অগাধ নির্জনতা, এখানে জনজীবনের বাইরে বসে তুমি লেখ। আমরাও লেখার প্রয়োজনে দ্বীপে চলে আসতে চাই। কিন্তু দশটা পাঁচটা চাকরি আমাদের সেই স্বাধীনতা দেয় না।

আমি চুপ হয়ে যাই শুনে। ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকি। বোকা লাগে আমাকে দেখতে। ওরা ভাবছেও আমাকে বোকার হদ্দ। ওদের কি ধারণা আছে আমি কোন দেশ থেকে এসেছি, সে দেশটি কেমন!

কিছুটা গণ্ডগোল না হলে, কিছুটা শব্দ না হলে আমি লিখতে পারি না। বলি আমি।

আমার কথায় দুজনই হেসে উঠলে, গাড়ির পুলিশরাও। সবাই ভেবেছে আমি মজা করছি।

ওদের কি ধারণা আছে স্টকহোম শহরটিকেই যে আমার মরুদ্যান বলে মনে হয়েছিল, সেই মনে হওয়ার কারণ? না, ধারণা নেই। স্টকহোম শহর সুইডেনের লেখক কবিদের কাছে খুব ভিড়ের শহর, খুব উৎপাতের শহর, খুব দুষিত বাতাসের শহর, খুব কান ঝালপালা করে দেওয়ার শহর বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা মনে হওয়ার কথা নয়। আমি এসেছি তেরো কোটি লোকের দেশ থেকে। যেখানে একহাজারের চেয়ে বেশি লোক বাস করে

এক বর্গমাইলেরও কম এলাকায়। আর এখানে খাঁ খাঁ করে শহর গ্রাম জনপথ। একটু শব্দ চাই,একটু মানুষ চাই, মানুষের ভিড় চাই। তা না হলে আমার লেখা হবে না। ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি লিখতে পারি না। ভাবনার ভেতর ভূতুড়ে ভয় ভিড় করে থাকে।

ইওস্তেরো নামের একটি দ্বীপ ভাসছে বাল্টিক সমুদ্রে। বাল্টিক, যে সমুদ্রের কোনও জোয়ার ভাটা নেই। বাল্টিকের দ্বীপগুলোয় মানুষের আছে বছরে এক দুমাস থাকার জন্য বাড়ি। সুইডিশরা প্রকৃতির কাছে বাস করতে ভালোবাসে খুব। তাই প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই আছে অন্তত একটি করে গ্রীস্ম-বাড়ি। লিলিয়ানার গ্রীস্ম-বাড়িটি টকটকে লাল। বাড়ি থেকে দশ কদম হাঁটলেই সমুদ্র। আমাকে বাড়ি বুঝিয়ে দিয়ে কোথায় কী আছে না আছে, বুঝিয়ে দিয়ে রান্নাঘর, বৈঠকঘর, লেখার ঘর, খেলার ঘর, ওপরতলার শোবার ঘর, নিজ হাতে কফি বানিয়ে পুলিশ বাহিনী সহ খেয়ে লিলিয়ানা চলে গেল। আমি হতভম্ব বসে রইলাম নির্জন দ্বীপে। যেন পিটকাইর্ন দ্বীপ। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ নেই। আমাকে নিয়ে যে বাউন্টি জাহাজটি এসেছিল, সেটিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার আর কোথাও ফেরার উপায় নেই। এই দ্বীপে কোনও বন্দর নেই। কোনও জাহাজ, উড়োজাহাজ কিছুই এখানে থামতে পারে না। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর একটি আগ্নেয়গিরির লাভা উঠেছে, খাড়াই পাহাড়। আমি সেই শ্বাপদসংকুল এবড়ো খেবড়ো লাভায় একা আটকে আছি। শত চিৎকার করলেও কেউ কিছু শুনতে পাবে না। সত্যিকার পিটকাইর্ন দ্বীপে মানুষ আছে পঞ্চাশ জনেরও কম। সবচেয়ে নিকট-দ্বীপের দূরত্বই দু হাজার কিলোমিটার। ইওস্তেরো তুমি কি পিটকাইর্নকে চেনো? তোমরা কি ভাই বোন?

কোথাও কোনও শব্দ নেই। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে মাঝে মাঝে চমকে উঠি। আমি কী করব সারাদিন, জানি না। কী করব সারারাত যদি ঘুম না আসে, জানি না। লেখা না ছাই! রাত হলে একটা শিরশিরে ভয় আমার সারা গায়ে। ভুতের ভয় নেই আমার। হয়তো চোর ডাকাতের ভয়, ধর্ষকের ভয়, খুনীর ভয়, বুনো জন্তু জানোয়ারের ভয়, সাপের ভয়। জানি না চিনি না বুঝি না এমন আরও অনেক কিছুর ভয়। সব চেনা অচেনা ভয় আমার চারদিকে

অদ্ভুত শব্দ করে ডাকতে থাকে। কিছু ভয় বোধহয় থাকে, কিছু না থাকার ভয়, ভরা শূন্যতার ভয়! আমার পক্ষে একা বাড়িতে বাস করা বড়ই দুঃসহ। দিনের বেলায় না হয় আকাশ আর সমুদ্র দেখতে দেখতে, ঘাসের ওপর খালি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে, সাদা কাগজে কলম হাতে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ফাঁকা মাথা নিয়ে বসে থাকতে থাকতে সময় কেটে যায়। রাতে অসম্ভব। রাতে এপাশ ওপাশ। রাতে উঠে বসে থাকা। রাতে শ্বাসবন্ধ। রাতে দ্রুত শ্বাস। পাশের ঘরে পুলিশ বা কোনও সহৃদয় প্রাণী থাকলে দিব্যি ঘুমোনো যেত। পুরো একটি বাড়িতে একা ঘুমিয়ে আমার অভ্যেস নেই। নিচের তলায় ওপর তলায় কেউ নেই ভাবলে গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

পুলিশেরা পাশের একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। ডায়ানা উল্ফ এর বাড়ির উঠোনে একটি আলাদা বারবাড়ি জাতীয় ঘর। লিলিয়ানার বাড়িটি বড়, ওতেই সবাই থাকতে পারতো, কী প্রয়োজন ছিল নতুন একটি ঘর ভাড়া নেওয়ার, আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। ওরা যখন সুইডিশ ভাষায় আলোচনা করে, খুব স্বাভাবিক কারণেই আমার পক্ষে ওদের আলোচনার কিছুই বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না। আমাকে সবকিছু বলার প্রয়োজনও কেউ মনে করে না। আমি ওদের কাছে *অবজেক্ট,* যে অবজেক্টকে *প্রটেক্ট* করার চাকরি করছে ওরা। ওদের তো বন্ধু নই আমি। কেন আড্ডা দেবে আমার সঙ্গে। পুলিশেরা বলে, এক বাড়িতে থাকার *নিয়ম* ওদের নেই। *নিয়ম* মেনে চলার আগ্রহ প্রচণ্ড সবারই। আমার যেমন নিয়ম ভাঙার স্বভাব, ওদের নিয়ম মানার। আর আমরাই এখন পাশাপাশি চলছি। পুলিশ মেশিন লাগিয়ে গেছে লিলিয়ানার বাড়িতে, যে কোনও অসুবিধেয় আমি বোতাম টিপলে ওরা চলে আসবে। বোতামে আমার আঙুল। আঙুল আমি টিপেও টিপছি না। সারারাত বোতামে আঙুল। দ্বিধান্বিত আঙুল।

দ্বিধা আমার আঙুল থেকে ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। আমাকে আমি আর চিনতে পারি না। দিন দিন কি অন্যরকম হয়ে উঠছি, যা করতে ইচ্ছে হয়, তা করতে পারছি না, ইচ্ছের কথাও কোথাও বলতে পারছি না। আমার নাকে একটি দড়ি আছে, দড়িটি এখনও গ্যাবি

গ্লেইসম্যানের হাতে। সুইডেনের পেন ক্লাবের সকলেই চায় নাকে আমার একটি দড়ি থাকুক, এবং দড়িটি এখানকার কারও হাতে থাকুক অর্থাৎ আমার গতিবিধি কেউ নিয়ন্ত্রণ করুক। দড়িটি সুইডেনের সরকারের হাতে থাকতে পারতো, যেহেতু সরকারের কথাই লোকে জানে যে আমাকে লালন পালন করছে। যে কোনও কারণেই হোক তা থাকেনি। লেখকের ভার লেখকরা নিলেই বোধহয় এ দেশে শোভন দেখায়। সরকারের কারও টিকি দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে কেবল গ্যাবির কণ্ঠস্বর। কণ্ঠস্বরটি তখনই কানে কামড় দেয়, যখন সে ইচেছ করে যে আমার দড়িটি একটু ঢিলে করার। ঢিলে সে করে যখন তাকে যথেষ্ট উৎকোচ দিয়ে কেউ আমার সাক্ষাৎ পেতে চায়। সাক্ষাৎএর উদ্দেশ্য মূলত পুরোনো বন্ধুত্ব, প্রকাশনা , সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে। উৎকোচ অনেক কিছু হতে পারে, দামি রেস্তোরাঁয় খাওয়ানো, অভিভাকত্বের-দায়িত্বের প্রশংসা করা, বিদেশের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো, দামি বিমান টিকিট পাঠানো, পাঁচতারা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, বিদেশি পত্রিকায় লেখার আমন্ত্রণ ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। *যাও, নরওয়ে থেকে খুব বড় সাংবাদিক এসেছে যাও। যাও, ফ্রান্স থেকে তোমার প্রকাশক দেখা করতে এসেছে।* এমনই চলছে। এই চলা যখন থামিয়ে দিতে চাইছি, গ্যাবি থেকে যখনই মুক্ত হওয়ার জন্য তড়পাচ্ছি, তখনই বুঝি আমাকে দ্বীপান্তর দেওয়া হল। এখন কোথায় যাবো আমি! যে দ্বীপে আছো সে দ্বীপেই। জীবনযাপন? লেখালেখি করো। প্রচুর চিঠিপত্র আসছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি দ্বীপের ঠিকানায়। তারপর? আর কী! খাবো কী! দ্বীপে বাজার আছে, নিজে বাজার করো, নিজে রান্না করো। নিজের খাওয়া নিজে খাও। দ্বীপ থেকে বেরোনো? দরকার হলে শহরে ডাকবো। পুলিশেরা তোমাকে নিয়ে আসবে। আর নিজে যদি ইচ্ছে করি? কী ইচ্ছে? শহরে এলোমেলো ঘুরে বেড়াতে? আশ্চর্য , সময় কোথায়! তোমাকে এখন প্রচুর লিখতে হবে। জগত তোমার লেখার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই বুঝি? হ্যাঁ তাই। যদি আমার ইচ্ছে না করে লিখতে? ইচ্ছে না করবে কেন? যে সুযোগ পেয়েছো, সেটা কাজে লাগাও তো মেয়ে। এই সুযোগ পরে নাও পেতে পারো। না পেলাম। তাতে কী! মাথায় তোমার গোলমাল আছে।

বাড়ি থেকে আট কিলোমিটার দূরে একটি ছোট দোকান। এই দোকানের ওপর ভরসা করে বাঁচে দ্বীপের হাতে গোনা কজন বাসিন্দা। বাসিন্দা এখন আরও কম। জুন জুলাই দ্বীপে কাটিয়ে আগস্ট মাস থেকে দ্বীপ ছেড়ে শহরে যেতে থাকে মানুষ। আমরাই আছি। আমাদেরই কোথাও চলে যাওয়া নেই। ডায়ানা পুলিশ বাহিনী আর আমি। বাকি যারা আছে, তারা যাবো যাবো করছে। দোকানে ভিড় নেই। দোকানে কাঁচা পাকা দুরকম জিনিসই রাখা। ফুলকপিও, সাবানও। ঘুরে ঘুরে প্রথম দিনই দেখেছি দোকানের বেশির ভাগ জিনিসই আমি জানি না কী। সারি সারি কৌটো, বোতল, শিশি। ওসবে তরল, কঠিন সব পদার্থ। সুইডিশ ভাষায় গায়ে লেবেল আঁটা। বোঝার কী কোনও পথ আছে! মাঝে মাঝে পুলিশদের জিজ্ঞেস করি এটা কী, ওটা কী। খাদ্যের মধ্যে অধিকাংশ জিনিস, লক্ষ্য করি, যে, আমি খাই নি আগে। শুয়োরের মাংস থরে থরে সাজানো। এই মাংস এর আগে খাইনি কখনও। যদিও ধর্ম মানিনা, কোনও সংস্কার মানি না, তারপরও শুয়োরের মাংস থেকে খানিকটা দূরেই সরে আসি। ও মাংস আমি কিনবো না। ঠিক একই রকম যে সবজি আমি আগে খাইনি, সে সবজি কেনার আগ্রহ আমার ভেতর, দেখি নেই। গরুর মাংসের দাম মাংসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। গরু কখনই আমার খুব প্রিয় নয়। দাঁতে টকে থাকে আশ। আছে ভেড়ার মাংস। ভেড়ার গায়ের বোটকা গন্ধ নাকে ঢুকে গেল, মাংসের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে। আর আছে মুরগি। এটিকে চিনি। সুতরাং একটি কেনার কথা ভাবলাম। চাল খোঁজো। চাল তো নেই। চাল ছাড়া ভাত হবে কী করে। খুঁজে পেতে ছোট একটি চালের প্যাকেট পাওয়া গেল। স্পেনের চাল। বড় বড় কালো কালো দানা। ঠিক চাল মনে হয় না, মনে হয় অন্য কোনও শস্য। যে শস্য ফুটোলে ভাতের মতো কিছু হয়তো হবে, কিন্তু ঠিক ভাত নয়। মশলা পাতি আছে? মশলা বলতে গোল মরিচের আর প্যাপ্রিকার গুড়ো। এ দিয়ে কী হবে? কিছুই হবে না। হলুদ নেই, জিরে ধনে নেই। গরম মশলার গও নেই। রসুন মিললো তো পিঁয়াজ মিললো না।

কী করে উনুন ধরাতে হয় জানি না। পুলিশের সাহায্য নিয়ে উনুন ধরানো হল, কীসে রান্না করবো, পাল্লা খূলে খুলে খুঁজছি কোথায় হাড়ি পাতিল। কোথায় চামচ কোথায় থালা বাটি।

পুলিশ এক নিমেষে বার করে দেয়। লিলিয়ানার রান্নাঘর তো পুলিশের অচেনা। তবে জানে কী করে তারা কোথায় কী আছে? রহস্য ভেদ অনেক পরে হয়। রান্নাঘরের কোন ড্রয়ারে কী জিনিস রাখতে হয়, কোন খোপে কী, তা প্রতিটি বাড়িতে অনেকটা একইরকম। আমার অভ্যেস নেই রান্না করার। কায়ক্লেশে রান্না করি। রান্না হবে বাড়িতে, আর দিব্যি একা একা খেয়ে নেবো, তা আমার ভাবনায় আসে না। যেরকমই রান্না হোক, একা একা খেতে আমার মন চাইল না। পুলিশদের সবাইকে নিমন্ত্রণ জানালাম। নিমন্ত্রণ পেয়ে পুলিশেরা এর ওর দিকে তাকায়। এসবে অভ্যস্ত তারা নয়। কোনও সেলিব্রিটি বা সুপারস্টার যাকে তারা নিরাপত্তা দিচ্ছে, কোনওদিন খাবারের জন্য এভাবে আমন্ত্রণ করে না। এ তাদের নিয়মের মধ্যে নেই। পুলিশেরা শুকনো খাবার খেয়েই মূলত থাকছে। রুটি মাখন পনির ইত্যাদি। খুব মায়া হয়। আমার পূর্ববঙ্গীয় আন্তরিকতার জোরে পুলিশদের রাজি হতে হয়। খাওয়ার পর সুয়েন নামের এক পুলিশ বাসন   মাজতে শুরু করল   আমি হৈ হৈ করে ছুটে গেলাম, *করছো কী, রেখে দাও, তুমি আমার অতিথি।* পুলিশ অবাক হয়ে গেল। বলল, যে, আমি যেহেতু রান্না করেছি, সে কারণে তিনি বাসন ধোবেন। আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু অতিথি বলেই যে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবে আর যে রেঁধেছে, সে রান্নাও করবে, বাসনও ধোবে তা হয় না। অতিথির আচরণ তবে নিঃসন্দেহে বড়ই বর্বর আচরণ। সুয়েন আমাকে ধীরে ধীরে বলল, তার বাড়িতেও তার স্ত্রী এবং সে দুজন মিলে রান্নাঘরের কাজ করে। আজকে এ রাঁধে তো কালকে ও রাঁধে। সুয়েন বাসন মেজে সেগুলো আবার শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে   তাকে সাজিয়ে রাখতে রাখতে নিজের গল্প করে, আমার অগুনতি প্রশ্নের উত্তর দেয়।   আমার খুব ভালো লাগে শুনে যে এ দেশে পুরুষেরাও সেই কাজগুলো করে, যে কাজগুলোকে ভাবা হয় মেয়েদের কাজ। বাড়ির যত কাজ তা স্ত্রীপুরুষ দুজনে মিলেই করে। রান্নাঘরের কাজ করা এখানকার পুরুষদের জন্য খুব স্বাভাবিক এবং প্রতিদিনকার ব্যাপার। আমার পূর্বদেশীয় চোখে এ চমকপ্রদ বটে। কারণ নিজের দেশে বাড়ির পুরুষদের বাড়ির রান্নাঘরের কাজ করতে, রাঁধতে বা থালা বাসন মাজতে, কাপড় জামা পরিস্কার করতে আমি দেখিনি। যদি

করে কেউ কখনও, হঠাৎ কোনও একদিন শখের আমোদ করার জন্য। পুলিশেরা খেয়ে দেয়ে উঠে যাবে ভেবেছিলাম পুরুষেরা যেমন যায়। ভেবেওছিলাম একা সব আমাকেই গোছাতে হবে। কিন্তু না। সেটি হয়নি। কালচার বলে কথা। আমি খাওয়ালাম দুপুরের খাবার। পুলিশরা আমাকে অত্যন্ত বিনত হয়ে একাধিকবার বললো, ডিনারের জন্য ধন্যবাদ। ডিনার হবে কেন? এ তো লাঞ্চ! না এ ওদের কাছে ডিনারই। সুইডেনে রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলা হয় সন্ধে হওয়ার আগেই। সাধারণত বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হয় দুপুর বেলায়। ভাবি বুঝি দুপুরের খাবারের নেমন্তন্ন। আলাপসালাপ শেষ হলে তিনটে চারটের দিকে টেবিলে ডাকা হয়। ওটাকে লেট লাঞ্চ বলে আমার মতো মানুষেরা ভুল করে বা করতে পারে, কিন্তু ওটাই আসলে ডিনার, রাতের খাবার। রাতে খেয়েই বিছানায় ঘুমোতে যাওয়া স্বাস্থ্যসম্মত নয় বলেই ওরা জানে । বিকেল বিকেল খেয়ে নিলে ঘুমোতে যাওয়ার আগ অবদি ওঠা বসা শোয়া হাঁটায় কিছু ক্যালরি তো অন্তত খরচা হয়।

আমাদের দেশে যেমন বাড়িতে অতিথি এল, খেল, এ খুব সাদামাটা সাধারণ জিনিস। বুঝি, এখানে তা নয়। এখানে যে কেউ যে কাউকে নিমন্ত্রণ করে না। খুব ঘনিষ্ঠ না হলে করে না। এরকম যখন পরিস্থিতি, কোনও তারকার রান্না খেতে কোনও ছাপোশা পুলিশ নিমন্ত্রিত হবে, এ ওদের বাহিনীর মধ্যে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। ওরা জানে এবং বলেও যে আমার আচরণ কোনও তারকার মত নয়। আমি খুব হৃদয়বান মানুষ, খুব উদার এবং ওরা দুঃখ করে বলে যে আমার মতো নরম হৃদয়কে হত্যা করার জন্য মানুষ কী করে যুথবদ্ধ হতে পারে, কোনও দরকার ছিল না সেইসব দুর্ঘটনা আমার জীবনে ঘটার, যেগুলো ঘটেছে। রোনাল্ডো পাশ থেকে বলে, *ঘটে অবশ্য ভালো হয়েছে, তাই তো তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ হল। আর তোমাকে নিরাপত্তা দেওয়ারও সুযোগ হল।* রোনাল্ডো সুঠাম সুদর্শন যুবক-পুলিশটির সঙ্গে ইচ্ছে করে প্রেম করি। কিন্তু মনে মনে প্রেম করতে চাইলেই কি প্রেম হয়! আমার ইচ্ছের কথা রোনাল্ডো কী করে বুঝবে? এখানে হয়তো প্রকাশ করার নানারকম কায়দা আছে, আমি কায়দাগুলো জানিনা আর জানলেও প্রকাশ করার ইচ্ছেই

করবো! যদিও যুক্তিবাদী আমিটি বলবে হ্যাঁ প্রকাশ করো, অন্য লাজুক আমিটি বলবে, না, পুষে রাখো। লাজুক আমিটিকে জীবনে যথাসম্ভব আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছি কিন্তু কিছু তো থেকেই গেছে যেগুলোর নাম দিয়েছি ভদ্রতা, সভ্যতা, রুচি, ব্যক্তিত্ব। রোনাল্ডো পুলিশের ভাড়া নেওয়া বাড়ি থেকে এক চিলতে মাঠ পেরিয়ে প্রায়ই আমার বাড়িতে চলে আসে ফোন ব্যবহার করার জন্য। আমার অনুমতি নিয়ে নেয় অবশ্য। অনেকক্ষণ ধরে ফোনে কথা বলে সুদর্শন। কার সঙ্গে কথা? প্রেমিকার সঙ্গে। এখানে প্রায় সব পুরুষেরই হয় প্রেমিকা নয় স্ত্রী আছে। খুব কম পুরুষ বা নারী একা। আমারই কেউ নেই কিছু নেই। একা একা বসে থাকা ছাড়া করার কিছু নেই। একাকীত্ব আমাকে ছিঁড়ে খেতে থাকে। ভয় হতে থাকে এখনও দেশ থেকে কোনও সবুজ সংকেত পাচ্ছি না বলে। মৌলবাদীরা কি থেমেছে? বন্ধ করেছে অসভ্য উন্মাদনা। কেউ প্রয়োজনই মনে করছে না এসব খবর আমাকে দেবার। যেন আমি বিদেয় হয়েছি, দেশ বেঁচেছে। আমিই ছিলাম যত নষ্টের গোড়া। দ্বীপ থেকে প্রতিদিনই আমি মনে মনে দেশে ফিরি। কিছু কি হল? কোনও খবর! কবে ফিরবো আমি দেশে? না কারও কণ্ঠে কোনও উত্তর নেই। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দিন যেতে থাকে। দিন অকারণে যেতে থাকে। সামনে যদি সে দিনটি না থাকে, যে দিনটিকে আমি চাইছি, তবে দিন পার যে করবো, কেন করবো? কোন দিনে যাবার জন্য দিন গুনবো! দিন যদি না থাকে দিন গোনার, তবে দিনগুলো ঠিক কেমন দিন হয়, ঠিক আমার জায়গায়, কোনও এক দূরতম অচেনা দ্বীপের নৈঃশব্দ আর দুঃসহ নির্জনতায় দিনের পর দিন না কাটালে কিছুই বোঝা যাবে না। সম্ভব নয়। হঠাৎ হঠাৎ যা কিছু আছে চারদিকে, দ্বীপ এবং বাল্টিক, পুলিশ এবং নিরাপত্তা, চিঠিপত্র, বইখাতা, ডায়না, সবকিছুই বড় অর্থহীন বলে মনে হয়। ভেতরে একটি আর্তনাদ শুনি। বাঁচাও বাঁচাও বলে প্রাণফাটা কান্না। কেউ কি শুনতে পাচ্ছে আমাকে! পায়!

প্রচুর চিঠিপত্র আসে আমার জন্য, সুইডিশ পেন ক্লাবের ঠিকানায়। চিঠি আমার দ্বীপের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয় গ্যাবি। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ আমার অটোগ্রাফ চায়। পত্রপত্রিকায় বেরোনো ছবি কেটে কেটে পাঠায়, যেন সই দিয়ে দিই। স্ট্যাম্প লাগানো ফেরত

খাম সঙ্গে দিয়ে দেয় যেন আমার কোনও পয়সা খরচ না হয়। মানুষগুলো বিদেশি। ইওরোপীও নাম সবার। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। আমিও এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে তবে জনপ্রিয়। এ শুধু প্রাণ বাঁচানোর ব্যাপার নয়। যে বিদেশিদের বিশাল কিছু বলে একসময় ভাবতাম, এরাই দেখছি নতজানু দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। প্রশংসা করছে আমার সাহসের, আমার সৃষ্টির, প্রাণ ঢেলে অভিবাদন জানাচ্ছে আমাকে। নমস্য ভাবছে। কেন, আমি কি সত্যিই সাংঘাতিক কিছু করে ফেলেছি! আমি তো আমিই ছিলাম যা ছিলাম। নিজের মতো করে চলেছি ফিরেছি কথা বলেছি চুপ করেছি চেঁচিয়েছি কেঁদেছি লিখেছি।

আমি কীভাবে বেঁচে আছি তা বিশ্বের মানুষ জানে না। জানে না এক নির্জন দ্বীপে আমি দিন পার করছি, নির্ঘুম রাতও। জানে না কাগজ কলম হাতে নিয়ে সারাদিন বসে থেকেও একটি যেন তেন বাক্যও আমি লিখতে পারছি না। না ইংরেজিতে, না বাংলায়। বিশ্বের বেশির ভাগ ভাবছে সুইডেন ধনী দেশ। এখানকার সরকার আমাকে সাতমহলা বাড়ি দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় আদর যত্নে আমি ডুবে আছি, ধুমসে লিখছি। দ্বীপে বসেই ফোন করতে থাকি কলকাতায়, ঢাকায়, ময়মনসিংহে। আমি ঠিক বুঝে পাই না কী করব আমি, কতদিন এই দ্বীপে পড়ে থাকব। আমার সামনে কোনও ভবিষ্যত নেই। ভবিষ্যত কি কোনওকালেই ছিল!

আমার অস্থির এবং নির্জন সময়গুলোর মধ্যে একদিন পাশের বাড়ির ডায়ানা আমার জন্য অন্যরকম বিকেল নিয়ে আসে। ডায়ানার মুখের একদিক পোড়া। বিকেলে হাঁটতে বেরোয় আমাকে নিয়ে। বনে জঙ্গলে নদীর ধারে হাঁটা। আমার জীবনে এরকম হাঁটা কখনও ছিল না। আমার হাঁটায় উদ্দেশ্য ছিল, কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্য। ডায়ানা আমাকে হাঁটা শেখাচ্ছে, এই হাঁটার পিছনে হাঁটা ছাড়া কোনও উদ্দেশ্য নেই। হাঁটতে হাঁটতে সারাক্ষণই আমার গল্প সে শুনতে চায়। আমি যেটুকু বলি, যা-ই বলি, খুব মন দিয়ে শোনে আর বারবারই মুগ্ধ চোখে আমাকে দেখে। আমি তার গল্প শুনতে চাই। যেটুকু বলে সেটুকুতে আমার তৃষ্ণা মেটে না। ডায়ানার মুখ পুড়লো কেন, কেউ কি পুড়িয়ে দিয়েছে, না কেউ পোড়ায় নি, দুর্ঘটনা। শুধুই

দুর্ঘটনা? হ্যাঁ শুধুই। কেন ইংলেন্ড থেকে সুইডেন? প্রেম। শুধুই প্রেম? হ্যাঁ শুধুই। ডায়ানাকে আরও বেশি জানতে ইচ্ছে করে, কিন্তু নিজের গল্প বলার চেয়ে বেশি আমার গল্প শুনতে সে আগ্রহী। একা সে থাকে এই দ্বীপের বাড়িতে। শহরে তার কোনও বাড়ি নেই। স্বামী চাকরি করে সৌদি আরবে। ফেরে মাঝে মধ্যে। কোনও ছেলে মেয়ে নেই। কী করে মানুষ থাকে এমন ভয়ঙ্কর নির্জনতার মধ্যে আমি বুঝে পাই না। যে আমার ব্যস্ত থাকার কথা চব্বিশ ঘন্টা, সেই আমিই বসে থাকি সেই সময়ের দিকে চেয়ে, যখন সময় হবে ডায়ানার আমার সঙ্গে সময় কাটানোর। অথচ ডায়ানা কোনও লেখক নয়, বাইরে কোনও ব্যবসা বাণিজ্য বা কোনও চাকরি বাকরিও সে করছে না, বসে থাকাই যার কাজ, তারই সময় হতে চায় না। স্থবিরতা মানুষ কী করে উপভোগ করে বুঝি না। কেউ কেউ করে, ডায়ানা করে। দেখে দমবন্ধ লাগে আমার। ঘরে বসে কী ঘোড়ার ডিম করে সে নিজেই জানে। তার বাড়িতে আমি গেছি, বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে বই আর বেড়াল। বেড়ালের বোটকা গন্ধ সারা বাড়িতে। বেশিক্ষণ আমি টিকে থাকতে পারি না ও বাড়িতে। একদিন হেঁটে হেঁটে জিজ্ঞেস করেছি, *তুমি এত কম বেরোও কেন বাড়ি থেকে, ডায়ানা? আমার কাছে তো ঘন ঘন আসতে পারো।* ডায়ানা বলেছিল, *কেন তোমাকে আমি বিরক্ত করব। তোমার সময়ের মূল্য অনেক। তুমি খুব নামি দামি মানুষ। আমি তো সামান্য। আমি সাধারণ। আমার তো উচিত হবে না তোমার সময় নষ্ট করা।* ডায়ানা জানে না যে সময় নিয়ে আমি বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করি না। লেখালেখিই তো কাজ। আর যা জিনিসই হোক আমার, এই জিনিসটাই হয় না। আমার হেঁটেও শান্তি নেই। চার পাঁচজন পুলিশ আমার পিছনে পিছনে দ্বীপের রাস্তায় হাঁটবে। ওদের খামোকা কষ্ট হচ্ছে ভেবে আমার কষ্ট হয়। চুক চুক করে দুঃখ করে বলি, *তোমাদের কষ্ট হচ্ছে।* ওরা থামিয়ে দিয়ে বলে, *কিচ্ছু হচ্ছে না কষ্ট।* বলি যতই, *তোমরা তোমাদের মতো ঘরে গিয়ে আরাম কর, খাও দাও, আড্ডা দাও,* কিন্তু কোনও পুলিশই তা শোনে না।

--উফ, এই দ্বীপে কেউ কি আমাকে খুন করতে আসবে? তোমাদের কি বিশ্বাস হয় ইওস্তেরো দ্বীপে কোনও আততায়ী অপেক্ষা করে আছে আমাকে কখন মারবে বলে? তোমরা কষ্ট করো

না। আমার জন্য কষ্ট করলে আমার খুব অস্বস্তি হয়। যেখানে আশংকা আছে, সেখানে যেও সঙ্গে।

পুলিশ বলে, *কে বলেছে আশংকা নেই। কোথাও কোনও জায়গাই নিরাপদ নয়। এই দ্বীপে কেউ খুন করতে আসবে না, তাই বা তোমাকে বললো, আসতেও তো পারে।*

--তোমরা কি পাগল হয়েছো? আমাকে মারতে চেয়েছিল বাংলাদেশের মোল্লারা। তারা কি এই দ্বীপে আসবে। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। ইওস্তোরো দ্বীপ পর্যন্ত নয়।

ওদের হাত কি সময় সময় খুব লম্বা হতে পারে।

--ধুর।

আমি উড়িয়ে দিই। পুলিশ আমাকে বোঝায় ওদের নিয়ে আমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। ওরা এই দ্বীপে থাকতে ভালোই বোধ করছে। এবং এতে ওদের বাড়তি টাকাও জুটছে। এ কথা শুনে উদ্বিগ্ন আমি আরও হই। এমনিতে একটি বাড়িভাড়া করতে হচ্ছে ওদের জন্য, তার ওপর পুলিশের জন্য বাড়তি টাকা। আমার জন্য সরকারের এত কাড়ি কাড়ি টাকা খরচা হোক, এ আমি চাই না। পুলিশ শুনে আহত।

--নিরাপত্তা তো আমরা দিচ্ছিই কাউকে না কাউকে। কিন্তু সবার সঙ্গে কাজ করে তেমন আনন্দ নেই। তোমায় সঙ্গে থেকে আমরা খুব খুশি। তুমি রাজনীতির লোক নও। বাড়িয়ে কথা বলতে হয় না। মিথ্যে নেই তোমার মধ্যে। তুমি অন্যরকম। খুব মানবিক তুমি। খুব খাঁটি।

--ঠিক কী?

--হ্যাঁ ঠিক।

অন্যান্য মানুষের সঙ্গে যত হয়, তার চেয়ে পুলিশের সঙ্গেই আমার দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্তা বেশি হয়। দ্বীপ থেকে প্রায়ই যাওয়া পড়ে স্টকহোমে। সে আমার ইচ্ছেয় নয়, গ্যাবির ইচ্ছেয়। পুলিশের কাছে সোজাসুজি সে জানিয়ে দেয় কোথায় কোন স্বর্গে বা নরকে নিতে হবে আমাকে। যাকে নিয়ে এত কিছু তাকে অতি সামান্যই জানানো হয়, যেমন, মিস্টার অথবা মিস এক্স ওয়াই জেডএর সঙ্গে আমার দেখা হতে যাচ্ছে এতটার সময়, তার পরিচয় এই।

আর কিছু আমার না জানলেও চলবে বলে মনে করে আমার অভিভাবক এবং নিরাপত্তাকর্মীবৃন্দ। কিছুই আমাকে জানানো হয় না নিরাপত্তার এত নিশ্ছিদ্র কারুকাজ কী করে কেমন করে হচ্ছে। কিন্তু মাঝে মধ্যে একটু আধটু যেটুকু জানি বা দেখি তা আমাকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে। ধরা যাক আমার যাওয়ার কথা কালচারাল হাউজে। সেটা আগেই স্টকহোমের পুলিশ অফিসে জানিয়ে দেওয়া হবে। সেই কালচারাল হাউজে আগের দিন থেকেই পুলিশি তল্লাশি চলবে। ধরা যাক আমি সকাল দশটায় ঢুকবো ওখানে। সারা সকাল অন্য কোনও প্রাণীকে ওখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ওই হাউজের সামনে পিছনে কাউকে দাঁড়াতে দেবে না। পারলে যান বাহন মানুষ কাউকে চলাচল করতে দেবে না সামনের রাস্তায়। এলাহি কাণ্ড। মানুষের ভোগান্তির অন্ত নেই। আমি ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি বলে প্রতিবারই মুখ লুকোই। কার কাছে প্রতিবাদ করবো, কাকে চিৎকার করে থামাতে বলবো এসব! জানি না। তাই নিজের দেহরক্ষীদের কাছেই দুঃখের ঝাঁপি খুলে বসি, *এই সব সার্কাস যে তোমরা কর, আমার খুব লজ্জা লাগে। মানুষের দুর্ভোগ আমি চাই না। কেন আমার জন্য অন্যের অসুবিধে করা হবে! ওরা কী দোষ করেছে! ওরা আর আমাকে ভালোবাসবে না দেখে নিও, এই দুর্ভোগের জন্য মনে মনে আমাকেই গালাগালি করবে।*

---*কী আর করা যাবে বল। নিরাপত্তার অনেক ধাপ আছে। তোমাকে এক নম্বরটা দেওয়া হচ্ছে। এসব চলবেই এখানে।*

---*এসবের তো কোনও প্রয়োজন নেই আমার, তা তোমরা এত বুদ্ধিমান হয়েও কেন বুঝতে পারছো না। কেন বুঝতে পারছো না যে এরকম নিরাপত্তা আমার বাংলাদেশে দরকার। এ দেশে দরকার নেই এসবের। সত্যি বলতে কী, তোমাদের গাড়িটা ছাড়া আর কিছুর দরকার নেই আমার।*

পুলিশেরা বলে, *তাহলে এটাই আপাতত ভোগ করতে থাকো। বাকিগুলো চোখ বুজে সহ্য কর।* পুলিশের লোক, কিন্তু অনেকের রসবোধ বেশ। প্রথম প্রথম খুব গম্ভীর মুখে থাকত। ধীরে ধীরে কাটাতে কাটাতে রস দেখি উথলে ওঠে। রাজনীতিকদের সঙ্গে নয়, লেখকদের সঙ্গে

নয়,   আন্তরিক সম্পর্কটা আমার সঙ্গে পুলিশেরই হয়। সুয়েন, লার্স, ইয়ান, ইয়রগান, পের, রবিন, আলেকজান্দর, ঠুমাস, অ্যান ক্রিস্টিন। একটিই মেয়ে পুলিশ, অ্যান ক্রিস্টিন। ডাকা হয় অ্যান ক্রিস্টিন বলেই। সুয়ান্তের স্ত্রীরও নামও অ্যান ক্রিস্টিন । কেন *হয় অ্যান নয় ক্রিস্টিন* নয়? কেন দুটো নাম একসঙ্গে ডাকা হয়, মনে প্রশ্ন আসে আমার। শুধিয়েও কোনও ভালো উত্তর পাওয়া যায় না। মানুষের নামগুলোই বা সব একরকম হয় কেন! গোটা দশেক বা বিশেক নাম, এগুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখা হচ্ছে। এই প্রশ্নও আমার মনে আসে। উত্তর যেটুকু এদিক ওদিক থেকে জোটে, তা হল, বাইবেল ঘেঁটেই মূলত মানুষের নাম রাখা হয়। আমি আকাশ থেকে পড়ি। ইওরোপ থেকে তো সত্যি বলতে কী ধর্ম উঠেই গেছে। রাষ্ট্রগুলো সেকুলার। এখানে নাম রাখতে গিয়ে বাইবেলের সাহায্য নেওয়ার দরকার কী! ওদের নামের কোনও অর্থ নেই। নামগুলো কেবল নামই। আমি উদাহরণ দিয়ে বলি, যে, --*দেখ আমার বোনের মেয়ের নাম আমি রেখেছি স্রোতস্বিনী ভালোবাসা। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই। কী রকম সুন্দর বলো তো। আমার এক বন্ধুর মেয়ের নাম অথই নীলিমা। এরকম নাম তোমরা রাখতে পারো না?*

ওরা মাথা নেড়ে বলল, *না।*

--*কেন?*

--*নিয়ম নেই।*

--*নিয়ম আবার কী! নিয়ম পাল্টাও। অর্থ আছে এমন নাম রাখো।*

--*নামের অর্থ থাকতে কেন হবে ?*

--*অর্থ থাকলে অর্থহীন হওনা।*

--*আমি কী কাজ করবো, সেটাই তো আসল। নামে কী যায় আসে!*

--*ধর নাম তোমার আকাশ..*

--*ধর নাম আমার আকাশ, তাতে কী! আমি কি আকাশের মতো বিরাট নাকি উদার! আমি মানুষটা হয়তো ভীষণই সংকীর্ণ। আসলে আকাশ বলতে তো কিছু নেই। ..*

--বাইবেলের নামেরই বা কী অর্থ?

--কিছুই অর্থ নেই।

--পিটার জন ম্যাথু মেরি সবাই তো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। তোমরা এখন ধর্ম না মেনেও ওই ধর্মগুরুদের নাম ধারণ করে বসে আছো। এটা তো অর্থহীন শুধু নয়। অন্যায়।

আমার কথা শুনে পুলিশ মৃদু হাসে। সবচেয়ে কমবয়েসী ইয়রগান, সে হাসে সাবধানে। তার ওপরের ঠোঁটের বারান্দাটা ফুলে থাকে বলে। ইয়রগান সিগারেট খায় না। কিন্তু ওপরের পাটির দাঁতের ওপর দিকে ঠোঁটের ওপরের চামড়া তুলে কিছু গুঁজে দেয়। গুঁজে দেওয়ার জিনিস কৌটোয় পাওয়া যায় দোকানে, সেখান থেকে কেনে। ঠোঁটের ওপরে পুরে দেওয়াতে ফুলে থাকে। চেহারাটা কেমন পাল্টে যায়। দেখেছি এই তামাক পাতা ব্যবহার করে প্রচুর লোকে।

ইয়রগান একদিন আমাকে বলল, চল সিনেমা দেখে আসি। রাতের শো। গ্রান্ড সিনেমা হলে দেখে এলাম সিন্ডলার্স লিস্ট। স্টিভেন স্পিলবার্গের। দেখে খুব ভালো লাগল। ইওরোপে কোনও সিনেমায় গিয়ে কোনও ছবি দেখা আমার এই প্রথম। আমাদের দেশের সিনেমাগুলোর মত নয় এখানকার সিনেমা। নিচতলা ওপরতলা কয়েকশ মানুষকে বসিয়ে ছবি দেখানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। খুব অল্প কিছু আসন পাতা। খুব বড় কোনও ঘর নয়। ছোট্ট ঘর। ছোট পর্দা। ছোট ছোট চেয়ার। শহরে প্রচুর সিনেমা আছে বলে ভিড়ের সমস্যা হয় না। সিন্ডলারস লিস্ট দেখে হেঁটে হেঁটে যখন গাড়ির দিকে যাচ্ছি তখন দেখি একটি স্মৃতি ফলক। ওলফ পালমে ঠিক যেখানে মারা গিয়েছিলেন। ফলকটি ফুটপাতে, পায়ের তলায় নাম, ওলফ পালমে। ওলফ পালমে সুইডেনের খুব জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী। কোনও নিরাপত্তা প্রহরী ছাড়াই ঘুরে বেড়াতেন। সিনেমায় এসেছিলেন দুজন, তিনি এবং তার স্ত্রী। হঠাৎ একটি উটকো লোক উদয় হয়ে, লোকটি একাই ছিল, গুলি করেছে ওলফ পালমের পেটে দুবার। আজ পর্যন্ত খুনী কে ধরতে পারেনি পুলিশ। একদিন রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য গিয়েছিলাম। ওখানে আমাকে দেখেই এক ভদ্রমহিলা ছুটে এসেছিলেন। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তিনি ওলফ পালমের স্ত্রী। লিসবেত। এখন রাষ্ট্রপুঞ্জে

শিশুউন্নয়নের কাজ করেন। ভদ্র মহিলা আমাকে গড়গড় করে বলে গেলেন তার স্বামীকে কে খুন করেছিল তিনি জানেন, তিনি দেখেছেন। ঘোর মদ্যপ লোক। ক্রিস্টার পেটারসন। তিনি নিজে তাঁর স্বামীর সঙ্গে ছিলেন সেদিন। থানায় গিয়ে একদিন সনাক্ত করেও এসেছেন যাকে তিনি দেখেছিলেন গুলি করতে। কিন্তু তাঁর কথার কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। কেউ তাঁকে বিশ্বাস করেনি। আততায়ী ছাড়া পেয়ে গেছে। দিব্যি বহাল তবিয়তে আছে। লিসবেথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি তখনও জানি না ওলফ পালমে সম্পর্কে খুব বেশি কিছু। পরে জেনেছি আরও। জেনেছি পালমে খুব কড়া সমালোচক ছিলেন আমেরিকার, বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের। তাঁর সময় সুইডেনে আমেরিকার কোনও দূতাবাস ছিল না, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপারথেইড পদ্ধতির ঘোর নিন্দা করতেন, ম্যান্ডেলাদের আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে অনেকভাবে সাহায্যও করতেন। অ্যাপারথেইড সরকারকে অর্থনৈতিক শাস্তি যার আরেক নাম *এমবারগো, দে*ওয়ার কথা বলতেন। প্যালেস্টাইন লিবারেশন আর্মি পিএলওর সমর্থক ছিলেন। পালমে কিউবা গিয়ে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। চরম ডানপন্থীদের চরম শত্রু ছিলেন তিনি। উনিশশ ছিয়াশি সালে পালমের মৃত্যুর আগে আগে এমন কথা খুব বলা হত যে, পালমের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনও গোপন সম্পর্ক আছে। স্টকহোমে যে সরোবর আছে, সেই মালারেন সরোবরের জলে একা একাই ঢেউ খেলে। মাঝে মাঝে সুইডেনবাসী লক্ষ করছে কিছু একটা নড়ছে, তাদের ধারণা সোভিয়েত সাবমেরিন আছে ওখানে। এই সংশয় নিয়ে সুইডরা যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিচ্ছে। জলের এই সাবমেরিন নিয়ে কথা বলার জন্য ওলফ পালমেকে একরকম চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। পরে, অনেক বছর পরে অবশ্য আবিস্কার হয় কোনও সাবমেরিন নয়, জলের তলে একধরনের সামুদ্রিক প্রাণী বাস করতো, তাদের নড়াচড়াই জল নাড়াতো। খুব অবাক কান্ড, আজও পালমের আততায়ীকে পাকড়াও করার ক্ষমতা হয়নি কারওর। অনেকগুলো বিশ্বাস বিরাজমান, যেমন খুব চরম এক ডানপন্থী খুন করেছে, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপারথেইড সরকার খুন করিয়েছে, যেমন পি.কে.কে, কুর্দিস্থানের স্বাধীনতা দাবি করার

দল খুন করেছে, যেমন মদ্যপ মাতাল আধ পাগল কেউ খুন করেছে। কোনও বিশ্বাসই শেষ অবদি প্রমাণিত হয়নি। ওলফ পালমের খুনীও কোথাও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

সুইডেনের লোকেরা, আমি লক্ষ করেছি, খুব গর্ব করে বলে *একশ আশি বছর ধরে আমরা কোনও যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নই। এমন কী দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধে যখন ইওরোপের দেশগুলি জড়িত ছিল, সুইডেন ছিল না।* এ বলার কারণ সুইডেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বলে ধনী দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পেরেছে, অথবা ধন কামিয়েছে যুদ্ধের ঠিক পর পর। পরে ধীরে ধীরে আমি জেনেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুইডেনের ভূমিকা ছিল নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ বলতে আমরা হিটলারের জার্মানিকেও সমর্থন করব না। জার্মান বিরোধী মিত্রশক্তিকেও করব না। এদিকেও আছি, ওদিকেও আছি, অথবা কোনওদিকেই নেই। আমররা রাস্তা দিয়েছি। রাস্তা দিয়েছি নাৎসি বাহিনী সোজা সুইডেনের ওপর দিয়ে চলে গেছে নরওয়েতে। গিয়ে নরওয়ে ধ্বংস করেছে। আর সুইডেনের গায়ে সামান্য আঁচড় অবদি লাগেনি। আর যুদ্ধ শেষ হলে ধ্বংস হওয়া জার্মানিতে বাড়িঘর তৈরির জন্য যা মালমশলা লাগে তা সুইডেন থেকে কিনেছে ওরা। যেহেতু এই একটা দেশই আশেপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। সুইডেন অরণ্যের রাজ্য। সুতরাং অরণ্য থেকে গেছে কাঠ, মাটির তলায় আছে লোহা, গেছে ইস্পাত, কাঠ আর ইস্পাত বিক্রি করেই সুইডেন একটি সাধারণ দেশ হয়ে গেল পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ। খুব দাদাগিরি করত নরওয়ের ওপর, তারপর নরওয়ে তেল পেয়ে যাওয়ার পর সুইডেনের চেয়ে ধনী হয়েছে বেশি। এদিকে ডেনমার্ক, সুইডেনের ছোট ভাই, ওদিকে নরওয়ে ছোট বোন। কিন্তু নরওয়ে আজকাল আর পছন্দ করছে না সুইডেনের ছোট বোন হিসেবে পরিচিত হতে। দুদেশের মধ্যে এখন ভালোবাসা আর ঘৃণার সম্পর্ক। যত কৌতুক সুইডেন আর নরওয়ে তৈরি করেছে, বেশির ভাগই পরস্পরকে নিয়ে, অপরপক্ষ যে বুদ্ধিমান নয়, বোকা, তা প্রমাণ করতে। সুইডেনের লোকেরা বলবে, *আচ্ছা বলতো নরওয়ের লোকেরা মরুভূমিতে মানচিত্র নিয়ে যায় কেন?* যদি বলা হয় *না জানি না, বল তো, কেমন সেই মানচিত্র?* উত্তর, *শিরিষ কাগজ। হা হা।* সুইডেন যুদ্ধবাজ ছিল। কদিন পর পর রাশিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত এ

দেশের এক রাজা গুস্তাভ প্রথম। সুইডদের আদিপুরুষ ছিল ভাইকিং। ভাইকিংরা ছিল জলদস্যু। জলে ভেসে যাওয়া জাহাজ নৌকো যা কিছুই পেত, তা লুঠ তো করতই। বিভিন্ন দেশে হানা দিয়ে ধন দৌলত লুঠ করে নিয়ে আসত। খুব বেশিদিন আগে নয়, সুইডেনের বরফযুগ শেষ হয়েছে। মাত্র দশ হাজার বছর আগে সুইডেন বরফের তলায় ছিল। বরফ গলতে শুরু করার পর মানুষ পূব থেকে দক্ষিণ থেকে এসে বাস করা শুরু করল। মানুষের বসবাস শুরু হবার পর প্রস্তরযুগ এল, তারপর তাম্রযুগ, তারপর লৌহযুগ। বারোশ সালে সুইডেনের পত্তন ঘটে। চাষবাস, মাছধরা, শিকার করা এই ছিল কাজ। দারিদ্র এত প্রকট ছিল যে, একশ বছর আগে, দশ লক্ষ লোক চলে গেছে এ দেশ ছেড়ে। উত্তর আমেরিকায় শরণার্থি হয়েছে।

সুইডেনের মত কড়া গণতান্ত্রিক দেশে কেন রাজা রানির চল থাকে, মাথা খাটিয়েও আমি বুঝতে পারি না। রাজার পিছনে নব্বই মিলিয়ন ক্রোনার ঢালা হচ্ছে, কিন্তু তারপরও রাজা রানির ওপর বিরক্ত কেউ নয়। এদের থাকার পক্ষেই বেশির ভাগ লোক। কিছু কড়া বামপন্থী মাঝে মাঝে আপত্তি জানায়, কিন্তু কোনও আপত্তিই বড় সমর্থন পায় না। রাজা রানি বটে, তবে এখনকার রাজা রানিকে রাষ্ট্র চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তারা সভা সমিতিতে যাচ্ছে, ফিতে কাটছে। আর কিছু পত্রিকা করে খাচ্ছে তাদের ঘরের খবর মনের খবর ছাপিয়ে। হাসি হাসি হাসি মুখ করে দেশ বিদেশ ঘুরে ঘুরে সুইডেনের জন্য সুনাম এবং বাণিজ্যের বার্তা আনছেন রাজা। সুইডেনের নারী পুরুষ এতে খুব তৃপ্ত। তারা পাশের বাড়ির কেউ ভালো একটি গাড়ি কিনলে ভ্রুতে ভাঁজ ফেলে দেয়, কর ফাঁকি দিচ্ছে নাকি ব্যাটা। অমনি কর আপিসে চিঠি লিখে দেবে, দেখুন তো ওর নাড়ি নক্ষত্র খোঁজ করে, অত দামি গাড়ি কেনার পয়সা ও ব্যাটা কোত্থেকে পেল! এমন হিংসুটে কুঁচুটে পরশ্রীকাতররা অকাতরে রাজা রানীদের লক্ষ লক্ষ টাকা বিনা কারণে দান করে যাচ্ছে! এ অবাক কাণ্ডই বটে। কিন্তু তাও যদি রাজা রানি এদেশি হত। রাজা হচ্ছে বারনাদতের বংশ। বারনাদত ফরাসি। নেপোলিয়ানের সৈন্য। হল সুইডেনের রাজা। তারই বংশধর আজকের রাজা কার্ল গুস্তাভ

ষোড়শ। সিলভিয়া, তাঁর স্ত্রী ব্রাজিলের মেয়ে। বাবা নাৎসি ছিলেন। হিটলারের পতনের পর বহু নাৎসি সেনা জার্মানি থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিল। সিলভিয়ার বাবা তাদের একজন। কার্ল আর সিলভিয়ার তিন ছেলেমেয়ে। ভিক্টোরিয়া, ফিলিপ, মাদেলেইন। রাজার মুকুট যাবে ভিক্টোরিয়ার মাথায়। এটি অন্তত একটি ভালো দিক, যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মতো পিতার মুকুট পুত্রের মাথায় যাচ্ছে না। পুত্র থাকা সত্ত্বেও যাচ্ছে কন্যার মাথায়।

সুইডেনের জাতীয় খাবার বলা হয় মিটবল, আর আলু। আলুও এসেছে লাতিন আমেরিকা থেকে। আর মিটবল তো রাজা গুস্তাব পঞ্চম এনেছে তুরস্ক থেকে। এই দেশ খুব বেশিদিন আগে নয়, শালগম খেতো আর শুয়োর মেরে মেরে খেতো । সভ্য ছিল না। হঠাৎ করে ধনী হয়েছে। হঠাৎ করেই মানবাধিকারে নাম করেছে। করার জন্য অবশ্য ভীষণ চেষ্টা করছে। আলফ্রেড নোবেলকেই তো এ দেশ থেকে চলে যেতে হয়েছিল দারিদ্রের কারণে। অন্য দেশে লেখাপড়া করেছেন। পরে ফ্রান্সে বসে আবিস্কার করেছেন ডিনামাইট। টাকা পয়সা যা কামিয়েছেন তা ফ্রান্সে গবেষণা করেই কামিয়েছেন। কিন্তু দেশের উন্নতির জন্য নিজের সঞ্চয়ের সব টাকা ঢেলে গেছেন। সুইডেনের মানুষ প্রায় সবাই হয় জাতীয়তাবাদী নয় দেশ-প্রেমিক। এই দুই নিয়ে তর্ক আছে, কোনটি ভালো। আলফ্রেড নোবেলএর মতোই বেশির ভাগের মানসিকতা। বনে হাঁটছি একদিন। বনে জঙ্গলে হাঁটা এদের অভ্যেস। হাঁটতে হাঁটতে ওরা আহা আহা বলে ব্যাঙের ছাতা কুড়োচ্ছে। আমার পুলিশ রমণী অ্যান ক্রিস্টিন তো প্রতিটি ব্যাঙের ছাতাকে বংশ পরম্পরা চেনে। সব ব্যাঙের ছাতা নাকি, তখনই শুনলাম, ওই শহরের মধিখ্যানের জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে যে, খাওয়া যায় না। কিছু ছাতা নাকি বিষ। খেলেই মরে যায় মানুষ। ভালো মন্দ কোনওটাই আমি খাই না। ব্যাঙের ছাতার প্রতি ওদের উচ্ছাস আমি বড় বড় কৌতুকময় চোখে দেখি। বলছিলাম, সেই বনে বা জঙ্গলে কত মরা পাতা পড়ে আছে, কত মরা ডাল, মরা শেকড়। ওর মধ্যে সিগারেট খেয়ে নিতম্বটা ফেলেছি। সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিল অ্যান্ডারস নামের এক দেহরক্ষী। মাইলের পর মাইল হেঁটে যখন একটি ময়লা ফেলার ড্রাম পাওয়া গেল, ওতে সিগারেটের শেষটুকু ফেলল পুলিশ। জিজ্ঞেস

করেছিলাম, ওখানে ওটি থাকলে অসুবিধে কী হত? জঙ্গল নোংরা হত। সোজা উত্তর অ্যান্ডারসের। এভাবেই ওরা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখে দেশটি। ঝকঝকে তকতকে রাখে। ফ্রান্সে বড় বড় দালানকোঠা আছে। আবার আস্তরওঠা ঝুরঝুর করে পড়তে থাকা বাড়িও আছে। সুইডেনে বড় বড় কিছু নেই। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো লুভর জাদুঘর বা হোটেল দ্য ভিল নেই। ফ্রান্সের মত পমপিডু নেই, গ্যঁ প্যালেস পিতি প্যালেস নেই। কনকর্ডের মত বিশাল স্কোয়ার নেই। নতরদামের মত, নেপোলিয়ানের কবরের মত কোনও স্থাপত্যশিল্প নেই। ইফেল টাওয়ারের মত উঁচু কিছু নেই। সবই আকারে ছোট এখানে। একধরনের মিনিয়েচার। স্থাপত্যের বালাই নেই। সবই প্রায় ম্যাচ বাক্স। ম্যাচবাক্স ছাড়া যা আছে কারুকাজ, কিছুই আসল নয়। সবই দুনম্বর। মূলত ফ্রান্সের স্থাপত্যের নকল করে বানানো, তাও আবার শতাব্দি পার হলে পর।

কিন্তু দেশপ্রেম আবার কখনও কখনও জাতীয়তাবাদে পৌঁছে যায়। জাতীয়তাবাদ ইওরোপে একটি নেতিবাচক শব্দ। কারণ হিটলার ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে নয়া নাৎসি আছে। নয়া নাৎসিগুলোও সোয়াস্তিকা চিহ্ন ব্যবহার করে। অবশ্য লুকিয়ে, কারণ নাৎসি দল করা, নাৎসি চিহ্ন ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। নতুল ছেলেপিলেদের কাছে নিষিদ্ধ জিনিসের আকর্ষণ প্রচণ্ড। তাই প্রায়ই দেখা যায়, নাৎসিদের সভা হচ্ছে রাতের অন্ধকারে গোপনে গোপনে। নাৎসি আদর্শের গান গাওয়া হচ্ছে। নিও নাৎসি। স্কিন হেড। ওদের দেখলে চেনা যায়। কামানো মাথা, মোটা বুট জুতো পরবে। কালো বা বাদামী মানুষের দিকে ঘৃণা চোখে তাকাবে। সুযোগ পেলে মারবে। বেশি সুযোগ পেলে মেরে ফেলবে। শুনেই আমার ভয় হয়। যাই হোক। ছবির মত দেশ এই সুইডেন। গরম কালের শেষদিকটায় এসেছি আমি। আসা অবদি একটা রং আমাকে মুর্হুমুহূ মুগ্ধ করে দিল, রঙটি সবুজ। ঘাসের রং, গাছের পাতার রং যে যে এত সবুজ হতে পারে, এবং সবুজ রংটি যে এত সুন্দর হতে পারে, তা আগে আমার জানা ছিল না। ডায়ানার সঙ্গে বিকেলে সবুজের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমার এই একটি জিনিস দেখা হয়, প্রকৃতি। জলে স্পিড বোট দাঁড় করানো আছে। ইয়রগান একদিন বেরিয়ে

এলো জলের মধ্যে। আমি তো ভয়ে ত্রাহি চিৎকার। সকলে আমার চিৎকারের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। আমি একটা ভীতুর ডিম। সাঁতার জানি না বলতে চমকে উঠেছিল ওরা। এ দেশে সবাই সাঁতার জানে। ইস্কুলেই এটা শেখা বাধ্যতামূলক। সাইকেল চালাতেও সবাই জানে। আমি কোনওটাই জানি না। জানি না বললে লোকে অবাক চোখে আমার আপাদমস্তক দেখে। আমাকে ঠিক সভ্য বলে ওদের কারওর মনে হয় না।

কখনও বসে থাকার মেয়ে নই আমি। দেশে আকণ্ঠ ব্যস্ততার মধ্যে দিন কেটেছে। আর এখানে এক-দ্বীপ-অকাজ দিয়ে আমাকে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দেহরক্ষীদের সঙ্গে যা কথা হওয়ার হয়। সকলেই বলে স্বামী বা স্ত্রী নিয়ে তাদের সুখের সংসার। সকলেই প্রেম করে বিয়ে করেছে। অনেকে আবার বিয়ে করেনি, কিন্তু প্রেমিক বা প্রেমিকার সঙ্গে সহ-বাস করছে। যারা বিয়ে করে, তারা করে বিবাহিতদের বেলায় আয়কর কম দিতে হয় বলে। আমার অভাব দেখে অভ্যেস। ইয়ানকে জিজ্ঞেস করি, যা বেতন পায়, তা দিয়ে তার চলে কি না। ইয়ান হেসে বলে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই চলে। ইয়ানের বাড়ি আছে গাড়ি আছে। স্ত্রীও চাকরি করে। ইয়ান বলে, এ দেশে কোনও মেয়েই স্বামীর ওপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল নয়। সুইডেনের সংসদে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মেয়ে। মেয়েদের দেখছি চারদিকে, রাস্তায় হাঁটছে, সাইকেল চালাচ্ছে বা গাড়ি চালাচ্ছে। বসে আছে বাসে। আছে ক্যাফেতে, রেস্তোরাঁয়, ঘাসে, সিঁড়িতে। প্রেমিকের হাতে হাত ধরে চলছে, আদর করছে দুজন দুজনকে, চুমু খাচ্ছে হাজার লোকের মধ্যে। কিছু জিনিস পূর্ব দেশীয় চোখে ধরা পড়ে। তরুণিরা নিতম্ব ছোঁয়া স্কার্ট পরে হাঁটছে, স্তন অনাবৃত করে চলছে। রাস্তায় যখন দম্পতি দেখি, দেখি পুরুষের কোলে বাচ্চা বা পুরুষ প্যারামবুলেটর ঠেলছে। বাড়িতে পুরুষ রান্না করছে থালা বাসন মাজছে। ঘরদোর গুছোচ্ছে, পরিস্কার করছে। এসব দৃশ্য দেখে চোখ আরাম পায়। তাহলে এ সমাজে মেয়েরা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি নয়। এমন সমাজের স্বপ্নই তো আমি দেখি। পাশ্চাত্যের সমাজের প্রায় কিছুই না জেনে আমি যে লিখছিলাম নারীর স্বাধীনতার কথা, নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা, সেই সমানাধিকার তো দেখছি এই সুইডেনেই। যে

দেশটিতে আমি কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। খাপ খাওয়াতে পারছি না। খানিক পর পর আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ইয়ানকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করি, ঘর সংসারের কাজ, বাচ্চা লালন পালন এসব নিয়ে। ইয়ান বলে, তার সন্তান জন্মাবার সময় বাবার ছুটি সে পেয়েছে। আর সব সন্তানের পিতাই তা পায়। এখানে এমনই নিয়ম। মায়েদের তিন মাস ছুটি। বাবাদেরও তিন মাস। সন্তান লালন পালনের ভার দুজনের ওপরই সমানভাবে বর্তেছে।

--*তোমরা কি ছেলে হলে খুশি হও, মেয়ে হলে কম খুশি হও। এরকম কোনও নিয়ম আছে?*

ইয়ান হেসে সজোরে মাথা নেড়ে বলল, *একেবারেই না। আমরা চাই সুস্থ শিশুর জন্ম।*

লিলিয়ানার বাড়ির মাঠে খালি পায়ে হাঁটি। আপেল গাছে আপেল ঝুলে আছে। কেউ খাবার নেই। সব পড়ে মাঠ লাল হয়ে আছে। দুএকটিতে কামড় দিই। এত ফল নষ্ট হয়, আমার মায়া হয়। ইয়ানকে জিজ্ঞেস করি, *এত ফল অন্য কাউকে দিয়ে দিচ্ছে না কেন, যদি নিজেরা নাই খায়।*

ইয়ান বলল, *কেউ নেবে না। সবারই প্রায় আপেল গাছ আছে। যারা শহরে আছে, অ্যাপার্টমেন্টে থাকে, ফলের গাছ নেই। তারা ফল কিনে খেতেই পছন্দ করে। দাম তো খুব সস্তা আপেলের। দিতে কলা, দিতে আনারস, তাহলে লুফে নিত। ওসব তো জন্মায় না এখানে।*

--*এই যে সবুজ সবজি মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সে কোত্থেকে আসে?*

--*আসে বাইরের দেশ থেকে। অন্য দেশ থেকে এলে কম দামে কেনা যায়। অন্য দেশ মানেই তো সুইডেনের তুলনায় দরিদ্র দেশ। আর, এদেশেও যে কিছুই ফলানো হচ্ছে না, তা নয়। গ্রিন হাউজে শাক সবজি ফুল ফলের চাষ হয়।*

গ্রিন হাউজ? ব্যাপারটি নতুন আমার কাছে। গ্রিন হাউজ মানে হচ্ছে কাচের দেয়াল ঘেরা, কাচের ছাদে ঢাকা ঘর, ওতে কৃত্রিমভাবে তাপমাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে শাক সবজি, ফুল ফল ফলানো হয়। টমেটো সারা বছর গ্রিন হাউজেই হয়। সারাক্ষণ প্রশ্ন মনে। জানার উৎসাহ

টগবগ করে ফোটে। এমন কী গ্যাবি, যে গ্যাবি সবকিছুই রহস্যে মুড়ে রাখে, তার কাছেই জানার বাসনা আমার ফুরোয় না। রাস্তায় সারি সারি গাড়ি রাখা নিয়ে ফ্রান্সেই চমকেছিলাম, এখানে সুইডেনেও একই জিনিস।

--এখানে কারও কি গ্যারেজ নেই নাকি? রাস্তায় গাড়ি রাখলে কোনও অসুবিধে হয় না? চুরি টুরি হয় না?

--গ্যারেজ সবার থাকে না। নাহ, চুরিও হয় না। চুরি হতে যাবে কেন? কারও তো কোনও অভাব নেই যে চুরি করবে।

--তাও তো কথা।

প্রশ্ন আমি অনেক করতাম গ্যাবিকে, সবসময় উত্তর না জুটলেও প্রশ্ন থামেনি। গ্যাবির বাড়িতে আমাকে কদিন সারাদিন কাটানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, সেদিন ছুটিতে ছিল। ছুটি সে নাকি মাস ধরেই নিচ্ছে, আমাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব তখন অনেকটা জাতীয় দায়িত্বের মতোই। অত কিছু না জেনে তখন আমি রীতিমত স্তম্ভিত। কারণ লেনা, গ্যাবির স্ত্রী, তার চাকরি থেকে বিকেলে বা সন্ধেয় ফিরে আমাকে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করেছে, গ্যাবির সঙ্গে ভালো সময় কেটেছে তো! আমি কিছু বলার আগে গ্যাবি বলেছে, হ্যাঁ খুব ভালো সময় কেটেছে। বাংলাদেশে এ ব্যাপারটি অসম্ভব। কোনও স্ত্রীই সন্দেহমুক্ত হতে পারতো না, একলা বাড়িতে এক যুবতীর সঙ্গে স্বামীকে রেখে যেতে, সে যতই নিজেদের উপকারের জন্য হোক। নারী পুরুষের বন্ধুত্বে যে আমি অনুদাররকম উদার, সেই আমার মতো মানুষের মনেই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। সন্দেহ, গ্যাবির বোধহয় অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে, নিশ্চয়ই সে আমার ওপর হাত বাড়াবে বা প্রেম নিবেদন করবে বা কিছু। ঙকে নিয়ে আমার সন্দেহ কিছু হত না, যদি না ঙ নিজে তাঁর স্ত্রীকে আমার সঙ্গে বিদেশে আসার খবরটি না জানানোর বিষয়টি উল্লেখ না করতেন এবং শামসুর রাহমানের প্রেমিকা বিষয়ে কথা বলার সময় অমন গায়ের কাছে সরে না আসতেন। দূর দ্বীপের একাকী জীবন যাপনে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি বোধহয় ঙর ওপর অন্যায় আচরণ করেছি। প্রকৃতির খুব কাছে

এসে আমার মন অন্যরকম হয়ে যায়। ইয়ানের মতো সহানুভূতিশীল মানুষের সঙ্গে কথা বলে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমি আরও উপভোগ করি।

পুলিশের সঙ্গে আড্ডা পেটানো হয় না, কিন্তু চলাফেরা করতে করতেই একধরনের মধুর সম্পর্ক আমার গড়ে ওঠে। অনেক কিছু আমি ওদের কাছ থেকে জানি, এমনকী শিখিও। জুতোর ফিতে বাঁধতে পারি না। অ্যান ক্রিস্টিন আমাকে হাতে ধরে ধরে শিখিয়ে দিল কী করে জুতোর ফিতে বাঁধতে হয়। অ্যান ক্রিস্টিনের হাত লেগে একদিন লিলিয়ানার কাচের থাল বাসনের স্তুপ আলমারি থেকে উপুড় হয়ে পড়ে ভেঙে গেল। রোনাল্ডো দেখতে খুব সুন্দর। বেশ অনেকদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি বডিগার্ড ছবিটা দেখেছি কি না। না দেখিনি। পরে দেখেছি ছবিটি। হুইটনি হিউস্টন কালো গায়িকা। তার দেহরক্ষী সাদা। কেভিন কস্টনার। কেভিন কস্টনারের সঙ্গে প্রেম হয় হুইটনির। রোনাল্ডোর কি আমার সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছে? অমন সুদর্শন যুবকের জন্য ভেতরে ভেতরে তৃষ্ণা জাগে কি আমার! জাগে হয়তো। অমন নীল চোখ। অমন গোলাপি অধর। অমন সুন্দর হাসি।

লিলিয়ানা এসেছে দুদিন। একদিন ঘুরে গেল দুই বন্ধু নিয়ে। কফি খেতে। কফি আর কুকি নিয়ে দু ঘন্টা গল্প করল খাবার টেবিলে বসে। এ দেশে দেখলাম খাবার টেবিলে বসেই মানুষ দিনের গল্পগুলো সারে। টেবিলে বসে খাবার খেতে খেতে, কফি খেতে খেতে দীর্ঘ দীর্ঘ আড্ডা হয়। আমরা যেমন আড্ডা দিই সোফায় বসে, বা বিছানায় বসে বা শুয়ে। এদের আড্ডা খাবার টেবিলে। খাওয়ার সংস্কৃতিটি এদের চেয়ে আমাদেরটি বেশি উচুমানের হওয়া সত্তেও কেন আমরা খাবার টেবিলে বসে খেতে খেতে আড্ডা দিই না, তার একটি কারণ আমার মনে হয় আমরা হাতে খাই। ওদের মত কাঁটা আর ছুরিতে খেলে বসে থাকা যেত খাবার নিয়ে। আর গরম গরম খাবার গরম গরম খেয়ে নেওয়াই আমাদের অভ্যেস। খাবার লাগা হাত নিয়ে বসে থাকা আরামপ্রদ নয়, সে কারণেই সম্ভবত খাবার টেবিলে আমাদের আড্ডার সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। না হলে এমন ভোজনবিলাসী জাতির সঙ্গে খাবার টেবিলের এত হালকা সম্পর্ক

কেন। আমি একসময় ভাবতাম গরিব দেশের মানুষ বলেই হয়তো খাবার নিয়ে মাথা ব্যাথা। ছোটবেলা থেকেই তাই অভ্যেস। যা দেখে আসছি তাই শিখছি। নিজস্ব বিশ্বাস না হয় নিজের বুদ্ধি বিবেক চেতন খাটিয়ে ভিন্ন করা গেল, কিন্তু সংস্কৃতির পাঠ কম বয়সেই নেওয়া হয়ে যায়। রক্তে ঢুকে যায় আচার আচরণ। আমিও আমার পূর্বনারীদের মতোই *ভালোবাসি* এই কথাটি মুখে না উচ্চারণ করে মানুষকে খাইয়ে দাইয়ে বোঝাতে চাই যে ভালোবাসি। ডায়ানাকে একদিন খাওয়ালাম, এ প্রকাশ করতেই তো যে ভালোবাসি। ইয়ান, লার্স, ইয়রগান, রোনাল্ডোকে দ্বীপের বাড়িতে খাওয়ালাম, কারণ ওরা তো রান্না করে প্রায় কিছুই খাচ্ছিল না, কীসব রুটি পনির, মাখন, আর ফল খেয়ে চলছিল। আর কাঁচা মাংস রুটির ওপর বিছিয়ে খাওয়া। ওদের খাওয়া দূর থেকে এক পলক দেখেই মায়া হয়েছিল খুব। তখনই নেমন্তন্ন। এই, দুপুরে খেয়েছো? রাতের খাওয়া হয়েছে? এভাবে কিন্তু কোনও দেশের মানুষ শুধোয় না কাউকে। বাঙালি মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের জীবনে এই সংস্কৃতি গেড়ে বসে আছে। এর উৎস তো দারিদ্র। দরিদ্র দেশের মানুষ যেমন কেউ খুব মোটাসোটা দেখতে হলে তাকে স্বাস্থ্যবান বা স্বাস্থ্যবতী মনে করে। সম্পদ যে আছে, খায় যে ভালো, তারই লক্ষণ এই যে, গায়ে মেদ মাংস বেশি হবে। মেদহীন কৃশকায় মানুষকে বলা হয় *রোগা,* যেন রোগের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে। বলা হয় তাদের নাকি *স্বাস্থ্য* ভালো নয়। স্বাস্থ্য বলতে মেদবহুল শরীর বোঝে সবাই। অথচ স্বাস্থ্য তো অন্য জিনিস, ঠিক উল্টোটি। একমই জানতাম যে, গরিব দেশে জন্মেছি বলেই খাওয়ার খবর বেশি নিচ্ছি। একজন ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ আমাকে শুধরে দিয়ে বলেছিল, *গরিব তো আফ্রিকার অনেক দেশ। ওরা তো ভালোবাসা প্রকাশ করে না নানা পদের খাবার রেঁধে খাইয়ে! এর কারণ হল,* আমার চোখে চোখ রেখে, ধীরে, বললেন, *তোমাদের খাদ্য সংস্কৃতি অনেক উন্নতমানের, অনেক সুক্ষ্ম কারুকাজের, এর প্রায় পুরোটাই শিল্প। এই শিল্প নিয়ে চর্চা কর, এই শিল্প তোমরা পরিবেশন করো। তোমরা কি খাও শুধু পেট ভরার জন্য? তাহলে অত মশলাপাতি দিয়ে, অত সুস্বাদু করে রাঁধতে যাও*

কেন! কেন নানারকম পরীক্ষা নিরিক্ষা করো রন্ধনশিল্পের পিছনে। কোনওরকমভাবে সেদ্ধ করে খেয়ে নিয়ে পেট ভরালেই তো হয়। তা তো করো না!

দ্বীপের জীবনের অবসান একসময় হয়। লিডিঙ্গো নামে স্টকহোম শহরের দামি এলাকায় একটি আসবাবপত্রসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেওয়া হল। ভাড়া সাড়ে তিন হাজার ক্রোনার। দুটো শোবার ঘর, একটি বসার ঘর। একটি ব্যালকনি। বড় রান্নাঘর, ওখানেই খাবার টেবিল, সাধারণত তাই থাকে সুইডেনে। খাবার ঘর আর রান্নাঘর একটি ঘরই। এখানে তো আমাদের দেশের মত বঁটি দিয়ে মাছ কুটতে হয় না, বা মাটির চুলোয় কিছু রান্না হয় না, বা কেরোসিন তেলের চুলোতেও হয় না। এখানে রান্নাঘরগুলোয় সব যন্ত্রপাতি বসানোই থাকে। উনুনের ভেতর হরেক রকম উনুন। সবই একটি বড় মেশিনের মধ্যে। থাল বাসন মাজার জন্য মেশিন আছে। এঁটো থাল বাসন গ্লাস কাপ যা কিছু আছে ঢুকিয়ে দিয়ে ট্যাবেলেটের মত দেখতে সাবান ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে মেশিন চালু করে দিলেই সব ধুয়ে পরিস্কার হয়ে ঝকঝকে হয়ে গরম গরম বেরিয়ে আসবে। ড্রয়ার আছে চামচ রাখার। এ আছে এ রাখার, ও আছে ও রাখার। সব কিছুরই নিয়ম আছে। যে কেউ এসে রান্নাঘরে কাজ শুরু করে দিতে পারে, যে বাড়ির যে রান্নাঘরই হোক না কেন। সবাই জানে ছুরি কাঁটা কোন ড্রয়ারে থাকবে। কফি চা কোন পাল্লায় থাকবে। মশলা (এদের মশলা কালো লঙ্কার গুড়ো, রসুন, নুন, প্যাপ্রিকার গুড়ো ইত্যাদি ঢংয়ের জিনিস।)ছাকনি ইত্যাদি কোথায় থাকবে। তরল সাবানগুলো কোথায়, তোয়ালে কোথায়, বাসন পত্র কোনটি কোন জায়গায় আছে। সবই নিয়মে চলছে। সুইডরা নিয়ম পালন করবে যে করেই হোক। এরকম গল্প আছে যে কোনও সুইড যদি ভুল করে গাড়ি থামিয়ে ফেলে জেব্রা ক্রসিংএ, ধরা যাক সে কোনও জনবসতিশূন্য রাস্তা, কেউ পারাপার করছে না, কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু সুইডটি সোজা পুলিশ অফিসে গিয়ে ট্রাফিক আইন ভেঙেছে দাবি করে নিজের পকেট থেকে যা জরিমানা হওয়ার সেই পরিমাণ টাকা দিয়ে আসবে। আইন বলে কথা। সুইড মায়েরা বাচ্চা হওয়ার পর বাচচাকে কী করে দুধ খাওয়াতে হয় তাও বই পড়ে শেখে। সবই এদের বই পড়া বিদ্যে। সবই শেখে এরা।

কোন পোশাক পরে ঘাস কাটতে হয়। বাড়ির রং করতে গেলে কোন পোশাক। কোন পোশাক পরে নিমন্ত্রণে যেতে হয়। মানুষের সামনে কী বলতে হয়, কী বলতে হয় না। যখন মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বলতে থাকে, তখন বোঝা যায় এই ধন্যবাদ মাথা থেকে নামছে, যেখনে বই পড়া বিদ্যেটা রাখা আছে। হৃদয় থেকে খুব কম জিনিস বেরোয়। কী বেরোয়, তা খুব বোঝা মুশকিল। কী করে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়, চলতে হয়, কী করে ভদ্রতা দেখাতে হয়, গাছের চারা কী করে মাটিতে পুঁততে হয়, দুঃখ পেলে কী করে সামলাতে হয়, সুখ হলে কী করে আনন্দ করতে হয়, সবই বই পড়ে শেখে। কিছুই সহজে এদের মাথা থেকে বেরোতে চায় না। আমি সবাইকে এক কাতারে ফেলতে চাইছি না। কোনও একটি জাতির কোনও নিজস্ব চরিত্র আছে বলেও আমি মনে করি না। এসব ব্যক্তি চরিত্রের ব্যপার। তবে বেশির ভাগের কথাই হচ্ছে এখানে। কেন মাথার বুদ্ধি এরা এসব জিনিসে খাটায় না, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। বুদ্ধি তো এমনিতে কম নেই। যে কোনও কিছু কিনেই এরা সবার আগে জিনিসের সঙ্গে আসা কাগজ পড়তে শুরু করে। কাগজ পড়ে আগে সম্পূর্ণ বুঝে নিয়ে জিনিস দিয়ে কী কী করতে হবে, তারপর জিনিস স্পর্শ করে। যদি টেবিল হয় টেবিল জোড়া লাগায়, যন্ত্র হলে যন্ত্রে নাট বল্টু ঢোকায়। আর আমরা সবার আগে যন্ত্র হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে নেড়ে চেড়ে যেটার মধ্যে যেটা ঢুকবে বলে চোখের দেখায় মনে হয়ে তা ঢুকিয়ে টেপাটেপি করে চালু করানোর চেষ্টা করি। গুল্লি মারো ম্যানুয়েল। নাট বল্টু বা খণ্ড খণ্ড অংশ নিয়ে এদিক ওদিক ঢোকাতে চেষ্টা করলে তো একটিতে লেগে যাবেই। এক দুই করে ইহা করুন তাহার পর উহা করুন এসব মেনে কিছু বাঙালিরা করবে না। কাগজ পড়ে আদেশ বা উপদেশ মান্য করার স্বভাব বাঙালির নেই। পশ্চিমিদের কিছু জিনিস আমার খুব পছন্দ হয়, কিছু জিনিস খুব বিচ্ছিরি লাগে। পছন্দ করার জিনিসগুলো যে এরা সবাই করে তা নয়। তারপরও দেখা যায় বেশির ভাগের মধ্যেই এই প্রবণতা আছে, এরা মিথ্যে কথা কম বলে, অন্যের অসুবিধে করতে চায় না, যার সঙ্গে প্রেম করে তাকে ছেড়ে অন্য কোথাও প্রেম করে বেড়ায় না, মেয়েদের দ্বিতীয় লিঙ্গ বা দুর্বল জীব বলে ভাবে না। বিচ্ছিরি অনেক কিছুই

লাগে। কৃত্রিমতা অনেক, খুব আন্তরিক নয়, হিসেবি হিসেবি আর হিসেবি। এত হিসেব করে কী করে মানুষ জীবন যাপন করে, জানি না। কাউকে পছন্দ করলে তার সব ভালো, অপছন্দ করলে তার সব খারাপ। আমার কিছু জিনিসও এদের কাছে উদ্ভট লাগে। এক দুই করে ধরলে অভিযোগগুলো এরকম--

১. কেন আমি তার চোখে চোখ রেখে কথা বলছি না? এর অর্থ আমি তার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করছি। মূলত তাকেই উপেক্ষা করছি।
২. কেন আমি ধন্যবাদ শব্দটি ব্যবহার করি না? কেউ আমাকে কিছু উপহার দিলে , আমার জন্য দরজা খুললে বা আমার কোনও প্রশংসা করলে বা এরকম একশ রকম কারণে।
৩. কেন আমি দোকানে বা পোস্টাপিসে বা ব্যাংকে বা যে কোনও টিকিট কাটার লাইনে, লাইন যদি লম্বা হয়, দাঁড়াতে চাই না!
৪. কেন আমি রেস্তোরাঁর বা ক্যাফের বিল একা মেটাতে চাই! তার কারণ কি আমি মনে করছি অন্যদের টাকা পয়সা নেই? এ কি অন্যদের অপমান করা নয়!
৫. কেন আমার বাড়িতে কেউ এলে আমি তাকে খাবার খেতে বলি? আমি কি ভাবছি তার বা তাদের খাবার জোটানোর মুরোদ নেই!
৬. কেন আমি এত পদের খাবার রান্না করি! আমি কি খাইয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে চাই, অন্য কিছুতে মুগ্ধ করার ক্ষমতা আমার দিন দিন লোপ পাচ্ছে কি!
৭. কেন কেউ খেতে থাকলে তার পাতে আমি খাবার তুলে দিই।
৮. কাউকে কেন আমি উপহার দিই? যে জিনিস উপহার দিই, তা কি তার নেই, বা তার কিনতে পারার যোগ্যতা া নেই বলে ভাবি।

৯. কেন আমি কারও কাছে কিছু চাওয়ার সময় *অনুগ্রহ করে* বলি না? কেন আমি *উড ইউ প্লিজ গিভ মি কাপ অব টি* না বলে *গিভ মি কাপ অব টি* বলি? আমি কি মানুষকে চাকর বাকর মনে করি?

১০. কেন কোথাও যাবার সময় আমি কাউকে সঙ্গে নিতে চাই, হাঁটার সময় বন্ধুদের হাত ধরে হাঁটতে চাই!

১১. কেন আমি কেউ কথা বলতে থাকলে মাঝখানে কথা বলি! অন্যদের কথার চেয়ে নিজের কথাকেই কি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি! অন্যদের কথা মন দিয়ে না শুনলে কেন অন্যরা আমার কথা শুনতে চাইবে!

১২. কেন আমি ফট করে জিনিস কিনে ফেলি। কেন দেখে শুনে, অনেকগুলো দোকান দেখে দাম বিচার করে তারপর কিনি না!

১৩. কেন আমি বন্ধুদের এটা ওটা করতে বলি। আমি কি ভাবছি কেউ আমার এটা ওটা করতে বাধ্য! কেউ আমার চাকর?

১৪. কেন আমি মানুষকে অল্প পরিচয়ের পরই বাড়িতে নেমন্তন্ন করি!

১৫. কেন আমার অসুখ হলে বন্ধুদের বাড়িতে ডাকি,   কপালে হাত রাখতে বলি?

এরকম কয়েকশ *কেন।*

এই কেনর মধ্যে লুকিয়ে আছে পূব এবং পশ্চিমের তফাৎ।

কোনও একটি সংস্কৃতি ভালো এবং কোনও একটি মন্দ -- নির্বোধের মতো এমন বাক্য আমি আর উচ্চারণ করি না। হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি যে পশ্চিম এবং পূব -- দুই সংস্কৃতিতেই ভালো অনেক কিছু আছে। দুই সংস্কৃতির মন্দগুলো বাদ দিয়ে যদি ভালোগুলো আলগোছে তুলে এনে   মিশিয়ে ফেলি, আমার গভীর বিশ্বাস, তা হয়ে উঠবে অতুলনীয়। প্রতিনিয়ত সমাজের সহস্র পচা পুরোনো নিয়মের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সমষ্টি থেকে বেরিয়ে ব্যক্তিতে উত্তরণের জন্য উন্মুখ ছিলাম, সে দেশে থাকাকালীন। কিন্তু যার জন্য সংগ্রাম

করতাম, সেই সতন্ত্রবাদের পূর্ণ রূপ এখানে, বিশেষ করে উত্তর ইওরোপের দেশগুলোয়, এবং এই রূপ নিয়ে আমি, খুব সত্যি কথা যে, এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সতন্ত্রবাদ বা ইন্ডিভিজুয়ালিজমের এই চেহারাটিই কি মনে মনে আমি ইচ্ছে করেছিলাম? সত্যি বলবো, আমি চাইনি এমন, এমন ইচ্ছে আমি করিনি। সতন্ত্রতা শেষ অবদি নিতে নিতে মানুষকে এত ভয়াবহ একাকীত্বের দিকে নিয়ে যায়, যে, এক *আমি* ছাড়া আর কেউ থাকে না চৌহদ্দিতে। আমার পক্ষে ওরকম একাকীত্ব নিয়ে বেঁচে থাকা, খুব বুঝি যে, অসম্ভব। অন্য কারওর জন্যও এমন দুঃসহবাস আমি কামনা করতে পারি না। কেবল পূবের চোখে আলাদা করে দেখছি না, পশ্চিমের চোখ দিয়ে দেখলেও ভয়ে কুঁকড়ে যাই।

পশ্চিমের সতন্ত্রবাদ মানুষকে কী ভীষণ একা করে দিচ্ছে, তা এই জীবনের গভীরে গিয়ে না দেখলে বোঝা যায় না, যাবে না। এখানে জীবন যার যার তার তার। অন্য কেউ ওতে নাক কেন, কিছুই গলাতে পারবে না। কেউ যদি ভোগে, এ তার একার ভোগা। কেউ কারও ভোগান্তির ভাগ চাইবে না। একই রকম স্ফূর্তিরও। তোমার আনন্দ তোমার কষ্ট, সব তোমার একার। যদি বিলোতে হয় কিছু, বরং আনন্দ বিলোবে, কষ্ট নয়। নিজ নিজ জীবনের দুঃখ কষ্টই যথেষ্ট সওয়ার জন্য, অন্যের কষ্ট ভাগ করে সওয়ার আগ্রহ কারও নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে কুকুর অথবা কড়িকাঠ এদের শেষ ভরসা হয়। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞর দুয়ারে সবচেয়ে বেশি ভিড় করতে হয় এদের, পূবের মানুষের তার প্রয়োজন হয় না। মন খারাপ! তাতে কী! বন্ধু আছে, স্বজন আছে, মন কেন খারাপ তা বল, মনের যত কথা, যত ভাবনা, সব নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ কর। অন্তত কথা তো বলা যায়, বলে কষ্টের বোঝা অনেকটাই কমিয়ে ফেলা যায়, অন্যের কাঁধ আছে নিজের মাথাটি রাখার, অন্যের হাত আছে হাতটি ধরার, অন্যের হৃদয় আছে নির্ভার হওয়ার। পশ্চিমের পরিবেশে তীব্র তীক্ষ্ম একাকীত্বের অন্ধকারে আমি যখন ডুবতে থাকি, পূবের সংস্কৃতির প্রয়োজন আমি হাড়ে মজ্জায় অনুভব করি । এ দেশের কাউকে যদি বলি

আমি একা বোধ করছি, তারা কিছুতেই তার সঠিক অনুবাদ জানবে না। মাসের কুড়িদিনই বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করছি, চূড়ান্ত ব্যস্ততার জীবন, তার ওপর তারকাখ্যাতি। একাকীত্ব কোত্থেকে আসে তবে? আসে ওই ঘুলঘুলি দিয়ে, শীতের সূঁচের মত আসে, অন্য কোথাও নয়, মাথায় বেঁধে। মনকে স্থবির আর শরীরকে অভ্যেসের দাস বানিয়ে   ফেলে। *আমি* বলে আমার তখন আর কিছু থাকে না।

মনে হতে থাকে আমি বুঝি জেলখানায় আছি। দু পা এগোনো যাবে না, পিছোনো যাবে না। যে স্বাধীনতার জন্য জীবনভর লড়েছি, সেই স্বাধীনতাই দেখি লুঠ হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। মুখ ফুটে বলতে চাইছি কিছু, পারছি না। বিদেশ বিঁভুইএ কী থেকে কী হয় কে জানে! কিছু হলে কে আসবে বাঁচাতে। নিঃসঙ্গতা আমাকে ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি গেয়ে গেয়ে দিনভর রাতভর ঘুম পাড়িয়ে রাখে। জেগে উঠেই দেখি খুব একা আমি। এই একাকীত্ব ঠিক কী রকম কাউকে বোঝাতেও পারি না।   অনেককে *বন্ধু* বলে সান্ত্বনা পাই। যদিও সত্যিকার অর্থে *বন্ধু* কেউই নয়, তবে অনেকদিনের পরিচিতকে আমরা বন্ধু বলে অভ্যস্ত, অথবা *বন্ধু আছে আমার, একেবারে একা নই*, এই ভেবে মিথ্যে হলেও স্বস্তি পেতে চাই। যে কোনও সময় চলে যাবো দেশে। দিন গুনছি। কে আমাকে জানাবে দেশে ফেরার খবর! কিছুই জানি না। ডঃ কামাল হোসেনের সঙ্গে দাদারা যোগাযোগ রাখছে। মামলার কী খবর, মৌলবাদিরা কী করছে, সরকার কী বলছে, এসব পই পই করে জিজ্ঞেস করি ফোনে। ওদিক থেকে উত্তর যা আসে, তাতে আমার মন ভরে না। দেশ দেশের মতো আছে। কিন্তু দূর দ্বীপবাসিনী তার দেশকে ডেকে ডেকে আকুল হয়ে কাঁদে ---

বল্টিক সমুদ্রের পাড়ে লাল একটি কাঠের বাড়ি
বাড়ির সামনে খোলা মাঠ, মাঠে বিস্তর চেরি, স্ট্রবেরি আর আপেলের গাছ,
পেকে একা একা পড়ে থাকে ঘাসে, হরিণ আসে মাঝে মধ্যে ঘাস খেতে
আর গাছের গায়ে গা চুলকোতে।
ম্যাগপাই পাখিরা আসে বেড়াতে বেড়াতে, কিছু নির্জন হাওয়াও,

সেই বাড়িতে অল্প অল্প করে একটি সংসার গড়ে উঠছে আমার, চাল ডাল আর নুনের সংসার
বিকেলের চায়ে দুচামচ নিঃসঙ্গতা গুলে পান করার সংসার,
সারারাত অরণ্যের অন্ধকারকে শিয়রে বসিয়ে আগুন তাপাতে তাপাতে
গল্প করার সংসার, অথবা ভোরের দিকে ঘুম নামলে আড়মোড়া ভেঙে চনমনে হওয়ার সংসার।

এখনও ফেরাও আমাকে।
এখনও আমাকে ধুলোবালি নদী হাওড় সর্ষে ক্ষেত আর ব্রহ্মপুত্র দাও।
এখনও দাও কলতলা, নিকোনো উঠোন, হাতপাখার হাওয়া, টিনের চালের রিমঝিম,
আর ঝিঁঝিঁর ডাকের গোটা বর্ষা, ধোঁয়া ওঠা ভাতে মাগুর মাছের ধনেপাতা ঝোল।
এখনও স্ক্যানডিনেভিয়ার শরীর থেকে সরিয়ে নাও আমার ছুঁই ছুঁই শেকড়,
আমাকে বাঁচাও।

খোলা চিঠি

খোলা চিঠি লিখেছিলেন ইওরোপ আমেরিকার কিছু লেখক। সুসান সনটাগ, সালমান রুশদি, এলফ্রিডে ইয়েলিনেক, বাত ইয়েওর, বার্নার্ড হেনরি লেভি, ফিলিপ সোলের, নাদিন গরডিমার, এরকম আরও অনেকে লিখেছেন । খোলা চিঠিগুলো ইওরোপের পত্রিকাগুলোয় একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ছাপা হত। চিঠিগুলোর বেশির ভাগই তখন লেখা, যখন আমি অতলে অন্তরীণ নিজের দেশে। চিঠিগুলোই পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠীকে আমার পক্ষে দাঁড়াতে ইন্ধন জুগিয়েছে। তা না হলে কার কী ঠ্যাকা পড়েছিল কিছু করার! চিঠিগুলো নিয়ে বই বের করে জার্মান প্রকাশক, ফরাসি প্রকাশক।

আমার শুধু সালমান রুশদির চিঠিই পড়া হয়েছিল। পড়া হয়নি অন্যদের চিঠি। যে যার ভাষায় চিঠি লিখেছেন। ইংরেজি ছাড়া অন্য যে ভাষায় লেখা হলে তা পড়ার ক্ষমতাও আমার নেই। সেসব চিঠির অনুবাদ বের হবার পর আমি জানিতে পাই যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখিকা দক্ষিণ আফ্রিকার নাগিন গর্ডিমার লিখেছিলেন *দ্য রিপাবলিক অব লেটার্স পত্রিকার ৮ জুলাই সংখ্যায় আমি তসলিমা নাসরিনের একটি সাক্ষাৎকার পড়েছি। তার মাধ্যমেই তাকে অল্প অল্প জানতে পেরেছি। ওঁর দৃঢ় চারিত্রিক শক্তি এবং সতেজ মননশীলতা তাঁকে সম্পূর্ণ সাহায্য করবে সেই পরীক্ষায় যাতে তাঁর লেখকসত্ত্বা ও মানবসত্ত্বাকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ওঁর সাহসের কোনও অভাব নেই। তবু তিনি হয়তো এ কথা জেনে আশ্বস্ত হবেন যে অন্যান্য বহু লেখক বন্ধুর মতো, চিন্তায় ও মননে আমি তাঁরই সঙ্গী। তাঁর মুক্তির জন্য আমি যথাসাধ্য*

করব। যে সত্য আমরা জানি তাকে প্রকাশ করতে গেলে যা হারাতে হয় সে সব কিছুরই তিনি জীবন্ত প্রতীক।

অনুবাদ না হলে জানা সম্ভব ছিল না বাত ইয়েওর এর চিঠি। *প্রিয় তসলিমা, আমি সেই লক্ষ লক্ষ নারীদের একজন, যারা আপনাকে শ্রদ্ধা করেন, অথচ যাদের আপনি চেনেন না। আপনি অসংখ্য নারীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন, এঁদেরই শক্তিতে, এঁরা আপনার সেই মর্যাদাবোধ ও সাহসকে শ্রদ্ধা করেন। এদিকে এরা নিঃশব্দে বলি হচ্ছেন এবং বিনা প্রতিবাদে নিজেদের ভাগ্যকে মেনে নিচ্ছেন। আপনি নিজে নারী, কাজেই এঁদের আবেদন এবং নীরব অনুযোগ আপনি উপলব্ধি করেছেন। আপনি মুখ ফিরিয়ে ঔদাসিন্য দেখাননি, বরং এঁদের অভিযোগ নিজের বলে গ্রহণ করেছেন। বইছেন এঁদেরই বোঝা। আপনার লেখায় সেই কষ্ট ও যন্ত্রণাকে তুলে ধরে আপনিও সেই কষ্টের ভাগীদার। অথচ, আপনাকে নিজে কখনও সেই কষ্ট ভোগ করতে হয়নি। আপনার চিন্তা ও বুদ্ধি তাদেরই সমর্থনে পুষ্ট, যারা নিজের মত প্রকাশে অক্ষম এবং হিংস্রতার অসহায় শিকার। একজন চিকিৎসক হিসারে আপনি চেষ্টা করেছেন রোগ নিরূপণ করতে। চেষ্টা করেছেন, সামাজিক কাঠামো থেকে ঘৃণা, কুসংস্কার এবং অন্ধ গোঁড়ামি উচ্ছেদ করে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, রোগির চিকিৎসা যিনি করেন, আপনি সেইরকমই একজন নিঃস্বার্থ বাস্তবধর্মী চিকিৎসক। এই পদক্ষেপের ফলে আপনি একটি মহৎ ও সাহসের কাজ সম্পন্ন করেছেন। এই অবিচার, এই লজ্জাকর ঘৃণ্য অবস্থা নিঃশব্দে মেনে নিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে এক নিরুদ্বিগ্ন আয়াসের জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু আপনি সেই নীরব নিষ্ক্রিয় মানুষের দলে যোগ দেননি।*

ভেদাভেদ কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যারা সমাজে কিছু মানুষকে বাতিল করে দিচ্ছে, আপনি কঠোরভাবে তাদের সমালোচক। আপনি চেয়েছেন সব মানুষকে মৈত্রী ও সংহতির বাণী শোনাতে। এই কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে কিছু লোককে আক্রমণ করেছেন। যারা নিজেরাই নৈতিকতার মান ঠিক করতে চায়, বা অন্যদের বিচার করার বা পঙ্গু ও হত্যা করার একচেটিয়া অধিকারী বলে মনে করে, তারাই আপনার আক্রমণের লক্ষ। এদের যারা

বিরোধী, তাদেরকে এরা নানাভাবে অত্যাচার করে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। আমাদের দুর্ভাগ্য এই অশুভ শক্তি পৃথিবীর সর্বত্র সব সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে আছে। এই অশুভ শক্তির পরিণতি গণহত্যা অর্থাৎ আউসহুইৎস, গুলাগ....। প্রিয় তসলিমা, অগুন্তি অপরিচিত নারী আপনাকে তাদের শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

আমেরিকার বিশিষ্ট লেখিকা সুজান সন্টাগের চিঠিটি এরকম, *আপনার বিরুদ্ধে যা ঘটেছে সেটা নারী বিদ্বেষের উদাহরণ। এটি কেবল বিদ্রোহী লেখকদের পীড়ন করার নমুনা নয়। এই পীড়ন এখন বিংশ শতাব্দির এক উন্নত ঐতিহ্য। বহু শতাব্দি আগে ইওরোপে ডাইনিদের শাস্তি দেওয়ার প্রথা ছিল। এখন একইরকম ভাবে বহু ইসলামিক রাষ্ট্রে নারীরা আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। বিশেষ করে সেই নারীরা -- যারা ভীরু নন, বশ্যতা স্বীকারে প্রস্তুত নন, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের মত প্রকাশে সক্ষম এবং যারা অন্যদের থেকে আলাদা। যারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম সেই সব নারী ও লেখকরা আপনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখে ভরসা পাবেন। আমি শুধু আপনার সহকর্মী লেখকই নই। আপনি মানবজাতির যে অর্ধেকের অংশ, আমিও সেই অর্ধেকের একজন। আমি আপনার সহমর্মী। আপনার জন্য রইল আমার উষ্ণতম অভিনন্দন।*

অস্ট্রিয়ার লেখিকা এলফ্রিডে ইয়েলিনেক লিখেছেন -- *প্রিয় তসলিমা, তোমার দেশে এত মানুষ আছে যে সেই দেশ মনে করে তোমার মতো ব্যক্তিকে বাদ দিয়েও তাদের চলবে। একজন মানুষ কমবে বই তো নয়, কে আর খেয়াল রাখছে। আর তারা ভাববে, এই মেয়ে তো আমাদের ধর্মকে অপমান করেছে, যে ধর্মকে কোটি কোটি পুরুষ তাদের কাঁধে আর কোটি কোটি নারী তাদের বেঁকে যাওয়া পিঠে চড়িয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে। ধর্মের কিছুই এসে যাবে না, যদি তার বিশাল প্রতিমূর্তির ভারে কোনও নারী ছিটকে পড়ে যায়। তাকে তো এই ভারবাহী নারীর অভাবে খুঁড়িয়ে চলতে হয় না -- সে অনায়াসে আরামে এগিয়ে চলে। কিন্তু সেসব দেশে তসলিমা, তোমার বা তোমার মতো মেয়েদের কোনও অধিকার নেই। সেখানে যে এখনও এক জুজুর শাসন অব্যাহত। এ সত্ত্বেও আমি মনে করি তোমার প্রতি যদি অত্যাচার করা হয়, তা*

হলে তোমার ধর্ম যাকে তুমি ন্যায়সঙ্গতভাবে অত্যাচারের হাতিয়ার বলে থাকো, একটা ভগ্ন কাঠামোর মতো হঠাৎ তীব্র শব্দে ভেঙে পড়বে। .. ইসলামধর্মী পুরুষের দল বলে থাকে ট্র ইসলাম তাদেরই হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করেছে। কোনও একদিন তারা বুঝবেন যে তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংসের কারণ। কেননা নারীকে তারা সমমর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছে। এ কথা ভালোভাবে জেনেও যে নারীপুরুষ সমান।

প্রিয় বান্ধবী, তুমি কিন্তু কোনও কাউন্টারের নিচে তোমার অন্য কোনও জীবন গোপন করে রাখোনি। তোমার একটিই স্বরূপ, সেটিই তুমি নিক্ষেপ করেছো। তোমার এ জীবন বিক্রয়ের জন্য নয়, যদিও তার জন্য বাজারের মূল্য ধার্য করা হয়েছে। এককালে এখানে আমাদের ঈশ্বরের মূল্য নির্ধারিত হয়েছিল মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্র। আজকালের যে কোনও সমৃদ্ধ দেশের মুদ্রায় সেই তখনকার ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার দাম কত দাঁড়িয়েছে কে জানে। তুমি তসলিমা কিন্তু আরও মূল্যবান। তোমার জীবন অমূল্য। তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তুমি সত্যভাষী এ কথাটি এবং সমস্ত কথা বলার আমার অধিকার আছে, তাই আমি বলছি। তোমাকে আমার আলিঙ্গন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জার্মান লেখক এরিখ ল্যেস্ট লিখেছেন, *আশা করি তসলিমা নাসরিন খবর পাবেন যে জার্মানির লেখকরা তাঁর লেখার স্বাধীনতা এবং তাঁর ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য সক্রিয়ভাবে সরব হয়েছেন। এবার যখন দশ হাজার বিক্ষোভকারী যারা সকলেই পুরুষ তারা জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করবে তসলিমাকে ফাঁসিকাঠে চড়াও, তখন একটা খবর তাকে নতুন শক্তি জোগাবে। খবরটি এই, পৃথিবীর অনেক দেশে তসলিমার নাম একটি প্রতীক চিহ্নে পরিণত হয়েছে।*

এরকম আরও চিঠি। চিঠির উত্তরও একটি খোলা চিঠি।

প্রিয় লেখকবন্ধুরা,

পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র দেশের ক্ষুদ্র লেখক আমি। আর এই আমার জন্য অন্ধকারের থাবা থেকে আমাকে মুক্ত করবার জন্য আপনারা কলম হাতে নিয়েছেন। এ যে আমার কত বড় প্রাপ্তি তা আমি কেবল উপলব্ধিই করতে পারি। কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে যায়। মাঝে মধ্যে ভাবি, এত আয়োজনের আমি বোধহয় যোগ্য নই।

পৃথিবীতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিবেকবান যুক্তিবাদী মানুষ এখনও আছেন, তাদের সহযোগিতায় গাঢ় অন্ধকার থেকে, নিঃশ্বাস ফেলা যায় না এমন বন্ধ ঘর থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পেরেছি আলোর পৃথিবীতে। পৃথিবীতে এখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস কিছু কিছু মানুষের আছে, আমার গর্ব হয় আমি সেইসব হৃদয়বান মানুষের কাছাকাছি আসতে পেরেছি। আসলে বিবেকবান সকল মানুষই আমরা পরস্পরের আত্মীয়। লেখকবন্ধুরা, আপনাদের আমি পরম আত্মীয় বলে ভাবতে ইচ্ছে করি।

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র, দরিদ্র দেশ। এর সভ্যতার ইতিহাস হাজার বছরের। বাংলায় কথা বলবার মানুষের সংখ্যা সমস্ত পৃথিবীতে দুশ মিলিয়ন। বাংলা ভাষার জন্য আমি গর্ববোধ করি। পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন এক বাঙালিরাই। ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করবার জন্য ১৯৭১ সালে যে জাতি রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধ করলো, তিরিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিল, সেই আলোকিত জাতির সামনে বিকট থাবা মেলে এগিয়ে আসছে গাঢ় অন্ধকার, বিজাতীয় সংস্কৃতি।

আমাদের দুঃখ এই, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, এবং জাতীয়তাবাদ ছিল এ দেশের প্রধান চার স্তম্ভ। সে দেশের সংবিধান থেকে হঠাৎ খসে গেল একদিন ধর্মনিরপেক্ষতা। প্রচণ্ড সম্ভাবনার দেশটিকে ধীরে ধীরে ইসলামিক বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে। এই ষড়যন্ত্রগুলো বরাবরই করেছে দেশের সরকার, আর এখন তাদের খৎনা করা সংবিধানটিই বহন করে চলেছে তাদেরই উত্তরসূরি বর্তমান সরকার। বাঙালি গর্জে উঠতে জানে, তা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, কিন্তু এই যে এক এক করে রাষ্ট্রকাঠামো থেকে সবলে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, তার বিরুদ্ধে এখনও ফুঁসে উঠছে না এখনও বাঙালিরা। বরং

মৌলবাদীদের সংখ্যা বাড়ছে, গলার জোর বাড়ছে, গায়ের তেজ বাড়ছে, ওরা রাজপথ দখল করে নিচ্ছে, ওরা এখন সদর্পে দেশের যেখানে সেখানে দাপিয়ে বেড়াতে পারে, মিটিং মিছিল করতে পারে, তুমুল চিৎকার, হইহল্লা সবই ওরা পারে। অথচ দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর পর এগুলো ছিল অসম্ভব ঘটনা। মৌলবাদীরা যুদ্ধাপরাধি অথবা তাদেরই বংশধর। ওরা গর্তের ভেতর মুখ লুকিয়েছিল ৭১এর পর, এখন ওরা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। বলিষ্ঠ যে কণ্ঠস্বরই তাবৎ অন্ধকার আর অন্ধত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার, সেই কণ্ঠকেই ফনা তুরে ছোবল দিচ্ছে। ঢাকার রাস্তায় ওরা দশ লক্ষ সাপ লেলিয়ে দেবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। সাপ এবং মৌলবাদীদের মধ্যে আমি কোনও তফাৎ দেখি না।

দীর্ঘ দুমাস। যখন বেঁচে থাকার সব আশা একটু একটু করে ঝরে পড়ছিল, সারা দে জুড়ে হরতাল হচ্ছে আমার ফাঁসির দাবিতে, লক্ষ লক্ষ লোক নেমে আসছে রাস্তায়., লং মার্চ করছে, মহাসমাবেশ করছে। আমাকে হত্যা করার জন্য বিশেষ স্কোয়াডও গঠন করছে, মাথার মূল্য ধার্য হচ্ছে কদিন পর পর---- শপথ নেওয়া হচ্ছে যে করেই হোক আমাকে তারা হত্যা করবেই ---আর দেশের প্রগতিশীল বলে যাঁদের মনে করা হয় তাঁরা আমার পক্ষে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন, আর রাজনৈতিক দলগুলোও ভোটের লোভে আমার বিপক্ষে কথা বলছেন---- সেই ভয়ংকর দুঃসময়ে আপনারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমি অতি সামান্য একজন মানুষ। আমার জীবন খুব একটা মূল্যবান বস্তু নয়। আমি মরে গেলে জগতের কিছুই ওলোটপালোট হবে না, কিন্তু আমার দুঃশ্চিন্তা ছিল তখন একটিই এবং এখনও এই একটিই, যে, যে দেশটি চমৎকার সব সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম নিল তার কেন আজ এই পরিণতি! মৌলবাদীরা আমাকে হত্যা করেই কি তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলবে? না, তারা দেশের সব মুক্তচিন্তার খোলা চোখের বিবেকবান মানুষকে এক এক করে হত্যা করবে। ওদের যদি এখনও না ঠেকানো যায়, তবে চোখের সামনেই হয়তো দেখতে হবে প্রিয় দেশটির ধ্বংসাবশেষ। ওরা ব্লাসফেমি আইন আনতে চায় দেশে। যদি এই আইন চালুই হয় দেশে, তবে নিশ্চিত যে নারী

বন্দি হবে ঘরে, বন্ধ্যাত্ব আসবে শিল্প সাহিত্যের জগতে। বাংলাদেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে ঠেলে দেবার জন্য মৌলবাদীরা যেরকম মরিয়া হয়ে উঠেছে, ওদের হিংস্র থাবা থেকে দেশটিকে বাঁচাবার দায়িত্ব এখন আমার, আপনার, পৃথিবীর সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের। আমি বিশ্বাস করি, শিল্পী সাহিত্যিকরাই বেশি তাগিদ অনুভব করেন সমাজের শরীর থেকে আবর্জনা দূর করার, তাঁরাই অন্ধকার সরিয়ে থোকা থোকা আলো আনেন।

আপনারা, বড় লেখকবৃন্দ, আমি বিশ্বাস করি, কোনও দেশ বা কালের প্রতিনিধি নন, আপনারা সকল দেশের, সকল কালের। এই যে ন্যায়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছেন আপনাদের উদার হাত, সেই হাতে আমি হাত রাখছি আমার। আপনারা আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

তসলিমা

পৃথিবীর পথে

একটি একটি করে দিন যায়,

একটি একটি করে মাস,

ফুল পাতা ঝরে, পাখিরা লুকায়

জীবন শুকিয়ে হয় নাশ।

নরওয়ের অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার সাতদিন পর পর্তুগালে ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব রাইটার্সদের সম্মেলন। আমাকে যেতে হবে দুটোতেই। হাতে আমার কোনও নথিপত্র নেই, সব গ্যাবি গ্লেইসম্যানের কাছে, অর্থাৎ সুইডিশ পেন ক্লাবের তত্ত্বাবধানে। বলা হল আমার সঙ্গে ভ্রমণ করবে লেখক ইউজিন সুলগিন। সাড়ে ছ ফুট উঁচু বিশাল পুরুষ। জন্ম নরওয়েতে, কিন্তু দু যুগ ধরে সুইডেনে বাস। লেখক তিনি, নরওয়ের ভাষাতেই লেখেন। সুইডেন আর নরওয়ের ভাষার পার্থক্য বাংলা এবং অসমীয়ার পার্থকের মতো।

নরওয়ে যাত্রাটিও চমকপ্রদ। আমাকে বিমান বন্দরের ভিতর দিয়ে নেওয়া হয় না। সোজা রানওয়েতে আমার গাড়ি। গাড়ি থেকে সামনে একটি সিঁড়ি দেওয়া হয় বিমানে ঢোকার। সুটকেস চেক ইন করাতে পুলিশের একটি অংশ চলে যায় বন্দরের ভিতরে, সেই সুটকেস আবার পুলিশ বাহিনী নিজেরা বহন করে নিজেরাই বিমানের পেটে ঢুকিয়ে দেয়। ওটিকেও বিমান বন্দরের নিজস্ব নিরাপত্তার নিয়মের মধ্যে ফেলা হয়নি। বিমানের ভিতরটা পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এসেছে যন্ত্রপাতি দিয়ে। এরপর কুকুর-পুলিশ বাহিনী বিমানের আনাচ কানাচ শুঁকে গেছে কোথাও কোনও বোমা আছে কী না দেখতে। সব যাত্রীকে আগে থেকেই তুলে ফেলা হয়েছে ভিতরে। আমার জন্য থেমে আছে বিমান। আমাকে নিয়ে চারজন দেহরক্ষী পুলিশ উঠে গেল বিমানে। প্রথম শ্রেণী। ওই শ্রেণীতে আর কারও আসন গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। দেহরক্ষীদের সকলের পকেটে পিস্তল। এদের আমার একইসঙ্গে বোকা এবং নিষ্ঠুর মনে হয়। বোকা এই জন্য যে আমি বুঝতে পারলেও এরা পারছে না যে নরওয়ে বা সুইডেনে আমাকে হত্যা করার জন্য কেউ বসে নেই। বাংলাদেশ মোল্লাদের দৌড় মসজিদ অবদি, অবশ্য তাদের দৌড়ের জন্য রাজনীতিকরা রাস্তাঘাটও প্রশস্ত করেছে, সংসদেও লাল গালিচা পেতেছে। কিন্তু তাদের হাত পা এত লম্বা হয়নি যে যে উত্তর ইওরোপের অলি গলি খুঁজে

আমাকে বের করবে আর এদের সুরক্ষিত বিমান বন্দরে ঢুকে ততোধিত সুরক্ষিত বিমানে আমাকে হত্যা করবে। এখানেও মুসলমান বাস করে, তারা আর যা কিছুই করুক, খুন করার মতো ভয়ঙ্কর কোনও কাজ করবে না। এ কাজটি করতে যে দুঃসাহস দরকার তা তাদের নিশ্চয়ই নেই। মূলত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধের জন্য পশ্চিমের দেশে বাস করছে। পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদে বেঁচে থাকতে ইচ্ছেই বেশির ভাগ মুসলমানের।

হঠাৎ টিকিট নাড়তে নাড়তে টিকিটে চোখ পড়ে। আমার নামের বদলে লেখা আছে এভা কার্লসন। পাশে বসা ইউজিনকে ধরি, *দেখ, নাম ভুল করেছে।* ইউনিজ বলে, *না এটা ভুল নাম নয়। এটাই এখন তোমার নাম। নিরাপত্তার কারণে এসব করা হচ্ছে।* নিষ্ঠুর মনে হয় এই কারণে যে আমি কোথায় আছি, কেমন আছি, বেঁচে আছি না মরে আছি। এই দেশে আদৌ কি আমি শ্বাস নিতে পারছি, অসুবিধে কী কী হচ্ছে তা জানার চেষ্টা একটি প্রাণীও করেনি। ভয়ংকর বিষণ্নতা আমাকে গ্রাস করে ফেলছে দেখেও কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি দুঃখে শোকে আত্মহত্যা করি ক্ষতি নেই, আমাকে যেন কোনও মোল্লা না খুন করে। এই হল মোদ্দা কথা। এর চেয়ে নিষ্ঠুরতা আর কী হতে পারে।

আমি নতমুখ বসে থাকি। আমার লজ্জা হয় নিরাপত্তা নামের সার্কাসের জন্য। আমার কারণে যাত্রীদের ভোগান্তি কম হচ্ছে না। সকলে বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে চিনতে পারছে সকলেই। কেউ কেউ অটোগ্রাফ নেবার জন্য সামনে আসতে চায়, কিন্তু বিমানের ভেতর পুলিশ ভেদ করে আমার নাগাল পায় না। নরওয়েতে নামার পর আমাকে বিমান বন্দরের দিকে যেতে দেওয়া হয় না। বিমানের পেট থেকে আমাকে রানওয়েতে নামিয়ে আনা হয় যেখানে অপেক্ষা করছে সারি সারি পুলিশের গাড়ি। সুইডেনের নিরাপত্তা বাহিনী আমাকে সোপর্দ করলো নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে। পুরো বিমান বন্দর ঘেরাও করে আছে পুলিশি-পোশাকের পুলিশ। আমাকে বন্দরেরই একটি গোপন কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। ওখানে, অবাক কাণ্ড, আমার সুটকেস। ওটি পুলিশ বাহিনী তুলে এনেছে

বন্দরে ঢোকার আগেই। জগতে যে নিরাপত্তার এমন পদ্ধতি থাকতে পারে, তা আমি বিস্মিত চোখে দেখি। ভয় লাগে শান্তি নগরে আমার বাড়ির সামনে দুটো রাইফেলধারী পুলিশ যে সরকার বসিয়েছিল, সে কথা ভাবলে। পুলিশদুটো পড়ে পড়ে ঘুমোতো। কে বাড়ি আসতো, কে বাড়ি থেকে বেরোতো তার কোনও খবরই রাখতো না। আমি কখন বাইরে যেতাম, কখন ঢুকতাম সেদিকেও ফিরে দেখেনি কোনওদিন। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হত, আদৌ কি তারা জানে কাকে তারা পাহারা দিচ্ছে। আর যেটা দিচ্ছে, তার নামইবা কী। আমাকে নিয়ে যাওয়া হল রাইটার্স হাউজে, লেখক ভবনে। বিশাল ভবন। কোনও এক ধনী লেখকের বাড়ি ছিল এটি। এখন লেখক সংগঠন এর সবকিছুর দায়িত্বে। লেখক সংগঠন হয়ত কোনও লেখককে আমন্ত্রণ জানালো কয়েক মাসের জন্য, যেন এখানে আরামে আয়েসে বসে নিজের লেখা লিখে যান। আমার জন্য ভবনটি খোলা হল। সুইডেনে অবতরণ করার পর এই প্রথম সত্যিকার আয়েস করার জায়গা পেলাম। শোবার ঘরে ঘুমোচ্ছি যেন রাজকন্যা ঘুমোচ্ছি। বিশাল উঁচু উঁচু সিলিং থেকে নেমে এসেছে ভারী পর্দা। জানালা ঢেকে দিয়েছে। ছাদে সিস্টিন চ্যাপেলের মত ছবি আঁকা। সারা বাড়িতে বিশাল বিশাল সোনালি কারুকাজ করা ফ্রেমে ছবি। সুক্ষ্ম নকশার সব পুরোনো কালের আসবাব। ঘোরানো সিঁড়ি। বিছানার ওম ওম লেপের তল থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। এ বাড়ির অর্ধেকটা এখন দখল করে আছে আমার নরওয়ের নিরাপত্তা বাহিনী। অনুষ্ঠানে শাড়ি পরব, আপাতত সার্ট প্যান্ট। সুইডেনের আশ্চর্য নিথর জীবন থেকে বেরোনো আমার দরকার ছিল। অনুভব করি একটি তির তির আনন্দ আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ইউজিন এসে খবরাখবর নিচ্ছে। হওয়ার কথা আমার সেক্রেটারি কিন্তু অভিভাবক হয়ে বসে থাকে, সেখানেই আমার আপত্তি। নরওয়ের নিরাপত্তা বাহিনী আমাকে অসলো ঘুরিয়ে দেখালো। সারা অসলো ঘোরার পর পুলিশদের জিজ্ঞেস করি, *কী ব্যাপার, শহরে ঢুকবে না?* শহরে ঢুকবে না মানে? ভেবেছিলাম কোনও নির্জন শহরতলীতে ঘুরছে বুঝি। ওটাই, সাকুল্যে দশ বারোটা মানুষ হাঁটছে, ওটাই শহরের সবচেয়ে জনবহুল রাস্তা। হবে না কেন, পুরো

দেশের লোকসংখ্যা তিন মিলিয়ন। ইওরোপে আসাতক শুনি কথায় কথায় মিলিয়ন। মিলিয়ন বুঝতে আমার সময় লেগেছে। আমরা তো দেশে গোনাগুনতি মিলিয়নে করি না। এক মিলিয়ন যদি দশ লাখ, তবে তিন মিলিয়ন তিরিশ লাখ। গোটা দেশটায় তিরিশ লাখ লোক। সেখানে রাস্তার ভিড় তো দশ বারোজনকে দিয়েই হবে। দেশের মানচিত্র বেশ বড়। বাংলাদেশের আয়তন একশ চুয়াল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার, আর নরওয়ের মোট আয়তন তিনশ চব্বিশ হাজার দুশ কুড়ি বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের জনসংখ্যা তেরো কোটির চেয়ে বেশি, আর নরওয়ের জনসংখ্যা এক কোটি তো নয়ই মাত্র তিরিশ কী সাড়ে তিরিশ লাখ। নিরাপত্তা বাহিনীর বড় কর্তাকে জিজ্ঞেস করে করে তথ্য আরও জেনে নিলাম। নরওয়ের জনসংখ্যার মধ্যেও পঞ্চাশ হাজার পাকিস্তানি। পাকিস্তানি কেন! ষাটের দশকে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলোতে কলকারখানায় কাজ করার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। শ্রমিক আনা হয় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশ থেকে। নরওয়ে এনেছিল পাকিস্তান থেকে। শ্রমিকেরা কাজ করেছে, এখন আর ওদের শ্রমের প্রয়োজন নেই। কিন্তু কারখানার কাজ শেষ হয়ে যাবার পর শ্রমিকেরা আর নিজেদের দেশে ফেরত যায়নি। পরিবারের লোকজন নিয়ে দিব্যি সংসার সাজিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছে। নরওয়েতে যেমন পাকিস্তানি মাইগ্রেন্ট, জার্মানিতে তুর্কী, সুইডেনে ফিন আর ইতালীয়, ফ্রান্সে আলজেরীয়, মরককীয় আর তিউনেশীয় লোক, বেলজিয়ামে আফ্রিকার কংগো থেকে আসা লোক। এরাই এখন দেশগুলোতে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। ইউরোপের পুরোনো কলোনি থেকে মানুষ নতুন জীবনের খোঁজে উঠে এসেছে। ব্রিটেনে ভারতীয় উপমহাদেশীয়, বেলজিয়ামে কঙ্গোনিজ, ফ্রান্সে উত্তর আফ্রিকার লোক।

বুলেটপ্রুফ গাড়িতে করে ঘোরা হল রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, হোলমেনকলেন স্কি জাম্প। গাড়ি ধেয়ে চলে এঁকে বেঁকে একেবারে পাহাড়চুড়োয়, যেখান থেকে স্কি করা হয় শীতকালে। উনিশশ বাহান্ন সালে শীত-অলিম্পিকের জন্য বানানো স্কি জাম্পের যে পাতটি পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে মাটিতে নেমে গেছে, তা সত্যিই হাঁ হয়ে দেখার মত। গা শিরশির করে

ভাবলে মানুষগুলো বরফের ওপর পায়ের তলায় ওরকম লম্বা কাঠ বেঁধে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত ফুট নিচে। স্কি জাদুঘরও আছে ওই পাহাড়ের ওপর। ঘোর কাটতে না কাটতেই নতুন কিছু। এসে থামি ভিগিল্যান্ড পার্কে। এ তো নিশ্চয়ই অদ্ভুত একটি পার্ক। জীবনে অনেক পার্ক দেখেছি ভাস্কর্যের পার্ক এই প্রথম। মোটা মোটা শরীরের নারী পুরুষ শিশুর ভাস্কর্য। এস এম সুলতানের ছবির মানুষদের মত দেখতে লাগে। সুখী, স্বাস্থ্যবতী। সবচেয়ে চোখ কাড়ে মনোলিথ। চৌদ্দ মিটার লম্বা কলামটিতে জড়াজড়ি করে শত শত মানুষের ভাস্কার্য। সবই একটি পাথরখণ্ডের ওপর করা। পুরো পার্কটিতে মোট ভাস্কর্য একশ বিরানব্বই আর মানুষের ভাস্কর্য মোট ছশটি। ভাস্করের নাম গুস্তাভ ভিগিল্যান্ড। ভিগিল্যান্ড পার্ক থেকে ভাইকিং জাহাজ জাদুঘরে। ভাইকিংদের, জলদস্যুদের পুরোনো জাহাজগুলো রাখা আছে। গলুইয়ের পাশ দুটো উঁচু হয়ে সরু হয়ে ওপরে উঠে গেছে। নানারকমের নৌকো। সুইডেনে দেখেছি ভাসা জাদুঘর। ভাসা নামের নৌকোটি ডুবে গিয়েছিল, পরে অবশ্য তিনশ না চারশ বছর পর তোলা হয় নৌকোটি। সেই আস্ত একটি নৌকোই এখন জাদুঘর। নরওয়ের সুইডেনের ডেনমার্কের আইসল্যাণ্ডের সব অঞ্চলই ছিল ভাইকিংদের অঞ্চল। জাদুঘর থেকে অ্যাডওয়ার্ড মুঞ্খ মিউজিয়ামে। মুঞ্খের সেই বিখ্যাত আঁকাটি, যেটির নাম চিৎকার, আছে ওখানে। এই চিৎকারটি খুব বিখ্যাত। মনে হয় একটি মেয়ে সন্ধের দিকে একটি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ একা হয়ে গিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে। নীল আর লাল রঙে আঁকা ছবিটি আগুন আগুন। কেন যে কোন ছবি হঠাৎ নাম করে, কে যে কী কারণে বিখ্যাত হয়ে যায়, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় না। মুঞ্খের এই চিৎকারটি ফেব্রুয়ারি মাসে চুরি হয়ে গিয়েছিল, চোর আড়াল থেকে দাবি করেছিল এক মিলিয়ন ডলার, না, ডলার টলার খরচা করতে হয়নি। ছবিপ্রেমীদের প্রবল চিৎকার চেচামেচিতে দুতিন মাসের মধ্যেই ছবিটি উদ্ধার হয়েছে। একবার দুলাল কাককু শিল্পীর নাম আড়াল করে রেখে আমাকে পিকাসোর হাতে ধরা ফুলের তোড়ার একটি ছবি চোখের সামনে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, *ছবিটি কার আঁকা।* আমি ছবিটির আপদমস্তক পরীক্ষা করে বলেছিলাম, *চার পাঁচ বছরের কোনও বাচ্চার আঁকা।*

দুলাল কাককু হাত সরিয়ে দেখালেন নাম। পিকাসো। আমি মুগ্ধ মিউজিয়ামে *চিৎকার* নামের বিখ্যাত ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবি, আমিই কী পারতাম না এমন কোনও ছবি আঁকতে, অথবা অন্য যে কোনও শিল্পীই। অবিখ্যাত কোনও ছবির সঙ্গে বিখ্যাত এ ছবির পার্থক্য কী! জগত অদ্ভুত। হঠাৎ করে কিছু জিনিস বিখ্যাত হয়ে যায়। যেমন মোনালিসা। ওকে লোকে ভিড় করে দেখতে যায়। অথচ প্যারিসের লুভর ঘুরে দেখেছি, মোনালিসা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির এমন কোনও ভালো ছবি নয়।

পরদিন সকালে বিশপের বাড়িতে নাস্তার নিমন্ত্রণ, ও বাড়িতে কবি সাহিত্যিকদের নিমন্ত্রণ। একজন ধর্মগুরুর বাড়িতে! আমি ধন্দে পড়ি। আগের দিন মন্ত্রী, পরের দিন বিশপ। বিশপ ডাকলেই আমাদের যেতে হবে কেন! বাংলাদেশে বায়তুল মোকাররমের খতিব কবি সাহিত্যিকদের ডাকলে সেখানে কি দল বেঁধে এমন যেত কেউ! এসব ধর্মের লোককে এত মান্য করার কারণ কি।

জিজ্ঞেস করি, *আচ্ছা আমরা কেন বিশপের বাড়িতে এসেছি?*

বল কী। বিশপ। চার্চ অব নরওয়ের বিশপ।

তাতে কী! খুব বড় কিছু নাকি?

নিশ্চয়ই বড় কিছু। তাইতো ডাকলেই এসেছি। রাজপরিবার, নরওয়ের সরকার, বিশপ এরা সবার ওপরে। এদের হাতেই ক্ষমতা।

আমি অবাক হই। এত সুন্দর একটি দেশ। এত সমতার দেশ। সেখানে কি না ধর্মগুরুর এত ক্ষমতা।

নরওয়ে একটি সেকুলার রাষ্ট্র। এখানে আবার ধর্মীয় লোকের ক্ষমতা কী করে থাকে। বিশপ কে যে ডাকলেই আসতে হবে নাকি।

একজন বললেন, *বল কী! বিশপ ডেকেছেন। অবশ্যই আমরা আসবো। আর কে বলল নরওয়ে সেকুলার!*

বিস্ময়ে চাপা আর্তনাদ শুনি নিজের কানেই। *কী বলছ কী, নরওয়ে সেকুলার রাষ্ট্র নয়?*

না। সবেগে মাথা নাড়লো নরওয়ের লেখক।

না নয়। নরওয়ের সংবিধানের দ্বিতীয় ধারায় লেখা, *এভেনজেলিকাল লুথেরান নরওয়ের রাষ্ট্র ধর্ম। রাজা হচ্ছে গির্জা এবং রাষ্ট্রের প্রধান। মন্ত্রীদের মধ্যে যারা নরওয়ের-গির্জার সদস্য তারাই গির্জার যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য ভোট দিতে পারে।*

ক্রিশ্চান পরিবারে যে শিশুই জন্ম নেয়, আপনা আপনি গির্জার সদস্য হয়ে যায়। যদি না কখনও সদস্যপদ থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে যায়, সারাজীবনই সদস্য থাকে। নরওয়েতে শতকরা সাতাশি ভাগ মানুষই গির্জার সদস্য। এ শুনে আমি ভাবি, এমন নিটোল দেশ, নারী পুরুষের এমন সমতার দেশ, মানবাধিকারের স্বর্গ এমন একটি দেশ, এই দেশেরও কি না রাষ্ট্রধর্ম আছে। তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে আমরা এত সোচ্চার কেন! রাষ্ট্রধর্ম রেখেও যদি দেশকে সমতা ও সাম্যের দেশ বানানো যায়, তবে আর অসুবিধে কী! নরওয়েতে মানববাদী নাস্তিকদের একটি সংস্থা আছে, যাদের ষাট হাজার মত সদস্য। তারা এই রাষ্ট্রধর্মকে বাতিল করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে যেন গির্জা থেকে নাম কাটিয়ে নেয়। নাম না কাটালে জীবনভর গির্জার চাঁদা দিয়ে যেতে হবে। মাইনে থেকে আপনাতে টাকা চলে যেতে থাকবে গির্জার খাতে। নাস্তিকতার উদারতা, মহানুভবতা, নাস্তিকতার গুরুত্ব ও প্রয়েজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে এই সংগঠন নরওয়ের লোকদের মানুষ বানাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিশপের বাড়িতে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এগিয়ে এলেন সাস্টিন একম্যান। সুইডেনের খুব নামকরা লেখিকা। ইদানীং গোয়েন্দা উপন্যাস লিখছেন। গোয়েন্দা উপন্যাস এখন আর আগাথা ক্রিস্টির ধরনে লেখা হয় না। পশ্চিমের বড় বড় সাহিত্যিকরাও গোয়েন্দা উপন্যাসকেও উঁচু মানের সাহিত্যের কাতারে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। সাস্টিন একম্যান সুইডিশ অ্যাকাডেমি, যে অ্যাকাডেমি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার জন্য সাহিত্যিক নির্বাচন করে, তার স্থায়ী সদস্য । রুশদির বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হওয়ার পর সাস্টিন একম্যান অ্যাকাডেমিকে ফতোয়ার প্রতিবাদ করার অনুরোধ করেছিল,

কিন্তু অ্যাকাডেমি রাজি হয়নি। সে কারণে তিনি উনিশশ উনাশি সালেই অ্যাকাডেমি থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু পদত্যাগ করলেই অ্যাকাডেমির স্থায়ী সদস্যপদ চলে যায় না। যারা পদত্যাগ করে বা ইস্তফা দেয়, তাদের চেয়ারটা থাকে, কিন্তু খালি থাকে। চেয়ার সরিয়ে নেওয়া হয় না। মরে গেলেই একমাত্র হয়। কেউ মরলেই তবে নতুন কাউকে সদস্য নেবার জন্য নির্বাচন হয়। মোট আঠারো জন সদস্য অ্যাকাডেমিতে। আঠারো জন সদস্য মৃত্যুর আগ অবদি সদস্য। সাস্টিন একম্যান এবং আমি নাস্তা খেতে এক টেবিলেই বসেছি। নাস্তা খেতে খেতে তিনি বললেন তার অ্যাকাডেমি ছেড়ে দেওয়ার কাহিনী। সাস্টিন একম্যানের সদস্যপদ কোনওদিন যাবে না, ভেবে আমার অবাক লাগে। এ আবার কেমন নিয়ম। আমি সদস্য আমি ইস্তফা দিলেও আমি থেকে যাবো ওখানে। আমার নামটি কাটা হবে না। তার মানে ইস্তফা দেওয়ার স্বাধীনতা থাকলেও নাম তুলে নেওয়ার স্বাধীনতা আমার নেই। এখন যদি আঠারো জনের মধ্যে সতেরো জন ইস্তফা দেয়, তবে কি একজনকে বসে নির্বাচন করতে হবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার কে পাবে, তার? হ্যাঁ তাই।

সাস্টিন একম্যান আয়না বের করে তাড়াতাড়ি মুখে একটু পাউডার পাফ করে নিলেন। কী দরকার ছিল, মনে মনে বলি। এমনিতে গাল একটু লালই হয়ে থাকে সাদা রঙের মানুষদের। কী দরকার ওই লাল জায়গাটুকু আরও একটু লাল করার। সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা আজকাল আমরা জানি, তা ইওরোপীয় সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাটিই এখন জগতসুদ্ধ সকলের মস্তিস্কে। শরীরে কোনও তেল চর্বি থাকবে না। মুখখানা লম্বাটে হবে। গালের হাড় একটু বেরিয়ে এলে ভালো। যে মেয়েদেরই দেখি প্রায় একই রকম শরীর। কত মেয়ে এসে আলাপ করে যাচ্ছে। কারও নাম কারও মুখ আমি মনে রাখতে পারি না। সব গুলিয়ে ফেলি। সে ওদের দোষে না আমার দোষে জানি না।

স্টকহোমের কোথায় তাঁর বাড়ি জিজ্ঞেস করতেই সাস্টিন একম্যান বললেন, সুইডেনের উত্তরে ছোট্ট একটি গ্রামে। বড় লেখক হলেই যে রাজধানীতে থাকতে হবে তার কোনও অর্থ নেই। ইঙ্গমার বার্গম্যানও সুইডেনের মেইনল্যান্ড এবং রাশিয়ার মাঝখানে বাল্টিক সমুদ্রে

ভাসা গতলাণ্ড নামের একটি দূর- দ্বীপেরও উত্তর প্রান্তে, ফোরে নামের অঞ্জলে, যেখানে জনবসতি প্রায় নেই বললেই চলে, থাকেন। কারও সঙ্গে দেখা করেন না। বরফের দেশের মানুষদের স্বভাব চরিত্রেই বোধহয় নির্জনতার প্রতি পক্ষপাত আছে। দীর্ঘদীর্ঘ কালের অভ্যেসে এই চরিত্র গড়ে উঠেছে। বরফের কারণে এদের জনযোগাযোগ খুব বেশি ছিল না। একাকিত্বই এদের সম্বল ছিল। একারণে বোধহয় রক্তে এদের নিভৃতে নির্জনে থাকার আকুলতা। তাই কি! ভাবতে থাকি। মানুষ তো সামাজিক প্রাণী। বাঘের মত অসামাজিক নয়। বাঘ নিজের সীমানায় অন্য কোনও প্রাণীর উপস্থিতি পছন্দ করে না। মানুষ কী করে মানুষ ছাড়া বাঁচে, বুঝি না।

রাতে সরকারি ডিনার। বিশাল রাজপ্রসাদে। আমি বিশেষ অতিথি। হাতে গোনা কিছু লেখককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমি সাধারণ কাপড় পরা সাধারণ মানুষ। কারও সঙ্গে আমি রঙে ঢঙে মিলি না। নিজেকে যত সরিয়ে রাখতে চাই, আড়াল করতে চাই, গুরুত্ব যত কম পেতে চাই, তত দেখি আমাকেই আনা হয় সবার মধ্যিখানে, সব চোখ কানগুলো আমার দিকেই। বড় অস্বস্তি হয় আমার। শত শত ক্যামেরা ঝলসে উঠছে আমাকে দিকে তাক করে। বড় অপ্রিতভ বোধ করি। টেবিলে সাজানো তিনটে করে ওয়াইন গ্লাস। বিশাল থালা, থালার বাঁদিকে দুটো ছোট বড় কাঁটা চামচ, আর ডানদিকে ছোটবড় দুটো ছুরি। আর থালার সামনে দুটো চামচ। পাশে সাদা ন্যাপকিন। প্রত্যেক থালার সামনে ছোট্ট কাগজে নাম ছাপানো। যার নাম যে চেয়ারের সামনে, সে বসবে সেখানে। আমাকে নাম খুঁজতে হল না, মন্ত্রীরাই সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে গেলেন আমার চেয়ারের কাছে। টেবিলে আমার নাম লেখা কাগজ। আমার ডানে প্রধান মন্ত্রী, বামে পররাষ্ট্র মন্ত্রী। আশেপাশে আরও কজন মন্ত্রী। টেবিলের মাঝখান জুড়ে তাজা তাজা ফুল এঁকেবেঁকে নদীর মতো বয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রুন্ডলান্ড। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কারি নরডহেইম। সংস্কৃতি মন্ত্রী অসে ক্লেভলান্ড। সকলেই মেয়ে। নরওয়ে সংসদে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মেয়ে। আমার খুব ভালো লাগে ভাবতে যে

পৃথিবীতে কোথাও এমন সমাজ আছে যে সমাজে নারীর অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রে সমাজে ঘরে বাইরে নারীরা মানুষ হিসেবে সম্মানিত। তারা নিম্নলিঙ্গ জীব হিসেবে দাসি হিসেবে যৌনবস্তু হিসেবে চিহ্নিত নয়। নারীরা নারী হওয়ার কারণে নিস্পেষিত নয়। যেন স্বপ্নের দেশ এই নরওয়ে। সমাজ ব্যবস্থা এমন যে কোথাও কারও দারিদ্র নেই। এমন নিখুঁত দেশটিতে বসে আমি কথা বলছি এই দেশেরই সরকারের সঙ্গে। চোখ বুলিয়ে আনি ঘরটিতে। নারী পুরুষ সকলেই খেতে খেতে চুমুক দিচ্ছে ওয়াইনে। সকলে কথা বলছে নিচুস্বরে। কেউ এখানে ঘেউ ঘেউ করে উঠছে না। কোনও পুরুষই কোনও মেয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে না। অনুমান করি কেউ বলছে না কাউকে কোনও অসম্মানজনক কথা। অসম্মান এই শব্দটিও বেশ আপেক্ষিক। যে কথা ভারতীয় উপমহাদেশে অসম্মানজনক নয়, সে কথা এখানে হয়তো চরম অসম্মানজনক।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী পুরোনো কথা পারলেন, সেই সব দিনের কথা, যখন আমি গা ঢাকা দিয়েছি ঢাকায়, যখন আমাকে হত্যা করার পণ করেছে দেশজুড়ে মৌলবাদিরা, কী করে তখন আমাকে বাঁচাতে নরওয়ের সরকার মরিয়া হয়ে উঠেছিল। আমি কিছুটা মন দিয়ে কিছুটা না মন দিয়ে শুনি মন্ত্রীর কথা।

বাংলাদেশের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত আমাদের নেওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়? হঠাৎ প্রশ্ন করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। খানিকটা চমকালাম। খানিকটা হাসলাম। খানিকটা জল খেলাম। তারপর বললাম, *সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা। আমি কী করে বলবো কী সিদ্ধান্ত নেবেন!*

আমরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সরকার যেন কোনও রকম আপনাকে উৎপাত না করে, তার জন্য। আপনি কি জানেন কী আমাদের সিদ্ধান্ত?

জানি না। কী সিদ্ধান্ত?

আমরা প্রায় তিনশো মিলিয়ন নরওয়েজিয়ান ক্রাউন দিই বাংলাদেশকে, বছরে। এই দান ভাবছি বন্ধ করে দেব।

কেন?

কেন নয়?

বাংলাদেশ গরিব দেশ। আশি ভাগ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে। দান বন্ধ করে দিলে বাংলাদেশের সরকারের তো কিছু যাবে আসবে না, যাবে আসবে দরিদ্র মানুষের। এনজিওর মাধ্যমে টাকা অন্তত কিছু হলেও তো যায় দীন দুঃখী মেয়েদের ভালোর জন্য। আমি একেবারেই এই সাহায্য বন্ধ করার পক্ষপাতি নই।

কিন্তু আপনার সঙ্গে যে আচরণ সরকারের! মৌলবাদকে যেভাবে প্রশ্রয় দিচ্ছে, দেশের উন্নতি কি এভাবে সম্ভব? আমরা দাতা দেশগুলো সাহায্য বন্ধ করার কথা বলে, অথবা সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়ে তো চাপ সৃষ্টি করতে পারি।

হ্যাঁ তা পারেন। তাতে কি সরকার সংশোধন হবে! কোনও দলই এমন কিছু করবে না, যা করলে ক্ষমতায় টিকে থাকায় অসুবিধে হয়। রাজনৈতিক দলগুলো মানুষের মঙ্গলের জন্য ভাবে না, নিজেদের আখের গোছানোর চিন্তায় তারা ব্যস্ত। আমি ভাবি অভাবী দুঃখি মানুষের কথা। ওদের কেন বঞ্চিত করবেন, কী দোষ ওদের? কেবল একটি ভুল দেশে জন্মানোর জন্য আজ ওরা শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য থেকে বঞ্চিত, সকলের সামান্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের নিরাপত্তাটুকুও জোটে না।

চুপ হয়ে থাকেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। চুপ হয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু অন্য টেবিল থেকে নিচুস্বরের কথোপকথন। আর কোনও শব্দ নেই। কাটা ছুরির টুংটাং শব্দ কেবল আমার থালা থেকে ওঠে, অন্য কোনও থালা থেকে নয়। এ থালার ওপর আনাড়ি হাতে ধরা কাটা ছুরি। হাত দিয়ে ভাত খাওয়া গরিব দেশের মেয়ে আজ ধনীর দরবারে। সে ভালো করে ধনী-দেশের মানুষের মতো কথা বলতে জানে না, ওদের মতো সে সাজতে জানে না, খেতে জানে না।

পরেরদিনের কাগজগুলোয় প্রথম পাতা ছেয়ে থাকে আমার ছবিতে। রেডিও টেলিভিশনে আমার নরওয়ে ভ্রমণের কথা বলা হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে। বসে বসে এসব দেখার সময় আমার নেই। দৌড়োতে হবে স্টাভাঙ্গারে। ইউজিন বলেছিল, অসলোতে আমি সরকারি অতিথি। স্টাভাঙ্গারে আমি সাহিত্য গোষ্ঠীর অতিথি। স্টাভাংগারে যাবার বেলায় গোঁ ধরলাম,

বিমানে যাবো না, রেলগাড়িতে যাবো। রেলগাড়িতে যাবার জন্য কেউ বায়না ধরে, এ যেন প্রথম ওখানে। কেন? অতলান্তিকের পাড়ে যাবো, দেখতে দেখতে যাবো মানুষ, প্রকৃতি। শহর নগর গ্রাম দেখতে দেখতে যাবো। বিমানে যাবো না। কিন্তু আমার গোঁ ধোপে টিকলো না। নিরাপত্তা বাহিনীর কর্তাদের কানে গিয়েছিল প্রস্তাব। শুনেই নাকচ করে দিয়েছেন। নিরাপত্তার কারণে বিমানেই যেতে হবে। আর কোনও উপায় নেই। অসলোর নিরাপত্তা রক্ষীরা আমাকে সঁপে দিয়ে এল স্টাভাঙ্গারের নিরাপত্তা রক্ষীদের হাতে।

স্টাভাঙ্গারে বিশাল হোটেল। হোটেলের ঘর থেকেই দেখা যায় সামনে বিশাল সমুদ্র। বিশাল খানাপিনা। বিশাল আদরযত্ন। আমার বত্তৃতা শুনতে এখানেও সারা ইওরোপ থেকে শ্রোতা এসেছে। এলাহি কান্ড। সাক্ষাৎ আর সাক্ষাৎকারের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে সাংবাদিকরা টিভির রেডিওর পত্রিকার ম্যাগাজিনের। পুলিশ দুহাতে সরিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। খুব মায়া হয় আমার। ওরা কি কোনও দোষ করেছে! কেবল দুটো কথা বলতে চাইছে আমার সঙ্গে। আমিই বা হঠাৎ কী এমন লাট সাহেব হয়ে গেলাম যে ওদের এত তুচ্ছ করব! নিজের চোখ কানকে বিশ্বাস হতে চায় না। এক সুইডিশ রেডিও সাংবাদিক শত আবদার করেও আমার সাক্ষাৎকার পায়নি, ক্ষোভ উপচে উঠেছে তার কণ্ঠে। আমার গ্রীবায় নাকি গ্রেটা গার্বোর অহং। অহংএর কিচ্ছু নেই, কিন্তু দেখায় হয়তো অহংএর মতো কিছু। আমার ক্রমে অসহ্য লাগে সাংবাদিকদের ভিড়। হেথা নয় হোথা নয় বলে দৌড়োতে থাকি। অসাংবাদিক মানুষের সঙ্গে সামান্য বাক্য বিনিময় হয়। অসলো থেকে উড়ে এসেছেন নরওয়ের সংস্কৃতি মন্ত্রী, তাঁর সঙ্গে সাগরপাড়ের বিখ্যাত জাহাজ-রেস্তোরাঁয় বসে কথা। উইলিয়াম নেইগর এসেছেন, মৌলবাদীদের গুলি খাওয়া বিখ্যাত প্রকাশক, এখন আমারও প্রকাশক। ঝকঝকে বই এর মধ্যেই প্রকাশ করে ফেলেছেন। অপূর্ব প্রকাশনা। লজ্জা, নিজের বই, অথচ পাতা উল্টে একটি বাক্যও বোঝার সাধ্য নেই। জার্মান ভাষায় আমার ওপর বই লিখেছেন পিটার পিঙ্কস্কি, জার্মানির ফাইবুর্গ থেকে এসেছেন দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে কথা হয় দেড় মিনিট। বাদ বাকি সময় আমার নাগাল পাওয়ার উপায় কারও নেই। থোরভাল্ড একদিন কাতর অনুনয়

জানালেন, *এত সাংবাদিক তোমার জন্য দূর দূরান্ত থেকে এসেছে, তোমার সাক্ষাৎকার চাইছে। তুমি বরং একটা প্রেস কনফারেন্স কর।*

প্রেস কনফারেন্সে বলার কিছু নেই আমার।

তোমার ইচ্ছেকে তো অসম্মান করতে পারি না। থোরভাল্ড মন-ভাঙা স্বরে বলে। সম্মেলনে ইংরেজিতে নিজের একটি লিখে আনা বক্তব্য পড়তে হয়েছে। এই হয়েছে মুশকিল। ভিন্ন একটি ভাষা, বত্রিশ বছরের দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষাটির চর্চা করিনি, সেই ভাষাই এখন আমার জীবন যাপনের একমাত্র ভাষা। থোরভাল্ট স্টিন, নরওয়ের লেখক সংস্থার সভাপতি। নিজে তিনি কবি। পঙ্গু। পঙ্গু হয়ে কী বিশাল আয়োজন করেছেন সাহিত্যের। নরওয়ে ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, আইসল্যাণ্ড, উত্তরের সব দেশ থেকে সাহিত্যিক ভিড় করেছেন সাহিত্য সম্মেলনে। হোটেল আটলান্টিকেই হচ্ছে সাহিত্য সম্মেলন, ওখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। আমাকে দেখলেই চারদিক থেকে ভিড় উপচে পড়ে, এত দৃষ্টি আকর্ষণের বস্তু হতে আমার ভালো লাগে না। কেবল হারাতে চাই, হারিয়ে যেতে চাই। লোকচক্ষুর আড়াল খুঁজি। দূরে কোথাওএর জন্য চঞ্চল হই। বেরিয়ে পড়ি একা একা। নরওয়ের এক ফটো সাংবাদিক অনেকক্ষণ ধরে অতলান্তিকের পাড়ে আমার ছবি তোলার জন্য মিনমিন করে অনুরোধ করেই যাচ্ছে করেই যাচ্ছে, ফিরে যায় না যদিও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকবার। জোঁকের মতো লেগে থাকায়, একসময় মন এমন নরম হয় যে তাকে সঙ্গে নিই। নিই অতলান্তিকের লোভে। বাকি সবার আবদার ফেলে সেই লোকটির আবদারে রাজি হই গোপনে। লোকটি উচ্ছ্বসিত। আমি উচ্ছ্বসিত অতলান্তিকের সৌন্দর্য দেখে। এই আমার প্রথম অতলান্তিকের পাড়ে দাঁড়ানো। তার জলে পা ভেজানো। হৃদয় ভেজানো। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ আমি উপভোগ করবো নাকি দিনভর সাংবাদিকদের সহস্র প্রশ্নের উত্তর দেব! দুটোর মধ্যে রূপ দেখাকেই বেছে নিই। অসহ্য লাগে সাংবাদিকদের অমন জেঁকে ধরা! তাদের অমন অভাগার মত তাকিয়ে থাকা। হেঁটে বেড়াই *উদাসী হাওয়ায়।* ঘুরি যেমন খুশি। পুলিশ বাহিনীকে জানিয়ে দিলেই হয় যে ঘুরে বেড়াবো। তারা পরম উৎসাহে আমাকে

নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। আমি না বেরোলে তাদের কিছু যে কম পরিশ্রম তা নয়। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমার দরজার সামনে ঠাঁয়। ইচ্ছে হল ঘুরে বেড়াতে গ্রামে। পুলিশের খান পাঁচেক গাড়ি চললো আমাকে নিয়ে গ্রামের উদ্দেশে। কে বলবে গ্রাম! কী অপূর্ব সুন্দর সব বাড়ি। অফুরান সবুজের মধ্যিখানে বাড়ি। কেমন অবস্থা কৃষকের, জানতে সাধ জাগে। কৃষক বলতে আমাদের মনে যে রকম একটি ক্লিষ্ট ক্লিন্ন অভাবী চেহারা ভেসে ওঠে, এখানকার কৃষক মোটেও তেমন নয়। প্রত্যেকে ধনী। তাদের বিশাল বিশাল ঝকঝকে বাড়ি। বাড়ির কাছে দাঁড়ানো একটি দুটি গাড়ি। সামনে কৃষিক্ষেত। কৃষিক্ষেতের ওপারে খামার। সকলেই ট্রাক্টর ব্যবহার করে। সবকিছুতেই মেশিনের ব্যবহার। শীতের দেশ বলে বেশি কিছু ফলাতে পারে না। গরম কালটায় ফলায়, যা ফলায়। একটি কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হই, সে হল, কৃষকেরা ফসল না ফলানোর জন্য টাকা পায় সরকারের কাছ থেকে। দুধ বেশি না উৎপন্ন করার জন্য গরুর খামার যাদের আছে, তারাও টাকা পায়। ফলালে হয়তো আয় হত দশ লাখ। সরকার প্রস্তাব দেয় দশ লাখ উপার্জন করার জন্য যা করতে, তা কোরো না, তোমাকে আমরা কুড়ি লাখ দেব। বছর বছর দ্বিগুণ ত্রিগুণ পাচ্ছে টাকা, আর কর্মহীন বসে আছে। এ শুধু নরওয়ের অবস্থা নয়। পশ্চিম ইউরোপের সবদেশেই একই অবস্থা। কৃষকেরা ফসল না ফলানোর জন্য সরকারের কাছ থেকে টাকা পায়। ফসল ফলালে যে খরচ, না ফলিয়ে বিদেশ থেকে আমদানি করে একই পরিমাণের ফসল কিনে নিলে অনেক কম খরচ। সুতরাং।

সম্মেলনের শেষ দিনে রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় বড় থিয়েটারে। আমার কবিতা পাঠ আর ল্যাপ সঙ্গীত। একটি মেয়ে কড়া নীল, কড়া লাল আর কড়া হলুদ রঙের পোশাক পরা, গান গাইল। ল্যাপের সুর বুকের বেদনা থেকে সোজা উঠে আসে। গানের কথা না বুঝলেও শুধু সুরই স্পর্শ করতে পারে হৃদয়! গানগুলোকে বলে ইয়ইক। ল্যাপসরা নিজেদের এখন আর ল্যাপস বলতে পছন্দ করে না। বলে সামি। নিজেদের ভাষাটির নাম সামি ভাষা। শিকার করা, মাছ ধরা, বল্গা হরিণের পিছনে ছোট হচ্ছে তাদের কাজ।

ইওরোপে সামিরাই সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসি। নরওয়ের ল্যাপল্যান্ডেই সবচেয়ে বেশি সামি বাস করে। এরা একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিজেদের তাঁবু বানায়। মাটিতে বৃত্তাকারে বাঁশ পুতে চুড়োয় মিলিয়ে দেয়। বাঁশের কাঠামোটি পুরোটাই ঢেকে দেয় পশুর চামড়ায়, সেলাই করে করে জোড়া লাগিয়ে। ঘরের মাঝখানটায় আগুন জ্বালিয়ে গোল ঘরটির কিনার ঘেসে বিছানা পেতে ঘুমোয়। খুব সাদাসিধে জীবন। জন্তুর লোম তুলে শীতের পোশাক বানায় এরা। বল্গা হরিণ দৌড়ানো এদের কাজ। সামিরা শুধু নরওয়ের উত্তরেই নয়, সুইডেন ফিনল্যান্ড, রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে বাস করে। জায়গার নাম ল্যাপল্যান্ড। সামিরা একসময় সারাদেশ জুড়েই ছিল, কেবল সামিরাই ছিল সেইসময়। কিন্তু বহিরাগতরা ঢুকে সামিদের তাড়াতে তাড়াতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে নিয়ে ফেলেছে। এদের ভিটেমাটিতে বসত শুরু করেছে বহিরাগত সাদারা। আর আদিবাসী সামিরা এখন চারটি দেশে ভাগ হয়ে উত্তরে স্থান পেয়েছে। সামিদেরকে বানানো হয়েছে এক একটি দেশের *সংখ্যালঘু।* এ অনেকটা আমেরিকার মত। ইওরোপীয়রা গিয়ে আমেরিকার আদিবাসীদের খুন করে বংশ নিশ্চিহ্ন করেছে। কিছু বাকি ছিল, তাদের তাড়াতে তাড়াতে একটি দুটি জায়গায় বন্দি করেছে। জায়গার নাম দিয়েছে রিজার্ভেশন। অস্টেলিয়াতেও তাই। সাদারা নিজেদের যে উচুঁশ্রেণীর মনে করত, বা করে, তা এই ব্যবহারগুলোর মধ্যেই স্পষ্ট।

স্টাভাঙ্গার থেকে ফিরে আসি অসলোতে। স্টাভাঙ্গারের পুলিশ আমার সঙ্গে অসলো উড়ে গিয়ে ওখানকার পুলিশের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে আসে। কী কান্ড। আমি এবারও অনেক বলেছি, এর কোনও মানে হয় না। মানে হয় না তারপরও নিরাপত্তার সার্কাস আমাকে লজ্জায় ফেলে। স্টাভাঙ্গারের অনুষ্ঠানে আমি পুলিশপাহারার কারণে লজ্জায় পড়েছি। অনেক সময় তাই অনুষ্ঠান না শুনে সরে গিয়েছি। ঘুরে বেড়িয়েছি।

অসলোয় পৌঁছোলে ইউজিন তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেল তাঁর মাকে দেখাতে। মা একটি বাড়িতে একা থাকেন। তিরানব্বই বছর বয়স। ইউজিনের মা একা থাকেন। কোনও

কাজের লোক নেই। নিজে তিনি হাঁটতে পারেন না। একটি ট্রলিতে ভর দিয়ে হাঁটছেন, খুব ধীরে। এভাবেই হেঁটে তিনি রান্না বান্না করছেন। ঘর দোর পরিস্কার করছেন। আমি হতভম্ব দাঁড়িয়ে থাকি।

কী আশ্চর্য ইউজিন! এভাবে তোমার মাকে একা রেখেছো কেন? ওঁর নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে। তোমার কোনও ভাই বোন এখানে থাকছে না কেন, বা ওঁকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে না কেন!

আমার প্রশ্ন শুনে ইউজিন অপ্রস্তুত হয়। আমতা আমতা করে বলল, *এরকম অন্যের ঘাড়ের ওপর কারও বাস করার নিয়ম এখানে নেই। আমার দাদা মাঝে মধ্যে দেখতে আসে।*

মাঝে মধ্যে?

হ্যাঁ ক্রিসমাসের সময় নিশ্চয়ই আসে দেখতে।

বল কী!

আর নিতে চাইলে কি মা যাবেন নাকি? মা তো যাবেন না কোথাও।

কিন্তু চলতে ফিরতে না পারলে। বাজার করে কে দেয়।

একা এভাবেই ট্রলি ঠেলে বাজারে যান। খুব অসুবিধে হলে সরকার থেকে লোক দেবে সাহায্য করার জন্য। আর যদি একেবারেই বিছানায় পড়ে যান। তবে বয়স্কদের বাড়ি আছে, সেখানে চিকিৎসাও হয়। সেসব সরকারি বাড়িতে সরকারই নিয়ে যাবে।

ইউজিন জোরে বলল, তার মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে যে *তসলিমা, লেখক, বাংলাদেশের। এখানে সাহিত্য সম্মেলনে এসেছে।*

মা কী বুঝলেন, কে জানে। মাথা নাড়লেন। মিষ্টি হাসলেন। বসতে বললেন। কফি দেবে কি না জিজ্ঞেস করলেন। আমি মাথা নেড়ে বললাম, *আমি কফি খাই না*।

ঘরে হেটে হেঁটে দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমের ছবি দেখতে থাকি। ইউজিন বলে দিল কোনটা কে। সুইডেনের বাড়িতেও দেখেছি। কেউ একা থাকছে, অথবা দুজন, কিন্তু দেওয়ালে প্রচুর আত্মীয়ের ছবি। এরকম হয়তো নিয়ম এখানে। দেখা হবে না। কথা হবে না। তোমার কে

রক্তের সম্পর্কে আত্মীয় তা দেখতে তুমি দেওয়ালে যাবে, দরজায় নয়। কারণ দরজায় কারও টোকা পড়ে না। হয়ত দেওয়ালে টাঙানো ছবিটির ওপর থেকে তুমি মাসে তিনবার করে ধুলো সরাচ্ছো, কিন্তু সত্যিকার সে মানুষটি তোমার সামনে এলে তুমি হয়তো তাকে কফিও খেতে বলবে না। ইউজিন এবং তার মাকে দেখে বোঝার চেষ্টা করলাম সম্পর্কটা কী রকম। এই সম্পর্কে পরস্পরের প্রতি আদৌ কোনও ভালোবাসা আছে কী না।

একটি রাত আমি কাটালাম ইউজিনের দাদার বাড়িতে। দাদা বৌদি এখন কেউ নেই ও বাড়িতে। খালি পড়ে আছে। বিশাল কাঠের বাড়ি। সুইডেন নরওয়ের বাড়িগুলো কাঠের বাড়িই। এত গাছ, এত কাঠ। তাই কাঠেই সস্তা পড়ে। এখানে ইটের বাড়ি বানাবার চল নেই। পুরোনো বাড়িগুলো হয় কাঠের, নয় পাথরের।

ইউজিন হঠাৎ বলে, তাঁর বাড়িতে একদিন কাটিয়ে পরদিন আমাদের রওনা হতে হবে স্টকহোম।

কেন এখানে আমি তো তিনদিন থাকতে পারি আরও। এখান থেকে আমি লিসবন চলে যাবো।

ইউজিন ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে চেষ্টা করে যে এ ব্যাপারটা সম্ভব হচ্ছে না।

ও বাড়িতে আমার একরাত্তির থাকার ব্যবস্থা করে ও বলল, *না কালকেই যেতে হবে। এখানে তিনদিন থাকার ব্যবস্থা হবে না।*

কেন হবে না!

আমার রাগ হল খুব। রাগ গিয়ে পড়ল গ্যাবির ওপর। গ্যাবির হাতে টিকিট লিসবন যাওয়ার। সে আমাকে নরওয়ে থেকে পর্তুগাল যেতে দিতে চাইছে না। ইউজিন গ্যাবির *আদেশ* মান্য করছে শুধু। আমাকে আমার ইচ্ছের বাইরে ফিরতে হয় সুইডেনে। ফিরতে হয় দ্বীপের দীপহীন জীবনে।

নরওয়েতে এরপর আমাকে সাত কী আটবার যেতে হয়েছে। ট্রন্ডহেইম বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবাধিকার বিষয়ে বক্তৃতা করতে। নরওয়ের নারীবাদী সংগঠনের আমন্ত্রণে, বক্তৃতা করতে

হয়েছে নোবেল কমিটিতে। নোবেল শান্তি পুরস্কার যেখানে দেওয়া হয়, সেখানে। নরওয়ের ধর্মমুক্ত মানববাদী সংগঠনের আমন্ত্রণে আবার। সেবারই মানববাদীরা তাঁদের বক্তৃতায় বলেন, যে, আমার তো নরওয়েতেই ছিল বাস করার কথা, নরওয়ের লেখক সংগঠন আর মানববাদী সংগঠনের চাপে নরওয়ের সরকার চেষ্টা করেছে আমাকে বাংলাদেশ থেকে উদ্ধার করতে, হঠাৎ নরওয়ের সম্পদকে সুইডেন কী করে ছিনতাই করে নিয়ে গেল! আমাকে মানববাদী পুরস্কার দিল নরওয়ের মানববাদী সংগঠন, হিউম্যান এটিস্ক ফরবুণ্ড। লেভি ফ্রাগেল, মানববাদী সংস্থার প্রধান, একসময় পুরোহিত ছিলেন, ওই পুরোহিত হওয়ার লেখাপড়া করতে করতে তাঁর ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস জন্মায়। ধর্মহীন মানববাদী এই দলটির সদস্যসংখ্যা ষাট হাজার। এরা সবাই চায় রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক না থাকুক। চায় ধর্মের উৎপাতহীন সুস্থ সুন্দর সমাজ। মানুষকে ধর্মমুক্ত, যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য এই দলটির আন্দোলন। দলটির সঙ্গে আমার হৃদ্যতা বাড়ে। হৃদ্যতা যুক্তিবাদীদের সঙ্গে বাড়ে, বাড়ে বলেই নরওয়ে থেকে শিল্পী আসে জিয়োর্দানো ব্রুনোর ছবিগুলোয়, নিজের তুলিতে আঁকা চার ফুট বাই তিন ফুট ছবির রিপ্রোডাকশানে সই নিতে। সেই ব্রুনো, যাকে রোমের ধার্মিকেরা একসময় পুড়িয়ে মেরেছিল। নরওয়ের বইমেলায় ছবি এবং সই বিক্রি করাই মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রুনোকে আর আমাকে এক ক্যানভাসে রাখার জন্য আমি কী গৌরবান্বিত বোধ করি না, জীবন কি আমার সার্থক হয় না! কেউ কেউ হয়তো আমার মতো বোঝে যে, হয়।

*

অনেক তো হল, মুগ্ধ মানুষের দল হাততালি দিল, প্যারিসে, স্ট্রাসবুর্গে, মারসেইএ, নানতে। মাথায় মুকুট পরা হল তো অনেক। অনেক তো হল লাল গালিচা সম্বর্ধনা --জুরিখে, বার্নে, বারসেলোনায়। রাজা মন্ত্রীর সাক্ষাৎ, সোনার মেডেল, গোল্ডেন বইএ সই। ট্রন্ডহেইম, স্টাভাঙ্গার, অসলো, স্টকহোম, গোথেমবার্গে যত ফুল ফুটেছিল, তার সবটুকু ঘ্রাণ নেওয়া তো হলই, পাইক পেয়াদা আর বশংবদ ভৃত্য নিয়ে ঢের দেখা হল হেলসিংকি, প্রাগ, কারলোভি ভেরি, ঢের পাওয়া হল হইচই, নগরীর চাবি, উপঢৌকন। এবার বাড়ি ফিরবো নিখিলদা।

বাড়ির দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসে উঠোনের কাক তাড়াতে তাড়াতে নুন লংকা মেখে পান্তা খাবো, খেয়ে তবক দেওয়া পান। ধনেখালি শাড়ি পরে কাগজি লেবুর, কামিনী ফুলের, মাচার লাউএর, বকনা বাছুরের, খলসে মাছের, পাঁচ ফোড়নের গল্প শোনাতে শোনাতে মা আমার হাতপাখায় বাতাস করবে, আর তার গায়ের ঘাম থেকে তীব্র ভেসে আসবে আমার জন্মের, শৈশবের, কৈশোরের গোল্লাছুটের ঘ্রাণ। অনেক তো হল মহাসাগরে সাঁতার, এবার গ্রামের পুকুরে ভরদুপুরে দুটো ডুব দেব নিখিলদা।

কদিন পর পর্তুগালের পথে। এবার গ্যাবি গ্লেইসম্যান রওনা হলেন আমার সঙ্গে। তিনি তাঁর নিজের জন্য একটি আমন্ত্রণপত্র যোগাড় করেছেন। আমন্ত্রণ আমার সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দেওয়ার। সারাক্ষণই সে বলে এসেছে তাঁর বক্তৃতা আছে লিসবনে। কী বিষয়ের ওপর বক্তৃতা তা আশ্চর্য, সারা পথে একবারও উচ্চারণ করেনি। পরে লিসবনের অনুষ্ঠানে আমি তাঁর বক্তৃতা শুনে আকাশ থেকে পড়ি। বিমানের প্রথম শ্রেণীতে বসে তিনি ভাব দেখাচ্ছিলেন যে তাঁকে না হলে ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব রাইটার্সের মোটেও চলছে না। অতি বড় তিনি আঁতেলেকচুয়াল ।

যথারীতি আমার বিমানের টিকিটে আমার নাম এভা কার্লসন। যথারীতি পুলিশের প্যাঁ পুঁ সার্কাস বাহিনী। যথারীতি আমার বিরক্তি এবং লজ্জায় মাথা নত করা। অনেক ফরাসি দার্শনিক এসেছেন লিসবনে। বেশির ভাগই পার্লাামেন্ট অব রাইটার্সএর সদস্য। ১৯৯৩ সালের শেষ দিকে এই সংগঠনটি করা হয়। আলজেরিয়ান লেখকদের মেরে ফেলছিল মৌলবাদী দল, সে কারণেই লেখকদের বাঁচাবার জন্য একটি ব্যবস্থা করবে বলে কেউ কেউ

এই সংগঠনটি শুরু করে। সালমান রুশদি প্রেসিডেন্ট হন চুরাশি সালে। স্ট্রার্সবুগে শুরু হয়েছিল, ওই শহরের মেয়র ক্যাথারিনা ত্রতম্যান সাহায্য করেছিলেন।

তিনি এসেওছেন লিসবনে। বাকি সদস্যরা হলেন পিয়ের বদৌ, অ্যাডোনিস, অ্যাডওয়ার্ড গ্লিসাঁ, ক্রিশ্চান সালমন, সালমান রুশদি। ক্রিশ্চান সালমন হল সেক্রেটারি, আর সালমান রুশদি নতুন প্রেসিডেন্ট। সালমান রুশদি লিসবনে আসেননি। কে এসেছেন, কে আসেননি তা আমার জানার কথা নয়। কারও সঙ্গে আলাপ নেই আমার। পরিচয় করতে এসে এতজন নাম বলে যায় নিজের, কিছুই মনে রাখা হয় না। ফরাসি লেখকরা ইংরেজি হয় জানেন না, জানলেও বলতে পছন্দ করেন না। অপছন্দ না করলে বলতে হয় বলে বলা, স্বস্তি পান না। লিসবনের অনুষ্ঠানেও নিস্তার নেই। সেখানেও সাংবাদিকদের দল ঘিরে ধরলো। মানবাধিকার সংগঠন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল নিজেদের কাগজপত্র, উপহার, ফুলের তোড়া ইত্যাদি দেবার জন্য। আমার হাত ছোঁয়ার আগেই ওগুলো নিরাপত্তা প্রহরীদের হাতে চলে যায়, ছোঁ মেরে নিয়ে নেয় বলেই। পরীক্ষা করে পরে আমাকে দেবে। অভিভূত হই দেখে যে এখানেও মানুষ আমার কথা জানে। নারীসংগঠনের নেত্রীরা ঘিরে ধরেছে আমাকে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে নিজেদের কাজ কর্ম সম্পর্কে বলছে। কী করছে তারা মেয়েদের জন্য। মেয়েরা যে এখানেও এদেশেও অত্যাচারিত, তা আমাকে খুব চাইছিল বোঝাতে। আমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা, বলল, যে, তাদের জন্য স্বপ্ন। এমন করে আমার দিকে তাকায়, যেন আমি বিশাল কিছূ। বিরাট কিছু। আমার ফটো তোলার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। পতূগিজ মেয়েদের এই উচ্ছ্বাস আমাকে স্পর্শ করে। এত দূরের দেশ, এত অজানা অচেনা মানুষ, কিন্তু যখন কথা বলে, যখন প্রকাশ করে নিজেকে, নিজের চারপাশ, তখন মনে হয় না ওরা আমার বা আমাদের চেয়ে ভিন্ন। মানুষ পৃথিবীতে সবাই এক, যত মানুষ দেখি তত মনে হয় আমার। সাদা কালো বাদামি হলুদ তাদের রঙ, ভিন্ন তাদের ধর্ম, ভিন্ন তাদের অর্থনীতি রাজনীতি ইতিহাস ভুগোল, কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলো একইরকম, যে কোনও দেশের মানুষের মতোই। ধনী দরিদ্রের অনুভব, বিখ্যাত অখ্যাতদের অনুভব সব সমাজেই এক।

অনুষ্ঠানটি মূলত বক্তাদের নিয়েই। দর্শক শ্রোতা বলতে দেশ বিদেশ থেকে আসা সাংবাদিক। জিল এসেছে। জিল গনজালেজ ফরস্টার। আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে বলে তার আসা। এসেছেন লিসবন শহরের মেয়র, রাজনীতির কজন, এবং কজন পর্তুগিজ লেখক, সাংবাদিক। পর্তুগিজ কোনও লেখকের নাম আমি জানি না। ফরাসি লেখকদের কারও কারও সঙ্গে আলাপ হয়েছে। অচেনার ভিড় থেকে এক অচেনা ভদ্রলোক একদিন অনেকক্ষণ ধরে সুযোগ খুঁজছিলেন কথা বলার জন্য। আমার চারপাশের ভিড় আর পুলিশের আগলে থাকা ভেদ করে তিনি আমাকে যে কথাটি বলতে চাইছিলেন, শেষ অবদি বললেন, *আপনার জন্য আমরা অনেক আন্দোলন করেছি। পথে নেমেছি। লিফলেট বার করেছি। বিলিয়েছি।*

শুনে তাকাই আমি। মাথাভর্তি সাদা চুল মানুষটির। দৈর্ঘে প্রস্থে এমন কিছু নন চোখে পড়ার মতো। যে কোনও বয়স্ক পুরুষের মতোই চেহারা তাঁর। ফরাসি কী পর্তুগিজ ঠাহর করতে পারি না। হাঁটতে হাঁটতেই কথা হয় তাঁর সাথে।

কোথায়? আমি জিজ্ঞেস করি।

ভদ্রলোক বললেন, *ফ্রান্সে।*

ও।

আমি মিষ্টি হাসি দিয়েই স্বভাবসুলভ ধন্যবাদ জানাই।

লোকটি আমাকে একটি লিফলেট হাতে দেন। লিফলেটে অনেকের নাম। চিনি চিনি না এমন অনেক ।

আপনার নাম কি এখানে আছে? আমি জিজ্ঞেস করি।

মাথা নেড়ে বললেন, *হ্যাঁ আছে।*

আচ্ছা, কী নাম আপনার?

বড় বিনীত কণ্ঠস্বর। *আমার নাম জ্যাক দারিদা।*

আপনি জ্যাক দারিদা!! মুহূর্ত পুলক বয়ে যায় গায়ে। *আপনার লেখা আমি পড়েছি। খুব শ্রদ্ধা করি আপনাকে। আপনারা এই আমার জন্য আন্দোলন করেছেন।*

জ্যাক দারিদা নম্র হাসলেন।

ফরাসি ভাষায় লেখা লিফলেট আমার হাতে। পশ্চিমের বড় বড় লেখক বুদ্ধিজীবী ক্ষুদ্র একটি দেশের ক্ষুদ্র এক লেখকের জন্য পথে নেমেছিলেন! সবই কী ভীষণরকম অবিশ্বাস্য এবং সত্য!

আমাকে ঘিরে নিরাপত্তার লোক, সাংবাদিক, অনুরাগী। আর ওদিকে অত বড় মানুষ জ্যাক দারিদা একা হাঁটছেন। কেউ তাকে ঘিরে নেই। আমার চারদিকের এই ভিড় আমার আর সহ্য হয় না। এগুলোকে চরম অপমান ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

অনুষ্ঠানে যে যার নিজের মাতৃভাষাতেই বক্তব্য রাখলেন। সব ভাষা থেকে অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। আমিই কেবল অন্য ভাষায়, ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য রাখলাম। বক্তব্য লিখিত। বিদেশের অনুষ্ঠানগুলোয় বক্তব্য সবার লিখিতই হয়। কেউ আমাদের দেশের মতো খালি হাতে মঞ্চে উঠে মাইকের সামনে দাঁড়ায় না এবং গড়গড় করে বলতে থাকে না বাচাল বাকবাজের মত যত খুশি, যেমন খুশি। এখানে নিজের বক্তব্য ভেবে চিন্তে গুছিয়ে লিখে আনতে হয়, সবার জন্যই নির্দিষ্ট সময় থাকে, একুশ মিনিট পঁয়ত্রিশ মিনিট। সেই সময় হিসেব করে বক্তারা তাদের বক্তব্য আগেই সাজিয়ে নেন। বক্তারা, লক্ষ্য করি, আমার প্রসঙ্গেই বললেন অনেকক্ষণ। আমার পাশে বসেছিল গ্যাবি। গ্যাবিও বললো আমাকে নিয়েই। বারবার আমার নাম উচ্চারিত হচ্ছে বলেই বোঝা। ভাষা বুঝিনি, কিন্তু অনুমান করি, কী করে আমার গুরুদায়িত্ব সে বহন করছে, বুদ্ধির মাধুরি মিশিয়ে তারই গীত গাইছে সে।

ইন্টারন্যাশন্যাল পার্লামেন্ট অব রাইটার্স গড়ে উঠেছে উনিশশ তিরানব্বই সালে। আলজেরিয়ায় যখন লেখকদের জবাই করে মেরে ফেলা হচ্ছিল তখন। এক একটি দেশের এক একটি শহর নির্যাতিত লেখকদের জন্য জন্য নিরাপদ আশ্রয় হবে, এই হল প্রকল্প। সেই শহর লেখককে বাড়ি দেবে, জীবনযাপনের জন্য যা খরচ সব দেবে। শহর দেবে মানে পৌরসভা দেবে, সরকার দেবে। পার্লামেন্টের কাজ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সরকারকে বলে

কয়ে দেশের কোনও একটি শহরকে আশ্রয়-শহর করার ব্যবস্থা করা। নিসন্দেহে মহত উদ্যোগ।

পর্তুগালে মিশেল ইডেলও এসেছে। জ্যাক দারিদার সঙ্গে আরও লেখক। হেলেন সিক্সুস নামে একজন নারীবাদী লেখকের সঙ্গে পরিচয় হল, পরিচয় হল আমেরিকা থেকে উড়ে আসা অনিতা দেশাইএর সঙ্গে। সকলে আমার গল্প জানে। হেলেন সিক্সুস বললেন, ফ্রান্সে আমাকে নিয়ে নাটক লিখেছেন তিনি, সেই নাটক অনেকদিন ফ্রান্সে অভিনীত হয়েছে। স্ট্রাসবুর্গে এখনও চলছে নাটক। হেলেন সিক্সুস কিছু ছবি দেখালেন নাটকের। কোনও পত্রিকায় ছাপা। একটি ফরাসি মেয়ে শাড়ি পরে মঞ্চে। শাড়ি ঠিকমত যদিও পরা হয়নি। তসলিমা চরিত্রে অভিনয় করছে। নাটক ফরাসি ভাষায় লেখা। কিছুই আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না, যদি দেখিও নাটক। মিশেল ইডেল এবং একদল সাংবাদিক, দুদিন পিছন পিছন ঘুরছেন, আমাদের, আমার, হেলেন সিক্সুসের আর অনিতা দেশাইএর কথোপকথন ফিতেবন্দি করতে। হেলেন সিক্সুস আনতোয়ানেত ফুকের বন্ধু। ফুকের কারণে মিশেল ইডেলেরও বন্ধু। সিক্সুস আবার জ্যাক দারিদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দারিদার মতো তাঁরও জন্ম আলজেরিয়ায়, যখন আলজেরিয়া ফ্রান্সের কলোনি। দুজনেই ইহুদি। দুজনেই দার্শনিক। দুজনেই উত্তর-আধুনিক। আমাদের একই প্রশ্ন করা হচ্ছিল, এবং আমরা উত্তর দিচ্ছিলাম। সাহিত্য এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব দুটো একসঙ্গে করার প্রয়োজন আছে কী নেই। নারীবাদের কথা বলার জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন আছে কী নেই। সাহিত্য দিয়ে আসলে আদৌ কি কোনও পরিবর্তন সম্ভব। ধর্ম সম্পর্কে মত কী! ধর্ম কি আসলেই নারীর স্বাধীনতার পথে বাধা? এরকম অনেক প্রশ্ন। তিনজনের উত্তর থেকে যা বেরোলো তা হল আমরা তিনজনই নারীর নিরঙ্কুষ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবে, অনিতা দেশাই একটু নরম। হেলেস সিকসুস অত নরম নন। এবং আমি খুবই কঠিন। সবচেয়ে বেশি আপোসহীন। আমার ধারণা ছিল না পশ্চিমেও আমাকে একই আখ্যা পেতে হবে, যে আখ্যা দেশে পাই। উগ্র। র‍্যাডিক্যাল।

পর্তুগিজদের জানি। ভারতবর্ষে পর্তুগিজ নাবিকেরা প্রথম ইওরোপীয় যে ঢুকেছিল, থেকেছিল। সে সব ইতিহাস। কিন্তু পতুর্গিজদের যে একটি দেশ আছে পর্তূগাল বলে নাম। সে ভুলেই বসে ছিলাম। লিসবন ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখি সেই পতুর্গিজ নাবিকদের দেশ। দেখি ভাস্কো দ্য গামার দেশ, তার ডিসকভারি মনুমেন্ট। তার কবর। দাঁড়াই এসে চুপচাপ লিসবন বন্দরে, যেখান থেকে ভাস্কো দ্য গামার নেতৃত্বে চৌদ্দশ সাতানব্বই সালের আটই জুলাইয়ে জাহাজ ছাড়ে, যে জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে, , মোজাম্বিক দ্বীপ পার হয়ে, মোমবাসা পার হয়ে, মালিন্দি পার হয়ে চৌদ্দশ আটানব্বই সালের আঠারোই মে মাসে প্রথম দেখে ভারতের মালাবার-তীর। কালিকুটে পৌঁছোয় এর তিন দিন পর।

লক্ষ করি, লিসবনের বাঁ পাশের বড় রাস্তার নাম ইণ্ডিয়া, ডান পাশের নাম ব্রাজিল। ব্রাজিলকে কলোনি করেছিল, এবং ভারতকে *আবিস্কার* করেছিল। যেন ভারত অনাবিস্কৃত ছিল যে দ্য গামার সেই বিশাল দেশটিকে আবিস্কার করতে হয়েছে। খুব মূর্খের মত, আমি মনে মনে ভাবি, যে, ইওরোপীয়রা নিজেদের দেশকে চিরকালই পৃথিবীর কেন্দ্র বলে ধারণা করে আসছে। পর্তুগিজ নাবিকেরা ভারত থেকে এনেছে মশলা, আর ব্রাজিল থেকে এনেছে সোনা দানা। লিসবনে দেখি ভাস্কো দ্য গামার নামে বানানো একটি লম্বা সেতু। এই ভাস্কো দ্য গামা পনেরোশ দুই সালে ভারতে ফিরে খুন করেছিল প্রচুর মানুষকে। কালিকুটের হিন্দু জনতা পর্তুগিজদের মেরেছিল বলে শত শত মানুষ ভর্তি একটি আরব বাণিজ্য-জাহাজের দরজা বন্ধ করে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। কালিকুটে বন্দরে বোমা মেরে প্রচুর ভারতীয় জনতা খুন করেছিল। পর্তুগালে ফিরে এলে তাকে বিরাট সম্মান দেওয়া হয়। আর এমন ভারত, এই বাণিজ্য-লোভী হন্তারক ভাস্কো দ্য গামাকেই সাদরে বরণ করেছিল। ওদিকে কলম্বাস আর তার সাঙ্গ পাঙ্গ আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েই সহস্র আদিবাসীকে প্রথম খুন করে নিয়েছে। তারপর তো আদিবাসীদের খুব পরিকল্পনা মত নিশ্চিহ্ন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিভিন্ন ইওরোপীয়রা।

স্টকহোম শহরটি যেমন একশটি দ্বীপের ওপর , লিসবন শহরটি সাতটি পাহাড়ের ওপর। উঁচু নিচু। শহরের বাড়িগুলোও পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলোর চেয়ে ভিন্ন। ঘন বসতি। লাগোয়া বাড়ি। ট্রাম চলার রাস্তা। আবার ঝুল বারান্দায় দড়িতে শুকোতে দেওয়া রঙিন কাপড় চোপড় বাতাসে উড়ছে। দৃশ্যটি দেখে দেশ দেশ লাগে। কোনও বাড়ির আস্তর খসা দেওয়াল দেখলে দেশ দেশ লাগে। হয়ত দারিদ্র দেখলেই দেশ দেশ লাগে। পর্তুগিজরা নাবিক হিসেবে এক সময় বিশ্বের এক নম্বর ছিল।   ইওরোপের ছিল শক্তি শালী দেশ। আর এখন ইওরোপের একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে পর্তুগালের নাম।

পর্তুগালে বসে আমি ঘোষণা করে দিই, সুইডেনে সরাসরি ফিরবো না, আমস্টারডাম যাবো, ওখানে কদিন থেকে তারপর সুইডেন। হ্যাঁ যা বলব তাই। তাই হল। আমার বক্তৃতা শেষ। আমি এখন যেতেই পারি।   পৃথিবীর নির্যাতিত নির্বাসিত লেখকদের কল্যাণে লিসবনকে শরণাগত লেখকদের শহর বলে চিহ্নিত করার চেষ্টাচরিত্তির চালাতে থাকে লেখক সংসদ। ওদের আরও একটি জিনিস আমি বলে দিই। আমার টিকিটের নাম যেন বদলে দেওয়া হয়। কারণ আমি তসলিমা। আমি এভা নই। এভা কার্লসন তো নইই।

*

একবার খুব ইচ্ছে করে পালাই
বার্চ বিচ ওক আর পাইনের চমৎকার অরণ্য আর
শীতল শান্ত বল্টিক সমুদ্র ঘেরা সাজানো নগর থেকে
কোথায় পালাবো? কোথায় নগর আছে আর আমার অপেক্ষা করে এই পৃথিবীতে?

আমার সর্বাঙ্গ এরা ঢেকে রাখে উষ্ণ চাদরে
হাত বাড়াবার আগে নুয়ে আসে হাতে থোকা থোকা প্রেমার্দ্র হৃদয়,

সব ফেলে ইচ্ছে করে পালাতে কোথাও।

কোথায় পালাবো? কোথায় মানুষ আছে আর আমার অপেক্ষা করে এই পৃথিবীতে?

ছোটদার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমস্টারডাম আসছে। *ঠিক আছে,* আমি বললাম, *আমি তোমাকে দেখতে যাবো।* ছোটদা বিশ্বাস করলো না আদৌ আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবো আমস্টারডাম। ইওরোপে ভ্রমণ কি সোজা জিনিস! আমস্টারডামে নেমে আমার এত খুশি লাগে যে মনে হয় নাচি। এখানে আমাকে বিমানের পেট থেকে আলাদা করে বেরিয়ে যেতে হয়নি। সবাই হাঁ হয়ে দেখছে না আমাকে। এখানে ছোটদার সঙ্গে আমার দেখা হবে। প্রায় দৌড়ে যাই এক্সিট লেখা দরজার দিকে। কিন্তু তার আগে ইমিগ্রেশন। পাসপোর্ট দেখিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তায় লাইন। আমি তো এখন আর লাইনে দাঁড়িয়ে অভ্যস্ত নই। আমি বুলেট প্রুফ গাড়ি থেকে বিমান, বিমান থেকে বুলেট প্রুফ গাড়িতে অভ্যস্ত। ইমিগ্রেশনে পাসপোর্ট দেখিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে যাত্রীরা। কাউকে থামতে বলছে না ইমিগ্রেশনের লোক। কিন্তু অবাক কাণ্ড আমাকে থামতে বলা হয় । কী দোষ করেছি? কিছু না।

প্রশ্ন, খুব কঠিন কণ্ঠে, *কেন এদেশে ঢুকতে চাইছেন?*

আমার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

আপনার ভাইয়ের নাম কি?

রেজাউল করিম কামাল।

সে কি হল্যাণ্ডের নাগরিক।

না সে নাগরিক নয়।

তবে সে কী? এখানে কী করছে সে?

বাংলাদেশ বিমানে কাজ করে। বিমান যখন এখানে থামে, তারাও থামে। তারা মানে ক্রুরা। আমার ভাই একজন ক্রু।

তোমার ভাইয়ের ঠিকানা কি?

হোটেলের ঠিকানা কি?

হোটেলের নাম বললাম।

কী করে প্রমাণ করবে যে সে তোমার ভাই।

সে আমার ভাই।

কদিন থাকবে তোমার ভাই?

তিন দিন।

তুমি কদিন থাকবে?

তিন দিন।

তারপর কোথায় যাবে?

সুইডেন।

কেন সুইডেন?

কারণ ওখানে আমি আপাতত থাকছি।

এখন তুমি সুইডেনে ফেরত যাও, অথবা পর্তুগালে ফেরত যাও। যেখান থেকে এসেছো।

আমি পর্তুগালে ফিরবো কেন? ওখানে তো আমি থাকি না।

এখানে তুমি ঢুকতে পারবে না।

এ দেশে আসার ভিসা তো আমার আছে। তাহলে ঢুকতে দেবেন না কেন?

উহুঁ। ঢুকতে দেওয়া যাবে না।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

সাদা মানুষেরা এগিয়ে যাচ্ছে। সবার পাসপোর্ট দেখেই ছেড়ে দিচ্ছে ইমিগ্রেশন। আমাকেই কেবল ছাড়ছে না। আমার মেরুদণ্ডের ভিতর আমি টের পাই আমাকে আটকে রেখেছে আমার পাসপোর্টটি দরিদ্র দেশের বলে, আমার গায়ের চামড়া সাদা নয় বলে।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, *আপনি কি মনে করছেন আপনাদের দেশে আমি থেকে যাওয়ার জন্য এসেছি?*

লোকটি মাথা নাড়ল। হ্যাঁ বোধক।

আমি বললাম, *আমি কিন্তু এসেছি এখানে মাত্র তিনদিনের জন্য। আপনাদের দেশে আমি থাকতে আসিনি।*

লোকটি অবিশ্বাসের চোখে তাকালো আমার দিকে। একফোঁটা বিশ্বাস তো নেই। এক তিল সহানুভূতি নেই। থিকথিক করছে ঘৃণা। লোকটি আমাকে জানিয়ে দিয়েছে আমাকে সে ঢুকতে দেবে না। এত অসহায় আমাকে আর লাগেনি কখনও। দূর থেকে দেখি ছোটদা দাঁড়িয়ে আছে।

আচ্ছা আপনি আমাকে ঢুকতে দিচ্ছেন না কেন? আমার তো ভিসা আছে এদেশের।

লোকটি শক্ত মুখে বসে রইল। আমার সুটকেস এসে যাবে। তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

আসি বললাম, আমার কণ্ঠে কষ্ট জমে বুজে আসছে। *আপনি ফোন করে জিজ্ঞেস করুন আমার ভাইকে। জিজ্ঞেস করুন সে হোটেলে থাকছে কি না। ও নামে কেউ আছে কি না জিজ্ঞেস করুন। জানুন সে বিমানের ক্রু কিনা।*

লোকটি এমন ভাবে নিজের কাজ করতে লাগল যেন আমার কথা সে শুনতে পায়নি। অথবা আমি নামক বস্তু এখানে দাঁড়িয়ে নেই। আমি হলাম নাথিং। ইমিগ্রেশন আমাকে ঢুকতে দেবে না। আমাকে এখন অন্য কোথাও অন্য কোনও দেশে চলে যেতে হবে। আমি যে বিমানে এসেছিলাম, সে বিমানের সবাই পার হয়ে গেছে এখানকার ইমিগ্রেশন, কানেকটিং ফ্লাইটের লোকেরা ধরেও ফেলেছে তাদের যার যার ফ্লাইট। অন্যান্য বিমানের যাত্রীরা যারা সবে নেমেছে, তারা এখন ইমিগ্রেশন পার হচ্ছে। আমি সেই যে দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়েই আছি দেয়াল ঘেঁসে। দাঁতে দাঁত চেপে অপমানে অপদস্থ হয়ে দাঁড়িয়েই আছি। ঠিক কী করব, বুঝতে পারছিলাম না। সুটকেস ফিরে এলে আমাকে এখন সুইডেনে ফিরে যেতে হবে, এই নিয়তিকে রোধ করার অন্য কোনও উপায় কি নেই? ছোটদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে যে আমি

ঢুকতে পারিনি! বৈধ পাসপোর্ট, বৈধ ভিসা কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেবে না। ছোটদার সঙ্গে আমার দুদিন থাকা হবে না। *থাকা হবে না কারণ আমার গায়ের রং সাদা নয়, আমার পাসপোর্ট গরিব দেশের পাসপোর্ট।* আমার মাথা একবার ঘোরে, আরেকবার স্থির হয়। চোখ একবার ভিজে উঠতে চায়, আরেকবার রোধ করি জল। ইমিগ্রেশনের লোকটি আমাকে ধমক দিয়ে একটু দূরে দাঁড়াতে বলে। কারণ সাদাদের ভিড়ের গায়ে লাগতে পারে আমার গা, ভিড়ের অসুবিধে হতে পারে।

এমন সময় ভিড় থেকেই কিছু লোক আমাকে লক্ষ্য করে, লক্ষ্য করে আমার ওপর ইমিগ্রেশনের লোকের আচরণ। লোকগুলো আমার দিকে এগিয়ে এসে অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বলে, *আপনি তসলিমা নাসরিন?*

বললাম *হ্যাঁ।*

কোনও অসুবিধে হয়েছে?

আমি আমার ভাইএর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এখন ঢুকতেই দিচ্ছে না।

আশ্চর্য!

লোকগুলোর মধ্য থেকে একজন ইমিগ্রেশনের লোককে বললো, *আপনি চেনেননা ওঁকে? কাকে আটকাচ্ছেন আপনি! উনি খুব বিখ্যাত লেখক। এটি জানার সৌভাগ্যও নিশ্চয়ই আপনার হয়নি! এ দেশের লোকেরা জানতে পারলে ওঁকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দেবে।* ওরা ওলন্দাজ। ওলন্দাজ ভাষাতেই কথা বলে ওরা। এরপর ইমিগ্রেশনের লোকটি একটু অপ্রস্তুত হয়ে আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইল। পাসপোর্টটি উল্টে পাল্টে কিছুক্ষণ দেখে সিল দিয়ে দিল। অগত্যা ছাড়পত্র। সাদা লোকের তিরস্কার সাদা লোকে শুনলো।

ছোটদা আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বিমান বন্দরে। আমি সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে আসতেই আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, *তর এত দেরি হইল কেন?*

হইল। আমারে ত ঢুকতেই দিতাছিল না।

কারণটা কী?

আবার কী। বর্ণবৈষম্য। হইতাম সাদা। থাকতো ধনী দেশের পাসপোর্ট, তাইলে সব ঠিক ছিল। ছোটদাকে দেখে ভুলে যাই দীর্ঘক্ষণ ইমিগ্রেশনে দাঁড়িয়ে অপমান সওয়ার যন্ত্রণা। আমি অনুভব করতে থাকি আমার পাখা গজিয়েছে। যেন ইচ্ছে করলেই আকাশে উড়তে পারি। যেন যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। এত আনন্দ আমার হয়নি বহুদিন। যেন হাজার বছর পর বেরিয়েছি ছোট্ট সিন্দুক থেকে। ছোটদা বলে, *চল মেট্রো দিয়া যাই।*

আমি লাফিয়ে উঠি খুশিতে। আমার তো মেট্রো চড়ার উপায় নেই। সুপারস্টাররা মেট্রো চড়ে না। প্যাঁ পুঁ করে সাইরেন বাজিয়ে তার গাড়ি যায়। ওই কৃত্রিম জীবন থেকে বেরিয়ে আসার আনন্দ আমাকে কাঁপায়। আমি ছোটদার হাত ধরে মেট্রোতে সাধারণ মানুষের মত চড়ি। সাধারণ মানুষের মত বেরোই। হাঁটি। হোটেলে পৌঁছি। হোটেলে আমার সুটকেস খুলে প্রথমেই ছোটদাকে দিই ব্যাগ বোঝাই ছোট ছোট বোতল। কত রকমের পানীয় এসবে, আমি চিনি না। ছোটদার জন্য এসব নিয়ে এসেছি খুশি হবে বলে। খুশি না হয়ে ছোটদা বরং মাথায় হাত দিয়ে বলে, *করছস কি! তুই তো দেখি হোটেলের মিনিবারে যা ছিল সব লইয়া আইছস।*

--হ। তাতে কি?

--টাকা দিতে হয় নাই?

--টাকা দিব কেন? হোটেলের রুমের ফ্রিজে তো এইসব দিয়াই যায় খাওনের লাইগ্যা। আমি খাইনা, তুমি খাও। তাই তোমার লাইগ্যা লইয়া আইছি।

--হায়রে। করছস কী করছস কী! এই গুলার তো টাকা নিব হোটেল। হোটেলের বিল দিতে গেলেই তো সব চার্জ করব। ফোন বিলের কি অবস্থা? হোটেলের রুম থেইকা তো ঘন্টা -দুই ঘন্টা কথা কইলি।

--দেশেও তো ফোন করছিলাম। সবার সাথে কথা হইছে। যারা আমারে ইনভাইট করছে, হেরা মিটাইব হোটেলের বিল।

--হ, হোটেলের রুমের খরচ দিব। দিব হয়ত খাওয়ার খরচ। কিন্তু পারসোনাল ফোনকল যে হইছে, হেইটা তো তর নিজের দেওয়া উচিত।

--কেন, ফোনের বিল নিজেদের দিতে হয় নাকি! প্যারিসের হোটেল থেইকা তো সমানে ফোন করছিলাম কলকাতায়, ঢাকায়। আমারে তো কেউ কিছু কয় নাই। আমি তো মনে করছি, ফোন আছে, যেইখানে ইচ্ছা ফোন করা যায় বোধহয়।

--করা তো যায়ই। আর থাকছস ফাইভ স্টার হোটেলে। ওইসব হোটেল থে্ইকা ফোন করা মানে গলা কাটা দাম দেওয়া। তরে যারা নিয়া গেছে, তাদের বারোটা বাজব।

হ্যাঁ এই আমি। হোটেলের নিয়ম কানুন কিছু জানি না। *তারকারা* সব জানে বলেই সবার ধারনা। তারকাদের জানতে নেই সাধারণ নিয়ম কানুন। অসাধারণ কেউ তারকা বনলে কোনও অসুবিধে নেই। সাধারণ মানুষকে তারকা বানিয়ে ফেললে এমন তো হবেই। আমার দুঃখ হয়, হতে চায়। কিন্তু দুঃখগুলোও ছোটদার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঝড়ো আনন্দে উবে যায় হাওয়ায়। নির্বাসিত জীবনে এই প্রথম কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হল। বেরিয়ে পড়ি বাইরে রাস্তায়। দুজনে গল্প করতে করতে হাঁটি। সাধারণ রেস্তোরাঁয় খাই। টাকা আমিই দিই। বাড়ির সবাই কে কেমন আছে সব শুনি ছোটদার কাছে। ছোটদা তার বউ বাচ্চাকে পাঠিয়ে দিতে চাইছে আমেরিকায়। বারবার বলি *যেও না। কোথাও যেও না। আমি ফিরে যাবো বাংলাদেশে। সবাই একসঙ্গে থাকব।* দেশ থেকে বেরোনোর পর এ অবদি কত কিছুই তো ঘটলো, কত সম্মান, পুরস্কার, কিন্তু আজকেই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে। ছোটদা ঘুরে ঘুরে যেখানে সবচেয়ে কম পয়সায় খাওয়া যেতে পারে তেমন রেস্তোরাঁ খোঁজে। আমি যে কোনও রেস্তোরাঁতেই যেতে চাই। যে ভাতের জন্য, সাদা ভাত*চল ভাত খাই। কতদিন ভাত খাই না।* আমার আকুল আবদার। রেলস্টেশনের কাছেই ছোটদার হোটেল। রেলস্টেশনের ম্যাগাজিনের দোকানের র‍্যাক বাইরে রাখা, ওখানে ওলন্দাজ ভাষার পত্র পত্রিকা। দূর থেকেই চমকে উঠি দুতিনটে পত্রিকার প্রথম পাতায় আমার ছবি। কাছে গিয়ে পাতা উল্টে দেখি প্রায় প্রতিটি

পত্রিকায় আমার ছবি, এবং রোমান হরফে নামের বানান দেখে বুঝি আমাকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ প্রতিবেদন। ভিনভাষার প্রবন্ধ আমার পক্ষে পড়া সম্ভব হয় না।

দুজন শুয়ে শুয়ে অনেক রাত অবদি কথা বলি।

--সপ্তু, আমার যাওয়ার কী হইব দেশে?

--তর কি আর সম্ভব হইব যাওয়া?

--কেন সম্ভব হইব না। খালেদা জিয়া তো তরে যাইতেই দিত না দেশে।

--কইলেই হইব নাকি! আমার নাগরিক অধিকারের জন্য আমি লড়ব।

--নেক্সট ইলেকশান হোক। আওয়ামী পাওয়ারে আসলে যাইতে পারবি। এহন তো সম্ভবই না।

--মোল্লাদের উৎপাত ত কমছে অনেক!

--কেডা কইছে কমছে? খালেদা তো মোল্লাদের কথায় চলে।

--দেশের অবস্থা কি ভালো হইব না আর?

--হাসিনা যদি আইসা ঠিক করে।

--হাসিনাই বা কী ঠিক করব! সে নিজেই তো ধর্ম ধর্ম কম করে না!

ছোটদাকে ক, খ, গ, ঘ, ঙ , চ .. সবার খবরই নিতে বলি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বলি। ঙর বাড়িতে গিয়ে আমার হয়ে ক্ষমা চাইতে বলি। ঙর প্রতি আমার দুর্বব্যহারের কথা সবটাই বলি ছোটদাকে। বলি আরও অনেক কথা। শুধোই অনেকের কথা। ছোটদা যখন আমার শান্তিনগরের বাড়ির কথা বলে, মনে হয় আমি যেন ওখানেই আছি, ওই বাড়িতেই, সবার সঙ্গে। কোথাকার জীবন কোথায় ছিটকে গেছে! কোনটি বাস্তব, সেই জীবনটি না এই জীবনটি। কোন জীবনে আমি আসলে বাস করছি! ফেলে আসা জীবনটি মনে মনে যাপন করি আমি। আর যে জীবনটি হাতের কাছে, সেটিকে ফেলে আসা জীবনের কাছে নেবার জন্য যাপন করে যাচ্ছি। কোনটি সত্যিকার যাপন করা তবে! ছোটদার সঙ্গে আমি ফেলে আসা জীবনটিকেই যাপন করতে থাকি, ঘোরের মধ্যে।

পুরো আমস্টারডাম শহর ঘুরে বেড়াই পরদিনও ছোটদা আর আমি। আমার আনন্দ হয় পুলিশহীন এই ঘুরে বেড়ানো। মুক্তির আনন্দ আমার রোমে রোমে। আমরা যেন ছোটবেলার সেই ভাই বোন। পিছুটান ভুলে গেছি। যেমন ইচ্ছে ছুটছি। ধনী দেশ, অথচ রাস্তার কিনারে ভিক্ষে পাবার জন্য বসে আছে মানুষ। সেই লোকের দিকে চোখ যায়, বসে বসে বই পড়ছে, সামনে টুপি পাতা আর বড় একটি শক্ত কাগজে ইংরেজিতে লেখা *উই আর হাঙ্গরি।* খানিক দাঁড়াই। জিজ্ঞেস করি, *আপনি তো একা। তবে যে বড় লিখলেন, উই। উইটা কে?* ভাবলাম খুব জব্দ করা গেল বোধহয়, অথবা বড় একটি ভুল ধরিয়ে দেওয়া গেল। লোকটি ইঙ্গিতে তার পাশে বসা কুকুরটিকে দেখিয়ে দিল। কুকুরটিকে যে আমি দেখিনি আগে তা নয়, আসলে কুকুরকে আমাকে পূর্বদেশীয় চোখ গোনেনি। কুকুরের না খাওয়া মলিন মুখটির দিকে তাকিয়ে বিশেষ করে ক্লান্ত দুটো চোখ দেখে বড় মায়া হয়, টাকা দিতে যাবো, কিন্তু শুধু ডলার আছে পকেটে। সুইডিশ ক্রাউনকে ডলার করে নিয়েছিলাম। ওকে যে এসকুডো করা যায়, গিল্ডার করা যায়, ক্রাউনকে আগে ডলার করে নিতে হয় না, কথাটিও কি আমি বুঝেছি কিছু। *টাকা পয়সা ব্যাপারে আমার চিরকালই বুদ্ধি,* ছোটদা বলে, *একটু কম।* সে কথা আমিও স্বীকার করি। ছোটদার বাধা না মেনে কুড়ি ডলার দিয়ে দিই ক্ষুধার্ত দুজনকে। এই দেওয়াটির মন মনের আনন্দ থেকে এসেছে, আনন্দটি ছোটদাকে দেখার আনন্দ। ছিলাম পড়ে অনাথ অসহায়, ছোটদার সঙ্গে দেখা আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়, আমারও স্বজন আত্মীয় আছে। ক্ষুধার্ত সাইনবোর্ড টাঙিয়ে আমস্টারডামের ফুটপাতে আরও দুতিনজনকে দেখি। কেবল তাই নয়, রাস্তায় মানুষ নানা রকম মূর্তি সেজে পয়সা তুলছে। ধনী দেশেও যে এভাবে ভিক্ষে চলে, এবং নানারকম সং সেজে পয়সা রোজগার করা হয়, তা আমার আগে জানা ছিল না। আপাদমস্তক সোনালী রং করা একটি মূর্তি প্রায় এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে একটি কাঠের ওপর, যেন পুতুল। দাঁড়িয়ে আছে অথচ এক ফোঁটা নড়ছে না। ভয়ে এবং বিস্ময়ে আমি মূর্তিটিকে দেখি। কী করে এত স্থিরতা মানুষ তার শরীরে আনতে পারে, আমার অবাক লাগে। অভাবই বোধহয় এই স্থিরতা দিচ্ছে। অভাব দেয়, এবং সম্ভবত কখনও কখনও

ধন দৌলতও এমন আশ্চর্য স্থৈর্য দেয়। সুইডেনের অতিধনীরা স্থবির বসে থেকে থেকে, বন্ধুহীন দিন কাটিয়ে কাটিয়ে একসময় আত্মহত্যা করে, আরও বেশি স্থবিরতার দিকে চলে যায়।

ভ্যান গগের মিউজিয়াম। মাদাম তুসো মিউজিয়াম তো হল। র‍্যামব্রেন্ট দেখাতে নিই ছোটদাকে। *এই হইল র‍্যামব্রেন্ট। এই হইল তার বিখ্যাত ছবি নাইটওয়াচার।* ছোটদা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। র‍্যামব্রেন্ট তাকে মুগ্ধ করতে পারে না। মুগ্ধ করে রাস্তা থেকে কোনও একটি বইয়ের দোকানে তাকিয়ে যখন দেখে   আমার বই সারি সারি সাজানো। প্রচ্ছদ জুড়ে আমার ছবি। ওলন্দাজ ভাষায় যে আমার বই বেরিয়ে গেছে, তা আমার জানা ছিল না। প্রকাশক আমাকে পাঠায়নি বই। এত তাড়াহুড়ো করে কী করে বই ছাপিয়ে ফেলে কে জানে। কখন অনুবাদ করল, কখন ছাপা, কখন বাঁধাই। বাণিজ্যের গন্ধ পেলে, বুঝি, তখন সময় কোনও বিষয় নয়। আর গন্ধ না থাকলে পাঁচ বছরও পাঁচ মিনিটের জন্য সময় হবে না পাণ্ডুলিপি নিয়ে ভাবতে। মানুষ আমার বই কিনছে, দেখে লজ্জায় আমি মুখ আড়াল করে বেরিয়ে আসি দ্রুত। ছোটদা   উত্তেজনায় আমার দুহাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে যায়। গিয়ে সোজা বইবিক্রেতার সামনে। আমার একটি বই হাতে নিয়ে আমার মুখের সামনে বইয়ের প্রচ্ছদ তুলে ধরে বলল, *এটা   এর ছবি।   এ বইয়ের লেখক এ। তসলিমা। তসলিমা নাসরিন। আমার বোন। এ আমার বোন।* ছোটদার কণ্ঠ উত্তেজনায় কাঁপছে।

লোকটি হা হা করে উঠল। *তাই নাকি! তাই নাকি। দেখা হয়ে খুব খুশি হলাম। খুব ভালো চলছে আপনার বই। এখানে তো বেস্ট সেলার। কিছু কপি কি সই করে দেবেন?* বইবিক্রেতার অনুরোধে কিছু বইয়ে সই করে আমি ছোটদার ধরে টানতে টানতে বেরিয়ে আসি।

--*কী রে তুই কি শরম পাস?*

--*না। শরম না।*

--*তাইলে কি?*

--*নিজেরে বড় পরাধীন বইলা মনে হয়।*

--কেন?

--আমি বইয়ের লেখক। আমার দিকে তাকাইয়া মানুষে হয়ত এক্সপেক্ট করে অনেক কিছু। আমারে ওই রিয়ালিটিটা ফালাইয়া দেয় এমন একটা অবস্থার মধ্যে যে আমি তহন আমার যা ইচ্ছা করে তা করতে পারি না। আমারে আর রিয়াল আমি বইলা আমার নিজেরই মনে হয় না। না, ছোটদা বুঝতে পারে না যা বলতে চাইছি। আমি দ্বিতীয় কোনও বইয়ের দোকানের ত্রিসীমানা মাড়াই না। রাস্তায় লাঠি আইসক্রিম খেতে খেতে বেস্ট সেলারের লেখক হাঁটছে, বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকদের হাতের চালাকির খেলা দেখছে আর মজা পাচ্ছে। এটা আমাকে কোনও অস্বস্তি না দিলেও পাঠককে দেয়।

রাতে ছোটদা দেখাতে নিল, বলেই নিল এক অভিনব জায়গা। রাত নটা দশটার দিকে যখন হোটেলে ফেরার সময় তখন রাতের খাবার খেয়ে দেয়ে ছোটদা আমাকে ড্যাম স্কোয়ারে নিয়ে যায়। সেখানের *দে ভালেন* নামের পাড়ায় স্তম্ভিত আমি দেখি সারি সারি দোকান। কাচের দোকান। কাচের দোকানে শুধু ব্রা আর প্যান্টি পরে অথবা পুরো উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। নানান বয়সী মেয়ে। লাল আলোর তলে মেয়েদের বড় রূপসী, বড় রহস্যময়ী দেখতে লাগে। অপ্সরার যে সব ছবি ছাপানো হয় বইয়ে, সেরকম এক একটি অপ্সরা । দোকানের ভেতরে বিছানা। শরীর দেখানো মেয়েদের আহবান, *এই শরীরটাকে কেনো। এক ঘন্টার জন্য কেনো।*

হাঁটছি তো হাঁটছি। শত শত ঘর। শত শত মেয়ে। আমার পলক পড়ছে না। আমার বিস্ময় কাটছে না। মাংসের হাট বসেছে এখানে। কোনও কোনও দরজার সামনে দরদাম চলছে। আমি শ্বাস বন্ধ করে দেখতে থাকি অবিশ্বাস্য সব দৃশ্য। ভয়ে আমি কাঠ হয়ে থাকি। পুরুষের ভিড়, কে পর্যটক, কে ক্রেতা কিছু বোঝার উপায় নেই। মাতালের ভিড়, নেশাখোরদের ভিড়। আমার ভয় হয়, আমার ওপর আবার কেউ না ঝাঁপিয়ে পড়ে। মেয়ে মানুষের লোভে চকচক করছে সবার চোখ। যৌন দোকানে, যৌন জাদুঘরে লাল নীল বাতি জ্বলছে নিবছে। কোথাও

একটু একটু কম আলো বা একটু গলির পথ হলেই আমি ভয়ে ছোটদাকে শক্ত করে ধরে দ্রুত পার হই গলি। পার হই অন্ধকার।

বেশ্যাবৃত্তি যে এত নিকৃষ্টভাবে কোথাও বৈধ হতে পারে, আমার জানা ছিল না। পাশ্চাত্যের কোনও দেশে নারীর শরীর যে এরকম উৎকটভাবে ভোগ্যপণ্য হতে পারে, তা আমার কল্পনার মধ্যেও ছিল না। যে দেশে কোনও অভাব নেই, সরকারি সমাজ কল্যাণ আছে, ভাতার ব্যবস্থা আছে, সবার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সবার জন্য অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে, সেখানে কেন পতিতাবৃত্তি করতে হয় মেয়েদের! হল্যান্ডে সবই বৈধ। ইওরোপের অন্য যে কোনও দেশে মারিহুয়ানা, হাসিস, হিরোইন নিষিদ্ধ, কিন্তু এ দেশে নয়। এ দেশে সব মাদকদ্রব্যই বৈধ। এ দেশে পতিতাবৃত্তিও বৈধ। দয়া করে খুন খারাবিটাকে নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। নয়ত মানবাধিকারের নামে ওটিকেও বৈধ বলে বিবেচিত করত। এ দেশে যে বৈধ জিনিসটি আমার ভালো লাগে তা হল ইউদেনিসিয়া। এটিই ইওরোপের একমাত্র দেশ, যেখানে ইউদেনেসিয়া বা ইচ্ছামৃত্যু বৈধ। মানুষের বাঁচার অধিকার যেমন থাকা দরকার, ঠিক তেমনি মৃত্যুর অধিকারও। অসহ্য যন্ত্রণাময় পঙ্গু প্রতিবন্ধী জীবন নিয়ে যুগের পর যুগ অযথা কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো।

গলিতে গলিতে যা কিছুই দেখছি, ভয় লাগছে আমার। ভয়ে ছোটদার গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটি। ভয়ে হাত শক্ত করে ধরা আছে, আরও শক্ত করে ধরি। ছোটদা বারবার বলে, *ডরাইস না। ডরাস ক্যা।* মদ খাওয়া লোক দেখলে আমার ভয় লাগে। গলি দেখলে ভয় লাগে। অন্ধকার দেখলে লাগে। লাগেই। এ আমি যত বড় সাহসী হিসেবে খ্যাত হই না কেন, ওই ভয় দূর হয় না, হবে না।

ছোটদা পতিতালয়ের কথা বললো, *খুব পুরানা এইটা। ছয়শো বছর ধইরা এই টা আছে। নাবিকেরা নামত, তাই ড্যামের আশেপাশেই গইড়া উঠছে পতিতাপল্লী। আমস্টেল নামের নদীতে বাঁধ বসানো হয়েছে। আর এখানেই গড়ে উঠেছিল বাঁধের কাছেই, মেয়েদের শরীর বেঁচা। নাবিকদের কাছে। সেই থেকে আজও।*

হ্যাঁ তাই। মনে মনে বলি, *সেই থেকে আজও।*

শুধু সাদা মেয়ে নয়, কালো, হলুদ, বাদামীও আছে। যেন গোটা পৃথিবী এই আমস্টারডামের দে ভালেন এলাকা। গোটা পৃথিবীতে এই হচ্ছে। নারীরা ভোগের বস্তু হচ্ছে। বস্তুকে দুনিয়া জুড়ে ভোগ হচ্ছে। আমি দ্রুত ফিরে আসি হোটেলে। ছোটদা বলছিল আরও কিছুক্ষণ থাকতে। না আমার ইচ্ছে করেনি। ইচ্ছে করেনি দেখতে জগতের এই জঘন্য নিষ্ঠুরতা। সারারাত আমার ঘুম হয় না। সারারাত ছটফট করি। আমার ধারনা হয়, বেশির ভাগ মেয়েদের মেয়ে- পাচারকারীরা মিথ্যে কথা বলে ধরে এনেছে অন্য কোনও দেশ থেকে। ঠিক যেভাবে বাংলাদেশের মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে ভারতে পাকিস্তানের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়। আমার ধারনা হয়, মেয়েদেরকে কোনও ফাঁদে ফেলে এই পেশায় নামিয়েছে কোনও চক্র। যতই ঝলমল করুক চারদিক, আমার বিশ্বাস হয় না, কোনও মেয়ে সাধ করে এই পেশায় এসেছে। মেয়েরা যতই হাসি ছুঁড়ে দিক রাস্তার পুরুষের দিকে, ভিতরে তাদের এক বুক কষ্টের কান্না। নীলাভ আলোর নিচে প্রায় উলঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে খদ্দেরের অপেক্ষায় আমস্টারডামের পতিতা --কাচের দোকান, দোকানে বিছানা পাতা পুরুষেরা দরদাম করে বিছানায় যায়, পতিতা শরীর বিক্রি শেষে টাকা গুনে দোকান গুটিয়ে বাড়ি ফেরে। পতিতারা কেউ কালো, কেউ সাদা, আবার বাদামি কেউ। কারো কালো চুল, কারোর সোনালি । এ যেন পতিতা পাড়া নয়, যেন আস্ত একটা পৃথিবী। আর পৃথিবীতে হাট বসেছে নারী মাংসের। লোভে আর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পুরুষের জিভ ঝুলে আছে আমেরিকা ইওরোপে, এশিয়ায়, আফ্রিকায়।

সুইডেনে ফিরে এলাম। ভেবেছিলাম হেঁটে পার হব বিমান বন্দর। না, বিমানের পেট থেকে পুলিশ বাহিনী এভা কার্লসনকে নামিয়ে আনল। চারদিকে ধ্বনিত হতে থাকে প্যাঁ পুঁ। প্যাঁ পুঁ। রাস্তা ক্লিয়ার। পুলিশের হাতে হাতে মোবাইল। চারদিকে খবর জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তসলিমা ফিরেছে। অবজেক্ট ফিরেছে। পুলিশের কানে কানে কানযন্ত্র। তারা শুনতে পাচ্ছে কন্ট্রোল রুম থেকে অর্ডার। ছুটোছুটি। হুড়োহুড়ি। প্যাঁ পুঁ।

*

গাছগুলো সবুজ থেকে হলুদ হচ্ছে, হলুদ থেকে লাল
কং বদলে যাচ্ছে, এরপর পাতা ঝরবে,
ডুবে যাবে সাদা বরফে।
নতলার জানালা থেকে আমি অন্ধকার দেখব,
অন্ধকারে তারার মতো ফুটে থাকবে
জাহাজের, বাড়ির গাড়ির দোকানপাট আর ল্যামপোস্টের আলো।
এরকম আলো তো আমার দেশেও ফোটে, আকাশে!
আমার দেশ?
আমার কি নিজের কোনও দেশ আছে আদৌ? নিজের কোনও শহর বা গ্রাম?
নিজের কোনও ঘর? কোনও শরীর বা হৃদয়?
এই যে এক দেশ থেকে আরেক দেশে ভাসছি,
এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে, এক আকাশ থেকে আরেক আকাশে,
অথবা এক সমুদ্র থেকে আরেক সমুদ্রে
ভাসতে ভাসতে একদিন শেষরাতে অথবা মাঝ দুপুরে কোথায় ভিড়বে আমার জীবন! আমিও হঠাৎ হঠাৎ
দেখি আমার ভেতরে যে এক দঙ্গল সবুজ সবুজগুলো
হলুদ হচ্ছে, হলুদ থেকে লাল, রং বদলে যাচ্ছে, এরপর হু হু শূন্যতা আমাকে কামড়ে ধরবে, ঝরে যাবো,
ডুবে যাবো সাদা কাফনে, তিন হাত গভীর হর্তে
স্ক্যানডিনেভিয়ার শীত আর কতটুকু কামড় বসায় গ্রীস্মের বালিকাকে,
তারও চেয়ে বেশি দাঁত বুঝি আগুনের, যে পোড়ায় ভীষণ একা, একাকী আমাকে।

লিডিঙ্গোতে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেওয়া হয়েছে আমার জন্য। আসবাবপত্রসহ অ্যাপার্টমেন্ট। অস্থায়ী বাসের জন্য আসবাবসহই বাসস্থান প্রয়োজন। আমি তো আর সুইডেনে বাস করতে যাচ্ছি না যে আসবাবহীন অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেব! আমাকে তো ফিরে যেতে হবে দেশে। খালি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে আসবাব কিনবো নাকি বোকার মতো! তখন কী করবো অত সব সংসারের জিনিস! সব আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিতে হবে। সংসার! সংসার তো আমার সেই শান্তিনগরের অ্যাপার্টমেন্টে। ওখানে যাবার জন্য বুকের ভেতরটা জ্বলে। খুব জ্বলে। লিডিঙ্গোতে আসার আগে আট হাজার ক্রোনারের একটা ফোন বিল দিয়েছিল লিলিয়ানা। আমি চমকে গেছি। এত টাকা কী করে হল! হল। বিল মিটিয়ে দিতে হয়েছে লিডিঙ্গোর অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া সাড়ে তিন হাজার। কুর্ট টুখোলস্কির পুরস্কারে যে টাকা পেয়েছি, সেটি দিয়েই আমাকে জীবন যাপন করতে হবে। কবে দেশে ফিরব? সে কথা আমিও যেমন জানি না, এ দেশের সরকার, লেখকগোষ্ঠী কেউই জানে না। টাকা ফুরোতে ফুরোতে যখন পুরো ফুরিয়ে যাবে তখন কী করবো আমি কী খাবো কোথায় থাকবো তা আমি জানি না, আমার বিশ্বাস আর কেউই তা জানে না।

গোথেনবার্গে আমন্ত্রণ। ওখানে বিশাল বইমেলা হয় প্রতিবছর। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বইমেলা। ওই বিখ্যাত বইমেলাটি আমাকে উদ্বোধন করতে হবে। তৈরি হও। তৈরি হও। তৈরি হওয়ার কী আর আছে। দেশ থেকে কিছু যে শাড়ি এনেছিলাম, সেগুলো থেকেই পরব। আর অল্প কদিনের ভ্রমণের জন্য গ্যাবি দুটো হলুদ ব্যাগ দিয়েছিল পত্রিকার নাম লেখা, সেগুলোই সম্বল। আমি এদেশে কেনাকাটা করতে চাই না। খামোকা খরচ করবো কেন! যা কেনার দেশেই কিনব। দেশে যে জিনিসটা দুটাকায় পাওয়া যায়, এখানে সে জিনিস দুহাজার টাকায় কেনার কী অর্থ থাকতে পারে। খুব সহজেই তাই হাত গুটিয়ে রাখি।

পুলিশের গাড়ি করে যাওয়া। পৌঁছে দেখি থমথমে অবস্থা। পুরো বইমেলা বোমা শোঁকার কুকুরে শুঁকছে। নানারকম নিয়ম বসানো হয়েছে। এটা করা যাবে না ওটা করা যাবে না।

আমি কোন করিডরে হাঁটবো, কোথায় বসব, কোথায় দাঁড়াব, কোন হোটেলের কোন রুমে থাকব, সব নির্দিষ্ট করে রাখা, নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত করে রাখা। পত্রিকার প্রথম পাতায় পুলিশ আর বোমার কুকুর বইমেলার বইয়ের স্তূপের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে, এই বিশাল ছবি। দেখে আমি লজ্জায় মাথা নুইয়ে রাখি। এসব সত্যিই আমাকে বিব্রত করে। পুলিশের এই উপদ্রব বইমেলার লোকদের আমার ওপরই বিরক্তি ঘটাবে জানি। তাতে হয়তো কারও কিছু যায় আসে না। যায় আসে শুধু আমার। আমি কারওর বিরক্তির কারণ হতে চাই না।

বইমেলার প্রেসিডেন্ট আমাকে গোথেমবার্গ বইমেলার ইতিহাস বলতে শুরু করলেন। উনিশশ পঁচাশি সালে শুরু করেছিলেন, তখন লোক হয়েছিল পাঁচ হাজার আর এখন প্রায় এক লাখ না হলেও কাছাকাছি। এই প্রথম আমি ইওরোপের কোনও বইমেলায়। বাংলাদেশে ভারতে বইমেলা যা দেখেছি খোলা মাঠে। এখানেও তাই আশা করেছিলাম, কিন্তু দেখি সবই চারদেয়ালের ভিতর, ওপরে ছাদ। বই আছে, লেখক আছে, বই বিক্রি হচ্ছে সবই ঠিক, কিন্তু উৎসব উৎসব মেলা মেলা ব্যাপারটি নেই। হৈ চৈ নেই। ধীরে সুস্থে মানুষ হাঁটছে, এর ওর সঙ্গে স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলছে, কোথাও হঠাৎ জোরে গান গেয়ে ওঠা নেই। যা ইচ্ছে তাই করে ফেলা নেই। এটি ধনী দেশের বইমেলা। এক একটি বই হাতে নিই আর দেখি প্রকাশনা কেমন ভালো। বাঁধাই ছাপা কত চমৎকার। এরা প্রথম শক্ত মলাটের বই বের করে। এরপর বই খুব বিক্রি হলে পকেট বই বের হয়, পকেট-বই আকারে ছোট, শক্ত মলাটের বদলে পাতলা মলাট। দাম অনেক কম। সবাই যে বই কেনে তা নয়। তবে বেশির ভাগ মানুষই কেনে। বইয়ের দাম খুব কম নয়। মানুষ যেহেতু এখানে ধনী, ওই দাম হয়তো খুব একটা বেশি দাম নয় কারও জন্য।

বইমেলার উদ্বোধন করি আমি। আমাকে ফিতে কাটতে হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বসতে হয়। হাজার হাজার মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। যত না কথা বলা, তার চেয়েও বেশি চেহারা দেখানো। চেহারাই লোকে দেখছে। অটোগ্রাফ নিচ্ছে। এখানে আমি লেখক, যে লেখকের বই কেউ পড়েনি। যে লেখকের নাম শুনেছে, ছবি দেখেছে। যে লেখকের প্রতি

মানুষের মায়া আছে, করুণা আছে, কারণ লেখককে তার লেখার জন্য উগ্রপন্থীরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল। এই তো! হাড়ে মজ্জায় বুঝি সে কথা। তাইতো উঠে আসি, তাইতো বেরিয়ে যেতে চাই বইমেলার আঙিনা ছেড়ে। মানুষের ভিড় সরিয়ে। বাইরে। শ্বাস নিতে। হাসি হাসি মুখ করে একদঙ্গল ক্যাচর ম্যাচরের মধ্যে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কী লিখেছিলাম যে মুসলমান মৌলবাদীরা ক্ষেপেছিল, বাংলাদেশে নারীর অবস্থা কেমন, প্রধানমন্ত্রী তো নারী ওখানে তার মানে কি এই নয় যে নারীর অবস্থা বেশ ভালো? দেশে আমার আত্মীয় স্বজনদের ওপর কি কোনও আক্রমণ হচ্ছে? আমি কি ফিরে যেতে পারবো নিজের দেশে কোনওদিন? আমি কি কিছু লিখছি এখন? আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি? বাংলাদেশের নারীদের জন্য এখান থেকে পশ্চিমের মানুষেরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে? কত বার এসবের উত্তর দেওয়া হল। টেলিভিশন, রেডিও, পত্রপত্রিকা, কোথায় নয়! স্টকহোমে এ অবদি ফ্রান্স, জার্মনি, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, জাপান, হল্যান্ড, ইংলেন্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইত্যাদি নানান দেশ থেকে সাংবাদিক এসেছে। থেকেছে গ্রান্ড হোটেলে বা ওই জাতীয় হোটেলে ভাড়া নিয়েছে হোটেলের সভাকক্ষ, সাক্ষাৎকার নিয়েছে আমার, ছবি তুলেছে, ফটোসাংবাদিকরা যখন তোলে ছবি, ক্যামেরার সাটারে আঙুল বসানোই থাকে, সারাক্ষণই ক্লিক ক্লিক চলে। আমি বুঝে পাই না, একটি বা দুটি ছবির জন্য ওরা কয়েক শ ছবি তোলে কেন! জিজ্ঞেসও করেছি, প্রশ্নের উত্তরে ওরা হাসে। মাঝে মাঝে বলে, *খুব ভালো একটি ছবি পেতে গেলে অনেক ছবি তুলতে হয়।* সবাই, সব সাংবাদিকই, সব উৎসাহী জনতা প্রায় একই প্রশ্ন করেছে। এক উত্তর দিতে দিতে আমি ক্লান্ত। কেন, আমি কি লেখক কোনও? কেন এই অদম্য আকর্ষণ আমার জন্য? আমি ভিকটিম বলে তো! তাছাড়া *আর কী!*

নিজের জন্য আমি একটু আড়াল চাই।

হঠাৎ মাইব্রিট উইগকে দেখি। সুইডিশ লেখিকা। প্রথম দেখা হয়েছিল যখন এক পার্টি ডাকা হয়েছিল সুইডেনের লেখকদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পার্টি, নোরস্টেডে, সেদিন।

মাইব্রিট সোনালি চুলের নীল চোখের সাদা মেয়ে। অনেকদিন আমাকে চিঠি লিখেছে বেড়ালের মুখ এঁকে। বলেছে তার বাড়িতে বাস করে সে আর তার ছেলেবন্ধু পের, আর অনেকগুলো বেড়াল। বেড়ালের ব্যাপারটি না থাকলে মাইব্রিটকে সম্ভবত আর সবাইকে যাদের সঙ্গে নতুন আলাপ হয়েছে যেমন ভুলে গেছি, তেমন ভুলে যেতাম। বেড়াল নিয়ে আদিখ্যেতার কারণে তাকে আলাদা করে চিনেছি। কদিন পর পরই খবর নেওয়াও বড় একটি কারণ। মাইব্রিট আমার লিডিঙ্গোর অ্যাপার্টমেন্টেও এসেছে। এই বইমেলায় সে আসবে আগে থেকেই ফোনে জানিয়েছিল। আমার ফোন নম্বর খুব অল্প কজন মানুষ জানে। এও নিরাপত্তার অংশ যে আমার ফোন নম্বর কেউ জানবে না। নিরাপত্তার রক্ষীদের আদেশ মতো চলতে চলতে এমন হয়েছে যে আমারও ভয় ধরে গেছে কাউকে নিজের ফোন নম্বর আর ঠিকানা দিতে। ভয় তো কখনও ছিল না আমার আগে। তবে কি

মাইব্রিটকে পেয়ে আমি ওর হাত চেপে ধরি। হাঁটি পাশাপাশি। এ সময় ওকে আমার সবচেয়ে আপন মানুষ বলে মনে হয়। মাইব্রিট ফিসফিস করে বলে, *ওরে বাবা, দেখেছো সে কী আয়োজন তোমার জন্য। এত পুলিশ দেখে আমার ভয় লাগছে।*

ভয় টয় বাদ দাও তো। চল ঘুরে বেড়াই।

কোথায়?

বাইরে। শহরটা কেমন দেখি। কী কী আছে দেখার।

চল বইমেলাটা দেখি।

ঢের দেখেছি। ভালো লাগে না।

কেন ভালো লাগে না?

সবাই আমাকে দেখে আমি হাঁটলে, বই দেখে না। আমার অস্বস্তি হয়।

বিখ্যাত যখন হয়েছো, তখন তো এসব সইতেই হবে।

সইতেই হবে কেন? না সইলেও তো পারি।

আমার কখন কোথায় যেতে হবে। কী কী কাজ আছে করার, কখন সভা, কখন সাক্ষাৎকার, কখন দুপুরের বা রাতের খাবার, এসব পুলিশের কাছে লেখা আছে। সেসব জায়গায় সময় দেখে পুলিশই আমাকে নিয়ে যায়। আমার নিজের কিছু মনে রাখার, কিছু ভেবে রাখার দরকার হয় না। কাজ বা অকাজের ফাঁকে ফাঁকে আমার অধিকার আছে যেমন ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবার। একটি সান্ত্বনা যে, এই মেলায় আমার কোনও বই নেই, এখনও বেরোয়নি বই। বই হলেই আটকে পড়তাম কাদায়। থাকো। সই করো। হাসো। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াও।

এই বইমেলায় আমার কোনও বই নেই। এখনও বেরোয়নি বই। নরওয়েতেও বেরোয়নি। উইলিয়াম নেইগার এসেছিল স্টাভাঙ্গারে আমার সঙ্গে দেখা করতে, জানাতে যে বই হচ্ছে। বই এর কথা শুনলেই আমি দুঃখ করি। জিজ্ঞেসও করি, *তোমরা কি ছাপার আগে বইটা পড়েছিলে?*

নিশ্চয়ই পড়েছি।

তাহলে কী করে ছাপাচ্ছো বল? কেন ছাপাচ্ছো?

পড়েছি বলেই তো ছাপাবো বলে স্থির করেছি।

এই বইএর নাম যদি পত্রিকায় এত না ছাপা হত, তাহলে নিশ্চয়ই ছাপাতে না।

কী যে বল। না না মোটেও তা নয়। খুব ভালো লেখা।

ভালো লেখা না ছাই।

দেশে থাকাকালীন বিদেশি প্রকাশকদের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ছিল, সত্যি বলতে কী, সেটা অনেকটাই চলে গেছে। আমাকে যদি একটা প্রকাশকও বলত যে দেখি তোমার অন্য বইয়ের পাণ্ডুলিপি দাও, দেখি অথবা তুমি নাকি নারীর অধিকারের কথা লেখো, নারীর অধিকার নিয়ে তোমার কোনও উপন্যাশ বা প্রবন্ধ থাকলে দাও, অথবা তুমি তো কবি, কবিতার বইয়ের একটা পাণ্ডুলিপি দাও তো। তাহলে আমি অন্তত বুঝতে পারতাম, এরা হুজুগে বই ছাপায় না।

আমি বলার পরও এরা চোখ কান নাক সব বন্ধ করে লজ্জা চেয়েছে। লজ্জা পেয়েছে। এরপর ছাপা হওয়ার পর পাঠক লজ্জা পাবে। আমি লজ্জা পাবো। প্রকাশক লজ্জা পাবে। লজ্জা লজ্জা ছাড়া আর কিছু দেবে না কাউকে।

মাইব্রিটকে জিজ্ঞেস করি, *তুমি কোথায় থাকবে রাতে?*

আমার আগের স্বামীর বাড়িতে। যদিও আমাদের তালাক হয়ে গেছে। গোথেনবার্গ এলে আমি তার বাড়িতেই থাকি। আমরা অনেকটা সাদামাটা বন্ধুর মত এখন।

ধুত। তুমি আমার সঙ্গে রাতে থাকো। আমার বড় হোটেল রুম।

মাইব্রিটকে নিয়ে আসি হাত ধরে। গোথেনবার্গের সবচেয়ে দামি হোটেল গথিয়া টাওয়ার্সএর ঘরে অনেক রাত অবদি আমরা গল্প করি। প্রথম দেখা হয় যেদিন আমাদের, মাইব্রিট বলে, যে সে খুব নার্ভাস ছিল, তার হাত থেকে ওয়াইনের গ্লাস পড়ে গিয়ে কার্পেট ভিজিয়ে ফেলে, কাপড় চোপড় তার সব রঙিন করে ফেলে।

কেন, নার্ভাস কেন?

বল কী। তুমি এত বিখ্যাত।

ধুত। বিখ্যাত! এসব কথা আর বোলো না তো!

বিখ্যাত ছিলাম বাংলাদেশে। তার একটি কারণ ছিল। তারা জানতো আমি কি লিখেছি। জেনে তারপর যে শ্রদ্ধা কিংবা ভালবাসা প্রদর্শন করে, তার মূল্য আছে। এমনকী জেনে যে ঘৃণা ছুঁড়ে দেওয়া হয়, সেই ঘৃণারও মূল্য আছে।

আমাকে যত ওপরে তুলছে ওরা, তত আসলে আমাকে হীনমন্যতায় ভোগার জন্য একটি পরিবেশ দিচ্ছে। আমার ভয় লাগে। ক্যামেরা আমাকে ঘিরে ধরে, আমি দ্রুত সরে যাই। ক্যামেরা আমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি তুলে রাখতে চায়। আমি ডানে ফিরলে খবর, আমি বামে কাত হলে খবর। সাংবাদিকরা মৌমাছির মত ছেঁকে ধরে। আমি দ্রুত বেরোতে চাই। অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে। বেরোই। ঘুরে বেড়াই শহর, সমুদ্র। মাছের বাজার। ফুলের

বাজার। রাতে মাইব্রিটকে তুলে নিই তার প্রাক্তন স্বামীর বাড়ি থেকে। চল ঘুরে বেড়াই গোথেনবার্গ। ঘুমোনোর কোনও দরকার নেই। ঘুরি ফিরি।

এখানে কোনও পতিতাপল্লী আছে? জিজ্ঞেস করি মাইব্রিটকে। আমস্টারডামের দৃশ্যগুলো চোখে তো আছেই, মাথাতেও ঘাঁপটি মেরে আছে। রাতের গোথেনবার্গ দেখি। বুট, মিনিস্কার্ট, আর বুক খোলা জামা পরে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার কিনারে। ভীষণ সাজগোজ করা মুখ। গাড়ি ধীরে ধীরে যেতে থাকে যেন দেখতে পাই মেয়েদের। আমস্টারডামের মতো এখানে নীলাভ আলোর দোকান নেই। এখানে ফুটপাতের থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েরা। একসময় মাইব্রিট বলল, *এখানে যাদের দাঁড়িয়ে আছে দেখলে, কেউই কিন্তু মেয়ে নয়।* চমকে উঠলাম। বলে কী! তবে এরা কী? এরা পুরুষ। এরা কেউ ট্রান্সভেস্টাইট, কেউ ট্রান্সসেক্সুয়াল। এরা দাঁড়িয়ে আছে পুরুষের অপেক্ষায়। পুরুষের গাড়ি এসে থামবে ওদের মধ্যে যাকে পছন্দ হবে, তার সামনে। আমাদের দুবার চককর দেওয়া হল জায়গাটি, কোনও গাড়ি দেখলাম না থামছে ওদের সামনে। মাথায় প্রশ্ন কিলবিল করছে। মাইব্রিটকে জিজ্ঞেস করি, *তুমি কী করে বুঝলে এরা ছেলে?*

--বুঝলাম। খুব সোজা।

--বোঝার কারণটি জানতে চাইছি। আমি তো বুঝতে পারছি না।

--কী যে বল, দেখলেই বোঝা যায়।

--আমি তো দেখছিই, বুঝি তো না।

--পাগুলো দেখ ওদের, উরুগুলো দেখ। এমন পেশিবহুল পা মেয়েদের হয় না। হাত দেখ। পেশি কেমন।

--তাহলে বুক!

--সেক্স চেঞ্জ যারা করেছে, তাদের তো স্তন আছেই।

--সেক্স কি সত্যিই চেঞ্জ করা যায়? পুরুষ নারী হতে গেলে, ইউটেরাস নিশ্চয়ই বসিয়ে দিতে পারে না পুরুষের শরীরে? ভ্যাজাইনাই বা বানায় কী দিয়ে?

-- সে আমি জানি না।

--ট্রান্সভেসটাইট ব্যাপারটা কি?

--যারা অপজিট সেক্সের পোশাক পরে, অপজিট সেক্সের মত ব্যাবহার করে। আর ট্রান্সসেক্সুয়াল হল যারা নিজেদের অপজিট সেক্সের বলে মনে করে, আর যারা অপারেশন করে সত্যিই সেক্স বদলেছে।

জগতটি এখনও আমার কাছে ধোঁয়া ধোঁয়া। সুইডেনে পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ। এদেশে হল্যান্ডের মত পতিতালয় নেই। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ রাস্তায় দেখা যায় মেয়েদের, বেশির ভাগই পূর্ব ইওরোপ থেকে আসা মেয়ে। কমিউনিজম ভেঙে পড়ার পর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উধাও হয়েছে, চাকরি চলে গেছে, দারিদ্র এসে কামড় দিচ্ছে, আর সবশেষে পাচারকারী মাফিয়ার দলের খপ্পরে পড়ে আজ মেয়েরা পূব থেকে পশ্চিমে। সেজেগুজে দাঁড়াচ্ছে আধো অন্ধকার রাস্তায়, ভয়ে ভয়ে। পুলিশ দেখলে ধরে নেবে। সুইডেনে শরীর বিক্রি করা বৈধ, শরীর কেনা অবৈধ। গোপনে অবৈধ অকম্ম করে অবৈধ অর্থ উপার্জন চলছে। আর এখন কিশোর কিশোর ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে সমকামী পুরুষের সাধ মেটাতে। পুরুষের আনন্দের জন্যই এই জগত। দরিদ্র নারী পুরুষ উভয়েই ধনী পুরুষের লোভ লালসা কামনা বাসনা মেটাতে বাধ্য হচ্ছে।

--কোথাও কি অসমকামি পুরুষ-প্রসটিটিউট দাঁড়ায়, মেয়েরা যেন দরদাম করে তুলে নিতে পারে?

মাইব্রিট হেসে না বলে।

--না কেন, তোমাদের এই দেশটি তো সমতার দেশ!

ও ঠিক কী বলবে ভেবে পায় না। আমি ওর জায়গায় হলে হয়তো চোখ টিপে বলতাম, *এত খোঁজাখুঁজি কেন, তোমার কি একজন দরকার?*

মাইব্রিট যতক্ষণ থাকে আমার সঙ্গে, আমার ভালো লাগে। ও চলে গেলে আবার একা হয়ে যাই। বইমেলায় দেখা হয় অনেক দেশ থেকে আসা অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে। বিক্রম

শেঠএর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা হয়। মানুষটি যে লম্বায় এত ছোট, তা আমি ছবি দেখে ভাবিনি কখনও। তার সুইটবল বয় বইটি আমার কাছে আছে, কিন্তু পড়া হয়নি। পড়া হয়নি কারণ প্রথম কারণ মোটা বই, অত মোটা বই আমার পড়ার ধৈর্য নেই। দ্বিতীয় ইংরেজি ভাষায় বই পড়তে আমার অনেক সময় লাগে। শব্দ না বুঝলে অভিধান দেখে দেখে শব্দ বের করে অর্থ জেনে নিয়ে পড়ারও ধৈর্য আমার নেই। কিন্তু বাদামি একজনকে দেখে, আমার অঞ্চলের কাউকে দেখে আমার মনে হয় যেন বিক্রম শেঠও আমার আত্মীয় কেউ। সাদার সমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। এ সময় বাদামি আমার জন্য খড়কুটোর মত। কিন্তু তিনি খড়কুটো হতে যাবেন কেন, তিনি বড় লেখক। আরও আরও বড় লেখককে দেখি রাতের খাবারের পার্টিতে। বিশাল পার্টি। প্রচুর টেবিল। প্রচুর চেয়ার। প্রচুর গ্লাস। থালা। অ্যাপারেটিফ, শ্যাম্পেন, ওয়াইন, অ্যাপিটাইজার, ফার্স্ট কোর্স, মেইন কোর্স, ডেসার্ট, কফি। বইমেলার প্রেসিডেন্ট আমাকে বড় বড় লেখকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

--নিশ্চয়ই চেনেন। পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার হয় না, তসলিমা নাসরিন।

সকলেই মাথা নেড়ে হেসে বলেন, *নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।*

--এবারের বইমেলার প্রধান অতিথি তিনি।

অভিনন্দনের হাসি সবার মুখে। প্রধান অতিথি বসেন গণ্যমান্য আরও অতিথির সঙ্গে। অনেক লেখক এসেছেন এই আন্তর্জাতিক বইমেলায়। জার্মানির গুন্টার গ্রাস। গুড্রুন পউজেভাঙ্গ, হাঙ্গেরি থেকে পিটার নাদাস, ইংলেন্ড থেকে টেরি প্র্যাটচেট, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ম্যারিলিন ফ্রেঞ্চ, নরমান মেইলর, রাশিয়া থেকে ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো, তুরস্ক থেকে আজিজ নেসিন, মরককো থেকে ফাতিমা মারনিসি, ক্যানাডা থেকে মাইকেল অনডাটজি, মার্গারেটা অ্যাটউড। আরও অনেক লেখক। কবি। আমি তখন ইয়েভতুশেঙ্কোর কবিতা, গুন্টারগ্রাসের কিছু লেখা ছাড়া আর কারও লেখা পড়িনি। কারও সঙ্গে কারও লেখা নিয়ে কথা বলা আমার হয়ে ওঠে না।

আমার লেখা প্রসঙ্গে বা কী লিখি কেন লিখি সেসব জানলেও আমার বই আমি অনুমান করি কেউ এখনও পড়েনি। সেটি সম্ভবত একধরনের বাঁচোয়া। আমি নিশ্চয়ই এমন কিছু লিখি না যা এই বড়দের পড়ার এবং প্রশংসার যোগ্য! গ্যাবি গ্লেইসম্যান ইওরোপের কাগজগুলোয় আমার লেখা ছাপানোর ব্যবস্থা করছিল, দুটো ছাপা হওয়ার পর সেটি আমি বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমার ভালো লাগেনি যেভাবে সে আমার প্রথম লেখাটির লেজটুকু কেটে বাদ দিয়েছিল। সেন্সর করা কেন হচ্ছে লেখা? সেন্সরশিপের বিরুদ্ধে আমি কথা বলিই। আমার কোনও লেখা কাটতে হলে আমি কাটবো। তুমি কাটার কে?

আমার টেবিলে অনেকেই আসে দেখা করতে। অভিনন্দন জানাতে। সহমর্মিতা প্রকাশ করতে। সমর্থনের কথা বলতে। এগিয়ে যাও, আমরা আছি ধরনের বাক্য বলতে। আমার শক্তি এবং সাহসের জন্য ধন্যবাদ জানাতে। আসেন হান্নান আশরাফি। মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ কোনও না কোনওভাবে আমার সঙ্গে এক ধরনের আত্মীয়তা অনুভব করে বোধহয়। তিনি পাশে বসে বলে গেলেন প্যালেস্টাইনের সমস্যার কথা। ইয়াসির আরাফাতের একসময়ের ঘনিষ্ঠ লোক, এখন আরাফাতকেই বড় সমস্যা মনে করছেন। হান্নান আশরাফি বললেন খ্রিস্টান তিনি, তিনি আরব, তিনি ফিলিস্তিনি। তিনি জীবন দেবেন তাঁর দেশের জন্য। ইজরাইলের অত্যাচার দিন দিন প্রকট ভাবে বাড়ছে। আরাফাত নেতৃত্ব দিতে পারছেন না। নতুন নেতৃত্ব চাই, এ হল আশরাফির বক্তব্য। আশরাফি এমনভাবে কথা বললেন আমার সঙ্গে যেন ওই এলাকার সমস্ত খবরাখবর আমার নখদর্পণে। তিনি নিজে উপদেষ্টা আরাফাতের। উপদেষ্টাই যদি আরাফাতের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না, তখন নিশ্চয়ই অবস্থা খুব সুখের নয়।

আমি যখন একা, নিজের মুখোমুখি, রাত তখন অনেক। কেন নিজের লেখালেখি নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগছি আমি! কেন নিজেকে এত তুচ্ছ তৃণ মনে করছি! আমি যেমনই লিখি, আমার লেখার কারণে পুরো একটি দেশ উন্মাদ হয়ে উঠল, লক্ষ লক্ষ মৌলবাদী ফাঁসি দেবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল এ কী খুব তুচ্ছ জিনিস নাকি! আমি আমার লেখা দিয়ে সত্যিকার আঘাত করতে পেরেছি নারীবিরোধী মানবতাবিরোধী রক্ষণশীল ধর্মশক্তি। এ কি সকলে

পারে! কেবল লেখা দিয়ে এত কিছু! এতটা বিপ্লব! প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমার বিরুদ্ধে নীল নকশা কেটে এখনও এগোচ্ছে। এখনও আমি ব্রাত্য, এখনও ওরা ভীষণ ভীষণ রকম ভয় পায় আমার কলমকে। এ কি সামান্য কিছু! জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তেইশ তলায় আমি! সবচেয়ে উঁচুতে, যেন ওপর থেকে সবকিছু সব দৃশ্য দেখতে পাই! জানালা খুলতেই ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগে। ওই হাওয়াটিই ফুসফুস ভরে নিই। রাতের গোথেনবার্গটিকে বেশ সুন্দর লাগছে। মন ভালো থাকলে অনেক সামান্য কিছুই অসামান্য লাগে দেখতে। মন খারাপ হলে আমি লক্ষ্য করেছি, সামনে দিয়ে হাতি হেঁটে গেলেও চোখে পড়ে না, পেখম তুলে ময়ূর নাচলেও তুচ্ছ করি।

প্রেস থেকে, জনতা থেকে আলগোছে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে, মান সম্মান বাঁচিয়ে গোথেনবার্গ থেকে স্টকহোম ফিরে যাই। যেতে যেতে পথে পুলিশদের সঙ্গেই চমৎকার গল্প হয়। ওরাও আনন্দ করে, রাগ করে। ওদের জীবনেও কত রকম গল্প আছে। মাঝে মাঝে ভুলে যাই ওরা পুলিশ। ওরাই আমার বন্ধু হয়ে ওঠে নির্বাসন জীবনের। দেখেছি অসাধারণ কারও সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। খুব সাধারণ যারা, আটপৌরে জীবন যাদের, তারাই আমার কাছাকাছি চলে আসে দ্রুত। আমার জীবনে কোনও কৃত্রিমতা নেই, লোক দেখানো নেই, ঝলমলে কিছু নেই, ওপরে ওঠার তাগিদ নেই, সিঁড়ি বাওয়া নেই, আছি মাটির সঙ্গে মিশে মাটিতে। ছোট খাটো দুঃখে সুখে। বাইরে থেকে একজনও তা বিশ্বাস করে না। মানুষের ভুল বোঝা বন্ধ করার কোনও উপায় আমার জানা নেই।

যত চাই আলগা হতে, যত চাই দিন গুনে গুনে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরতে। কিন্তু কোথাকার কোন শিকল এসে আমাকে কেবল জড়াতে চাইছে। এখন এমন হয়েছে যে আমার দম ফেলার ফুরসত নেই। দিনে একশটা করে আমন্ত্রণপত্র আসে ফিনল্যান্ড। ইংলেন্ড। ডেনমার্ক। অস্ট্রিয়া। সুইৎজারল্যান্ড। ফ্রান্স। জার্মানি। দ্য নেদারল্যন্ডস। আয়ারল্যান্ড। স্পেন..... । একই দিনে সাতটি দেশে যাবার আমন্ত্রণ। আমন্ত্রণ রক্ষা করা খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার পক্ষে

সম্ভব হয় না। গ্যাবি গ্লেইসম্যানকে আমি বলেছি তার নয়, যেন আমার ঠিকানায় আসে আমার চিঠি। নিরাপত্তার কারণে আমার ঠিকানা ব্যবহার করা যাবে না, সোজা বলে দিল। কিন্তু গ্যাবির ঠিকানায় আমার চিঠি আসুক তা আমি চাই না এ কথা জোর দিয়ে বলার পর অগত্যা গ্যাবি ঠিকানা বদল করে। চিঠি এখন যাবে নরস্টেড প্রকাশনীর ঠিকানায়। নরস্টেডে গেলে আমার চিঠি নিয়ে আসবো, অথবা প্রকাশনীর লোক এসে আমার বাড়িতে হাতে হাতে দিয়ে যাবে।

নরস্টেড বড় প্রকাশক। কিন্তু সুইডেনের সবচেয়ে বড় প্রকাশনীর নাম নরস্টেড নয়, নাম বনিয়ের। বনিয়েরের জমকালো এক পার্টিতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বারবারই গ্যাবি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, আমি যেন কিছুতে ওদের প্রস্তাবে রাজি না হই। বনিয়ের আমার বই বের করতে চাইছে। কিন্তু রাজি না হয়ে আমি যেন নরস্টেডকে দিই আমার বই। নরস্টেডের দায়িত্বে আছে সুয়ান্তে ভেইলর। তার সঙ্গে গ্যাবির সম্পর্ক ভালো। গ্যাবি একদিন আমাকে নিয়ে সুয়ান্তের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাইয়ে এনেছে। বনিয়েরের পার্টিতে সুইডেনের সাহিত্যজগত এসে জমেছিল। সরোবরের ধারে প্রাসাদোপম বাড়িতে সেই আয়োজন। সোনালি চুলের নীল চোখের নারী পুরুষের ভিড়। মেয়েদের পোশাক বেশির ভাগই কালো। কালোই এখানে রাতের অনুষ্ঠানের পোশাক। আমরা রঙিন পোশাকে অভ্যস্ত, কড়া রং ব্যবহার করি। এদের পছন্দ সাদা, কালো, এবং খুব হালকা যে কোনও রং। আমাদের দেশে সাহিত্যজগতে অত ধোপ দুরস্ত পোশাকের প্রচলন নেই। এখানে আছে। এ দেশটি বিদেশ। এখানে সবাই সেজেগুজে, সে ব্যবসায়ী হোক, লেখক হোক, আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে আসে। এখানেও যে দুএকজন বোহেমিয়ান চোখে পড়ে না তা নয়। পড়ে। মাইব্রিট যেমন। মাইব্রিটের পোশাকে চাকচিক্য নেই। সবই কমদামি। সেকেণ্ড দোকান থেকে কেনা। একেবারেই সাধারণ মেয়ে মাইব্রিট। ওর বই বেরিয়েছে বনিয়ের প্রকাশনী থেকে। ট্রিওলজি। প্রথম বইটি বাবার সঙ্গে কন্যার যৌন সম্পর্ক নিয়ে। ও বইটির বিক্রি খুব ভালো ছিল। বহু বছর কিছু আর বেরোচ্ছে না কিন্তু লিখেই যাচ্ছে একটির পর একটি উপন্যাস। মাইব্রিট উইগ

আমার চেয়ে এগারো বছরের বড়। ষাটের দশকের অর্থাৎ হিপির যুগের তরুণী। চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে জীবন কাটিয়েছে। ওই বয়সের মানুষের অভিজ্ঞতায় আছে ষাটের দশকের হিপি জীবনের অবিশ্বাস্য সব কাহিনী। মাইব্রিটের বয়সীরা লক্ষ করেছি বেশির ভাগই একা থাকে, বিয়ে থা করেনি। বড়জোর সহ-বাস করছে এখন কারও সঙ্গে, বাচ্চাকাচ্চার উৎপাত নেই বললেই চলে। মাইব্রিট আমাকে কিছু কিছু বলেছে কী করে পুরো ইওরোপ ঘুরেছে রাস্তায় কেবল বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে চড়ে। এক গাড়ি থেকে আরেক গাড়ি। এক শহর থেকে আরেক শহর। অচেনা মানুষদের চেনা করে নিয়েছে। হিচাইকিংএর চল তখন। পকেটে কোনও পয়সা নেই। হিচাইকাররা ওভাবেই দেশ দেখেছে। দিনভর মদ গাঁজা ড্রাগস। রাতভর যার তার সঙ্গে সেক্স। ওই হিপি যুগের ছেলেমেয়েরা যারা সমাজের নিয়ম কানুন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, ও যুগের ইতি ঘটার পর তাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়নি পুরোনো নিয়ম মেনে চলা, প্রচলিত সংসার কাঠামোয় ফিরে যাওয়া। বনিয়েরের ভিড় থেকে গা বাঁচিয়ে একসময় সরোবরে নেমে যাই। সরোবরের পাড় ধরে হাঁটতে থাকি। আকাশ আমাকে ডাকে।

এখন নরস্টেডের ওপর চাপ। ফোন ফ্যাক্স চিঠি। তসলিমাকে এই দেশে চাই, ওই দেশে চাই। সুয়ান্তে ভেইলর নিজে পারছে না, তার সেক্রেটারি সামলাচ্ছে এসব। এসব তো আছেই, এছাড়া দৈনন্দিন খুচরো জিনিস লেগেই আছে। প্রায় প্রতিদিনই সাক্ষাৎকার নেবার জন্য বা ফটো তোলার জন্য ইওরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে কেউ না কেউ আসছে। টেলিভিশন, ডকুমেন্টারি, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ফটো এজেন্সি, নিউজ এজেন্সি। ধুত বলে পাশ কাটাতে চাইলে সুয়ান্তের অনুরোধ, এদের ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। আমার নিজের যা বক্তব্য,যা আদর্শ, তা আমি প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় প্রচার করতে পারি। আর প্রচার থাকলে বই পড়তে চাইবে পাঠকেরা। বইও বিক্রি হবে। আমার নিশ্চয়ই এমন ভাবনা চিন্তা আছে, যা বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে --তা ছড়িয়ে দেওয়ার এত বড় সুযোগ কেন

আমি নিচ্ছি না! মানুষ এ সুযোগ চেয়েও পায় না, নোবেল পুরস্কার পাওয়া লেখকও পায় না, আর আমি কি না প্রায় ঠেঙিয়ে বিদেয় করছি সাংবাদিকদের! প্রচার মাধ্যম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, একে অবজ্ঞা করে এখনকার জগতে কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমি যদি জনগণের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে চাই। প্রচার মাধ্যম অতি মন্দ এবং একই সঙ্গে অতি ভালো। ভালোর জন্যই আমার দ্বারে মাধ্যমটির মাথা ঠোকা। উন্নাসিক হলে এ আমারই সমূহ ক্ষতি। সুয়ান্তে আমাকে ততক্ষণ বলে, যতক্ষণ অবদি আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি। কার আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া উচিত, কার আমন্ত্রণে নয়, সুয়ান্তেকে বলে দিয়েছি, সে-ই যেন দেখে। তারও তাই মত। সূক্ষ্ম ছিদ্রের চালুনি নিয়েছে হাতে, খুব বেছেই তবেই রাজি হচ্ছে। আমার ঠিকানা এবং ফোন নম্বর কারও জানা চলবে না। সে ক্ষেত্রে নরস্টেডের দায়িত্ব নিতে হয়। আপিসেই একটি ঘর ছেড়ে দেওয়া হয় সাক্ষাৎকারের জন্য। সুয়ান্তে সত্যি বলতে কী, আমার সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করে। সুয়ান্তেরও আছে এক সেক্রেটারি। নরস্টেড প্রকাশনীর বাড়িটি স্টকহোমের পুরোনো শহর গামলাস্তানে। দূর থেকে দেখলে ম্যালারেন নামে যে বিশাল সরোবর আছে শহরের মাঝখানে, তার জলের ওপর মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটি। বাড়ির মাথায় কপারের উঁচু ছাদ। হাত বাড়ালে নাগালে আসে সিটি হল, সেই লাল বাড়িটি, যে বাড়িতে নোবেল পুরস্কারের ব্যাংকোয়েট বসে রাতে। নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় শহরের একটি প্রায় দরজা জানালাহীন গুদামঘরের মতো বিদঘুটে একটি দালানবাড়ির ভিতরে। দালানটি ভিড়বাজারের মধ্যে। কনসার্ট হল। এমনিতে গান বাজনা হয় সারাবছর। আর প্রতিবছর একটি দিনে এখানেই দেওয়া হয় নোবেল পুরস্কার। নোবেল পুরস্কারের দেশে বাস করছি, মাঝে মাঝে ভুলে যাই। নোবেল পুরস্কারকে যত বড় মনে হত আগে, তত এখন আর মনে হয় না।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বইমেলা উদ্বোধন করার জন্য বা প্রধান অতিথি জাতীয় গোছের কিছু হওয়ার জন্য। আমাকে বিশেষ কিছু না জানিয়ে, গ্যাবি

গ্লেইসম্যান গেল সেখানে। মানুষ তো পিলপিল করে আমার গন্ধ পেয়ে এসেছিল। গ্যাবি, অন মাই বিহাফ মঞ্চে উপস্থিত। বলল, তসলিমার খুব অসুখ করেছে, তাই সে আসতে পারলো না। আমার রক্ষাকর্তা হিসেবে ওখানে প্রচার হল তাঁর নাম। তাঁকে সম্মান জানানো হল বিস্তর।

এসব আমার জানার কথা নয়। কিন্তু এই খবর ছাপালো *সুয়েন্সকা ডগব্লাডেট* নামে সুইডেনের পত্রিকা। এই পত্রিকার সাংবাদিক ফ্রাঙ্কফুর্টের অনুষ্ঠানে ছিল, অপেক্ষা করছিল আমার, এবং আমার বদলে গ্যাবি গিয়ে উপস্থিত আর তার বুক ফুলিয়ে দেওয়া বক্তৃতায় সে রীতিমত বিরক্ত হয়ে একটি কলাম লিখলো গ্যাবির সমালোচনা করে।

এই প্রথম রাগ ফুটে বেরোলো কারও ভিতর থেকে। রাগ, কারণ এ দেশে এসেছে এক *আন্তর্জাতিক তারকা, তাকে সব সাংবাদিকদের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে সে। এক গ্যাবি ছাড়া আর গ্যাবির পছন্দের সাংবাদিক ছাড়া আর কেউ যোগাযোগ করতে পারবে না তার সঙ্গে। কেন গো! তসলিমা কি গ্যাবির সম্পত্তি নাকি! গ্যাবি যথাযথই তসলিমাকে মুঠোর মধ্যে রাখার চেষ্টা করছে।* এসব জানার পর আমি গ্যাবিকে ধরেছিলাম,

--*এসব কী হচ্ছে শুনি! তুমি তো জার্মানির আমন্ত্রণের কথা আমাকে বলোনি!*

--*বলেছিলাম তোমার মনে নেই হয়তো। তুমি তো যেতেও পারতে না। তখন তুমি অন্য দেশে ভ্রমণ করছো।*

--*আমার অসুখ হয়েছে এ কথা বলতে গেলে কেন!*

--*বললাম এই কারণে যে তোমার না যাওয়ার একটি তো কারণ থাকতে হবে, অন্য কারণ তো ঠিক ভালো শোনাবে না। তুমি অন্য দেশে চলে গেছো, জার্মানির আমন্ত্রণ তোমার কাছে ততটা গুরুত্ব পায়নি। কী ভাববে ওরা!*

--*তাই বলে তুমি মিথ্যে বলবে?*

না, গ্যাবির সঙ্গে বহুদিন এরপর আমার দেখাও হয়না। কলকাঠি তার হাত থেকে আমি নিজেই নিয়ে নিয়েছি, পুরোটা এখনও না পারলেও বেশির ভাগই। সুয়েনস্কা ডগব্লাদেতের

সেই সাংবাদিক মেয়ে এরপর আমার নাগাল পায়। জিজ্ঞেস করে, গ্যাবি কি তোমাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতো? হ্যাঁ নিশ্চয়ই করতো।

সুইডেনের সাহিত্য জগতে বোমা। কিন্তু বোমা থেকে বাঁচতে হলে একটা কিছু তো গ্যাবিকে করতে হবে। গ্যাবি তা করল। দিকে দিকে জানিয়ে দিতে লাগল, বিশেষ করে যত ইহুদি আছে যে তসলিমা ইহুদি বিরোধী। গ্যাবি খুব ভালো করে জানে যে আমি কোনও ধর্মে বিশ্বাস করি না। আমার কাছে মানুষ হচ্ছে মানুষ। মুসলিম খ্রিস্টান হিন্দু ইহুদি এসব আমার কাছে কোনও পরিচয় নয়। কিন্তু এই বোমার বিরুদ্ধে পাল্টা বোমার জন্য সে পশ্চিমে অ্যান্টিসেমেটিক অর্থাৎ ইহুদিবিরোধী হলে যে তীব্র নিন্দা জোটে, সেই নিন্দাটি সে আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। অর্থাৎ আমি নাৎসিদের মত, হিটলারের মত। বের্নাআঁরিলেভি, জ্যাক দারিদা, হেলেন সিক্সুস, আনতোয়ানেত ফুক, মেরেডিথ ট্যাক্স সকলেই ইহুদি। সকলেই ইহুদি কিন্তু কেউই ধার্মিক নয়। ইহুদি পরিবারে জন্ম কিন্তু নাস্তিক, এই সংখ্যা প্রচুর। পশ্চিমের সমাজে এরাই বেশি দার্শনিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী সাহিত্যিক। এদের অনেকে আমার বন্ধু।

গ্যাবির দুর্নাম কোনও কাজে আসেনি। গ্যাবি পরে বাধ্য হয়েছে পেন ক্লাবের সভাপতির পদে ইস্তফা দিতে।

এর পরের বছর গেছি ফ্রাঙ্কফুর্টে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় আমন্ত্রিত হয়ে। জার্মান লেখক পিটার পিংসলি বই লিখেছেন আমার ওপর, তিনি অনেকদিন আগে থেকেই তাঁর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, বলেছিলাম যাবো। সেদিন গোঁ ধরলাম যাবো না বলে। আমি তখন কথা না রাখা, অন্যের আবেগ আবদারকে তুচ্ছ করা, যা ইচ্ছে তাই করার বেয়াদব মেয়ে। রুখো স্বভাবের মেয়ে। বরং আমার জার্মান ফরাসি প্রকাশক বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ালাম। বাঙালি দুজন প্রকাশকের দেখাও মিললো। তাদের সঙ্গেও বহুকাল পর দেখা হয়ে আমি স্বর্গ হাতে পেলাম। পশ্চিমি লেখক দার্শনিকদের সঙ্গে মঞ্চে যে

আলোচনার অনুষ্ঠানগুলো না করলেই নয়, সেগুলোই করলাম শুধু। যা পাই যা পাচ্ছি, তার প্রতি আকর্ষণ ফুরোয়। যা পাচ্ছি না, যার দেখা নেই, সব ঠেলে ঠুলে তার দিকে দৌড়োই।

অনেক কবি লেখক সাহিত্যিকদের সঙ্গে কথা বলেছি, আড্ডা দিয়েছি। দিয়ে দেখেছি, কিছু কিছু জিনিস বাঙালির সঙ্গে মেলে কিছু মেলে না। আড্ডার বিষঙবস্তু বাংলাদেশের বাঙালিদের মধ্যে রাজনীতির পরিমাণ বেশি, এতটা পশ্চিমে নয়। পশ্চিমে যখন দার্শনিক সাহিত্যিকদের আড্ডা হয়, তখন সেটা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়কই হয়। হিংসে দ্বেষ, ও কিছু জানে না ইত্যাদি একইরকম এখানেও আছে। কেউ প্রকাশ করে, কেউ লুকিয়ে রাখে। তবে একটা বড় তফাৎ পশ্চিমে আছে, এখানে প্রায় সকলে প্রচার চায়, এবং তারা বলতে লজ্জা বোধ করে না যে তারা প্রচার চায়। তারা বই খুব বিক্রি হোক চায়, বই বিক্রি হওয়ার টাকা তারা চায়, তারা যে চায় তা বলতে কোনও দ্বিধা নেই তাদের। তারা বই লেখাকে পেশা বলে মনে করে। আদর্শ এখানেও আছে, নিজের বিশ্বাসের কথাই সবাই লেখে। কিন্তু একই সঙ্গে বই বিক্রির সবরকম চেষ্টা করে। বই সামনে নিয়ে বইমেলায় বড় বড় লেখকরাও বসে থাকে। বই এর প্রচার নিজেরাই করে। এমনকী মানুষকে ডেকে ডেকে নিজের বই সম্পর্কে বলে যেন তারা তার বই কেনে। বইকে তারা পণ্য বলে মনে করে। এবং চায় বেশি মানুষ সেই পণ্যের ক্রেতা হোক। যেটা বাংলার লেখকরা মনে মনে কামনা করলেও মুখে প্রকাশ করে না। এখনও বইকে স্থূল পণ্যের কাতারে ফেলতে তারা চায় না। এখনও আদর্শ হিসেবে নির্লোভের খ্যাতি পেতে চায়। নির্লোভ হলে, ত্যাগী হলে, পশ্চিমের অনেক অঞ্চলেই মূর্খ বলে পরিচিত হয়, অথবা তাদের বলা হয়, নন প্রফেশনাল। নন প্রফেশনাল ব্যাপারটিকে এখানে ভালো চোখে দেখা হয় না। নন প্রফেশানাল মানে হচ্ছে নট সিনসেয়ার। বোহেমিয়ান। উদাসিন। তোমাকে বিশ্বাস করা যায় না। তোমাকে যদি ডেডলাইন দিই, তুমি সেটা রাখবে না, অগ্রিম রয়েলটি নিয়ে হাওয়া হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে প্রফেশানালি কোনও কথাবার্তা চলতে পারেনা। তোমার সঙ্গে কাজ করে তৃপ্তি নেই। তুমি কথা রাখো না। তুমি ভালো লেখো, ভালো লিখলেই তো বিশ্ব জয় হয় না। লক্ষ কোটি লোক লিখলে দেখা যাবে ভালো লিখছে।

আমাদের সময় নেই তোমার পিছনে লেগে থাকার। হয় প্রফেশানাল হও, বোঝো যে এটি বাণিজ্য, তুমিও টাকা পাবে, আমরাও টাকা পাবো। দুদলকে দুদলের ভালোর জন্য কাজ করতে হবে। তুমি আমাকে ভালো কাজ না দিলে, আমিও তোমাকে ভাল কাজ দেব না। তুমি আমাকে ভোগাতে চাইলে আমি নিজেকে না ভুগতে দিয়ে অন্য পথ দেখবো। ভালো কাজ, ভালো কাজের পুরস্কার, প্রচার, খ্যাতি, যশ, প্রতিপত্তি,   --- এসবের জন্য পরিশ্রম করাটাকে এবং এসব প্রাপ্তিকে পশ্চিমে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ত্যাগি আদর্শ অনেকটা ম্যাসোকিজমের মতো। আরাম আয়াস থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা, নিজেকে কষ্ট দেওয়া। ম্যাসোকিজমকে এ পারে মানসিক রোগ বলে ধরা হয়।

*

আমিও ঢেকে যাচ্ছি সাদা বরফে
ঘাসের মতো গাছপালার মতো, বাড়িঘরের মতো,
আমাকে উদ্ধার করো তুমি, উষ্ণতা।
আমিও ঢেকে যাচ্ছি নীল অন্ধকারে
পাখির মতো আকাশের মতো সমুদ্রের মতো,
আমাকে উদ্ধার করো তুমি, আলো।
আমার হৃদয়ই আমাকে উদ্ধার করে, শরীর-ভরা তার আগুন।

প্রাগের সবচেয়ে বড় হোটেলে আয়োজন। আন্তর্জাতিক পেন ক্লাবের পক্ষ থেকে লেখক সম্মেলন। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে লেখক এসেছেন। চেকোস্লোভাকিয়া বলতে অভ্যস্ত আমি। চেক রিপাবলিক নতুন নাম। স্লোভাকিয়া আলাদা হয়ে গিয়েছে। ভাকলভ হাবেল

চেকোস্লোভাকিয়ার শেষ প্রেসিডেন্ট আর চেক রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট। ভাকলভ হাবেল নিজে একজন নাট্যকার। তিনিই এই সম্মেলনের উদ্বোধক। সম্মেলনে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় মেরেডিথ ট্যাক্স-এর। যে মেরেডিথ ট্যাক্স আমাকে বিপদে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক পেন সংগঠন থেকে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে গেছে। যে চেষ্টাটি একসময় সে আরও পেন সংগঠনকে বলেছিল করতে, আরও অনেক পেন এর মধ্যে ছিল সুইডেনের পেন সংগঠন। মেরেডিথ পরিচয় করিয়ে দেয় আরও অনেক লেখকের সঙ্গে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পেন সংগঠনের অনেকে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তারা আমার পক্ষে আন্দোলন করেছিল। সমর্থনের চিঠিপত্র লেখা, লেখক সাহিত্যিকদের সই সংগ্রহ করা, বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী, এবং প্রেসিডিন্টের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া সইসম্বলিত আবেদন। তসলিমার বইএর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিনি। তাকে বিপদ থেকে বাঁচান। যারা ফতোয়া দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু একটা করুন। তসলিমাকে হত্যা করার দাবি করছে মৌলবাদীরা, তসলিমাকে নিরাপত্তা দিন। যদি না দিতে পারেন, তাকে নিরাপদে দেশ ছাড়ার অনুমতি দিন।

আমার চারদিকে ভিড়। দেশ বিদেশের কবি লেখক সাংবাদিক। হঠাৎ একসময় লক্ষ করি ভিড় অন্যদিকে জড়ো হচ্ছে। কী কারণ। শুনি, আর্থার মিলার ওখানে। টিভিতে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। আর সবাই দেখছে দূর থেকে। গুন্টার গ্রাসও এসেছেন। তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হয় আমার। আমি যখন দেশে, কেবল ভিন্ন মত থাকার কারণে অত্যাচারিত হচ্ছি, সে সময় গুন্টার গ্রাস আমার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম। তিনি জানতে চাইলেন দেশের অবস্থার কথা, রাজনীতির কথা, দেশের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে আমার সমর্থন পাওয়া না পাওয়ার কথা। পেয়েছি বলেছি। গুন্টার গ্রাস ঠিক মানলেন না আমার এই *পেয়েছি* কথাটি। তাঁর বিশ্বাস, পেলে আমি আজ দেশেই থাকতে পারতাম, দেশ থেকে নির্বাসনে আসতে হত না।

এখানেও হানস। জার্মান এক সাংবাদিক, থাকেন অসলোতে, সঙ্গে একজন ক্যামেরাম্যানের কাঁধে বিশাল এক ক্যামেরা নিয়ে হাজির হয়েছেন এখানেও, এই প্রাগেও। তথ্যচিত্র করছেন তিনি আমার ওপর। গ্যাবির সঙ্গে ভাব করে সুইডেনেই প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। খুব হাসিখুশি দিলখোলা লোক। কারও সঙ্গে সামান্য আলাপ হবার পর এমন ভাব দেখাবেন যেন তিনি জন্ম থেকে চেনেন তাকে। জার্মানিতে জন্মে, নরওয়ের মত ঠান্ডা দেশে থেকে তার ঠান্ডা মেরে যাওয়ার কথা, কিন্তু হৈ চৈ হুল্লোড়ে তিনি রীতিমত গরম। প্রাগে তাঁকে আমি মোটেও সময় দিতে চাইনি। আমি হাঁটব চলব, পিছন পিছন সামনে সামনে সারাক্ষণ একটি বিশাল ক্যামেরা থাকবে, এ বড় অস্বস্তিকর। নিজেকে শিম্পাজির মত লাগে। অন্যান্যরা মানুষের মতো ঘুরছে ফিরছে, কেবল আমিই পারি না। হানসকে তাই চুড়ান্ত এড়িয়ে চলি। হানস শেষ অবদি কিছুক্ষণ প্রাগের বিখ্যাত চার্লস সেতুতে হাঁটছি ছবি তুলে, ভাকলভ হাবেলের সঙ্গে কথা বলছি তুলে নিয়ে ফিরে গেল। শুধু হানস নয়, ফ্রান্স থেকে জার্মনি থেকে সাংবাদিকরা আমার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য উড়ে এসেছে। ফ্রান্সের দ্য নোবেল অবজারভেতর পাঠিয়েছে তুখোড় এক মেয়েকে, এলিজাবেথকে। আমি প্রশ্ন করি, *এত টাকা খরচ করে এত দূর থেকে এসেছো শুধু এক ঘন্টার এই সাক্ষাৎটির জন্য।*

এলিজাবেথ বলল, *হ্যাঁ।*

--কেন?

--কেন মানে? এলিজাবেথের চোখ গোল।

--এ তো মোটেও জরুরি কিছু নয়।

--বল কী! তোমার মত সাহসী এবং সৎ লেখক এই বিশ্বের সাহিত্যজগতে খুব বেশি নেই তসলিমা। তুমি জানো না তুমি কী।

--ধুত।

--এত বিনয় করার কিছু নেই। তুমি খুব সাংঘাতিক কাজ করেছো। হাজার হাজার মেরুদণ্ডহীন লেখকদের ভিড়ে তোমাকে তাই আলাদা করে চেনা যায়।

--এসব বলো না। আমি খুব সামান্য মানুষ। কত কত মানুষ কত কত ভাবে সাহসের কাজ করছে। আমি যা করেছি আমার মনে হয় না খুব সাহসের কাজ। যা করা উচিত ছিল, তাই করেছি।

--উচিত কাজই বা কজন করে সংসারে!

-- না না এসব বলো না। আমি বিনয় করছি না, সত্যি কথা বলছি, আমি এমন কিছুই করিনি।

বলি বটে, এলিজাবেথ আমার কথা কিছুতেই মেনে নেয় না। সে ঘন্টাখানিক আমার সঙ্গে কথা বলে ফিরে যায় ফ্রান্সে।

কংগ্রেস চলছে। যার যার রিপোর্ট পেশ করছে পিইএন নামের পেন ক্লাব। আন্তর্জাতিক পেন। বিশ্বের লেখক সংগঠন। অ্যা ওয়ার্ল্ড অব পিইএন পি ফর পোয়েট, ই ফর এসেইস্ট, এন ফর নোভেলিস্ট। মেরেডিথের রিপোর্ট পুরোটাই আমাকে নিয়ে। সে কী করে আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করার পদ্ধতিতে লিপ্ত ছিল এবং সফল হয়েছে। মেরেডিথের প্রচুর নথিপত্র। কংগ্রেসে সামান্যক্ষণ উপস্থিত থেকে চলে যাই বাইরে। আমি এখানে অতিথি, কোথাও কোনও আনুষ্ঠানিক আলোচনায় উপস্থিত থাকা আমার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। বক্তৃতা এবং সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থেকে বাকি সময় আমি আড্ডায়, আলোচনায়। চারদিকে নতুন সব মানুষ। কৌতূহল উঁকি দিচ্ছে বারবার। এ অনুভূতির অনুবাদ জানি না, সকালে জলখাবারের টেবিলে আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ঘানা, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাষ্ট্রের লেখকদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে। দুপুরে আর রাতের খাবারের টেবিলেও তাই ঘটছে। ফিলিপিনের লেখিকা নিনচকা রসকা, মেক্সিকোর লুসিনা ক্যাথমান, নেপালের গ্রেটা রানার সঙ্গে গল্প হচ্ছে। উনিশশ চুরানব্বই সালের অক্টোবর নভেম্বর। ইমেইল ইন্টারনেট তখন খুব কম মানুষই ব্যবহার করে। ওসবে হাতেখড়ি ঘটছে আমার। গ্রেটা রানা ইংরেজ, কিন্তু নেপালের রাজপরিবারের কাউকে বিয়ে করে এখন নেপাল পেন প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি উপন্যাস দিয়ে দিয়েছে ইন্টারনেটে, যার খুশি সে পড়বে। বই হিসেবে

বের করার ইচ্ছে তার নেই। দক্ষিন এশিয়া থেকে নেপাল লেখকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে গ্রেটা। আরেকজন করছে। আমি আকাশ থেকে পড়ি তাকে দেখে। তিনি সৈয়দ আলী আহসান। দাড়িঅলা ছোটখাটো লোক। ঢাকা থেকে প্রাগে এসেছেন বাংলাদেশ পেন থেকে। বাংলাদেশে যে পেন নামের কোনও সংগঠন আছে, তা দেশে এতকাল সাহিত্য জগতে থেকে কোনওদিন জানিনি। সৈয়দ আলী আহসান নামী মৌলবাদী সাহিত্যিক। আমি হাসবো না কাঁদবো বুঝে পাই না। মেরেডিথকে বলি, *তোমাদের এই পেন সংগঠনে এমন লোককে এনেছো যারা বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। এই সৈয়দ আহসান আলী আমার বিরুদ্ধে অনেকবারই বলেছেন, বলেছেন ইসলাম সম্পর্কে কোনও কুমন্তব্য করার অধিকার আমার নেই। এবং আমার বিরুদ্ধে মামলা হওয়াটা যুক্তিসঙ্গত, এবং আমার ফাঁসির দাবি যারা করছে, তারা কোনও অন্যায় কাজ করছে না।* মেরেডিথ খবরটি জানিয়ে দেয় উঁচু তলায়। সে নিজেও উত্তেজিত। আমার সোজা কথা, *আরও লেখক আছে বাংলাদেশ, যারা মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, বাংলাদেশ পেন সংগঠনের দায়িত্ব তাদের নিতে বলো।* কিন্তু আন্তর্জাতিক এই সংগঠনটি এমন, যে, অন্য দেশে গিয়ে খবরদারি করতে পারবে না, কে সদস্য হবে কে না হবে। এই সম্মেলনে সকলে গাঁটের পয়সা খরচ করেই আসে। এশিয়া আফ্রিকার কিছু গরিব দেশের লেখককে টিকিটের টাকা পাঠানো হয় শুধু। কারণ দেখতে ভালো লাগে কটা কালো বাদামি লোক থাকলে, বুক ফুলিযে আন্তর্জাতিক শব্দটি তখন ব্যবহার করা যায়। এখানে আমি কোনও দেশের প্রতিনিধিত্ব করছি না। কারণ আমার কোনও দেশ নেই। আমি বাংলাদেশের পেন ক্লাবের সদস্য নই। বাংলাদেশে থাকাকালীন আমাকে পাঠানো হয়েছিল ইংলিশ পেন ক্লাবের সাম্মনিক সদস্য কার্ড। আমাকে পেন ক্লাব কানাডা শাখার সাম্মানিক সদস্য করা হয়েছে। করা হয়েছে সুইস জার্মান পেন ক্লাবের সদস্য। কিন্তু ওসব কোনও দেশের প্রতিনিধিত্বও আমি করছি না। এই সম্মেলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, আমি একজন লেখক, সে হিসেবে। কোনও গন্ডির মধ্যে আমার ফেলা হয়নি। দেশসমাজগোত্র ইত্যাদি পরিচয়ের উর্ধে আমি।

বাইরে ঘুরতে যাবো এ প্রস্তাবটি দিলে সবার আগে লাফিয়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াল্টার মোসলি। ওয়াল্টার মোসলির প্রথম উপন্যাস *ডেভিল ইন এ ব্লু ড্রেস* বেরিয়েছে নব্বই সালে, ছবি হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে। কিন্তু তারপরও তত নাম হয়নি, নাম হয়েছে যখন বিল ক্লিনটন বললেন তাঁর প্রিয় রহস্য উপন্যাস লেখকদের মধ্যে আছেন ওয়াল্টার মোসলি। ওয়াল্টারকে নিয়ে বেরোই। ছোট ছোট জিনিস কিনি, ছোট ছোট স্যুভেনির, চেকোস্লোভাকিয়ার একেবারেই নিজস্ব। একটি চকলেট রঙের হ্যাট কিনি। জীবনের প্রথম হ্যাট। ওয়াল্টার খুব দাম দিয়ে গারলেন্ডের মালা কেনে। সম্ভবত তার প্রেমিকার জন্য। আমার তো উপহার দেবার বাতিক। উপহার থেকে একটি তাকে দিয়ে দিই। চমকে ওঠে ওয়াল্টার। *না না আমাকে দিচ্ছ কেন!* দিচ্ছি এ পূবের সংস্কৃতি কিছুটা, কিছুটা আমার। ওয়াল্টার মোসলিকে সব সাদা মানুষের মধ্য থেকে চোখে পড়ার কারণ ওর রং বাদামি, আমার মত। বাদামি মানুষদের নিজের অজান্তেই কাছের মানুষ বলে আমার মনে হয়। ওয়াল্টারের বাবা কালো ক্যারিবিয়ান, মা সাদা ইহুদি। একটি অঞ্চলের নাম, আরেকটি ধর্মের নাম। ইহুদির বেলায় জাত ধর্ম অঞ্চল সংস্কৃতি সব একটি শব্দেই বোঝাতে হয়। চার্লস সেতুতে আমি আর ওয়াল্টার হেঁটে বেড়াই। বিখ্যাত ঘড়ির ঘন্টাধ্বনি শুনি। ইওরোপের অনেক দেশেই এরকম আছে। শহরের মাঝখানে প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে একটি বিশাল ঘড়ি থেকে প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় বেরিয়ে আসবে পাখি, বা নানা রকম পুতুল এবং পুতুলের গল্প। এই দেখার জন্য ঘড়ির কাঁটা ঘন্টার ঘর ছোঁবার আগে কিছু লোক দাঁড়ায় এসে সামনে।

পশ্চিম ইওরোপ দেখা চোখ আমার। কখনও সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখিনি আগে। চেক রিপাবলিক এখন আর সমাজতান্ত্রিক দেশ নয়। কিন্তু খুব বেশি দিন হয়নি এ দেশ থেকে সমাজতন্ত্র দূর হয়েছে। তার অন্তত গন্ধটা তো পাওয়া যায়। পশ্চিম এবং পূবের পার্থক্য প্রকট, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। দারিদ্রের চিহ্ন আছে। শহরের পাঁচতারা হোটেল অ্যাট্রিয়ামে তা বোঝার কোনও উপায় নেই। বেরিয়ে পড়তে হয়। বেরিয়ে পড়ার আমার আরও কারণও আছে। পুলিশরা ওই কয়েকশ লেখকের মধ্যে অ্যাট্রিয়াম হোটেলে রাইফেল নিয়ে,

হাতে বোমার ব্রিফকেস নিয়ে পিছন পিছন চলার দৃশ্যটি আমি চাই না কেউ দেখুক। আমার ওই উদ্ভট নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে আমি কারও সঙ্গে মন খুলে মিশতেও পারছি না। মেরেডিথকে বলেছি, *দেখ এসব সার্কাস বন্ধ করার ব্যবস্থা কর।* না, চেক পেনকে বলেও এসব বন্ধ করার ব্যবস্থা করা যায় না। চেক পেন বলে দিয়েছে এসব সরকার থেকে করা হয়েছে। সরকার এই নিরাপত্তার কোনও নড়চড় করবে না। সারাক্ষণ গায়ে গায়ে লাগা রূপবান সব পুরুষ, কেউ লেখক নয়, কবি নয়, সবই পুলিশ। রাতে পাশের ঘরে তাদের বসে থাকার ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে মনে হয় অহেতুক ওখানে বসে না থেকে কোনও সুপুরুষ আমার ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে প্রেম করলেই পারে, তাতে সত্যিই কিছু একটা কাজ হবে। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া সুদর্শন সব পুরুষ দেখে আমার যে ইচ্ছে করে না ছুঁয়ে দেখি, শুয়ে দেখি, তা নয়। ইচ্ছে করে। প্রচণ্ডই করে।

এখানে মানুষ তেমন ইংরেজি জানে না। পুলিশদের মধ্যে যে ইংরেজি জানে তার সঙ্গে কথা হয়। *কোন জায়গায় গেলে ভালো হবে বল তো! আশে পাশের কোথাও আমাকে নিয়ে চল।* যেই কথা সেই কাজ। পুলিশ বাহিনী আমাকে মহাসমারোহে নিয়ে চললো। প্রথমে শহর, শহরের নানা অঞ্চলে নেমে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালাম। শহরে ট্রাম চলে। পুরোনো দালানকোঠার স্থাপত্য অসাধারণ। মুগ্ধতা কাটে না চোখের। পুলিশেরা মহাউৎসাহে আমাকে বেশ কয়েক মাইল দূরে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে   কারলোভি ভেরি নামের একটি ছোট্ট শহরে নিয়ে যায়। কারলোভি ভেরি পার হলেই জার্মানি। কারলোভি ভেরি   স্পার জন্য বিখ্যাত। দিকে দিকে জলের কল। এই কলের জল খেলে পেটের অসুখ সারে, ওটা খেলে মাথার অসুখ সারে। জলের চিকিৎসা। লোকে জল ভরে নিচ্ছে নিজেদের পাত্রে। প্রচুর লোক দেশ বিদেশ থেকে কারলোভি ভেরি নামের ছোট্ট শহরটিতে আসে। শহরটির জার্মান নাম কার্লসবাড। তেরোশ আটান্ন সালে শিকার করতে এসে বোহেমিয়া অঞ্চলের রাজা কার্ল পঞ্চম এখানে একটি ঝর্নার দেখা পান। উনবিংশ শতাব্দিতে রাজরাজরারা এখানে চিকিৎসার জন্য আসা শুরু করেন। এসেছেন গোয়েটে, শিলার, বেটোফেন, শপা, কার্ল মার্কস।   অসুখ বিসুখ হলে এ শহরে

এসে চিকিৎসা করতে পুরো ইওরোপ থেকে লোক আসে। ষাটটি ঝর্না, এর মধ্যে বারোটির জল দিয়ে চিকিৎসা হয়। আমি অবিশ্বাস্য চোখে জলের বাণিজ্য দেখি। শত শত মানুষের আনাগোনা। আশ্চয! কী করে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত মানুষ এখানকার জল খেলে, জলে স্নান করলে অসুখ সারে বলে বিশ্বাস করে! বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে যে রকম কুসংস্কার, এখানেও তো তেমন। কেবল মানুষগুলোর রং ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, অর্থনৈতিক অবস্থা ভিন্ন। চোখ বুজলেই সব একাকার হয়ে যায়। অজ্ঞতা আর মূর্খতা দেশ কাল পাত্রভেদে এক। একাকার। কারলোভি ভেরি থেকে প্রাগ যাওয়ার পথে দেখি দারিদ্র। চুন সুড়কি ঝুরঝুর করে ঝরছে বাড়িঘর থেকে। রং হীন। ছাল চামড়া হীন। শ্রীহীন। সমাজতন্ত্র তবে কি অমন বিবর্ণ করে রেখেছিল ভিতরটা ! আমি আঁতকে উঠি। অ্যাট্রিয়াম হোটেলে রাতে প্রচুর স্বল্প পোশাকে সাজগোজ করা তরুণির দল দেখা যায় লাউঞ্জে বা বারে বসে আছে। ভেবেছিলাম প্রাগের মেয়েরা দেখতে বেশ। লেখকদের মধ্যে থেকে আমাকে জানালেন একজন, *ওরা প্রসটিটিউট।* শুনে আঁতকে উঠি। হ্যাঁ এই তবে হয়েছে। সমাজতন্ত্রকে সরিয়ে বেশ্যাতন্ত্র ঢুকেছে পূর্ব ইওরোপে। একজন কানে কানে বললো, *কে বললো কমিউনিস্ট আমলে বেশ্যাবৃত্তি ছিল না? খুব ছিল।*

--*খেতে পরতে পারতো মানুষ।*

--*খাওয়া পরাই কি জীবনের সব? সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই?*

--*কিসের?*

--*যা ইচ্ছে তার?*

যে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র বিদেয় হয়েছে এ দেশ থেকে, সে বিপ্লবের নাম মখমল বিপ্লব। উনিশশ উননব্বই সালের নভেম্বরে। নভেম্বরের ন তারিখে দুই জার্মানির মাঝখানের বার্লিন দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। এখানেও লক্ষ লোকের মিছিল হয়েছে। নভেম্বরের আঠাশ তারিখে কমিউনিস্ট ঘোষণা দিয়ে গদি ছেড়ে দিল। কোনও খুনোখুনির দরকার হয়নি।

পুরোনো প্রাগ নতুন প্রাগ দু শহরে ঘুরে বেড়াই। কেবল পর্যটক যা দেখতে আসে, তা নয়। সাধারণ পথচারি, পাড়ার ছোট দোকান, মোড়ের ক্যাফের ব্যস্ততা, বাস ট্রামে মানুষের বসে থাকার ভঙ্গি, পোশাক আশাক, কথা বলা, চোখ, বাড়ির জানালা, ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ, ফুলগাছ। গির্জার দিকে যাচ্ছে একপাল মানুষ। গির্জা থেকে বেরোচ্ছে। চোখে মুখ কৃত্রিম উল্লাস। দেখি সব। গোগ্রাসে। দেখি জীর্ণ বাড়িঘর, দেখি প্রাসাদ। পৃথিবীর প্রাচীততম প্রাসাদগুলোর মধ্যে প্রাগের প্রাসাদটিই সবচেয়ে বড়। নবম শতাব্দিতে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। পনেরো শতাব্দির পাউডার টাউয়ার। কয়েকটি গির্জাও দেখা হয়। একসময় সব মন্দির মসজিদ গির্জা দেখার বিরোধী ছিলাম আমি। কিন্তু কেবল স্থাপত্যশিল্প দেখব বলেই দেখি। বিভিন্ন শতকে তৈরি করা গির্জার ভিতর বাহিরের স্থাপত্য আমাকে কেবল শিল্পই দেখায় না, ইতিহাসও শেখায়। প্রাগের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পুলিশ সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করি,

কোন সময়টা ভালো ছিল, কমিউনিজমের সময়, নাকি এখন?

একজন বলল, *এই সময়টা।*

আরেকজনকে অনুবাদ করে দেওয়ার পর মাথা নাড়ল, *নিশ্চয়ই এই সময়।*

কেন? আগের সময়টা খারাপ ছিল কেন? আমার প্রশ্ন।

তখন আমাদের স্বাধীনতা ছিল না। প্রায় একযোগে উত্তর।

কিসের স্বাধীনতা ছিল না?

দেশের বাইরে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল না।

এখন কি দেশের বাইরে যাও?

মানে?

এখন তো কমিউনিজম নেই। এখন তো দেশের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে, তাই না?

হ্যাঁ তা আছে।

যাও কি? দেশের বাইরে কি যাও? বেড়াতে যাও?

না! মাথা নাড়ল পাঁচজন পুলিশ। যায় না কেউ দেশের বাইরে বেড়াতে।

কেন? আমার প্রশ্ন।

এক এক করে প্রত্যেকে বললো, কেউ যায় না, কারণ, বেড়াতে যাবার মতো টাকা তাদের কারওরই নেই।

*

পরবাস তার সস্নেহ বরফে ঢেকে রাখে আমার ঘামাচির পিঠ
তবু এক বেয়াদপ বাঙালি বেরিয়ে আসে
মাথা ফুঁড়ে, যেন থই থই আগুন সাদা মাঠে ..

পানি এখানে ফুটিয়ে খেতে হয় না, মশা মাছি ইঁদুর বা তেলাপোকা দেখতে হলে পোকামাকড়ের যাদুঘরে যেতে হয়। সুইচ টিপলে কাপড় চোপড় ধুয়ে শুকিয়ে বেরিয়ে আসে। তবু বাড়ির জন্য মন কেমন করে আমার। বোতাম টিপে টাকা চাইলে রাস্তার ব্যাংক থেকে সুড়সুড় নোট বেরিয়ে আসে। জন্মের, চরিত্রের নাড়িনক্ষত্রও পলকে দেখে নেওয়া যায়। দোকানিও বসিয়ে রাখে না, যন্ত্রই পণ্যের গা থেকে দাম পড়ে বলে দেয়, কত। দোকানের, হাসপাতালের অফিস আদালতের বাসের ট্রেনের দরজা আপনাতেই খুলে যায় হেঁটে গেলে, আপেল বা কমলালেবু পিষে রস করবার দরকার হয় না। প্যাকেটেই রস থাকে, প্যাকেটেই রান্না থাকে মাছ মাংস, প্যাকেটেই সেদ্ধ থাকে সবজি। তবু বাড়ির জন্য মন কেমন করে। রাত বিরেতে রাস্তায় একা বেরোলে কেউ এসে গলার চেইন খুলে নেয় না, ছুরি দেখিয়ে টাকা চায় না, মেয়ে দেখলে এক দঙ্গল ছোকরা লাগেনা পেছনে। শিস বা টিটকিরি কিছু না। যখন খুশি ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে পারি, বাতাসের উল্টোদিকে দক্ষিণে উত্তরে পুবে পশ্চিমে দৌড়োতে পারি। প্রেমিকের কোমর জড়িয়ে হাঁটতে পারি, চুমু খেতে পারি গাঢ়। তবু দেশের জন্য মন কেমন করে আমার।

এদিকে মালিন তোবো নামের এক মেয়েকে আমার সেক্রেটারি করে পাঠিয়েছে নরস্টেড। কারণ আমার নিজের পক্ষে এত সব আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ সামলানো মুশকিল। এর

মধ্যেই কয়েকটি ভালো আমন্ত্রণপত্র কোথায় ফেলে রেখেছিলাম। টিকিটও পাঠিয়েছিল উদ্যোক্তারা। কিন্তু কোথায় কাগজপত্রের তলে তলিয়ে গেছে, আর খোঁজা হয়নি। সুয়ান্তে ভেইলর পাঠিয়ে দিলেন মালিনকে, মালিন আমার সেক্রেটারির কাজ করবে। মালিনের মাইনে নরস্টেডই দেবে। বাইশ তেইশ বছর বয়স তার। সত্যিকার চাকরিতে ঢোকার আগে অল্প পয়সায় এমন ছোট খাটো কাজ করে অনেকে। এতে চাকরি করার সামান্য হলেও কিছুটা অভিজ্ঞতা হয়। এই অভিজ্ঞতার কথা লিখলে ভালো চাকরি জোটে। মালিনকে দায়িত্ব দিই আমার কাগজপত্রগুলোকে চরিত্র বুঝে আলাদা করে ফাইল বন্দি করার জন্য। মালিনকে একটি আলাদা ঘরও দিয়ে দিই বসে কাজ করার জন্য। দুটো ঘরেই টেবিল চেয়ার দোতলা বিছানা ইত্যাদি আছে। একটি ঘরে আমি, আরেকটিতে মালিন। দু ঘরেই ফোন আছে। মালিন কাগজপত্র ফাইলবন্দি করার বদলে, লক্ষ করি, ফোনে কথা বলতে বেশি আগ্রহী। এমনকী আমাকে যারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তাদের দায়িত্ব ফোন করে খবরাদি নেওয়া, দায়িত্ব ওদের পালন করতে না দিয়ে মালিনই করে, ফোন করে তাদেরকে খবরাদি দেয় এবং নেয়। বিমানের টিকিটি এসে পৌছোঁলো কি না, কটার সময় ওঠা, কটার সময় নামা, অনুষ্ঠানের বিষয় কী, বক্তৃতা কতক্ষণ, হোটেলের নাম ধাম। কী বলবো, ঠ্যাকা যেন আমার। ফোনের বিলের কথা মেয়ে কি জানে!

আমন্ত্রণের তোড়ে ভেসে যাচ্ছি। সুইডেনে মাসে এক সপ্তাহের মতো থাকা হচ্ছে। উড়ছিই বেশি। ফিনল্যান্ড থেকে আমন্ত্রণ। ফিনল্যাণ্ডের লেখক গোষ্ঠী ওরফে পেন ক্লাব আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কয়েকদিনের জন্য যেতেই হবে ও দেশে। উড়ে যাই হেলসিংকি। একাই উড়ি এখন। নিরাপত্তা বাহিনীকে অনুরোধ করে উড়োজাহাজে অন্তত নিরাপত্তার উপদ্রব থেকে রক্ষা চেয়েছি। আমাকে ওঁরা রক্ষা করে যথেষ্ট মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন।

হেলসিংকিতে পৌঁছেই দেখি যথারীতি এক নম্বর নিরাপত্তা। সুইডেনের নিরাপত্তা-পুলিশই যে দেশে যাবো সে দেশের নিরাপত্তা-পুলিশকে জানিয়ে দেয় কখন কটায় আসছি। এবং আমাকে কী ধরনের নিরাপত্তা দিতে হবে ইত্যাদি। এক দুই তিন নাকি চার। সমুদ্রবন্দরে

বিশাল গ্র্যান্ড ম্যারিনা হোটেল। একসময় এটি গুদামবাড়ি ছিল। এখন স্থপতি আর শিল্পীর ছোঁয়ায় হোটেল। প্রায় পাঁচশ ঘর। যথারীতি এই হোটেলেও রাখা আমার জন্য সুইট। শোবারঘর, লেখার ঘর, বসার ঘর, ইত্যাদি। সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া বিলাসিতা।

বিমান থেকে এবার বন্দরের মধ্য দিয়ে নামা। ফটো সাংবাদিকের ভিড় বিমান বন্দরে। শত শত ক্যামেরা। নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে আমাকে ছুঁতে পারে না কেউ। উঁচু হয়ে মাইক্রোফোন বাড়িয়ে প্রশ্ন করেও কোনও কাজ হয় না। টেলিভিশনের খবরের প্রথমেই শিরোনাম থাকবে, আমি ফিনল্যান্ডে এসেছি। হোটেলে ঢোকার সময়, হোটেল থেকে বেরোবার সময় পাপারাৎজির দল পিছু নেয়। যেদিকে হাঁটি, যেদিকে চলি নিস্তার নেই। আগে থেকে যোগাযোগ করে একজন এসেছে। তুরস্ক থেকে। অপূর্ব দেখতে এক যুবক। নাম বলল, বরকত। এত যে সুদর্শন পুরুষ দেখেছি, এত সুদর্শন দেখিনি আগে। মনে হয়, মনে কি হয় এই কারণে যে বরকত নামটি আমার চেনা, এই নাম এবং বরকতের অত না-সাদা শরীর আমাকে আমার অজান্তেই ভাবাচ্ছে যে সে আমার খুব আপন! আমার খুব ইচ্ছে করে এই যুবকের স্পর্শ পেতে। ইচ্ছে করে যুবকটির হাতে হাত ধরে পুরো শহর ঘুরে বেড়াই। যুবকটি ভালোবাসুক আমাকে, চুমু খাক। আমার দৃষ্টিতে যে তৃষ্ণা তা সেই যুবক টের পায় না। জিজ্ঞেস করে, আপনি কি *আমাকে আর পনেরো মিনিট সময় দিতে পারবেন?*

আপনি এত দূর থেকে এসেছেন, মাত্র পনোরো মিনিট চাইছেন কেন? যত ইচ্ছে সময় নিন।

যুবক তাঁর ক্যামেরা বসিয়ে আলো মেপে, আমার জন্য চেয়ার তৈরি রেখে,অপেক্ষা করছিল। প্রমাদ গুনছিল, হয়ত পাঁচ মিনিটের বেশি আমি দেব না তাকে। তুরস্কের কিছু পত্রিকার কাগজ আমাকে দিয়ে বলল, *তুরস্কেও প্রচুর লেখা হয় আপনাকে নিয়ে, ওখানে সকলেই আপনার কথা জানে।*

আশাতিরিক্ত পাওয়ায় যুবক কাঁপে। যুবকের কাছে আমি নিতান্তই তারকা, এর বেশি কিছু নই, আমার চোখের তৃষ্ণা বোঝা তার হয় না। বুঝি, যে, বোঝা, কোনওদিন হবেও না। পনেরোমিনিট চেয়েছিল, সে জায়গায় একঘন্টা তার সঙ্গে কথা বললাম। তার প্রশ্নের উত্তর

দিলাম। যুবক উত্তেজিত, টেলিভিশনের খবর কেবল নয়, একটি ভালো তথ্যচিত্র তৈরি হচ্ছে বলে। তার নাম হবে।

তুরস্ক সম্পর্কে আমি আমার আবেগের কথা জানাই।

--তোমাদের কামাল আতাতুর্ককে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। একদিন যাবো আতাতুর্কের দেশ দেখতে।

বরকতের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল মুহূর্তে। বলল, *আতাতুর্ক খুব খারাপ লোক ছিলেন।*

--বাজে কথা বলছ তুমি। আতাতুর্ক খারাপ লোক হতে যাবেন কেন? তিনি তুরস্ককে সেকুলার করেছিলেন। আজ তুরস্ক মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সেকুলার। কামাল আতাতুর্ক ছাড়া এমন হতে পারতো? অন্য মুসলিম দেশগুলো দেখছো তো মৌলবাদীরা কেমন কামড়ে খাচ্ছে!

বরকত আরও গম্ভীর হয়ে বলল, *কামাল আতাতুর্ক একটা খুনী। তিনি প্রচুর মানুষ খুন করেছেন। যাদেরই মৌলবাদী বলে মনে হত, তুলে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিতেন।*

--আচ্ছা, তুমি কি খুব ধার্মিক লোক?

বরকত বলল, *না, মোটেও না। আমি নাস্তিক। আমি মানববাদী।*

আমার মাথা ঘুরে ওঠে মুহূর্তে। কোথাও কি অংকে কোনও গোলমাল হচ্ছে! কোথায় হচ্ছে! ভাবতে থাকি। মানববাদের প্রধান শর্ত নাস্তিকতা, কিন্তু নাস্তিকতাই হয়তো একমাত্র শর্ত নয়। আমার ভাবনায় তুরস্কের কামাল এবং তাঁর কাজ জট পাকাতে থাকে। যা বলেছে বরকত, তার সবই যে সত্য তা মানছি না। ক্রমশ ব্যক্তি উবে যায়, আদর্শ পড়ে থাকে, তার ভুল ভ্রান্তি পড়ে থাকে। তার ভালোত্ব বিরাটত্ব পড়ে থাকে। কোনটি নেব, কোনটি নেব না, কোনটিকে গ্রাহ্য করব, কোনটিকে জলে ফেলে দেব, তা নির্ভর করে আমরা কী চাই না চাইএর ওপর। কিন্তু এরকমও তো হয়, কোনওটিকেই অগ্রাহ্য করছি না!

অনুষ্ঠান লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে। আমার লেখা, আমার অভিজ্ঞতা শুনতে চাইছে লেখকেরা। যা প্রশ্ন করা হয় তার উত্তর দিই শান্ত কণ্ঠে। প্রশ্নগুলো খুব কঠিন বলে কখনও মনে হয়নি। এখানকার মানুষেরা তত্ত্বকথা শুনতে চায় না, খুব ব্যক্তিগত গভীর অনুভবের কথা শুনতে চায়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, যে, দীর্ঘ দীর্ঘ কাল তত্ত্বকথা দর্শনকথা ভারী ওজনদার কথা শুনতে শুনতে এরা এখন ক্লান্ত। যে জিনিসটি দীর্ঘ দীর্ঘ কাল তথাকথিত সভ্যতা আর অর্থনীতির পসার বাড়াতে দরকার হয়েছিল, সে জিনিসে হৃদয় ছিল না। এখন এরা হৃদয়ের ছোঁয়াচ পেতে চায়।

কেউ কেউ বলে, *তুমি এত শক্তিমান, অথচ কী নরম তোমার কণ্ঠস্বর। কি করে এমন হল!* হঠাৎ করে কিছু হয়নি। আমি এরকমই। ছোটবেলা থেকেই। আমার মনে হয় না খুব র‍্যাডিক্যাল হতে গেলে উচ্চকণ্ঠে কথা বলার বা রাগ দেখানোর কোনও দরকার আছে। আমার ভিতরে যদি শক্তি থাকে, বাইরে তা প্রদর্শন করার দরকার হয় না। ভিতরের শক্তি দিয়ে আমি চারপাশ জয় করবো সহজে।

ফিনল্যাণ্ডে ইংরেজি ভাষাটি শিক্ষিতদের মধ্যে প্রায় সবাই জানে। ফিনিস ভাষাটি শুনে দেখেছি ঠিক কী রকম যেন, নরওয়ে, সুইডেন, আইসল্যান্ড ডেনমার্ক, রাশান কোনও ভাষার সঙ্গে মেলে না। ভাষাটির মিল, খুব অবাক কাণ্ড, হাঙ্গেরির ভাষার সঙ্গে। কোথায় হাঙ্গেরি, কোথায় ফিনল্যান্ড! ভাষা চিরকালই বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করেছে। পূর্ব ইওরোপ থেকে কোনও এক কালে কেলটিক জাতের লোক এই উত্তরে এসে বসত শুরু করেছিল হয়ত।

ফিনল্যাণ্ড সুইডেনের অংশ ছিল ছশো বছর। এরপর সুইডেনকে যুদ্ধে হারালো রাশিয়া। এর ফলে রাশিয়ার অধীনে চলে গেল ফিনল্যান্ড, ছিল প্রায় একশ বছর। রাশিয়াতে বিপ্লব ঘটার পর ফিনল্যান্ড মুক্তি পেয়েছে, একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তারপর তো আবার বিশ্বযুদ্ধের সময় কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। যুদ্ধের পর থেকে ফিনল্যান্ড আবার ফিনল্যান্ড। দেশ খুব নড়বড়ে, বাইরে থেকে মনে হতে পারে। অথচ এখনই কী রকম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অত ধনী ছিল না এই সেদিনও। এখন ধনীই শুধু নয়,

নীতিআদর্শও বেজায় ভালো। আন্তর্জাতিক ট্রান্সপারেন্সির দূর্নীতির রিপোর্টে পৃথিবীতে সবচেয়ে কম দূর্নীতির দেশ ফিনল্যান্ডে এবং পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দূনীর্তির দেশ বাংলাদেশ। নীতিতে বাংলাদেশের সঙ্গে পেরে উঠলেও সংস্কৃতিতে হেরে যাবে। ফিনদের গর্ব গৌরব যা আছে তা এক কালেভালাকে নিয়ে। সেই পুরোনো পুঁথির সংকলন। ওই কালেভালা কি দাঁড়াতে পারবে এক ময়মনসিংহ গীতিকার সামনেই?

কালেভালাকে নিয়ে ভীষণ বাণিজ্য। পদ্যের চরিত্রদের গলার মালা মাথার টুপির নকশা নকল করে বিক্রি হয়। আমি কিনতে যাইনি কিছু, উপহার যা কিছুই পেয়েছি,সবই কালেভালা। হেলসিংকি ঘুরে দেখবো, পুলিশ তো আছেই, আমার সঙ্গে সারাক্ষণের জন্য সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে এক যুবক মার্কুসকে। মার্কুস সদ্য সিগারেট ছেড়েছে, মুখে নিকোটিনের চুইংগাম , এভাবেই নিকোটিন নিচ্ছে রক্তে চুষে। আমি তৃপ্তিতে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলি, *আমার নেশা নেই সিগারেটের। যে কোনও সময় ছেড়ে দিতে পারি। খেলেও চলে, না খেলেও চলে।*

মার্কুস বলল, তুমি কি সত্যিই মনে করছো তোমার নেশা নেই!

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলি।

মার্কুস মাথা নেড়ে বলে, *আমার মনে হয়, তোমার অজান্তেই তোমার নেশা হয়ে গেছে। সিগারেট না পেলে তুমি ছটফট করবে।*

মার্কুসের কথা হেসে আমি উড়িয়ে দিলাম। কিন্তু ঘন্টা দুই সিগারেট না খাবার পর আমি লক্ষ করছি, আমি খেতে চাইছি সিগারেট। প্যাকেটে হাত দিলেই মার্কুস বলল, *ওটা ওই হাতটা তুমি দাওনি, তোমার রক্ত দিয়েছে।*

সিগারেট ধরালাম। খেতে খেতে আমি আশংকা করছি, তবে কি সত্যিই সিগারেটের নেশা হয়ে গেছে আমার! খেতেই হবে সিগারেট ! আমার বিশ্বাস হতে চায় না। কোনও কিছু আমাকে নিয়ন্ত্রণ করুক আমি চাই না। কোনও কিছুর ওপর নির্ভর করার মতো মৃত্যু আর হয় না।

ফিন মেয়েরা সুইড মেয়েদের মত। তরুনিরা ছিপছিপে, বয়স্কদের মধ্যে মেদের আধিক্য। তবে যে-হারে সব বয়সীদের মধ্যে ওজন কমাবার উৎসাহ, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতার দরুণ দেখি মধ্য বয়সী মেয়েরাও ছিপছিপে হতে শুরু করেছে। পুরুষের চেয়ে নারীই স্বাস্থ্য সচেতন বেশি। মেয়েরাও অনেক এগিয়ে এদেশে। ইওরোপে সবার আগে মেয়েদের ভোটের ব্যবস্থা হয়েছিল বলে। উনিশশ ছ সালে। সায়ত্ত্বশাসিত ফিনল্যান্ডে একটি জাতীয় সংসদ গঠন করা হয়, সেই সংসদে মেয়েদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। ফিনদের এ নিয়ে গর্ব আছে।

আরও অনেক গর্ব আছে। স্যান্টা ক্লজকে নিয়ে গর্ব --স্যান্টা ক্লজের বাড়ি ফিনল্যান্ডের উত্তরে ল্যাপল্যান্ডে। প্রতি বছর বাচ্চাদের লেখা কয়েক লক্ষ চিঠি যায় সান্তা ক্লজকে লেখা। চিঠির জন্য আর্কটিক সার্কলএ স্যান্টা ক্লজ গ্রামে স্যান্টা ক্লজ পোস্টাপিস খোলা হয়েছে।

মার্কুসের সঙ্গে হেলসিংকি শহরে হেঁটে বেড়িয়ে অনেক কিছু দেখি। টেমপেলিআউকিও গির্জাটি এখানে বড় একটি আকর্ষণ। এমনিতে বলা হয় পাথরের ওপর গির্জা। পাথরের টিলা কেটে দেওয়াল তৈরি হয়েছে, আর ছাদ বানানো হয়েছে কপার দিয়ে। হেলসিংকি চলতে গিয়ে দেখি হেলসিংকির রাস্তায় রাস্তায় আমার ছবি দিয়ে পোস্টার লাগানো। স্টকহাউজের বড় লাইব্রেরিতে আমার বক্তৃতা, এবং শেষে প্রশ্নোত্তর। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। কিন্তু বই কারও হাতে নেই। বই ছাপা হবে হবে করছে ফিনল্যাণ্ডে। লিকে নামের প্রকাশনী সংস্থা বই প্রকাশ করছে। প্রকাশক আমাকে প্রকাশনীতে নিয়েও গেল। লজ্জার নাম হচ্ছে হপ্পা। সুইডিশ নরওয়েজিয়ান ভাষায় লজ্জা হল স্কাম, যেটা *শেম* এর সঙ্গে মেলে। আর প্রতিবেশি দেশগুলোর ভাষা জার্মানিক ভাষা থেকে উদ্ভুত, অ্যাংলো স্যাক্সনের সঙ্গে কিছুটা মিল তো আছেই, যেহেতু স্যাক্সনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে জার্মানির। এরা স্কাম বলছে যেটাকে, সেটাকে ফিনরা বলছে হপ্পা। বলছে কারণ ভাষাটি তো উত্তরাঞ্চলের ভাষা নয়। ভাষাটিতে হাঙ্গর হাঙ্গর গন্ধ।

আরও দায়িত্ব আছে ফিনল্যান্ডে। সংসদ ভ্রমণ করা। করি। মন্ত্রীরা লাইন দিয়ে দেখা করেন। হাত মেলান। ছবি তোলেন। কোন মন্ত্রী আমাকে আগে কোথায় নিয়ে যাবেন, বেড়াতে না খাওয়াতে, এ নিয়ে কিছুটা কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

হেলসিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করতে হবে, অমনই আয়োজন। আমার অত কিছু মনে নেই কী কী করতে হবে। বিস্তারিত কাগজে লেখা আছে, লেখা থাকে, যেখানেই যাই। কাগজ পড়ার ইচ্ছে আমার হয় না। নতুন দেশটি আবিস্কারের জন্য ভেতরে ছটফট আমার। বক্তৃতাতে আমি অভ্যস্ত নই। খুব সংক্ষেপে কিছু বলে জানিয়ে দিই তোমাদের কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস কর। এতে কেউ তৃপ্ত হয় না। কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কথা বলে মাতিয়ে দেব, এরকমই মনে হয় ধারনা সবার। বিখ্যাত মানুষেরা তো ওই এক জিনিস পারে, চমৎকার কথা বলতে পারে। কী কান্ড। মনে মনে বলি।

এমন আশকারা দিয়ে মাথায় তুললে, মাথায় বসে যা করতে হয় তার কিছুই না করলেও একটা কিছু করি। গ্রান্ড মারিনা হোটেলে বসে দূর থেকে ভেসে আসা বিশাল জাহাজ দেখে ইচ্ছে করি জাহাজে চড়ার। শুধু চড়াই নয়, জাহাজে করে সুইডেনে যাবো। যেই না উচ্চারণ করি ইচ্ছে, অমনি জাহাজের প্রথম শ্রেণীর সুইট আমার জন্য রেখে দেওয়া হল। বিমানের যে প্রথম শ্রেণীর টিকিট, সেটির কী হবে? সেটির কিছুই হবে না। সেটি বাতিল। ছিঁড়ে ফেলো।

হঠাৎ একসময় উৎসাহ দেখালাম মাইব্রিট উইগএর জন্য। এ সময় মাইব্রিট এর ফিনল্যান্ডে থাকার কথা, ও যদি যেতে চায় সুইডেনে, আমার সঙ্গে যেতে পারে জাহাজে। কমপিউটারের দেশ এটি। পুলিশের লোকেরা বোতাম টিপে বের করে ফেলতে পারে কে কোথায় আছে। মাইব্রিট অন্য এক শহরে ছিল, সেই শহরে পুলিশ গিয়ে ওকে খবর দিয়েছে এতটার সময় গ্র্যান্ড মারিনা হোটেলে। জাদুর মত মাইব্রিট হাজির।

এলিজাবেথ, পেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট, এবং পেন এর আরও কিছু সদস্য আমাকে জাহাজে তুলে দিতে আসে। ওদের সঙ্গে সখ্য হয়ে ওঠে আমার। জাহাজে নিরাপত্তার সার্কাস শুরু হয়। ফিনল্যান্ডের নিরাপত্তারক্ষীদের একটি দল যাবে আমার সঙ্গে সুইডেন অবধি। ওরা

জানিয়ে দিয়েছে সুইডেনে, আমি উড়ে আসছি না, ভেসে আসছি। জাহাজে দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল পুলিশের। রীতিমত এলাহি কাণ্ড। আমি ওঠার আগে জাহাজে কাউকে উঠতে দেয়নি। আমার সুইটের ধারে কাছে কারও ছায়া পৌঁছোনো বারণ। জাহাজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসে দেখা করে বলে গেলেন, জাহাজে আমি তাঁর অতিথি। এর মানে হচ্ছে ভাইকিং লাইন জাহাজের লাক্সারি সুইটটির জন্য কোনও পয়সা লাগছে না।

--*আপনার সঙ্গে আপনার একজন বান্ধবী আছে?*

--*হ্যাঁ আছে।*

--*আপনার বান্ধবীকেও আমরা একটি সুইট দিতে চাই। পাশেরটি।*

আমি সঙ্গে সঙ্গে না না করে উঠলাম-- *না, ও আমার সঙ্গে থাকবে। এখানে তো বড় বিছানা আছে।*

মাইব্রিটও সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে চাপ দিয়ে জাহাজের মালিক বা ম্যানেজারকে বলল, *না, কোনও অসুবিধে হবে না, সোফা আছে বসার ঘরে, ওখানে আমি ঘুমোতে পারবো।*

হাত ধরে মাইব্রিটকে কাছে টেনে বললাম, *সোফায় থাকবে কেন? বিছানায় থাকবে। এত বড় বিছানায় আমি একা শোবো কেন!*

একেঁ বেঁকে মেয়ে নিজেকে আমার আলিঙ্গন থেকে আলগোছে ছাড়ালো। ম্যানেজার স্থানুর মতো সামনে দাঁড়িয়ে। পিছনে পুলিশ। পাশের ঘরে কয়েকজন পুলিশ থাকছে। দরজার সামনেও পায়চারিরত পুলিশ।

ডিনার কি ঘরেই করবেন? নাকি রেস্তোরাঁয়। ম্যানেজারের বিনীতি প্রশ্ন।

পিছন পিছন পুলিশবাহিনী যাবে রেস্তোরাঁয়, আর সকলে হাঁ হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে ভাবতেই গা গুলিয়ে আসে। বলি, *ঘরেই।*

ম্যানেজার বিদেয় হতেই মাইব্রিট বলে, *ও তসলিমা এ কী করলে তুমি!*

--*কী করলাম?*

--*ওরা সবাই আমাদের লেসবিয়ান ভেবেছে।*

--কেন?

--এক বিছানায় শোয়ার কথা বললে যে!

--এক বিছানায় শুলে লেসবিয়ান হয় কে বলল?

--হ্যাঁ লেসবিয়ান হলেই শোয়। দেখনি পুলিশরা চোখ চাওয়াচাওয়ি করল। ম্যানেজার তো ধরেই নিয়েছে আমরা লেসবিয়ান।

--আমাদের দেশে মেয়েরা এক বিছানায় ঘুমোয়। বান্ধবীরা। আত্মীয় স্বজনেরা। তাই আমি বলেছি।

--আর তুমি হাত ধরে কাছে টানলে, এতে তো একশ ভাগ নিশ্চিত ওরা।

--বল কী! হাত ধরলে, কাঁধ ধরলে লেসবিয়ান মনে করে নাকি!

--এখানে তাই। এখানে মেয়েরা ওভাবে হাঁটে না, চলে না। যদি লেসবিয়ান না হয়।

--আশ্চর্য!

আমাকে লেসবিয়ান ভাবুক কী না ভাবুক, তাতে কিছু কি যায় আসে! কিন্তু সৌহার্দ প্রীতি ভালোবাসার প্রকাশ যদি স্পর্শ দিয়ে না হয়, তবে কী দিয়ে হবে? মুখোমুখি বসে কথা, স্পর্শহীন কথা! স্পর্শের সঙ্গে কেন শুধু মৈথুনের সম্পর্ক থাকবে, স্নেহের শ্রদ্ধার মায়ার সম্পর্ক থাকতে পারে না! ওই অনুভব নিয়ে দূরে বসে থাকবো! সারারাত এক বিছানায় শুয়ে শুয়ে গল্প করা যাবে না! চাঁদ দেখতে দেখতে! জাহাজের ওই ঘর থেকে আকাশে সত্যিকার পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে দেখতেই কথা বলি আমি আর মাইব্রিট। বিছানার সঙ্গে কি শুধু রতিক্রিয়ার সম্পর্ক? দুই বন্ধু বা দুই বান্ধবীর সারারাত জেগে গল্প করা কি সামান্য জিনিস?

মাইব্রিটকে টেনে বিছানায় এনেছি, এ আমার সংস্কৃতির কথা ভেবে সে মেনে নেয় হয়ত, কিন্তু তার নিজের মধ্যেও অস্বস্তি কাজ করে। গোথেনবার্গের হোটেলেও দেখেছি সে এপাশ ওপাশ করেছে। যেহেতু সে সমকামী নয়, হয় একা ঘুমোবে নয় কোনও পুরুষ নিয়ে ঘুমোবে। কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘুমোনো চলবে না। আমি পূর্ব এবং পশ্চিমের সংস্কৃতির মাঝখানে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকি। পশ্চিমের স্বাধীনতা আর অধিকার বোধ আমাকে মুগ্ধ করে, আবার পূবের

স্পর্শের জন্য, পূবের চোখের জলের জন্য আমি তীব্র টান অনুভব করি। এদিকে বুদ্ধি ওদিকে আবেগ, আমার কোনওটিকে ছাড়া চলবে না। তবে বুদ্ধিতে আমি চাতুর্য চাই না, আবেগে আমি কৃত্রিমতা চাই না।

সাজানো টেবিলে খাবার আসে। উপাদেয় খাবার। খেয়ে দেয়ে মাইব্রিটের প্রস্তাবে ডিসকো দেখতে যাই। আগে কোনওদিন দেখিনি ডিসকো নাচ। কান ফেটে যাওয়া গানের শব্দ, ওর মধ্যে মানুষ মদ খাচ্ছে, নাচছে। মাইব্রিট আমাকে টানলো নাচার জন্য, আমি নাচতে জানি না। শরমে বসে থাকি এক কোণে, বসে মানুষের হৈ রৈ উল্লাস দেখি। তারুণ্য ফেটে পড়ছে। যে কিশোরী বয়সে আমার ঘর থেকে এক পা বাইরে ফেলার অনুমতি ছিল না, সেই বয়সের মেয়েরা বন্ধু বান্ধবী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যা প্রাণে চায় তাই করছে, তুমুল সুখে মেতে আছে। ওই ডিসকোতে বসে থাকাকালীন অনেকে আসে অভিনন্দন জানাতে, অনেকে আসে অটোগ্রাফ নিতে। পত্রিকায় টেলিভিশনে এত ছবি দেখানো হচ্ছে, যে, মানুষ আমাকে দেখলেই চিনে ফেলে। সঙ্গে পুলিশ দেখে আরও নিশ্চিত হয়। পুলিশ যদিও সাদাপোশাকে থাকে বেশির ভাগ সময়, কিন্তু অভিজ্ঞ চোখ পুলিশের চারদিক দেখতে থাকা চোখ আর সুঠাম শরীর দেখলেই, ঢিলেঢালা জ্যাকেটও দরকার চিনে ফেলে যে পুলিশ।

কতক্ষণ চলবে এই নাচ গান, ফূর্তি? আমি জিজ্ঞেস করি।

মাইব্রিট বলে, *সারারাত।*

সারারাত?

মাইব্রিট মাথা নাড়ে। আমি নাচের দিকে তাকিয়ে নাচের মাথামুন্ডু কিছু খুঁজে পাই না। নাচ সম্পর্কে যা জানতাম তা হল নাচে একটা নিয়ম থাকে, কথক, মনিপুরি, ভরত নাট্যম, দেশি নাচ দেখে অভ্যস্ত আমি। কিন্তু নিয়মহীন নাচ, বন্ধনহীন গ্রন্থি! ওখানে বসেই অনেকগুলো নাচের কথা শুনলাম। বলরুম নাচে ওয়াল্টজ, ভিয়েনিজ ওয়াল্টজ, টুইস্ট, ট্যাঙ্গো, ফক্স ট্রট, চা চা, সাম্বা, রাম্বা, মাম্বো, সালসা, মেরেঙ্গো, ফ্লামেঙ্কো, পলকা, ব্যালে, বেলি। আসলে প্রতিটি দেশে, প্রতিটি অঞ্চলে এক এক ধরনের নাচ। কিন্তু সবকিছুরই নিয়ম আছে কিছু না

কিছু। কিন্তু এই ডিসকো নাচেরই কোনও নিয়ম কানুন নেই। যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। যেমন ইচ্ছে হাত পা নাড়া। তালটা যদিও ঠিক রাখতে হয়, তবে শরীর দোলানোর কোনও মা বাপ নেই। ডিসকোর আমদানি সত্তর দশকের শুরুতে। শব্দটা ফরাসি শব্দ ডিসকোটেক থেকে নেওয়া। ডিসকএর ডিসক আর লাইব্রেরি অর্থাৎ ফরাসি ভাষার বিবলিওটেকএর টেক। দুটো মিলিয়ে ডিসকোটেক। ডিসকোটেক ছিল নাইট ক্লাব। প্যারিসের ডিসকোটেকএ বাজানো হত হারলেম রেনেসাঁর সেই সব জ্যাজ রেকর্ড, যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালো মানুষের সঙ্গীত বলেই নাৎসীবাহিনী জ্যাজ সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল।

ফিনল্যান্ড আর সুইডেনের মাঝখানে অ-লন্দ নামের ছোট্ট একটি দ্বীপ। দ্বীপটি ফিনল্যান্ডের দ্বীপ, কিন্তু একধরনের স্বায়ত্ব শাসন এখানে চলে। দ্বীপটিতে জাহাজ সামান্যক্ষণের জন্য থামে আর হুড়মুড়িয়ে তরুণ তরুণি ঝাঁপিয়ে পড়ে কেনে ক্রেট ক্রেট বিয়ার। সুইডেনে ঢুকে যাবে কাস্টমস পার হয়ে। কোনও ট্যাক্স দিতে হবে না। সুইডেনের হাই-ট্যাক্সএর কারণে যে কোনও জিনিসের মতোই মদের মূল্যও বেশি। কম মূল্যে পাওয়ার সুযোগ হলে, বিনে পয়সার গুঁড়ের দিকে পিঁপড়ের ভিড় করার মতোই মানুষ ভিড় করে।

যেমনই ভিড় হোক, জাহাজ থেকে সবার আগে পার হতে হয় আমাকে। আমি যতক্ষণ না বেরোবো, জাহাজের আর কারও বেরোনো নিষেধ। আমাকে নিয়ে যতক্ষণ না বন্দরে অপেক্ষমান সুইডিশ নিরাপত্তা অদৃশ্য হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাহাজের তরুণী তরুণ, বৃদ্ধা বৃদ্ধকে অপেক্ষা করতে হবে। এত সুবিধে দিয়ে কোথায় নিচ্ছে আমাকে? একশটি দ্বীপ নিয়ে গড়ে ওঠা স্টকহোম শহরটির লিডিঙ্গো নামের দ্বীপে। দ্বীপ বলে কিছু বোঝার উপায় নেই। একশ দ্বীপই সেতুতে বাঁধা। লিডিঙ্গোর ন-তলায় আমাকে নিয়ে তিনজন পুলিশ উঠবে। একজন থাকবে নিচে, যে গাড়ি চালাচ্ছে। এদেশে গাড়ির চালক তারা নিজেরাই। আমার ঘরের দরজা কারা খুলবে? তারাই খুলবে। তাদের কাছেও চাবি থাকে। আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে তারা আবার দরজার তালা বন্ধ করে চলে যাবে। তালা, কিন্তু ভিতর থেকে আমি খুলতে পারবো সে তালা। খুলতে পারবো, কিন্তু খোলার কোনও নিয়ম নেই আমার। আমার এক পা একা বাইরে

যাওয়া নিষিদ্ধ। আমার যদি কোথাও বেরোতে হয়, তবে পুলিশের নম্বরে ফোন করতে হবে। পুলিশ চলে আসবে, আমাকে নিয়ে যাবে যেখানে যেতে চাই। কবে কোথায় কখন আমাকে যেতে হবে তা কদিন আগেই জানিয়ে দিতে হয়। কিন্তু ইমারজেন্সির জন্যও ওরা তৈরি থাকে। কোথায়ই বা যাবো আমি? কোথাও তো আমার যাবার নেই। কেউ তো আমাকে বলেনি তার বাড়ি যেতে। আমি তো কারও দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তেও পারি না। এখানে সে নিয়ম নেই। কার বাড়ি যাবো, কার সঙ্গে কথা বলবো? একা বসে থাকি ঘরে। সারাদিন, সারারাত। কোনও বই নেই পড়ার। মাথায় কোনও শব্দ নেই যে লিখবো। টেলিভিশন খুলি। চ্যানেলগুলো সুইডিশ ভাষায়। কথা হচ্ছে, কিন্তু একটি শব্দও বুঝি না। কেবল ছবির দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকি। রিমোট কন্ট্রোলে বোতাম টিপতেই থাকি। একটির পর একটি। জেনেও, যে, কোনও চ্যানেল আসবে না, যে চ্যানেলটি আমার চেনা। চ্যানেলগুলোয় সেই ভাষায় কেউ কথা বলবে না, যে ভাষাটি আমি বুঝবো। ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেদের ভাষার পাশাপাশি টেলিভিশন রেডিওতে অন্তত ইংরেজি খবর হয়। এখানে তা হয় না। এ দেশে কোনও ইংরেজি পত্রিকাও বের হয় না। এ পর্যন্ত পশ্চিমে যত জাতি দেখা হল, কেউ নিজের ভাষায় যখন কথা বলে, তখন কোনও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে না। কথা বলতে বলতে ইংরেজিতে কোনও বাক্য আওড়াবে, প্রশ্নও ওঠে না।

ফ্রিজে সাতদিন আগের রাধা ভাত, তরকারি। ওগুলো বের করে থালায় নিয়ে মাখতে থাকি। অনেকক্ষণ মাখি। ক্ষিধে নেই। তারপরও খাই। একসময় বারান্দায় এসে দাঁড়াই। সুইয়ের মত শীত বেঁধে গায়ে। চারদিক অন্ধকার। অন্ধকার আমাকে আমূল ঢেকে দেয়। ঘরের আলোয় এবং উষ্ণতায় যখন ফিরে আসি, তীব্র তীক্ষ্ণ একাকীত্ব আমাকে ভীষণ এক কামড় বসায়। সারাক্ষণ মানুষ মানুষ আর মানুষ। আর মানুষ থেকে হঠাৎ আমি এক ঘর একাকীত্বের মধ্যে। ভয়ংকর বীভৎস এই একাকীত্ব। আমি কখনও এত একা ছিলাম না কোথাও। বাড়িতে ঘরে কেউ না কেউ ছিলই। আয়নার সামনে দাঁড়াবো ভাবি, অন্তত নিজের প্রতিবিম্ব হলেও

দুজন মানুষ তো চোখে দেখবো। এত মানুষের ভিড়ে থেকেও মানুষের জন্য আমার আকুতি কেন এত! সম্ভবত মানুষের ভিড়ে থেকেও আমি আসলে একা বোধ করি। ভিড় থেকে বেরিয়ে এলে একা ঘরে কেবল নিজের অর্থহীন মূল্যহীন জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়ে ঘৃণায় আমি কাঁপি। হতাশা আমার আগাগোড়া আচ্ছাদিত করে রাখে।

*

ফ্রান্সে আমাকে বারোশো পুলিশ ছিল ঘিরে,
পেতেছিল লাল গালিচা রাজ্যপালেরা,
শহর উপচে পড়েছিল কোটি দর্শকে,
রাজা মন্ত্রীও দাঁড়িয়েছিলেন মহাউৎসবে ভিড়ে।

ঘর ছিল ভরা ফুলে আর উপহারে
কে আগে আমাকে সোনার মেডেল দেবে
তাই নিয়ে ছিল সভ্য লোকের লড়াই।
মাঝখানে আমি নাস্তানাবুদ অভিনন্দন-ভারে।

রাজা মন্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে একা,
ফরাসি একটি তরুণি কাতর চোখে
বলেছিল *তুমি একা নও, আমি আছি।*
ইচ্ছে আমার তাকেই হয়েছে বারবার ফিরে দেখা।

২৩.১১.৯৪

সুইডেনে শীত পড়ছে। অনেক রাত অবদি আলো থাকতো যে দেশে, সে দেশে দেখছি বিকেল হওয়ার আগেই অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক।

আমার চিঠি এখন নরস্টেডের ঠিকানাতেই আসে। নরস্টেড থেকে আমার লিডিঙ্গোর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ওপরে আমার নাম ব্যবহার করা হয়না যদিও। কিন্তু চিঠিগুলো বাড়িতে পৌঁছোয়। এ বাড়ির ফোন নম্বরের সঙ্গে গ্যাবি তার বাড়িতে নেওয়া নতুন ফোনটির নম্বর, যে ফোনটি আমার কাজে ব্যবহার করতো, যুক্ত করে দিয়েছে। টেলিফোনের কত রকম বাহারি নিয়ম এদেশে। এদেশের প্রতিটি মানুষের নাম ঠিকানা টেলিফোন নম্বর, সবই টেলিফোন বইএ আছে। কিন্তু যে চায় না তার টেলিফোন নম্বর কেউ জানুক, তার নম্বরটি বইয়ে থাকবে না। টেলিফোন অফিসে ফোন করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফোন-লাইন পাওয়া যায়। আমার নিজের দেশটির কথা ভাবি, বছরের পর বছর অপেক্ষা করলেও লাইন পাওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এখানে ঘরে বসে থেকে অনেক কাজই টেলিফোনে হয়, যেগুলো আমরা আমাদের দেশে কল্পনাও করতে পারি না। মাত্র আশি লক্ষ মানুষের দেশ, অথচ কী ঢাউশ ঢাউশ বই টেলিফোনের। প্রত্যেকের জন্য ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে বই। হলুদ পাতা, গোলাপি পাতা, সাদা পাতা হরেক রকম পাতার বই। এক একটি এক একটির। যে কোনও প্রয়োজনে এরা টেলিফোন বইগুলো টেনে নেয়। এমন একজন সুইড আমি দেখিনি যে জানে না ওসব বইএর পাতা খুঁজে অসম্ভব কিছু একটা বের করতে। আমার টেলিফোন নম্বর, নিরাপত্তা বাহিনীর আদেশ, যেন আমার চেনা জানা দুএকজন ছাড়া আর কোনও প্রাণীকে না দিই। বিদেশে আমন্ত্রণ, সাক্ষাৎকার প্রার্থণা, পত্র পত্রিকার জন্য লেখা চাওয়া, বই প্রকাশ করতে চাওয়া ইত্যাদি চিঠি বা ফ্যাক্স সবই আমার বাড়িতেই আসছে এখন। অনেক চিঠি অনেক ফ্যাক্স আমার পড়াও হয় না। অনেক ফোন আমার ধরাও হয় না। মালিন টবো সেক্রেটারি হিসেবে আসার পর এসব কাজের দায়িত্ব যদিও তাকে দিই, কিন্তু দশটি কাজ দিলে দেখা যায় সে একটি নিয়েই পড়ে আছে সাতদিন। একটির গভীরে যাচ্ছে সে। অহেতুক ফোন করছে এদিক ওদিক। ইংলেন্ড থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, অস্ট্রিয়া থেকে এসেছে, ওরাই

ফ্যাক্স করবে, ফোন করবে, কিন্তু না মালিন টবো নিজে ওদের ফোন করে খোঁজ খবর নিচ্ছে। কী হচ্ছে না হচ্ছে। জানতে চাইছে কী হবে না হবে। সেক্রেটারির কাজে মালিন পারদর্শী নয়। সে লেখাপড়া শেষ করেছে, এখন চাকরিতে ঢুকবে, চাকরিতে ঢোকার আগে তরুণ তরুণীদের কোথাও অল্প পয়সায় সাময়িক কোনও কাজ করতে বলা হচ্ছে। বেতন সরকারই দেয়। মালিন সেরকম এক একুশ বছর বয়সী মেয়ে। নিজে চা বানিয়ে আমি মালিনকে যখন দিই, সে অনেকবার ধন্যবাদ জানায়। এত ধন্যবাদ শুনে আমি অভ্যস্ত নই। এরা ধন্যবাদ যেমন দেয়, ধন্যবাদ শুনতেও চায়। আমার ধন্যবাদ দেবার অভ্যেস নেই। আমি মিষ্টি হেসে আমার কৃতজ্ঞতা বোঝাই। কিন্তু এতে দেখা যায় দুর্নাম হয়। ধন্যবাদ আমাকে বলতে হবেই আমি সত্যিই হৃদয়ে ধন্যবাদ পুষি কী না পুষি। একদিন দুপুরে খেতে বসে মালিনকে ডেকেছিলাম খেতে, সে যে কী বিস্ময় ওর! কেন খাবে ও এখানে? আরে এটা তো বাড়ি, এখানে রান্না করেছি, খাবে না কেন, আমি বুঝি একা একা খাবো, আর তুমি ও ঘরে বসে থাকবে? হ্যাঁ থাকবে, তাই তো থাকার নিয়ম, ওকে *আরে বোসো তো খাও তো* বলে যখন খাবার দিলাম, ও খেলো, কী যে কৃতজ্ঞতা ওর! কেউ কাউকে খাওয়াচ্ছে এভাবে, বুঝি যে এ দেশে এই ব্যাপারটা নেই। খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলেই তবেই এমনটা ঘটতে পারে। তারপরও নানারকম কানুন আছে, নিমন্ত্রণ করা চাই, সেই নিমন্ত্রণ এক বছরে অথবা কয়েক বছরে একবার। কফি খাবার নিমন্ত্রণ সেটির জন্যই কয়েকমাস নাকি অপেক্ষা করতে হয়। এটি কি এই দেশেরই নিয়ম, যেহেতু বরফের দেশের মানুষ এরা, বরফের কারণে ঘর থেকে বাইরে যাতায়াতে বাধা পড়েছে, ঘরে একা থেকে অভ্যস্ত হয়ে গেছে! নাকি অতি যান্ত্রিকতায় আর অতি-আধুনিতকায় যাপন করা ঘড়ি মাপা জীবনে সময়ের অভাব, ব্যস্ততা, সারাদিন কাজ করার পর এক শরীর ক্লান্তি --তখন আর অতিথি ভালো লাগে না বলে, ঘরে আরাম করে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিতে চায় বলে, অতিথি এবং আতিথেয়তা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে? নিজেরাও কারও আতিথ্য বরণ করতে চায় না, কারণ বরণ করলে নিজের ঘাড়েরও অন্যকে অতিথি করার দায়িত্বটি পড়ে বলে!

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক শীতল, এ সত্য এরাও এদেশিরাও অস্বীকার করে না। করে না বলেই চারদিক থেকে সম্পর্ককে উষ্ণ করার দায়িত্ব নেওয়া হচ্ছে। কোম্পনি থেকে কর্মচারিদের দূরে কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়, বলা হয় তোমরা কিছু কাজ একসঙ্গে করো, নৌকো চালাও, পাহাড়ে ওঠো, সাইকেল দৌড়োও। কাজের কথা বা আপিসের কথার বাইরে সামাজিক কথা বলার জন্য বা একেবারেই ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য এই আয়োজন। হঠাৎ করে চরম অসামাজিক মানুষদের সামাজিক বানানোর জন্য জোর করা হচ্ছে। জোর করলেই কি সব হয়, যদি মানুষ ছোটবেলা থেকে সেই পরিবেশে বড় না হয়ে ওঠে!

চিঠি আসে ফ্রান্সে যাবার। টেলিভিশনে বের্নাড পিভোর অনুষ্ঠানে। পিভো ফরাসি টেলিভিশনে সাহিত্য বিষয়ক অত্যন্ত উচুঁ মাপের অনুষ্ঠান করেন। সাহিত্যিকদের ডাকেন, তাঁদের বই নিয়ে আলোচনা করেন। বর্তমান ফরাসি সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক জগতে পিভো হচ্ছেন এক ঈশ্বরের মত। অনুষ্ঠানটি খাঁটি আঁতেলেকচুয়ালদের জন্য। পিভোর আমন্ত্রণপত্র পাবার পর যথারীতি যা করতে হয় তাই করি, ফরাসি দুতাবাসে গিয়ে ভিসার আবেদন করি। ভিসা নেওয়া তো সহজ জিনিস নয়, দূতাবাস থেকে বার্তা পাঠানো হয় ফ্রান্সে। সরকারি অনুমোদন পেলে তবেই আমাকে ভিসা দেওয়া হবে। আমাকে চিনতে পেরে বেশ খাতির যত্ন করলেন রাষ্ট্রদূত। নিজের ঘরে বসিয়ে হাসিমুখে গল্প করলেন এবং অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে জানালেন যে ভিসা হয়ে গেলেই তিনি আমাকে জানিয়ে দেবেন ফোনে, আমি যেন কাউকে পাঠিয়ে ভিসাটি সংগ্রহ করে নিই।

হ্যাঁ এল এরপর ফোন দূতাবাস থেকে। বলা হল, আমাকে ২৪ ঘন্টার ভিসা দেওয়া হচ্ছে। আমি চেয়েছি সাত দিনের ভিসা, আমাকে দেওয়া হবে ২৪ ঘন্টা? এ দেওয়ার অর্থ কী! দেওয়া না দেওয়া তো সমান কথা। একটা দেশে যাবো, প্রকাশক আছে, বন্ধু বান্ধব আছে, দেখা সাক্ষাৎ হবে, মাত্র ২৪ ঘন্টা ভিসা দিয়ে নিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়! ২৪ ঘন্টা পর ও দেশে আমি নিষিদ্ধ! আমি বিরক্ত তিক্ত। করবোটা কি এই ভিসা দিয়ে? রাষ্ট্রদূতের কাছে আমার

জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর নেই। পিভোর অনুষ্ঠানে যাচ্ছি, এ খবরটি বিরাট করে ফ্রান্সে প্রচার মাধ্যমে প্রচার হয়েছিল। বারবারই টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে, শুনেছি। পিভোর অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে থাকার কথা আরও কয়েকজন সাহিত্যিকের, এরমধ্যে নারীবাদী সাহিত্যিক অ্যানতোয়ানেত ফুকও আছেন। মজার ব্যাপার হল, পিভোর আমন্ত্রণ পাবার পর আমার কাছে প্রকাশকের প্রচুর টেলিফোন কারা আমার সাক্ষাৎপ্রার্থীদের। এরমধ্যে একটি অভিনব আবেদনটি জানিয়েছেন ফুক। ফুকের শিষ্যা মিশেল ইদেল ক্রমাগতই আমাকে ফোনে এবং ফ্যাক্সে কাতর অনুনয় করছেন যে পিভোর অনুষ্ঠানে ফুকও যাচ্ছেন। আমি যেন পিভোকে বলি ফুককে যেন আমার পাশের চেয়ারে বসতে দেন, আমি বললে পিভো রাজি হবেন। ষাটের দশকের নারীবাদী আন্দোলনের বেশ নামকরা নেত্রী এই আনতোয়ানেত ফুক। নিজে তিনি নারী অধিকারের নানা বিষয়ে বই লিখেছেন, নিজের একটি নারীগ্রন্থ প্রকাশনী আছে, জ্যাক দারিদার মতো দার্শনিকরা ফুকের অনুরাগী, নিজে তিনি মিতেরোঁর দলের লোক, ইওরোপীয় ইওনিয়নের সংসদ সদস্যা। তিনি প্রায় প্রার্থণা করছেন আমার পাশের চেয়ার। কেন? কী এর কারণ? আমি যেহেতু প্রধান অতিথি, প্রধান আকর্ষণ, তাই আমার পাশে বসলে গুরুত্ব পাওয়া যাবে বলে! তা না হলে আর কী কারণ! আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় গুরুত্ব পাওয়ার মূল্য পাওয়ার নির্লজ্জ লোভ সেই মানুষের মধ্যে, যাদের আমি নমস্য বলে ভাবি । আমি বের্নার্ড পিভোকে কিছুই লিখি না, বরং বড় বিবমিষা জাগে, ধুত্তরি আমি যাবোই না ফ্রান্সে। অত ছোটলোকি আমার ভালো লাগার কথা নয়। ভিসা নাও, সুটকেস গোছাও, বিমান বন্দরে যাও, বিমানে চড়ো, নামো ওঠো, দূর দূরান্ত থেকে শহরে যাও, হোটেলে ওঠো, বিশ্রাম নাও, টেলিভিশনে যাও, অনুষ্ঠান করো, শেষ হলে হোটেলে ফেরো, সুটকেস গোছাও, বিমান বন্দরে ছোটো, চলে যাও, বিদেয় হও। এ কী! এ কি মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার! তোমার দেশটাকে আমি কি ছিঁড়ে ফেলবো, না খেয়ে ফেলবো! না যাবোই না। আমি ক্রিশ্চান বেসকে জানিয়ে দিই, সিদ্ধান্ত নিয়েছি না যাবার। ক্রিশ্চান বলল, ভালো সিদ্ধান্ত।

এরপর শুনলাম, ফ্রান্সে ভীষণ ভীষণ কান্ড ঘটছে। দেশ জুড়ে ভীষণ হই চই। খবর আগুনের মতো ছড়িয়ে গেছে। প্রতিটি টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকার প্রধান খবর *তসলিমাকে ফ্রান্সে আসার ভিসা দেয়নি ফরাসি সরকার। ২৪ ঘন্টার ভিসা দিতে চেয়েছিল, তসলিমা ফিরিয়ে দিয়েছে।* তাণ্ডব বটে। তুমুলই তাণ্ডব। বের্নার্ড পিভোর বিখ্যাত অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠানটি আমাকে নিয়ে করার কথা ছিল, সে অনুষ্ঠান বের্নার্ড পিভো করলেন আমার অনুপস্থিতিতে। পিভোর পাশের চেয়ারটি খালি। চেয়ারটিতে বসার কথা ছিল আমার। চেয়ার খালি রেখে ক্যামেরায় বার বার সে খালি চেয়ারটিকে দেখিয়ে অনুষ্ঠান হল। সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পিভোর প্রতিবাদ নজিরবিহীন। পিভোর অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল আমাকে ফ্রান্সে যেতে বাধা দেওয়া। ফরাসি শিল্পী সাহিত্যিক সাধারণ মানুষ রেগে আগুন। এই ফ্রান্স চিরকালই আশ্রয় দিয়েছে লেখকদের, চিরকালই মুক্ত চিন্তার আর বাক স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়িয়েছে। আর এই ফ্রান্স কিনা দরজা বন্ধ করেছে সেই লেখকের মুখের ওপর, যে লেখক মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে নিজ দেশ থেকে নির্বাসিত, যে লেখককে সহানুভূতি জানাচ্ছে সারা বিশ্ব, যে লেখককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সভ্য দেশগুলি, যে লেখককে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়েছে উত্তর ইওরোপে! সরকারের এই জঘন্য সিদ্ধান্ত গোটা ফ্রান্সের জন্য অপমান। এ আমাদের লজ্জা। প্রতিদিন প্রচার মাধ্যমে চলছে ফরাসি সরকারের নিন্দা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শার্ল পাসকোয়াকে মুহুর্মুহু ভৎসর্না। কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল তাঁকে। সাংবাদিকরা বোলতার মত কামড়ে ধরলো। পাসকোয়ার এক উত্তর, *তসলিমার নিরাপত্তার কথা ভেবে ভিসার সময় কমিয়ে এনেছি।* সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন, *স্টকহোম, অসলো, স্টাভাঙ্গার, লিসবন নিরাপদ হতে পারে, প্যারিস তার জন্য নিরাপদ হবে না কেন?*

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এই ঘটনার কারণে বিরাট এক ধাককা খেল। টেলিভিশনে শুরু হয়ে গেছে পাসকোয়াকে কার্টুন বানিয়ে অপমান। পাসকোয়ার গদি অব্দি নড়বড়ে হয়ে উঠলো। অবিশ্বাস্য বটে। পত্রিকাগুলো কেবল প্রথম পাতায় নয়, ভিতরে কয়েকটি পাতা করে নিচ্ছে এ খবর আলোচনায়। না, এখানে আমি শেষ অব্দি বড় বিষয় নই। বড় বিষয় হচ্ছে ফ্রান্স এবং

সাহিত্যিকদের প্রতি ফ্রান্সের দায়িত্ব ও কর্তব্য। বিশ্বের সামনে ফ্রান্স যে দুএকটি বিষয়ে সবার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, ফ্রান্সের সেই গৌরব ধুলোয় লুণ্ঠিত করার অধিকার ওই গবেট পাসকোয়ার আদৌ আছে কি না তা নিয়ে বিতর্ক। আমি অবাক! কাকে ফ্রান্স ভিসা দিল না ফ্রান্সে ঢুকতে, এটা একটা জাতীয় অপমানের খবর কী করে হয়! ফ্রান্সের দূতাবাসগুলো তো বিভিন্ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় হাজার হাজার ভিসাপ্রার্থী মানুষকে ফিরিয়ে দিচ্ছে! কে তার খবর রাখে! এই আমাকেই তো ভিসা দেবে না বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল, খুব বেশিদিন আগের গল্প নয় সেটি। জিল গনজালেজকে সেই প্যারিস থেকে বাংলাদেশে গিয়ে ভিসার ব্যবস্থা করিয়ে পরে আমাকে নিয়ে যেতে হয়েছিল ফ্রান্সে। এই ফ্রান্স এখন হঠাৎ উন্মাদ হয়ে উঠলো কেন ক্রোধে! আমি বিখ্যাত বলে? মনে মনে হাসি। ভাবি, তৃতীয় বিশ্বের কে না কে প্রথম বিশ্বে এসে হঠাৎ বিখ্যাত হলেই বা কার কী যায় আসে! নাকি এ কোনও ভিতরকার দলীয় রাজনীতি! নাকি সত্যিই আত্মসম্মানবোধ! নাকি মিডিয়াই বিরাট খবর করে মানুষের ভিতর জাগিয়েছে সচেতনতা! মিডিয়ার শক্তি কী প্রচণ্ড! আজকে যদি খবরটার প্রচার না হত, খবরটা অত বড় খবর না হত, তবে কেউ জানতেও পারতো না। জানাজানি হওয়ার পর জগত পাল্টে গেল। এই তুচ্ছ ঘটনাটি আজ আন্দোলনের মতো।

আন্দোলনের ফল ভালো। ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে ফোন। ফরাসি দূতাবাস থেকে ফোন। ফরাসি রাষ্ট্রদূত আমার বাড়িতে উপস্থিত। আমি যেন ফ্রান্সের ভিসা গ্রহণ করে পুরো ফরাসি জাতকে কৃতার্থ করি। একবারের ভিসা আর ২৪ ঘন্টার নয়, অনেকটা যতদিন চাই ততদিনের। শুধু তাই নয়, আমি ফরাসি সরকারের মানবাধিকার পুরস্কার পাচ্ছি, সেটির একটি সরকারি চিঠিও দিয়ে গেল। কিছুটা উত্তেজনাও ছিল। কারণ গতকাল স্ক্যানডিনেভিয়ান এয়ারলাইন্স এসএএস জানিয়ে দিয়েছে এগারোটার ফ্লাইট পাল্টে আমাকে সকাল আটটার ফ্লাইটে নিয়ে যেতে হবে। ফরাসি টেলিভিশন ক্রু দুদিন আগে স্টকহোমে এসেছে আমার ফ্রান্স ভ্রমণের ওপর তথ্যচিত্র বানাতে। এসএএস এর কর্তা এই খবর পেয়ে সুইডিশ পুলিশকে

জানিয়ে দিয়েছে এগারোটার ফ্লাইটে তারা আমাকে নেবে না। যেতে হলে আগের ফ্লাইটে যেতে হবে। এসএএসএর বড়কর্তাদের আশংকা টিভি সাংবাদিকদের ভিড় দেখে যাত্রীরা বুঝে যাবে যে তসলিমা আছে বিমানে, তারা সুরসুর করে বিমান থেকে নেমে যেতে পারে। নেমে যাবে ভয়ে, ভয় যদি সন্ত্রাসী মৌলবাদীরা আবার বিমানখানা আস্ত উড়িয়ে দেয় আমাকে মারার জন্য। অগত্যা আমাকে সুইডিশ সিকিউরিটি চিফএর পরামর্শ মানতে হল যে এগারোটার ফ্লাইটে আমি যাচ্ছি না। আটটায় যাবো, কিন্তু এয়ারপোর্টের প্রেস কনফারেন্সে কাউকে জানতে দেওয়া যাবে না যে আমি আগেই পৌঁচেছি প্যারিসে। জানতে দেওয়া যাবে নারও কারণ আছে। জানলে সাংবাদিকরা এএসএকে তুলোধুনো না করে ছাড়বে না। ফ্রান্স থেকে নিরাপত্তাবাহিনীর একটি দল উপস্থিত স্টকহোমে, আমাকে নিয়ে যাবে প্যারিসে। সুইডিশ সিকিউরিটিরও কয়েকজন প্যারিস পর্যন্ত গেল আমার সঙ্গে।

প্যারিস বিমান বন্দরে পৌঁছে দেখি এলাহি কাণ্ড। আমাকে নামানো হল বিমান থেকে আলাদা সিঁড়ি দিয়ে। নামিয়ে সোজা গাড়ি। গাড়ি চলতে শুরু করলে দেখি সামনে পেছনে অনেকগুলো গাড়ি। সবার আগে ইউনিফর্মড পুলিশের আটটি মোটর সাইকেল। ফ্রান্সে পুলিশ থাকবে বেশি শুনেছিলাম, তাই বলে এত বেশি!

শার্ল দ্য গোল বিমান বন্দরে আমাকে একটি ঘরে বসানো হল। বোমা-কুকুর চারদিকে। যতদূর চোখ যায় পুলিশি পোশাকের পুলিশ। সাজ সাজ রব।   আমার বড় ভয় লাগে। যেন গোটা জগত জয় করে রাজা ফিরেছে রাজ্যে। তার জন্য পাইক পেয়াদা সৈন্য সামন্ত দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে মাঠ ঘাট শহরবন্দর। তাই তো! এসব হচ্ছে কী! বুকের ভিতর টিপটিপ করে। পুলিশ একসময় আমাকে একটি বড় ঘরে নিয়ে যায়, ঘর ভর্তি মানুষ গিজগিজ করছে। একটি বড় টেবিল পাতা। টেবিলের মাঝখানে অগুনতি মাইক্রোফোন। জগতে কোনও প্রলয়ঙ্করী ঘটনা ঘটলে বিরাট কোনও প্রেস কনফারেন্সে কিলবিল করা সাংবাদিকরা এসে স্পোকসপারসনের মুখের সামনে প্রচুর মাইক রেখে যায়, এ ঠিক তেমন। কিন্তু কী ঘটেছে এ জগতে হঠাৎ যে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে! একে অবশ্য কাঠগড়া বলবে না

কেউ, বলবে সিংহাসন। সিংহাসনে কেন বসবো আমি, কাকে জিজ্ঞেস করবো। ভয়ে তখনও বুক ঢিপঢিপ। শত শত সাংবাদিক সামনে। এই প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করেছে রিপোর্টার্স সা ফ্রন্টিয়ার্স, ফন্যাক আর নোভেল অবজারভেতর। পৃথিবীতে যেখানেই সাংবাদিকদের ওপর হামলা হচ্ছে, রিপোটার্স সাঁ ফ্রান্টিয়ার্স,   সেই সাংবাদিকদের বাঁচাচ্ছে, এই সংগঠন মেডিসঁ সাঁ ফ্রন্টিয়ার্সের মত, পৃথিবীতে যেখানে মানুষ অসুস্থ হচ্ছে, এই সংগঠন সেখানে গিয়ে অসুস্থদের চিকিৎসা করছে। ফন্যাক ফ্রান্সের বইপত্রের সবচেয়ে বড় আধুনিক দোকান।   প্রতিটি শহরেই আছে ফন্যাক। ফ্রান্সেরও সীমানা ছাড়িয়ে এখন ফন্যাক ইওরোপের অনেক দেশে। নোভেল অবজারভেতর ফ্রান্সের সবচেয়ে উন্নতমানের সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ের ম্যাগাজিন। এদের আয়োজনে এই অনুষ্ঠান। আমাকে বলতে হবে কিছু, কী বলব আমি জানি না। হয়ত পাঁচ দশ মিনিট কিছু, যে, ফ্রান্সে আমি এসে আমার খুব ভালো লাগছে, আপনারা যে পাসকোয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়েছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে যদি ফ্রান্স না দাঁড়ায় মুক্তচিন্তার স্বাধীনতার পক্ষে, তবে দাঁড়াবে কোন দেশ! ফ্রান্সই তো উদাহরণ ছিল এসবের, এখনও কেন হবে না। কোনও অন্যায় আপনারা মেনে নিইনি, আপনাদের তাই আমার মনে হচ্ছে সবচেয়ে আপন লোক। নিজের দেশে আমি অন্যায় মানিনি বলে দেশ থেকে   আমি বিতাড়িত....। না, এসব আমি লিখে আনিনি। সে উপদেশ আমাকে কেউ দেয়নি। আমার কাছে বরং লেখা আছে একটি কাঠখোট্টা প্রবন্ধ, সেটিই সমবেত সুধী এবং সাংবাদিকদের সামনে পড়ি। বাধ্য হয়ে শুনতে হয় তাদের। আমার বক্তব্যে ফ্রান্সের পাসকোয়া আর ভিসা ঘটনার কোনও উল্লেখ নেই। ফ্রান্সের সাহিত্য সংস্কৃতির কথা আছে। ফরাসি সংস্কৃতির সঙ্গে আমার বাঙালির সংস্কৃতির মিলের কথা আছে। একটি বাক্য কিন্তু ওতে বেশ, *কে একজন জানি না কবে বলেছিল যে পৃথিবীর সব মানুষেরই দুটি মাতৃভূমি, একটি তার নিজের যেখানে সে জন্মেছে, আরেকটি হল ফ্রান্স।* ফ্রান্সের এই প্রতিবাদী রূপ দেখে এ তো ঠিক যে আমি মুগ্ধ। ফ্রান্সের মানুষের সঙ্গে

একাত্মবোধ আমি করতেই পারি। ফ্রান্সকে খুব আপন আমার মনে হতেই পারে। মনে হতে পারে বড় এক আশ্রয়, এক নিরাপত্তা।

এখন আর নিখিল সরকারও আমাকে লুকিয়ে রাখতে বলেন না যে আমি নির্বাসিত একজন লেখক। তিনি এখন আর মানুষকে ধোঁকা দিতে বলেন না এই বলে যে আমি ইওরোপে বিশ্রাম নিতে এবং লিখতে এসেছি। সম্ভবত তিনি মনে করছেন যে দেশে যাওয়া আমার সহসা হচ্ছে না। আর সকলে যখন জানেই ভিতরের সত্যটা, যেহেতু চারদিকে বলা হচ্ছেই যে আমি দেশ থেকে নির্বাসিত লেখক, পশ্চিমের আশ্রয়ে আছি, সেখানে বিশ্রাম বিশ্রাম বিশ্রাম করতে এসেছি বলে চিৎকার করতে থাকলে আর কিছুই নয়, মিথ্যুক হিসেবেই চিহ্নিত হব। বিশ্রামের জন্য এসেছি তো বিশ্রাম শেষ হওয়ার কথা এতদিনে, যাচ্ছি না তো ফিরে দেশে! নিখিল সরকার ভেবেছিলেন, যে আমাকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দেশে আন্দোলন হবে। নিতান্তই তাঁর অলীক কল্পনা। আমি তো জানতাম যে ও জিনিসটি কস্মিনকালেও ও দেশে হবে না! নিখিল সরকার বিশাল বুদ্ধিজীবী, কিন্তু কোনও একটি দেশের সমাজে দীর্ঘদিন বাস না করলে,সেই সমাজের আসল চেহারা কোনওদিন চেনা যায় না, আর, কেবল বুদ্ধি দিয়েই ভবিষ্যতবাণী করলে সেটা বেশির ভাগই ভুল প্রমাণিত হয়। তিনি অনুমান সঠিক করেননি। বাংলাদেশে এ অবদি একটি প্রাণীও বলেনি, *ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরুক, তসলিমাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক।* সবাই যে যার মতো আছে। যে যার মতো সুখে। তসলিমার কথা ভাবার দুদণ্ড ফুরসত নেই কারও। কত তসলিমা মরে যাচ্ছে প্রতিদিন। আর এক তসলিমাকে দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কার খেয়ে দেয়ে কাজ পড়েছে যে করবে!

আমার পাশে রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্সের রোবার্ট মিনার্ড, ফন্যাকের বড়কর্তারা, নোভেল অবজারভাতের এর সম্পাদক জঁ দানিয়েল, এডিশন স্টকএর ক্রিশ্চান বেস আর মনিক নেমের। সাংবাদিকদের ভিড়ে একটি চেনা মুখ মধ্যে। জিলের মুখ। জিলের দিকে চোখ পড়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। মিষ্টি হাসছে আমার দিয়ে চেয়ে। জিলকে দেখে আমার খুব

আনন্দ হয়। তাকিয়ে হাসি, কনফারেন্স ভুলে জিলের সঙ্গে কথা বলতে থাকি, চোখ ও ঠোঁটের ইঙ্গিতে।

বিশাল কাণ্ড। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ আমার ওপর। বড়রা লাইন দিয়ে গালে গালে ঠেকিয়ে চুমু খায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের শেষ নেই। প্রশ্ন কিছু বুঝি কিছু বুঝি না। আমার উত্তরও ওরা কিছু বোঝে, কিছু বোঝে না। একজন জিজ্ঞেস করে, *তসলিমা আপনি কী হিসেবে নিজেকে দেখেন? লেখক? নারীবাদী? মত প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষের প্রতীক? কী?* আমি ম্লান হেসে উত্তর দিই, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজেকে ভাবতে দেওয়া হয় কি? আমার চারদিকে আক্ষরিক অর্থে শত শত পুলিশ। বোমা শোঁকার কুকুর নিয়ে হাঁটছে পুলিশ বন্দরের সর্বত্র। আমাকে দ্রুত বের করে নিয়ে গাড়িতে বসানো হল। সঙ্গে ক্রিশ্চান বেস। সত্যিকার উচ্চ বিত্তের, উচ্চ রুচির অভিজাত ফরাসি মাদাম। পুলিশের সারি সারি ভারি ভারি গাড়ি। আমার গাড়ির সামনে অনেকগুলো মোটর সাইকেল, তারপর ছটি পুলিশের কালো গাড়ি, পিছনে একইরকম ছটি পুলিশের গাড়ি। আর সবার পিছনে সাংবাদিকদের। যেখানে ফ্রেডেরিক লেফ্রয়, আর্তে টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমার ফ্রান্স ভ্রমণের ক থেকে চন্দ্রবিন্দু ফিতেবন্দি করছে।

এই বহর যায় বিমান বন্দর থেকে সব ছাড়িয়ে মাড়িয়ে প্যাঁ পুঁ বাজিয়ে সবার আগে, আগুনের মত ছুটে, ফ্রান্সের সবচেয়ে দামি এবং নামি হোটেল প্যারিস শহরের মধ্যিখানে রিৎজ হোটেলে। ভিতরে ঢুকে এক ঝাড়বাতি দেখেই মাথা ঘুরে যায়। যেন স্বর্গে এলাম। ঝকঝক ঝলমল করছে চারদিক। আমাকে যে ঘরে ঢুকোনো হয়, তা এই হোটেলের সবচেয়ে সিক্রেট ঘর, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার জন্য ঘর। সেই ঘরের পাশে দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে। একটি আমার নিরাপত্তারক্ষীদের, আরেকটি আমার মিটিংএর। আমার যে শোবার ঘরটি, ওতে বিশাল বিশাল ফুলের তোড়া। কত মানুষ, কত সংগঠন যে অভিনন্দন জানিয়েছে। আমি কোথায় আছি, এসব তো সাধারণ মানুষের জানার বাইরে। অভিনন্দন এসেছে অসাধারণ

মানুষদের মধ্য থেকে। পরিচিত অনেকে ভিড় করেছিল দেখা করার জন্য। পুলিশ সকলকে জানিয়ে দিয়েছে তসলিমা এই হোটেলে নেই অথবা দেখা হবে না।

আমার পরনে সার্ট প্যান্ট কোট। দেশের বানানো। কোটটা ছোটদার। সার্ট প্যান্ট ঢাকার বঙ্গবাজারের। সবই বেঢপ। বেঢপ ছাড়া আমার নেই কিছু পরার। কটা শাড়ি আছে। আমার পশ্চিমি পোশাক পশ্চিমের কারও পছন্দের পোশাক নয়। শাড়ি পরো। শাড়ি পরো। শাড়িতে মানায় নাকি বেশি। শাড়ির প্রশংসা ক্রিশ্চানের মুখে। লম্বা একটি স্কেজুয়াল ক্রিশ্চান ধরিয়ে দিয়েছেন

হাতে। ফোন নাকি আসছেই আরও অনুষ্ঠানের আবেদন নিয়ে। নাকচ করে দিচ্ছেন মাদাম বেস। চল চল। তৈরি হও। সারাদিনই এটা সেটা। টেলিভিশনের অনুষ্ঠান। লাইভ। ফ্রান্সের সবচেয়ে উঁচুমানের সাহিত্য শিল্প বিষয়ক অনুষ্ঠান। পরিচালক জঁ ক্যাবাডা। টিভি সেন্টারে পৌঁছোতেই ক্যামেরার দৌড়োদৌড়ি শুরু হল। জঁ ক্যাবাডা নিচে নেমে এলেন আমাকে রিসিভ করতে। বার্নার্ড পিভো এসেছিলেন দেখা করতে আমার সঙ্গে। খুব ঘুম পাচ্ছিল আমার। আবার ক্ষিদেও। অতি সামান্যই সৌজন্য বিনিময় করলাম। আমার তো দেখা বা বোঝা দথনও হয়নি বের্নার্ড পিভো কী অনুষ্ঠান করেছিলেন। কী ছিল তাঁর সেই অসাধারণ প্রতিবাদের ভাষা। সেই খালি চেয়ার।

নোবেল পুরস্কার পাওয়া ওলে সোয়েঙ্কা, মারিয়া ভারগাস লোসা, জঁ দানিয়েল, উইলিয়াম বয়েড। এরকম কয়েকজন। অনুষ্ঠান পুরোটাই আমাকে নিয়ে। সকলের সিদ্ধান্ত, তসলিমা ভলতেয়ারের চেয়েও বেশি সাহসী। আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল বেশ, কিন্তু উত্তর ভালো দিতে পারিনি। ক্ষিধে আর ক্লান্তির ওপর জমেছিল স্নায়ুর চাপ। লাইভ অনুষ্ঠান বলেই কী না কে জানে। তাছাড়া ফরাসি, ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদির মধ্যে পড়ে কিছুটা বোকা বনে গিয়েছিলাম। দুঘন্টার অনুষ্ঠান। শেষ হলে আরেকটি টিভি চ্যানেল আমার আর ওলে সোয়েঙ্কার সাক্ষাৎকার নিল।

আমি এরকম বিশাল কোনও টেলিভিশনের ভিতরটা দেখিনি। আলো আর রঙের বন্যা বইছে যেন। সবাই উপস্থিত। আমাকে ঢোকানো হয়েছে শেষ মুহূর্তে। আমন্ত্রিত দর্শকও আছেন বসে। ঠিক পৃথিবীর কোনও জায়গায় আছি বলে আমার মনে হয় না। সব কিছু কেমন যেন দূরের, শত আলোকবর্ষ দূরের বলে মনে হয়। আমার কানে একটি যন্ত্র লাগিয়ে দিয়ে বলে দেওয়া হল, আমি বাংলা অনুবাদ শুনতে পাবো কানে, সবকিছুর, বাংলায় বলতে হবে আমাকে যা কিছু বলার। এই অজানা অচেনা পরিবেশে বাংলা এল কোত্থেকে! আনানো হয়েছে, সেই দুজন কম বাংলা জানা মেয়ে যাদের নেওয়া হয়েছিল স্ট্রাসবুর্গের আর্তে টিভিতে, ওদেরই খুঁজে বের করা হয়েছে। বাংলা শুনে স্বস্তি লাগে, বাংলা এক ঝলকে কিছু সাহস আমাকে দিয়ে যায়। ভালো, এই টেনশনে ইংরেজি শব্দ খুঁজতে আমাকে অ্যা অ্যা করতে হবে না। গতকাল সারারাত ঘুম হয়নি, দুশ্চিন্তায়।

ঝিক ঝা ঝা ঝিক ঝা ঝা। অনুষ্ঠানে শুরু হয় গেল। প্রথমেই মাথার ওপরে বিশাল পদার্য় দেখানো হচ্ছে মোল্লাদের মিছিল, দেখানো হচ্ছে হাবিবুর রহমানের ফতোয়া। বাংলাদেশের তুমুল তাণ্ডবের সময় গিয়ে করা তথ্যচিত্র। ফরাসি তথ্যচিত্র থেকে অংশ বিশেষ দেখানো হচ্ছে। তারপর প্রশ্ন আমাকে, দিনগুলি তখন আমার কেমন ছিল, কেমন আছি এখন। দেশের অবস্থা কেমন, আদৌ কি কখনও ফিরতে পারবো, কেন দেশে ইসলামি মৌলবাদ বাড়ছে বলে মনে করি, সরকারের ভূমিকা কী। বলি যা জানি, যা বিশ্বাস করি। আমার বিশ্বাস আমি ফরাসি থেকে বাংলা সঠিক পাচ্ছি না অনুবাদ, আর আমার বাংলাও ফরাসি ভাষায় ঠিক মত অনুদিত হচ্ছে না। আমার বিশ্বাস মৌলবাদ শব্দটির মানে ওই খুকি জানে না, যার বাবা ভারত থেকে চল্লিশ বছর আগে চলে এসেছিল এ দেশে। এ দেশে এসে এদেশি বিয়ে করে যে আধফরাসি আধভারতীয় জন্ম দিয়েছে, যে পরে কোনও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ থেকে বাপের কালচারকে ভালোবেসে হিন্দি শিখেছে দুকলম, এবং ভাবতে শিখেছে ভারতীয় উপমহাদেশের সকল ভাষার অনুবাদক হিসেবে, সেই খুকিটিকে, অনুবাদক-খুকিটিকে আমি দেখেছি, আমি বাংলা বললে সে কাগজে দ্রুত লিখে নিচ্ছে কী বলেছি, লিখছে হিন্দি ভাষায়।

ফ্রান্স একটি সুন্দর দেশ। আমি ফ্রান্সে বাস করি। আমার বাড়ি বড়। আমি ভাত খাইয়া থাকি। আমার বিশ্বাস এরকম কিছু বাক্যের অনুবাদ ছাড়া ওই খুকির পক্ষে অন্য কিছু সম্ভব নয়। আমার কথার অনুবাদ গমগম করে স্টুডিওর মধ্যে বাজছে। তা আমার কানে এসে লাগছে। আমি পাঁচটা বাক্য বলি, তো একটির অনুবাদ করা হয় থেমে থেমে। খুকি থেমেই থাকে। এরা কোনও প্রফেশানাল অনুবাদক নয়। বাংলা ফরাসির জন্য প্রফেশনের প্রয়োজন হয় না। বুকের ঢিপঢিপ চলে গিয়ে আমার রাগ হতে থাকে। যদি মানুষ নাই বোঝে আমি কী বলছি, তবে কী লাভ। হাঁ হয়ে আছে সমস্ত ফরাসি দেশ আমি কী বলবো তা দেখার জন্য। আর এখানেই হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। বাকিরা তসলিমা প্রসঙ্গে মৌলবাদ, বাংলাদেশ, সমস্যা, সমাধান, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে করা প্রশ্নের উত্তর দিলেন। একবার প্রশ্ন বুঝতে না পেরে হাবার মত জিজ্ঞেস করলাম, *আপনি কি আবার বলবেন কি প্রশ্ন করেছিলেন?* আমার এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন না করে জঁ মারি অন্য একজনকে প্রশ্ন করলেন। নিজের দিকে বড় রাগ হচ্ছিল। কিন্তু কী আর করা, আনাড়ি দুটো খুকি নিজেরাই ঘাবড়ে বসে আছে নিশ্চয়ই। আমাকে তেমন কিছু দিতে পারছে না, আমার কাছ থেকে নিতেও পারছে না কিছু। তার চেয়ে ইংরেজি থেকে ফরাসি অনুবাদের ব্যবস্থা করলে ঢের ভালো হত। কিন্তু ফরাসি দেশে যার যার মাতৃভাষাকে সম্মান করার রীতি। ইংরেজি ভাষাকে জাতকে কোনওটাকেই তারা পছন্দ করে না। বিশ্বায়নের চাপে ইংরেজিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে বটে, কিন্তু এ ভাষা পারলে তারা উচ্চারণ করতে চায় না।

টেলিভিশনে বের্নার্ড পিভো বসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি অতি সামান্যই সৌজন্য বিনিময় করলাম। আমার তো দেখা বা বোঝা পরে হয়েছে বের্নার্ড পিভো কী অনুষ্ঠান করেছিলেন। কী ছিল তাঁর সেই অসাধারণ প্রতিবাদের ভাষা। সেই খালি চেয়ার।

২৪.১১

জ্যাক শিরাখ প্যারিসের মেয়র। একসময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। আসছে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট। তিনি দেখা করতে চাইছেন। আমার যাওয়া মানেই তো একধরনের সার্কাস। রাস্তা ব্লক হয়ে যায় একঘন্টা আগে থেকে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। প্যাঁ পুঁ বাজিয়ে ছুটল গাড়ির শোভাযাত্রা। শিরাখ হোটেল দ্য ভিলে (টাউন হল বা সিটি হল, পৌরসভাকে ফরাসি ভাষায় হোটেল দ্য ভিল বলে) লাল গালিচা পাতা সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে আসতেই তিনি আমাকে গালে চুম্বন করে নিয়ে গেলেন ওপরে। বসার পর চোখের কী একটা ইঙ্গিত করলেন জ্যাক শিরাখ। অমনি লাইন ধরে ক্যামেরাধারী রোবটের মতো দড়ির ওপারে দাঁড়িয়ে ক্লিক ক্লিক করলো আর চারদিক ঝলসে গেল আলোয়। পাঁচ মিনিট ছবি নেওয়া, পাঁচ মিনিট পর সব ক্যামেরা বিদেয়। বিদেয়ের পর তিনি ফরাসি ভাষায় কথা বললেন, সঙ্গে দোভাষী নিয়ে। দোভাষীর মাধ্যমে কথা শেষ পর্যন্ত তিনি চালিয়ে যাননি। নিজেই ধীরে ধীরে প্রচণ্ড ফরাসি উচ্চারণে ইংরেজিতে কথা বললেন। আলাপ শুরু হল আমাদের। মূলত মুসলিম সমস্যা। অবাক কাণ্ড, তিনি আমার কাছে পরামর্শ চাইলেন কীভাবে ফ্রান্সের মুসলিম মৌলবাদী সমস্যা দূর করবে ফ্রান্স সরকার। হেসে ওঠা ছাড়া আর কিছু আমার করার ছিল না। হাসতে হাসতেই বললাম, *আমি তা পারবো কেন? এ আপনাদের দেশ, আপনারা সমাধান করুন। আমি সামান্য লেখক মানুষ। এই সমস্যার সমাধান আমি করবো কী করে, ফ্রান্স সরকারই আশা করছি যথেষ্ট ক্ষমতা রাখেন এসব সমাধানের।*

শিরাখ মাথা নেড়ে বললেন, *প্যারিসের শহরতলিতে উগ্রপন্থীদের নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। মসজিদের সব ইমাম যে মন্দ, তা নয়, কিছু ইমাম ভালোও আছে। আমি শহরতলিতে আলাদা করে মুসলমান- ইস্কুল করে দিতে চাই। আপনি ইমামদের সঙ্গে কথা বলুন।*
ইমামরা সাধারণত মৌলবাদী হয়, এ কথা শুনে তিনি প্রতিবাদ করে বললেন, মোটেও না, এরা খুব আধুনিক।

মুসলমানদের সংখ্যালঘু -নিরাপত্তহীনতাবোধ দূর করার জন্য তিনি মুসলমানদের জন্য আলাদা ইস্কুল করে দিতে চাইছেন। আমি বললাম, *আলাদা ইস্কুল কেন! আলাদা ইস্কুল করলে তো ওদের আরও আলাদা করে দেওয়া হল। ওরা ফরাসি সমাজের মূল স্রোতে মিশতে আরও পারবে না। ওরা আলাদা মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠবে। বেশি মুসলমান হবে, বেশি মৌলবাদী হবে, এ তো ওদের জন্যও ভালো নয়, এই ফরাসি দেশের জন্যও ভালো নয়। ইস্কুলগুলো তো সেকুলার হওয়াই উচিত একটি সেকুলার রাষ্ট্রে।*

শিরাখ আরও কিছু বলতে চাইছিলেন, আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, *আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়। সব রিলিজিয়াস ইস্কুল তুলে দিয়ে কেবল পাবলিক ইস্কুল রাখুন।*

তিনি মোটেও তা মেনে না নিয়ে ক্যাথলিক ইস্কুলের প্রশংসা করে বললেন, রিলিজিয়াস ইস্কুলে রিলিজন শেখানো হয় কিন্তু কোনও জবরদস্তি নেই যে তাকে রিলিজিয়াস হতে হবে। অনেকে এ ধরনের ইস্কুল চায় তো!

যেহেতু ক্যাথলিক ইস্কুল বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে, তাই শহরতলীতে পাঁচ মিলিয়ন মুসলমানের জন্য এখন দরকার হয়ে পড়েছে মুসলিম ইস্কুল। সেখানে যে মেয়েরা ঘোমটা পরতে চায়, পরতে পারবে। পাবলিক ইস্কুলে যেহেতু ঘোমটা এবং অন্যান্য ধর্মীয় চিহ্ন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি অবশ্য এধরনের যুক্তির পক্ষপাতি নই। আমার সাফ কথা, ফ্রান্সের রিলিজিয়াস ইস্কুল রিলিজনকেই প্রধান পাঠ্য করছে না বলে রিলিজিয়াস ইস্কুল তৈরিতে উৎসাহ দিতে হবে একেমন কথা! এ যুগে রিলিজিয়াস ইস্কুল জিইয়ে রাখার কোনও মানে হয় না আর ক্ষুদ্র সমস্যা মেটাতে গিয়ে খ্রিস্টান ইস্কুল, মুসলিম ইস্কুল ইত্যাদি বানানো সত্যিকার কোনও সমস্যার সমাধান নয়। বরং এ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পরে আরও বড় সমস্যা হয়ে ঘাড়ে চাপে। শিরাখ বললেন, *ঘোমটা পরা মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলুন। কেন তারা ঘোমটা পরছে জিজ্ঞেস করুন। কিছু পরামর্শ দিন ওদের। আমি মনে করি ওরা ঘোমটা পরছে ওদের বাপ ভাইয়ের চাপে। অল্প বয়সের ছেলে ছোকরারাই এখানে মৌলবাদী।*

কথা দিলাম পর্দানসীন মুসলমান মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবো। বাংলা এবং ফরাসি ভাষায় মুসলিমদের মুসলমান বলা হয়। ফরাসি এবং বাংলার এই মিল আমাকে মুহূর্তের জন্য এক চিলতে বিস্ময় দেয়।

জ্যাক শিরাখ আমাকে একটি মূল্যবান উপহার দিলেন। দিলেন ভলতেয়ারের ধর্ম বিষয়ক পাঁচটি বই। সতেরোশ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত বইগুলোর প্রথম সংস্করণ। ছোট ছোট রেক্সিন বাঁধাই বই। প্রকাশ হয় সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে। তখন তো ভলতেয়ার নিজের দেশ ফ্রান্স থেকে নির্বাসিত। *এক নির্বাসিত মানববাদী নাস্তিক লেখকের গ্রন্থ আরেক নির্বাসিত মানববাদী নাস্তিককে উপহার দিয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।* বললেন শিরাখ। আমাকে বিদেয় দিতে তিনি নিচে গাড়ি পর্যন্ত এলেন। সাংবাদিকরা ঘিরে ধরেছিল শোনার জন্য কী আলোচনা হল আমাদের। আমি কোনও মন্তব্য করিনি। আমি চলে যাওয়ার পর ছেঁকে ধরলো সাংবাদিকরা শিরাখকে। কী কথা হয়েছে আমার সঙ্গে তাই জানতে।

গাড়িতে আমার সঙ্গী ক্রিশ্চান বেস। আমরা দুজন শিরাখের ফ্রান্সের মৌলবাদ-সমস্যা সমাধানের উদ্ভট প্রস্তাব নিয়ে এক পশলা হেসে নিলাম।

এরপর জ্যাক তুবো। গিয়েই দেখি আগের মতোই সাংবাদিকদের ভিড়। ভিড় সরিয়ে আলাদা ঘরে। শিরাখের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা হয়েছে। তুবো ফরাসিতে বললেন। বাঙালি ইন্টারপ্রেটার রেখেছিলেন তিনি। রাজনীতি অর্থনীতি মৌলবাদ পশ্চিম পূব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। এরপর যা হয় তাই, সাংবাদিকদের প্রশ্ন। আমার সময় নেই। সাংবাদিকদের ভিড় সরিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হয় গাড়িতে। গাড়ি প্যাঁ পুঁ বাজিয়ে ছুটে চলে। মানুষ ইতিমধ্যেই জেনে গেছে কে যাচ্ছে, কারণ টিভি রেডিওর প্রধান খবর, তসলিমা এসেছে। আসার পর থেকে প্রচার মাধ্যম এই নিয়ে মেতে আছে। রাস্তায় মানুষ উৎসুক দাঁড়িয়ে থাকে আমাকে দেখবে বলে। কেউ দেখে আবার অন্যকেও দেখায়। আমার বেশ সংকোচ হয় এরকম চিফ অব দ্য স্টেটের মতো চলতে। ক্রিশ্চানকে বলি, এত পুলিশ দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না।

ক্রিশ্চান বলে, এ গভরমেন্টের ব্যাপার। আমাদের করার কিছু নেই।

--কত পুলিশ মোট?

-- জানতাম আড়াইশ। আজ পত্রিকায় ছাপা হয়েছে বারোশ। সিকিউরিটির চিফ সঙ্গে থাকছে। টপ লেবেল নেমে এসেছে।

রাগ হয় শুনে। বলি -- এসবের কোনও মানে হয় না। দুজন পুলিশই আমার জন্য যথেষ্ট ছিল। যদি তারা বেশি সিকিউরিটি দিতে চায় সেক্ষেত্রে দুজনের জায়গায় ছজন, বড়জোর দশজন, ব্যস। ফ্রান্সে আমাকে কেউ খুন করার জন্য বসে নেই। আমি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে চাই। রাস্তায় সাদাসিধে মানুষের মতো হাঁটতে চাই। অথচ আমি কিনা তাদের চোখে মুখে ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাচ্ছি, তারা আমার নাগাল মোটেই পাচ্ছে না।

এরপর রিপোর্টার্স সাঁ ফ্রন্টিয়ার্সের অফিস। অফিসের সামনে গাড়ি থেকে নামতেই দেখি প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, হাততালি দিচ্ছে, বলছে ব্রাভো তসলিমা। একটু চমকালাম। ভাবতে চেষ্টা করলাম দেশটির নাম ফ্রান্স। এখানের লোকেরা চাষাভুষো নয়, এরা আমাকে ব্রাভো বলবে বলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি খানিকটা অপ্রতিভ হয়েই পুলিশের সঙ্গেই তীব্র গতিতে ভেতরে ঢুকে গেলাম। সাজ সাজ রব অফিসে। অফিস ঘুরে দেখানো হল। জিল ছিলই অফিসে। ওরা আমার জন্য দুবছর ধরে কাজ করছে। রবার্টের সঙ্গে জিলের সংঘাত চলছে, তা চললেও রবার্টকে আমার বেশ কর্মঠ এবং প্রতিভাবান বলেই মনে হয়। প্রায় একা এই সংগঠন দাঁড় করিয়েছে। যখন বেরিয়ে এলাম আরএসএফ অফিস থেকে, দেখি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আবারও অসংখ্য মানুষ। আমাকে দেখেই শুরু হল হাততালি। এমন দৃশ্য আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল স্বপ্নেও ভাবিনি।

রাস্তা বন্ধ। অর্ধেক প্যারিসে কোনও যান বাহন নেই। নিষিদ্ধ করা হয়ে গেছে সাধারণের জন্য। লাল বাতি চারদিকে। রাস্তায় যান বাহন চলবে না, যেহেতু সেসব রাস্তায় আমার গাড়ি চলবে। যেদিকে গাড়ি চলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ প্যাঁ পুঁ গাড়ির বাহার দেখতে থাকে, এবং অনুমান করতে চেষ্টা করে কোন গাড়ির ভিতর আমি। আমাকে নিজ চোখে দেখার সাধ্য তাদের নেই। কালো কাচ। ভিতর থেকে আমি তাদের দেখতে পাচ্ছি।

তারা আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। পুরো ফ্রান্স জানে আমি ফ্রান্সে এসেছি। সুতরাং কে যায় কার গাড়ির বহর অর্ধেক প্যারিসকে বন্ধ রেখে, সে তো সকলে জানে। আমার এই জীবনে আমি এত কিছু দেখেছি, এভাবে কারও গাড়ি যেতে কোনও রাস্তায়, আমি দেখিনি। পুলিশ দেওয়া হয়েছে, পুলিশেরা জানালেন, বারোশো। হ্যাঁ বারোশো পুলিশ আমার নিরাপত্তার জন্য চব্বিশ ঘন্টা কাজ করছে। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে থাকে ভয়ে। প্যারিসের মত ব্যস্ত শহরে যানবাহন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যে সব রাস্তায় আমি চলব, সেসব রাস্তায়, আমার ঝিমঝিম করতে থাকে মাথা। আমার বিরুদ্ধে না আবার সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়! ফরাসিরা প্রতিবাদ করে যে কোনও ওলোটপালোটে। সরকারি এই অনাচারের প্রতিবাদও নিশ্চয়ই করবে। তাদের এই দুর্ভোগের জন্য মাঝখান থেকে আমার ওপর গিয়ে যদি সব রাগ পড়ে! এসব করার কী যুক্তি। কানাঘুষায় শুনি, পাসকোয়া এমন নিরাপত্তার আয়োজন করে প্রমাণ করতে চাইছেন যে আমাকে যে প্রথম ভিসা ২৪ ঘন্টার বেশি দেওয়া হয়নি, তার কারণ আমার জীবনের হুমকি আছে ফ্রান্সে, হুমকি আছে বলেই এমন কড়া কঠিন নিরাপত্তার প্রয়োজন হচ্ছে। নিজের অন্যায়টিকে এখন এই ভয়াবহ নিরাপত্তার আয়োজন দেখিয়ে মোচন করতে চাইছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

গাড়ি যাচ্ছে ফ্ল্যাকের দিকে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ। পুলিশ দেখে জনতা বুঝে যায় যে আমি যাব, জনতা দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে ছটি গাড়ি, পিছনে ছটি। ও মাঝখানের গাড়ি লক্ষ করে হাততালি দিতে থাকে। আমি ভেতর থেকে সবকিছু দেখে বোবা হয়ে থাকি। ফন্যাক ইওরোপের বড় একটি কালচারাল অরগানাইজেশন। ইওরোপের সাতটি দেশে এদের শাখা আছে। প্রকাশনী, বইয়ের দোকান, লাইব্রেরি নানা রকম কায়দা কানুন এদের। ফন্যাকের মালিক পরিচালক সকলে লাঞ্চে বসলেন। তার আগে আমার শাড়ির আঁচল দেখেই ফন্যাকের ভেতর থেকে হাততালি শুরু হল। ফন্যাকের পরিচালক সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমাকে হাত নাড়তে হল হেসে। লাঞ্চে রবার্ট আমন্ত্রিত ছিলেন। আমি জিলকে নিয়ে আসি। জিল কিছুটা অপ্রতিভ ছিল এমন ফরমাল লাঞ্চে। লজ্জা বইটি কী ভীষণ বিক্রি হচ্ছে তাদের

বইয়ের দোকানে তাই বারবার করে আয়োজকরা বললেন। বললেন প্রচুর পাঠক এসে বই রেখে গেছে যেন সই করে দিই। ব্যাকডোর দিয়ে নেমে আসতে হল। তাই হচ্ছে। ফ্রন্টডোরের বালাই নেই সিকিউরিটি ব্যবস্থায়। চারপাশে পুলিশি পোশাকের, সাদা পোশাকের অসংখ্য পুলিশ। পনেরোদিন আগে থেকেই কোন দরজা দিয়ে কোথায় ঢুকব, কোন পথ দিয়ে কীভাবে যাবো, সব কিছুর নকশা তৈরি করে রেখেছে। টেলিভিশন ক্যামেরা সবসময় দৌড়োচ্ছে, ফটোগ্রাফার দৌড়োচ্ছে আগে আগে, আর ফ্রেডেরিক তো আছেই, ও আমার দশদিনের একটি তথ্যচিত্র করছে, আর্তের পক্ষ থেকে। বের্নার্ড আঁরি লেভি চিঠি পাঠিয়েছিল অনুমতি চেয়ে ৩০ তারিখ আর্তে একটি এক ঘন্টার পোর্টেট তৈরি করতে চায় আমার। ফ্রেডেরিক বলেছে প্রথম দিনই, কোনও বিরক্ত করবো না, কোনও প্রশ্ন না, কোনও উত্তর না, কেবল যা হচ্ছে তোমাকে নিয়ে, তাই নিঃশব্দে ক্যামেরা বন্দি করবো। রিৎজ হোটেলে ফিরে আসতে হল কিছুটা বিশ্রামের জন্য। বিশ্রাম শেষে বিকেলে ল্যূভর মিউজিয়াম। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, ল্যূভর-এ আমার জন্য প্রাইভেট ভিজিটের ব্যাবস্থা করা হয়েছিল। কোনও পাবলিক ঢুকতে দেওয়া হয়নি। মিউজিয়াম দেখাচ্ছিলেন ল্যূভরএর ডিরেক্টর। প্রতিটি ছবি , প্রতিটি ভাস্কর্যের তিনি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করছিলেন যেন একটু ভুল ভাল হলে তাঁর চাকরি যাবে। অতিরিক্ত সচেতন ছিলেন তিনি আমাকে তুষ্ট করতে। ল্যূভরের সিঁড়িতে সিঁড়িতে পুলিশ নানা কায়দায় দাঁড়ানো ছিল। এসব দেখে ক্রিশ্চানের সঙ্গে এক দফা চোখাচোখির হাসি হেসে নেওয়া হল। ক্রিশ্চান এরপর আমার কানে কানে বলে, তোমার পেছনে দুজন ডাক্তার ঘুরছে, হাতে ডাক্তারি বাক্স নিয়ে, যদি কখনও অসুস্থ বোধ কর। বোঝ এদের আয়োজন। ল্যূভর আমার আগেই দেখা ছিল। তখন এসেছিলাম দোমিনিক আর জঁ শার্ল বারথেয়ারের সঙ্গে। কিছুটা দেখার পর দেখি ল্যূভর বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে, আর দেখতে পারিনি। আর এবার? সকল বন্ধ দুয়ার খুলে গেল একা আমার জন্য। আমাকে স্বস্তি ও সুখ দেবার জন্য দর্শকের জন্য দুয়ার বন্ধ হল। এরা পারেও বটে।

শুধু কি প্যারিসের রাস্তা ঘাট বন্ধ! পুরো লুভর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কোনও দর্শক থাকতে পারবে না। কারণ, আমি দেখব লুভর। এসব কীর্তিকলাপ আমাকে তো আগে জানানো হয়নি। লূভর মিউজিয়াম থেকে দর্শক তাড়িয়ে দেওয়া হল। শত শত পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল লুভর। মিউজিয়ামের ভিতরে পোশাকি পুলিশ দাঁড়িয়ে পড়ল বড় বড় রাইফেল তাক করে। সাদা পোশাকের পুলিশেরাও পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এবার আমি কোথাকার কোন রানি এসেছি আমাকে মিউজিয়াম দেখানোর জন্য স্বয়ং মিউজিয়ামের প্রধান কিউরেটর এসে উপস্থিত। আমি যা দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করি, তা তিনি দেখাবেন। হাঁটছিলাম মিশরের শিল্পকর্ম যেখানে আছে, সেখানে। সেই শিল্পকর্মগুলো বর্ণনা করে করে দেখালেন ভদ্রলোক। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, *আপনি কি কিছু ইসলামি আর্ট দেখবেন?*

আমি বললাম, *ইসলামি আর্ট বলতে কিছু আছে নাকি? মানুষের ছবিই তো ইসলামে আঁকা নিষিদ্ধ।*

--সে থাক। কিন্তু প্রাণীর ছবি ছাড়াও ইসলামি আর্ট তো বেশ চমৎকার।

--শিল্প শিল্পই। আপনি শিল্পকে কোনও একটি ধর্মের নামে যুক্ত করছেন কেন! পশ্চিমের ছবিগুলোকে কি ক্রিশ্চান আর্ট বলে সম্বোধন করেন? নিশ্চয়ই করেন না। এক একটা অঞ্চলের এক একধরনের আর্ট। ওদের ভাগ করা হবে অঞ্চল ভিত্তিতে। ইসলামি আর্ট!! বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ মুসলমান। তাই বলে কি সৌদি আরবের মুসলমানের আঁকা ছবি আর বাংলাদেশের মুসলমানের আঁকা ছবিতে কোনও মিল থাকবে? থাকবে না। তবে ধর্ম আসে কেন শিল্পকে চিহ্নিত করার বেলায়। আমি যদি বাংলার আর্ট বলি কোনও শিল্পকর্মকে। তবে বাংলা নামক জমিতে বাঙালিরা সেই শিল্প তৈরি করেছে। এই বাঙালি হিন্দু বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান যে কোনও কিছুই হতে পারে।

--কিন্তু যত যাই বলা হোক না কেন, ইসলামি আর্ট বলে একটা আর্ট আছেই।

না, ওই আর্ট দেখার আমার সময়ও ছিল না। ইচ্ছেও ছিল না। আমি লুভর তো আগেই দেখে গেছি। আর এভাবে সমস্ত মানুষ বের করে দিয়ে আমাকে দেখানো হচ্ছে এত বড় একটা

মিউজিয়াম, ভাবতেই আমার গা গুলিয়ে ওঠে । আমার মত সাধারণ মানুষের জন্য এই আয়োজন মানায় না। আর আমি চাই না মানুষের ওপর অন্যায় আচরণ করা হোক আমার কারণে। এ একেবারেই নিষ্ঠুরতা। আর এই নিষ্ঠুরতা করা হচ্ছে আমার নামে। আমার তিক্ত হয়ে আসে মন। যত বড় ওরা করতে চায় আমাকে, তত ছোট হয়ে আসি আমি।

এখন কোথায়? ল্যুভরের এক কোনায় নবেল অবজারভেতরের রিসেপশান। দুশ লেখকের মিলন। ৩০ বর্ষপূর্তিতে বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে। সেটি সাজিয়ে রাখা প্রতিটি টেবিলে। নোভেল অবজারভেতর প্রকাশ করেছে সেই ২৯ এপ্রিলের রোজনামচা। সেই রোজনামচা বিশাল আকারে বেরিয়েছে। সকলের হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। ভিড়। আমাকে কোনও ভিড় ছুঁতে পারে না। আমার চারদিকে সাদা পোশাকের সশস্ত্র পুলিশ। কানে তাদের পেঁচানো তার, শুনছে। ঘড়িতে তাদের মাইক্রোফোন। শার্টের হাতের তলে মাইক্রোফোন। খুঁজলে পাওয়া যাবে মাথা থেকে পা অবদি নানান কিছু, বুকে কিছু, পেটে কিছু, জুতোয় কিছু, মোজায় কিছু। শরীরে বাঁধা তাদের মাইক্রো ম্যাক্রো যন্ত্র। জমজমাট ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ পাসকোয়া। সাংবাদিকরা আমার কাছে প্রায় টেনে এনে পাসকোয়াকে দাঁড় করালো। পাসকোয়া এবং আমি -- দুজনকে একসঙ্গে দেখার জন্য প্রতিটি লোক মরিয়া হয়ে উঠলো। দেখতে অনেকটা আলফ্রেড হিচককের মত লোকটি আমাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করে স্বাগতম জানালেন ফ্রান্সে। বললেন, *আপনার দিনগুলি নিরাপদে কাটুক, নিশ্চিন্তে কাটুক, আনন্দে কাটুক।* কাটুক কিন্তু, সাংবাদিকরা আশা করেছিল আমি বোধহয় ঝগড়া করব, কান খাড়া ওদের, পকেটে কথা তুলে রাখার যন্ত্র চালু করা। ঈষৎ হাস্য আর ধন্যবাদ ছাড়া কিছু দিইনি। *লিবারেশন*এর এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলো, *অতপর তসলিমা আপনার সামনে, কী ভাবছেন এই মুহূর্তে?* পাসকোয়া, ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন -- *তসলিমা যতদিন মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে আছে, আমরা ততদিন তার সঙ্গে আছি।* -- এটুকু বলেই কুখ্যাত *২৪ ঘন্টা*র ঝামেলায় যেন পড়তে না হয়, তাড়াতাড়ি কেটে পড়লেন।

ভিড় সরিয়ে সরিয়ে আমার কাছে এলেন একটি লম্বা লিকলিকে দাড়িওলা লোক। বড় বিনীত কণ্ঠে বললেন, *আমার নাম অ্যালেন গিনসবার্গ। আমি আপনাদের দেশে গিয়েছিলাম। লালনের ওপর একটা বই লিখেছি। এই দেখ।* নিজের ঝোলা থেকে একটি বই করে দেখালেন তিনি।

আমি উত্তেজিত। *আপনি অ্যালেন গিন্সবার্গ। আপনার কবিতা আমি অনেক পড়েছি। খুব ভালো লাগে আমার। আপনার যেশোর রোডও আমার পড়া আছে। জানি আপনার কথা অনেক..*

কথা চলতে লাগলো আমাদের। কিন্তু বেশিক্ষণ চলতে পারে না। যথেষ্ট হয়েছে, এবার চলো বলে একটি নির্দেশ আসে। তারকার নাকি কখনও কোথাও বেশিক্ষণ থাকতে নেই। কানে কানে এরকম একটি কথাই ক্রিশ্চান বেস বলেন। হা তারকা! কত ভালো লাগতো যদি অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গে এবং আরও কিছু কথা বলতে উন্মুখ ফরাসি লেখক কবির সঙ্গে কথা বলার সময় হত। কোনও তো কাজ ছিল না। আমাকে বিলাসবহুল রিৎজ হোটেলের বাথটাবের গরম জলে শুয়ে থাকতে হল গিয়ে। ক্রিশ্চান বেস আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে বাড়ি যান।

২৫.১১

সকালে খালিদা মাসহুদি এলেন। সঙ্গে সউয়াদ বেলাদাদ। বেলাদাদ আমাকে ফোনে খুব বলেছিল যে খালিদা আসতে চান স্টকহোমে আমার সঙ্গে দেখা করতে। বলেছিলাম ভীষণ ব্যস্ত আমি, তাকে সময় দেওয়ার সময় নেই। যদি প্যারিসে আসে তবে ভালো। বেলাদাদ উত্তেজিত, প্যারিসে তোমার প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানি। একসেকেন্ড সময় তোমার নেই। কথা দিয়েছিলাম সময় বার করে নেবো। খালিদা আলজেরিয়া থেকে এসেছে প্যারিসে। আমার অনুরোধে ক্রিশ্চান অবশেষে আধঘন্টা সময় বার করেছে। খালিদা মৌলবাদিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে রাস্তায় নেমে। দুবছর থেকে একরকম পালিয়ে আছে। জীবনের ঝুঁকি

নিয়েছে, মৌলবাদিরা তাকে মেরে ফেলতে চাইছে। সে তার জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা শোনালো। কাঁদলো। আর বললো *তোমার কাছে আসার পর প্রয়োজন মনে করছি না সব অভিজ্ঞতা বলার। কারণ তুমি তো বুঝতেই পারো আমরা কেমন আছি।*

খালিদার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বললে ভালো লাগতো কিন্তু সময় নেই। যেতে হবে ফন্যাকে। ওখানে অপেক্ষা করছে পাঠকেরা। ফন্যাকের হলঘরটি বিরাট কিছু নয়। তাই পুরো এগারো তলা ফন্যাক বিল্ডিংএ টেলিভিশন সেট করা আছে, যারা ঢুকতে পারবে না, টেলিভিশনের পর্দায় তারা দেখতে পাবে আমাকে। ফন্যাকে পৌঁছে ভেতরের রুমে দেখি গাদা গাদা বই রাখা, সব সই করতে হবে। ফরাসি অনুবাদ বেরিয়ে গেছে লজ্জার। লজ্জাই রাখা হয়েছে। কিছু সই করলাম। এরপর যেই না এসেছি পাঠকের সামনে, ঘর ফাটানো হাততালি। অনেকে বাইরে দাঁড়িয়ে, ভেতরে ঢোকার জায়গা নেই। মঞ্চে আমার আসনের সামনের টেবিলে বই রাখা। পাঠকরা অভিনন্দন জানালো। কিছু বললাম আমি। আমি তৈরি নই, প্রস্তুত নই কিছু বলার জন্য। আমার সামান্য বক্তব্যে কেউ তৃপ্ত হয় না। আসলে আমি নিজে থেকে কিছু বলার চেয়ে প্রশ্ন শুনে উত্তর দিতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশি। পাঠকরা প্রশ্নও করলো। আলজেরিয়ার এক মেয়ে কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো, বললো, তুমি যে কত বড় প্রেরণা আমাদের জন্য, এ তুমিও জানো না। এক ফরাসি নারীবাদী অভিযোগ করলো, *টেবিলে শুধু লজ্জা রাখা হয়েছে। ফাম মেনিফেস্টিভো কোথায়?* আয়োজকদের অনুরোধ করলাম মেয়েদের নিয়ে লেখা বইটি যেন টেবিলে রাখে। বইটি বেরিয়েছে এডিশন দ্য ফাম থেকে। এতে মেয়েরা উৎফুল্ল। অনুষ্ঠান শেষে দর্শকশ্রোতারা সামনে আসার জন্য চেঁচামেচি শুরু করলো কেবল হ্যান্ডসেক করার জন্য, অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য, আলাদা করে সামান্য কথা বলার জন্য। কিন্তু পুলিশ তাদের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে রাখলো। এরপর ফন্যাক আয়োজিত লাঞ্চ। রেস্তোরাঁয় যাবো, এও পেছনের দরজা দিয়ে। যেতে হয় প্যারিসের ফন্যাকে। ওদিকে আরও একটি বই এডিশন দ্য ফাম থেকে *ফাম মেনিফেস্টেভু।* বই দেখে মেজাজ

খারাপ হয়ে গেছে, নির্বাচিত কলাম বইটি থেকে ধর্ম বিষয়ক আমার মন্তব্যগুলো খামচি দিয়ে তুলে তুলে বই ছাপিয়েছে। সময় নেই এসব ভাবার। বই কেনার জন্য লম্বা লাইন।

হোটেলে খানিক বিশ্রাম নিয়ে টিভি ফাইভ জার্নাল। ওতে যে আমার ইন্টারভিউ নিল, সে গত এপ্রিলেও নিয়েছিল। তবে এবারের আয়োজন আরও বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। রাত আটটায় হোটেল রিৎজে ডিনার। এসব ডিনার রাজকীয়। হাত দিয়ে ভাত মেখে খাওয়ার মেয়ে আমি। বড় অস্বস্তি হয় এমন রাজকীয় ব্যাপার স্যাপারে। নোবেল অবজারভেতরের নোবেল ডিনারে আমাকে জঁ দানিয়েলের পাশে, আমাকে রথীমহারথীর পাশে। অন্য লেখক কবি টেবিলের আনাচে কানাচে। এর মধ্যে অ্যালেন গিন্সবার্গও। আমি এক চুঁনোপুটি লেখক, আমাকে নিয়ে হই হুল্লোড়। আর বিশাল তিমির মতো কবিটির দিকে কারও নজর পড়ছে না। গিন্সবার্গ একা একা নিজের সঙ্গে। গিন্সবার্গের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমার খুব ইচ্ছে হয় কিন্তু সুযোগ হয় না। লক্ষ করি খাবারের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর ক্যামেরাটি পাশের লোকের হাতে দিয়ে নিজে পোজ দিচ্ছেন, তাঁর ছবি তোলা হচ্ছে। নানা কায়দার ছবি তোলেন তিনি। আমি ক্যামেরা জিনিসটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। যা মনে থাকার তা মনে থাকবে। স্মৃতির ওপর বিশ্বাস অথবা জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা আমাকে ক্যামেরাবিমুখ করেছে। গালে হাত দিয়ে, পায়ের ওপর পা তুলে। নিজেও উঠে নানা কোন থেকে নিঃশব্দে অন্যদের ছবি তুলে যান। ব্যাপারটি নোবেল ডিনারে ঠিক মানায় না। আমি বেমানান সব আচরণে ওস্তাদ হয়েও বুঝি সে কথা। এখন আমি কাঁটা ছুরি ঠিকভাবে ধরে খেতে শিখেছি। ওয়াইনের গ্লাস কী করে ধরতে হয়, শিখেছি। কী করে চুমুক দিতে হয় শিখেছি। শিখেছি কি সত্যিই! অন্তত নিজেকে সান্ত্বনা দিই শিখেছি বলে। কে আমাকে শেখাবে, সকলে তো ভেবেই নিয়েছে আমি জানি এসব। আমাকে সবজান্তা ভাবার একটি রোগও দেখেছি সবার মধ্যে। শিরাখ যেমন আমাকে ফ্রান্সের মৌলবাদ সমস্যার সমাধান করে দিতে বললেন, তেমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে দেখেছি প্রশ্নোত্তর পর্বে আমাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, আলজেরিয়ায় এখন যে গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়েছে, এটার সমাধান কী করে হবে? ইরানে খোমিনির পতন কী করে ঘটানো যায়? বসনিয়ায় কি আপনি

মনে করেন ন্যাটোর হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্তটি সঠিক? পৃথিবীর ভবিষ্যত কী? আমি হাঁ হয়ে থাকি এসব প্রশ্নে। কে এদের বলেছে যে আমার কাছেই আছে জগতের সমস্ত সমস্যার সমাধান? কে এদের বুঝিয়েছে যে আমি পৃথিবীর গণক? বা আমি সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক বুদ্ধি ধারণ করি? কেবল রাজনীতি নয়, যে কোনও বিষয়েই আমাকে এই সময়ে সবচেয়ে অভিজ্ঞ বলে ভাবা হচ্ছে বলে মনে হয়। যেন আমার কাছেই আছে সব প্রশ্নের উত্তর। মানুষ ধেয়ে আসছে আমার দিকে। আমার পরিত্রাণ নেই। ডিনার শেষ হলে অ্যালেন গিন্সবার্গের দিকে এগিয়ে যাই। বলি, যে, *আপনার সঙ্গে আমার খুব গল্প করার ইচ্ছে।*

--*আপনি কোন রুমে আছেন, বলুন। আমি ফোন করে দেখা করবো আপনার সঙ্গে।*

--*কোন রুমে বলতে?*

--*মানে এই হোটেলের কোন রুমটি আপনার, বলুন।*

--*আমি তো এই হোটেলে থাকছি না। আমাকে একটি ছোট হোটেলে ওরা রেখেছে।*

শুনে আমার লজ্জাই হয়। আমন্ত্রিত বড় লেখক কবিদের রাখা হচ্ছে যেখানে, তার চেয়ে দামি আর বড় হোটেলে রাখা হয়েছে আমাকে। গিন্সবার্গ সোৎসাহে আমাকে তাঁর হোটেলের ঠিকানা আর রুমনম্বর লিখে দিলেন। বললেন, তাঁরও খুব কথা বলার ইচ্ছে আমার সঙ্গে। গিন্সবার্গ আমন্ত্রিত নোবেল অবজারভেতর দ্বারা। ২৯ এপ্রিলের স্মৃতিচারণ লেখার কারণে। সেই ২৯ এপ্রিল বইটির প্রকাশনা উৎসবে এসেছেন। ছোট হোটেলে থাকছেন, কাল পরশু ফিরে যাবেন আমেরিকায়। গিন্সবার্গ তাঁর আমেরিকার ঠিকানা ফোন নম্বরও দিলেন। নিই বটে, কিন্তু আমার কী আর যোগাযোগ করা হয়! ভুলো মন আর জগত সংসারের ওপর নিস্পৃহতার কারণে অনেক কিছুই করা হয় না।

আমার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি। কারণ সময় হয়নি আমার। তবে অ্যালেন গিন্সবার্গের মত বড় কবি আছেন একটি ছোট হোটেলে। আর আমার মত ছোট কবিকে রাখা হয়েছে সবচেয়ে বড় হোটেলে এর কী মানে? এত ছোট মানুষকে এত খাতির করার, তার পিছনে এত টাকা ঢালার কী অর্থ! এ আমার দোষ নয়। কিন্তু মনে হতে থাকে সমস্ত দোষ বুঝি আমার।

এই দোষের কারণে যত লজ্জা, সবই আমার। যত আমাকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করা হয়, তত আমি ভিতরে ভিতরে নিঃস্ব হয়ে উঠি। এই শহরে অ্যালেন গিন্সবার্গের মত শক্তিশালী বিট কবি উপস্থিত তা কজন ফরাসি জানে! জানে তসলিমা এ শহরে। তারা দিকে দিকে *ব্রাভো তসলিমা* বলে উল্লাসধ্বনি দিচ্ছে। অর্ধেক প্যারিস বন্ধ করে রাখা আমার জন্য, মানুষ, অবাক হই, ক্ষেপে এখনও উঠছে না কেন!

রাতে মিউচুয়ালিটিতে অনুষ্ঠান। মিউচুয়ালিতে খুব বিখ্যাত জায়গা প্যারিসের। এখানে একদা বিখ্যাত সব রাজনৈতিক নেতারা আসতেন সভা করতে, বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিকদের সভা করার জনপ্রিয় জায়গা এটি। এখানকার অনুষ্ঠানের আয়োজক ফরাসি জনপ্রিয় সাহিত্যিক দার্শনিকগণ। জমজমাট অনুষ্ঠান। ফরাসি সাহিত্য- সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান এই মিউচুয়ালিতেতে আমার গাড়ির বহর পৌঁছোলো। রাস্তায় যান বাহন নেই। ব্যারিকেডের ওপারে মানুষ। ফুটপাতে। হাজার হাজার মানুষ। চিৎকার করছে ব্রাভো তসলিমা বলে। ফরাসি দার্শনিক বের্নার্ড হেনরি লেভি আমায় সম্বর্ধনা জানাতে আমার গাড়ির কাছে। আমাকে আলিঙ্গণ করে প্রথমে ফরাসি কায়দায় গালে সশব্দে দুটো চুমু খেয়ে নিলেন। পুলিশি ব্যারিকেডের বাইরের মানুষকে দেখিয়ে বললেন, *এরা সবাই তোমাকে দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে ঢুকতে পারেনি। টিকিট পায়নি। ভিতরে ছ হাজার লোক। একটি আসনও খালি নেই। সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে অনেক আগেই। ভিতরের লোকেরা তোমার জন্য বিকেল চারটে থেকে অপেক্ষা করছে।* ঘড়িতে তখন রাত দশটা।

আমি ঠিক কী করব বুঝতে পারি না। লেভি যখন পেছনের দরজা দিয়ে গ্রিন রুমের ভেতর দিয়ে আমাকে মঞ্চে নিলেন। আমাকে দেখে মিউচুয়ালিতের ছ হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে লাগল। ওই অভিনব দৃশ্য আমি কল্পনাও করতে পারি না আমার জন্য ঘটছে। আমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। না, কেউ বসছে না। মঞ্চে

বসে থাকা ফরাসি সাহিত্যিক দার্শনিকরাও দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে হাততালি দিচ্ছেন। আমি মঞ্চে দাঁড়ানো, মাথাটি আমার ধীরে ধীরে নিচু হতে থাকে। আমার চোখ বুজে আসতে থাকে। আমার চোখে সত্যি সত্যি জল চলে আসছিল। দীর্ঘদীর্ঘক্ষণ টানা পনেরোমিনিট কেউ বলে আধঘন্টা ওভাবে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে ছ হাজার মানুষ বসল। আমিও বসলাম। একজন মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী থাকতে পারে? মনে মনে বলি, আর কিছুই না। আমার জন্ম, বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমার যাবতীয় লেখালেখি, মুক্তচিন্তার জন্য আমার লড়াই সবই ওই মিউচুয়ালিতের ছ হাজার ফরাসি দর্শক আর রাস্তায় টিকিট না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আরও কয়েক হাজার   মানুষ সার্থক করে দিল।

মঞ্চে, পরে জেনেছি, বিখ্যাত সব ফরাসি দার্শনিক ফিলিপ সলের, জ্যাক জুলিয়ার্ড, জঁ দানিয়েল, বের্নার্ড আঁরি লেভি এবং আরও ফরাসি দার্শনিক আমাকে নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করলেন। আললেজিয়ার যোদ্ধা মেয়ে খালিদা মাসহুদিও ছিলেন। জ্বালাময়ী সব বক্তৃতা দিয়েছেন আমার পক্ষে, আমার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের সমর্থন করে, বাক স্বাধীনতার পক্ষে। সকলে বললেন আমি এখন বাক স্বাধীনতা আর মুক্তচিন্তার একটি প্রতীক। সিম্বল। সিম্বল। সিম্বল। প্রতিধ্বনিত হল গোটা মিউচুয়ালিতেতে সিম্বল --এই শব্দটি। পুরো অনুষ্ঠানই সবধরণের মৌলবাদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ। আলজেরিয়ায় মৌলবাদীদের অত্যাচারে মানুষের জীবন বিপন্ন। বিশেষ করে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের। বসনিয়ায় মুসলমানদের হত্যা করা হচ্ছে। এথনিক ক্লিনজিংএর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। আমার খানিকটা পিছনে বসে কানের কাছে ফিলিপ বেনোয়া আমাকে অনুবাদ করে দিচ্ছে বক্তারা কে কী বলছে। ফিলিপ বেনোয়া বাংলা থেকে ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে। কিন্তু আমি যে লেখাটি এনেছি সেটি ইংরেজিতে লেখা। ইংরেজি পছন্দ করার লোক বেশি নেই। ফিলিপ তো ইংরেজিও ভালো জানে না। এখানেই সমস্যা। কোনওভাবে দীর্ঘ বক্তৃতাটি শেষ হওয়ার পর আমি বাংলায় ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে কিছু বাক্য উচ্চারণ করলাম, দর্শক খুশিতে লাফিয়ে উঠল, আমার মুখে আমার ভাষা শুনতে চায়, অন্য ভাষা নয়। বের্নার্ড হেনরি লেভি আমাকে বলতে বললেন, বসনিয়ার

সমস্যা নিয়ে। আমি প্রমাদ গুনলাম। বসনিয়ার খবর কিছুই আমার জানা নেই, হঠাৎ করে কী মন্তব্য করব! বলে দিই আমি এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারছি না। একটু কি অবাক হয় না দর্শক? নিশ্চয়ই হয়। আমার কাছ থেকে আশা করেছিল সাংঘাতিক কিছু মন্তব্যের। কিন্তু কিছুই পেল না। লেভি বসনিয়ায় নিজে গিয়ে গিয়ে রিপোর্ট করছেন, আন্দোলন গড়ে তুলছেন ইওরোপে, যেন বসনিয়ায় মুসলমানদের বাঁচানো হয়, সার্বদের অত্যাচার বন্ধ করা হয়। বের্নার্ড হেনরি লেভি ফরাসি-ইহুদি। ইহুদি মুসলমানের শত্রুতা আজকের নয়। কিন্তু ধর্মের ক্ষুদ্র গন্ডি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বিস্তৃত ভূবনের দিকে এগিয়ে গেলে মানবতাই হয়ে ওঠে শুদ্ধ-শক্তি।

আমি বেরিয়ে আসি সবার বেরোনোর আগে। তখন মধ্যরাত। আমার বিস্ময়ের সীমা থাকে না যখন দেখি মানুষ ওভাবেই ফুটপাতে পুলিশি ব্যারিকেডের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছিল আমার ফেরার। আমাকে দেখেই সোৎসাহে চিৎকার করে উঠলো, *ব্রাভো তসলিমা! ব্রাভো তসলিমা!* লেভি, ক্রিশ্চান, এবং পুলিশের বড়কর্তারাও বললেন, হাত তোলো ওদের উদ্দেশ্যে। হাত তোলার অভ্যেস আমার নেই। রাজনীতির নেতারা সমর্থকদের সোল্লাসের দিকে হাত তুলে দেয়। আমি কৃতজ্ঞতায় মিইয়ে যাই, কিন্তু কোনও নেতা বা নেত্রির মত হাত তুলে অভিনন্দন গ্রহণ করতে পারি না। আমার প্রকাশ অন্যরকম। আমার চোখে জল চলে আসে মানুষের সমর্থন দেখে। মানুষ কি বোঝে সে কথা? নাকি আমাকে ভেবে বসে আছে আমি খুব অহংকারি, মোটেও মূল্য দিচ্ছি না কারও আবেগকে।

২৬.১১

এলিজাবেথ শিমলা এলো তিনজন ঘোমটা পরা মুসলমান কলেজ ছাত্রী নিয়ে, ওদের জন্ম ফ্রান্সে। বাবা মা মরকেকা থেকে এসেছিল। এলিজাবেথ প্রাগে যখন গিয়েছিল আমার সঙ্গে কথা বলতে, অনুরোধ করেছিল কিছু মাথা ঢাকা মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে। রাজি হয়েছিলাম। আলাপ শুরু হল আমাদের। কোরানের পক্ষে ফালতু সব যুক্তি দেখিয়ে কথা বলে গেল।

খানিকক্ষণ কথা বলে আমি বুঝলাম, বোঝালে এরা বুঝবে না। বিরক্তই লাগছিল বোরখাওয়ালিদের অন্ধত্বে। ফরাসি ইংরেজি অনুবাদক ছিল। যা কথা হচ্ছিল, মেশিনে লিখে নিচ্ছিল দ্রুত। পরে আমাদের আলোচনা নবেল অবজারভেতরে ছাপা হয়েছে।

বের্নার্ড আঁরি লেভি রিৎজ হোটেলে আমার সঙ্গে দুপুরের খাবার খেলেন। সুদর্শন যুবক লেভি। বয়স অনেক হলেও কিছু কিছু পুরুষ যুবক থেকে যেতে পারেন। বললেন বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। একাত্তরে তিনি সাংবাদিক হিসেবে গিয়েছিলেন বাংলাদেশ। ও দেশ নিয়েই লিখেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস। লজ্জা নিয়ে কথা হচ্ছিল। লজ্জা ফ্রান্সে এখন বেস্ট সেলার। লিস্টের এক দুই তিন নম্বরে নাম। লেভি জানালেন, *লজ্জা* তিনি পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় আমি চুপসে গেলাম। বললাম, *আসলে কি জানেন, লজ্জাটা ঠিক উপন্যাস নয়। আমি তথ্যমূলক উপন্যাস বলতে পারেন। এদেশে আমি জানি তা ছাপানো উচিত হয়নি....।*

লেভি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, *আমি লজ্জা পড়েছি। আমার ভালো লেগেছে।*

--বলছেন কী?

--হ্যাঁ আমি বলছি। বলছি যে লজ্জা আমার ভালো লেগেছে।

--ভালো লাগার কিছু তো নেই ওখানে। এত ডকুমেন্টস..

--তাতে কী! উপন্যাস লেখার কি কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে নাকি?

--ভারতীয় উপমহাদেশের জন্য সম্ভবত বইটা বোধগম্য হবে?

--আমাদের কি একটু বুদ্ধি কম বলে মনে কর? আমরা বুঝবো না মানুষে মানুষে দাঙ্গা ফ্যাসাদ? বুঝবো না এক্সোডাস? এসব তো মানুষেরই ইতিহাস।

--এত লম্বা লিস্টি! কার ঘর পুড়েছে, কে মরেছে..

--তা পড়েই তো আরও ভালো করে বুঝি মানুষের অজ্ঞানতা আর অশিক্ষার কারণে ধর্ম কীভাবে রাজত্ব করে। আর মানুষ কীকরে অমানবিক হয়ে ওঠে। কুৎসিত হয়ে ওঠে। ওই লিস্টি খুব দরকারি ছিল। ওগুলো এক একটি আমাদের সভ্যতার গালে এক একটি থাপ্পড়ের মতো।

ওই থাপ্পড় খাওয়ার দরকার আছে খুব। খুব ভালো বই। খুব দরকারি বই।

লেভিকে আমার বিশ্বাস হয় না। এই প্রথম আমার মনে হল মানুষটি মিথ্যে বলছেন। লজ্জা বেস্ট সেলার লিস্টে। এতে আমার করার কিছু নেই। শত চাইলেও আমি বিক্রি বন্ধ করতে পারবো না। লজ্জার নাম হয়েছে, লোকে কিনতে চাইছে। আপাতত আমার প্রকাশক তাতে রাজি। কিন্তু যখন লজ্জা পড়ার পর আমার দুর্নাম হবে, তখন তিনি কী করে তা সামলাবেন! একটি বাংলা শব্দ এখন ফরাসিদের মুখে মুখে। লজ্জা। ইংরেজি জে র উচ্চারণ অনেক দেশে এ হয়। লজ্জাকে অনেকে লয়য়া বলে। শুধরে দিতে হয়।

সেই জার্মান সাংবাদিক হান্স তাঁর সেই নরওয়েজিয়ান ক্যামেরাম্যান নিয়ে উপস্থিত এই রিৎজ হোটেলে, আমি দেখে অবাক। তিনি বের্নার্ড আঁরি লেভির সাক্ষাৎকার নিতে এসেছেন। সেই যে তথ্যচিত্র বানাচ্ছেন, সে কারণে বিভিন্ন দেশ ঘুরছেন যেখানেই যাচ্ছি আমি। হান্সকে আমি যে দেশেই যাই সে দেশেই গিয়ে গিয়ে ছবি তোলার হাতির খরচ যোগাচ্ছে কে জানতে ইচ্ছে করে। মিউচুয়ালিতের অনুষ্ঠান, আমার এদিক সেদিক, লেভি এবং আরও লেখক দার্শনিকের কাছ থেকে আমার সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নেয় হান্স। লেভি যখন আমার সম্পর্কে বলেন, বারবারই তিনি জোর দিয়ে বলেন সিম্বল, সিম্বল, সিম্বল। জার্মানি বা নরওয়ে থেকে উড়ে আসা হান্সের জন্য মোট পাঁচ মিনিট সময় বরাদ্দ হল। লেভির শুধু সাক্ষাৎকার দেওয়া নয়, নেওয়ার ব্যাপার আছে। বললেন, *তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই, তোমাকে নিয়ে লিখতে চাই নিউ ইয়র্ক টাইমসে।* লাঞ্চের একটি নেমন্তন্ন বাতিল করে লেভির সঙ্গে হোটেলে লাঞ্চ সারতে সারতে কথা হল। আমি কথায় পটু নই। যে মানুষ কথায় পটু সে মানুষ কথা বলেন। আমি শুধু চেয়ে থাকি অগাধ সুন্দরের দিকে।

বিকেলে ২০ বছরের পূর্তি উৎসব দ্য ফামের। অ্যানতোয়ানেত ফুকএর দ্য ফাম। উৎসবে আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। সম্বর্ধনা দেবেন জ্যাক দারিদা। মঞ্চে আমাকে বসানো হল দারিদার পশে। দারিদা আমার ওপর দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা করলেন। লিখিত বক্তৃতা।লক্ষ করি

ফরাসিতে লেখা তাঁর বক্তৃতাটি বাইশটি ফুলস্কেপ কাগজ-ভর্তি। দারিদা ধুমসে সমালোচনা করলেন সাংবাদিকদের। আমি কোনও এক সময় সাংবাদিকদের ছেকে ধরা, ফটোগ্রাফারদের ঝাঁপিয়ে পড়ায় খুবই বিরক্তি প্রকাশ করেছিলাম। দারিদা বড় মানবিক চোখে তাকিয়েছেন আমার দিকে। তিনি চান আমি আমার মতো বাঁচি। প্রেসের প্রয়োজন যেন আমাকে দিয়ে মেটানো না হয়।

এরপর আমি কিছু বললাম, আমার লেখা থেকে পাঠ করলো একজন। ফরাসি নারীবাদী দার্শনিক হেলেন সিক্সুস করলেন বক্তৃতা, আমার লেখালেখি নিয়ে। আনতোয়ানেত ফুক সহ আরও অনেক নারীবাদী করলেন। ফুকের সংগঠন ফতোয়া জারির পর প্যারিস শহরে আমার সমর্থনে মিছিল করেছিল। যখন আমি নিজ দেশে অতলে অন্তরীণ, ফুক পাঠিয়েছিলেন আইনজীবী মিশেল ইডেলকে বাংলাদেশে, যদি আইনের ব্যাপারে আমার আদনজীবীদের কোনও সাহায্য করতে পারে। ফুক অনেকটা বলতেও চাইছেন যে তিনিই আমাকে একরকম দেশ থেকে বাঁচিয়ে এনেছেন। মনে মনে প্রশ্ন করি, তাহলে সুইডেনে পৌঁছোলাম কী করে আমি? আমার তো ফ্রান্সে এসে পৌঁছোনোর কথা! নরওয়ের মন্ত্রীরা বলেছিল, আমার আশ্রয় নেওয়ার কথা নরওয়েতে। কিন্তু কী কারণে সুইডেন হল তা তাঁরা বুঝতে পাচ্ছেন না। নরওয়ে থেকে বিশেষ দূত পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশে। সরকারের সঙ্গে আমাকে নিয়ে প্রথম আলোচনা নরওয়ের দূতই করেছিলেন। সরকারি নরওয়েজিয়ান কর্মকর্তা হেসে বললেন, সুইডেন কিন্তু তোমাকে ছিনতাই করে নিয়েছে। আসলে তুমি নরওয়ের। আসলে আমি কি কারও! নিজেকে শুধোই। নিজেকে মনে মনে বলি, শুধু শোনো, শুধু দেখ। শুধু মাথাটা ঠিক রাখো। অহংকারকে ধারে কাছে আসতে দিও না।

আমাকে চলে যেতে হবে। আমার সময় বেশি নেই। এরকম বলা হচ্ছিল। কারণ তাদের আগেই বলা হয়েছে আমি আধঘন্টার বেশি থাকতে পারবো না। আরও একটু সময়ের জন্য আনতোয়ানেত ফুক আর ক্রিশ্চান বেসের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শেষ অবদি ক্রিশ্চান ট্রেনের সময় পিছিয়ে দিয়ে দ্য ফামের জন্য কিছুটা সময় বার করেছে। ওই সময়টুকু

ওখানে থেকে ভালোই হয়েছে। প্রচুর ফুলের তোড়া আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, অপেক্ষা করছিল গান। ফরাসি গায়ক গায়িকারা আমাকে উদ্দেশ্য করে গান গাইলেন -- অসাধারণ। আমি মুগ্ধ হতেও ভুলে গেলাম, স্তম্ভিত হলাম কেবল।

যেতে হবে নান্ত শহরে। পুরস্কার আনতে। আমি শ্বাস নিতে চাই। আবদার করি, আমার সঙ্গে জিলকে যেতে হবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। জিলকে ধরে আনা হল। আমি বিমানে যাবো না। যাবো রেলগাড়িতে। তাই সই। তেজেভে। দ্রুতগামী রেল। এখানেও স্বস্তি নেই। আমি যাবো তাই পুরো রেল স্টেশন খালি করে ফেলা হল। আশ্চর্য। দেখে এত মন খারাপ হয়ে যায়! মাথা নিচু করে রাখি। বড় অপরাধি বোধ করি। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীরও যে প্রথম শ্রেণী আছে তা পুরোটাই আমাদের জন্য রাখা। ক্রিশ্চান, জিল, আমি এবং অগুনতি পুলিশ। বিমানে ভ্রমণ করার চাইতে রেল ভ্রমণে আমি আনন্দ বেশি পাই। মানুষ, বাড়িঘর, গাছপালা এসব দেখতে দেখতে যেতে ভালো লাগে। আকাশের মেঘ আর অমোঘ শূন্যতা দেখতে আমার ভালো লাগে না। জিলের সঙ্গে খুঁনসুটি করতে করতে, আমার কাছে আসা বিস্তর চিঠিপত্রের কিছু খুলে খুলে অনুবাদ শুনতে শুনতে, আমাকে নিয়ে লেখা ফরাসিদের পদ্য শুনতে শুনতে, মুখে বলার জন্য দুএক টুকরো ফরাসি বাক্য শিখতে শিখতে, জানালা দিয়ে ছুটে চলা ছোট ছোট গ্রাম শহর দেখতে, চা খেতে খেতে চলি। ব্যক্তিগত একটি জীবন আমাকে অমল আনন্দ দেয়।

নান্ত শহরের হোটেল দ্য ভিলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হল। পুরস্কাটির নাম এডিক্ট দ্য নান্ত পুরস্কার। এই পুরস্কারের একটি ইতিহাস আছে। ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ হেনরি ১৫৯৮সালে ধর্মযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য যে কাগজে সই করেছিল, সেই কাগজটিই এডিক্ট দ্য নান্ত। ফ্রান্স মূলত ক্যাথলিকদের দেশ। কিন্তু এখানে যারা প্রটেস্টান্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের বলা হল ইউগোনোত। মার্টিন লুথারের প্রটোস্টান্ট ধর্ম নয়, জন কেলভিনের রিফর্মেশন যারা গ্রহণ করেছিল তাদের। ইউগোনোতদের ওপর অত্যাচার চলত ক্যাথলিকদের। কেবল অত্যাচার

নয়, ঠাণ্ডা মাথায় তাদের খুন করা হত। হাজার হাজার ইউগোনোতদের খুন করা হয়েছে। ফ্রান্সের এই নান্ত শহরটিই তখন ইউগোনোতদের বাঁচিয়েছিল প্রাণে। ফ্রান্সের কুড়িটি শহরে ইউগোনতরা ধর্মপালন করার স্বাধীনতা পেয়েছিল। ১৬১০ সালে চতুর্থ হেনরিকে যখন হত্যা করা হয়, তখন ক্যাথলিক গির্জার মূল কাজ হল ইউগোনতদের খুন করা। চতুর্থ হেনরির ছেলে ত্রয়োদশ লুই এই খুনের পক্ষে ছিল। মোটেও গ্রাহ্য করেনি এডিক্ট দ্য নান্ত। তাকে একবার বলা হয়েছিল ইউগোনতদের তো তৃতীয় এবং চতুর্থ আঁরি (হেনরি) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সুবিধে দেবে, ত্রয়োদশ লুই বলত, *প্রথমজন ওদের ভয় পেত, দ্বিতীয় জন ওদের ভালো বাসতো, আমি ওদের ভয়ও পাই না, ভালোও বাসি না।* এরপর চতুর্দশ লুই সূর্যরাজার আগমনের পর থেকে প্রচার তিনি শুরু করলেন যে এক বিশ্বাস, এক আইন, এক রাজা। তার শাসনামলেই ইউগোনতদের পুরো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ঘরবাড়ি ছাই করে দেওয়া হয়েছে। দেশ থেকেও ওদের বেরোতেও দেওয়া হয়নি। যারা বেঁচেছিল, জাহাজে করে তুরস্কের কাছে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। ওদের প্রতিটি মন্দির গুঁড়ো করে দেওয়া হয়েছিল। অনেককে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফরাসি কলোনিতে সারাজীবনের জন্য ক্রীতদাস হতে পাঠানো হয়েছিল। ইউগোনত বাবা মার কাছ থেকে তাদের সন্তানদের কেড়ে নেওয়া হত, সন্তানদের দেওয়া হত ক্যাথলিক পুরোহিতদের কাছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আড়াইলক্ষ ইউগোনত পালিয়ে গিয়েছিল সুইৎজারল্যান্ড, জার্মানি, ইংলেন্ড, আমেরিকা, হল্যান্ড, পোলান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, যেখানে তারা তাদের নিজ ধর্ম পালন করার স্বাধীনতা পেয়েছিল। ১৬৮৮ থেকে ১৬৮৯ পর্যন্ত বিশাল মাপে শরণার্থি পৌঁছেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনের দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরীপে।

সেই এডিক্ট দ্য নান্ত পুরস্কার তাদেরই দেওয়া হয় যারা ধর্মবিশ্বাসের কারণে যে দাঙ্গা যে যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। সকলেরই মত, আমিই এই পুরস্কার পাবার সবচেয়ে যোগ্য। ভিড় সেদিন। মেয়র বললেন বড় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানের কথা ছিল। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে সেটা করা গেল না। নিরাপত্তার দায়িত্বে যে বড়কর্তা আছেন, বলে দিয়েছেন ছোট

অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠান করতে। সবারই আগপাশতলা এত বেশি তল্লাশি করা হয়েছে, যে অনেকে এমনকী অনেক মন্ত্রীও, মন্ত্রীর ডেপুটিও পরিচয়পত্র না আনায় ভেতরে ঢুকতে পারেননি। খুবই কড়াকড়ি ব্যবস্থা। শুনে রাগে আমার গা জ্বলে।

আমার ফরাসি লজ্জা হোটেল দ্য ভিলে সোনার ফ্রেমে রাখা হল। আনুষ্ঠানিকভাবে আমার হাতে অর্পণ করা হল পুরস্কারটি। পুরস্কারে দেড়লক্ষ ফ্রাঁর চেক আছে, মানপত্র আছে, ক্যানভাসে আঁকা একটি ছবি আছে। আমার সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ছবিটি আঁকা। আবছা আবছা কিছু শাড়িপরা মেয়ের ছবি। শহরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা। নান্ত শহরের গণ্যমান্য লোক, সরকারের উচ্চ পদস্থ লোক, সকলের ভিড় সেদিন হোটেল দ্য ভিলে, সিটি হলে। আমার লিখিত বক্তব্য ইংরেজিতে, পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজি থেকে ফরাসি ভাষার দোভাষী অনুবাদ করলো। দোভাষী যখন অনুবাদ করছিল, লক্ষ্য করছিলাম তার আঙুল কাঁপছে। ও প্রফেশনাল ইন্টারপ্রেটর। তাই কাপা আঙুল দেখে অবাকই হলাম। পরে মেয়েটি অবশ্য বলেছে, তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এ আমাকে খুব নার্ভাস করে তুলছিল, এ আমাদের জীবনের স্বপ্ন।

এরপর প্রেস কনফারেন্স। জিনিসটিকে কিছুতেই পছন্দ করতে পারি না। চাপিয়ে দেওয়া জিনিসটিকে হেলায় ফেলায় সারি। এরপর অপেক্ষা করছিলেন ব্যাংকোয়েট রুমে নান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, জুরি বোর্ডের সকলে, আর নগরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। সকলে প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন আমার অটোগ্রাফ নিতে। আর বই, সকলের হাতে হাতে লজ্জা। আর কলামের বইটি। যারা বই আনেনি, তারা সই নিল নিমন্ত্রণ পত্রে। নিমন্ত্রণপত্রটি বেশ সুন্দর। ইচ্ছে করে একটি নিজের কাছে রাখি। কিন্তু ওরা তো ভাবতেই পারবে না এত তুচ্ছ জিনিস আমার চাই। মেয়র এবং অল্প কজন মিলে ফরলাল ডিনার। ডিনারের সময় বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে ছবি আঁকা কার্ড নিয়ে, কার্ডে লেখা আমরা তোমাকে ভালোবাসি, উপহার দেয়।

পুরসভা থেকে ঘোষণা করা হল নান্ত শহরের চাবি আমার হাতে।, এই শহরের নাগরিক এখন আমি। আসলেই কি নাগরিক? তার মানে কি এই যে আমি এখন এই শহরে এসে বাস করতে পারি! ভাবতে থাকি একা একা। আমার মন চায় সুইডেন ছেড়ে চলে আসি, এই শহরের দরজা খুলে এই শহরে এসে থাকি।

ক্রিশ্চানকে জিজ্ঞেস করি, *সত্যিই কি আমি নাগরিক ওই শহরের?*

--*হ্যাঁ নিশ্চয়ই।*

একটু হেসে, একটু থেমে, বলি, যেন ঠাট্টা করছি, *তার মানে আমি এখন এ শহরে এসে থাকতে পারবো।*

ক্রিশ্চান হেসে বলল, *এই চাবিটাবির ব্যাপারগুলো মূলত সম্মানের জিনিস।*

মেয়র এবং তাঁর স্ত্রী নান্তের মাটিতে পা দেবার পর থেকে ছায়ার মতো আছেন সঙ্গে। আমাকে খাওয়ালেন   শহরের সবচেয়ে ভালো রেস্তোরাঁর সবচেয়ে ভালো খাবার। বাঙালির মতো ফরাসিরা ভালো খাবারের জন্য পাগল। খাবারের সঙ্গে সবখানেই ওয়াইন। আমি না খেতে জানি ওয়াইন, না বুঝি ফোয়াগ্রা, না বুঝি মাগরে দ্য ক্যানারের মাহাত্ম্য। না বুঝি, তবু ভালোবাসলেন আমাকে। মেয়র, মেয়রের স্ত্রী এবং হোটেল দ্য ভিলের কজন ডেপুটি। গেলাম ডলফিন রেস্তোরাঁয়। ওখানে চমৎকার দীর্ঘ লাঞ্চ। মেয়র বারবার স্মরণ করিয়ে দিলেন, নান্ত এখন তোমার সিটি, যখন খুশি আসবে, তুমি এলে নান্তএ আবার সুখের উৎসব হবে।

নৌবিহারে বেরিয়ে পড়লাম সবাই। সেই নদীতে, যে নদীটি গিয়ে মিশেছে ইংলিশ চ্যানেলে, সেটির ওপর দিয়ে সিটির দিকে। মেয়র দেখাতে দেখাতে নিলেন পুরোনো ক্যাসেল, ওয়াটার রেস। মেয়র এবং তাঁর স্ত্রীই আমাকে অধিকার করে রাখলেন, বিশেষ কেউ আর সুযোগ পেল না কথা বলবার। মেয়রের স্ত্রী আমাকে কোটে একটি পিন লাগিয়ে দিয়ে বললেন   -- *নান্ত নগরী তোমাকে মনে রাখবে চিরকাল।* যখন নামলাম সিটিতে, কয়েকশ লোক দাঁড়িয়ে ছিল দেখবে বলে। অস্বস্তি হয়। আবার ভালোও লাগে। স্টেশনে এলাম, মেয়র এবং তাঁর সঙ্গীরাও এলেন বিদায় দিতে। এভাবেই কাটানো হল জুল ভার্নের জন্মের শহর নান্ত।

২৮.১১

অরলি বিমানবন্দর থেকে স্ট্রাসবুর্গের দিকে। এই যাত্রাও এক মহাকাণ্ড। সোজা গাড়ি ঢুকে পড়ল বিমানের সিঁড়ির কাছে, অপেক্ষা করতে হল। কেন? বিমান তল্লাসি চলছে। কী দিয়ে? পুলিশের কুকুর দিয়ে। কুকুর শুঁকে চলে এলে পর আমাকে ঢোকানো হল। সঙ্গে প্রায় এক বিমান পুলিশ, ক্রিশ্চান, ফ্রেডেরিক, ফন্যাকের কর্তারা, ভাড়া করা দোভাষী। স্ট্রাসবুর্গে নেমে প্রথমেই ট্রানজিট প্রোগ্রাম। আর্তে টেলিভিশন। এই টিভির আমন্ত্রণে গত এপ্রিলে এসেছিলাম ফ্রান্সে। ফরাসি জার্মান টেলিভিশন এই আর্তে। এখানের ট্রানজিট প্রোগ্রাম খুব উঁচুমানের। ওই টিভি স্টেশনেই ফরাসি টিভি তিন এর সঙ্গে কথা বলতে হল।

এরপর সিটি হল। স্ট্রাসবুর্গের মেয়র সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছিলেন সাঙ্গপাঙ্গ সহ, ক্যামেরা অজস্র। বসলাম ভেতরে। খানিক কথাবার্তা। মেয়র ক্যাথারিন ট্রটম্যানের সঙ্গে আগেই আমার দেখা হয়েছিল। মেয়র বললেন, ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব রাইটার্স অক্টোবরে স্ট্রাসবুর্গে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিল, তসলিমাকে নিয়ে লেখা নাটক। রচয়িতা হেলেন সিক্সুস। নাটকটি চলাকালে তসলিমার অভিনয় যে মেয়েটি করেছিল, তাকে সত্যিই সাংবাদিকরা তসলিমা ভেবেছিল। ফটোগ্রাফাররা ঝাঁকে ঝাঁকে ফটো তোলা শুরু করলো। সে এক ভীষণ কাণ্ড। মেয়র আমার সঙ্গে এলেন ফন্যাকে। ফন্যাকের বাইরে রাস্তায় শত শত দর্শক। সকলে আমাকে দেখামাত্র করতালিতে মুখর করলো জনপথ। ফন্যাকের হলঘরভর্তি দর্শক। ভেতরে যারা ঢুকতে পারেনি, তারা দাঁড়িয়ে সীমানার বাইরে। আমাকে দেখেই শুরু হল তুমুল হর্ষধ্বনি। মেয়র তাঁর বক্তব্যে বারবারই বললেন স্ট্রাসবুর্গ নির্বাসিত লেখকদের জায়গা নিঃসন্দেহে। পুলিশ সবসময় দর্শকদের সামনে ব্যারিকেড দিয়ে রাখে, এবার কী মায়া হল -- চিফ বললেন ভেতরে ঢুকতে না পেয়ে যারা দাঁড়িয়ে আছে করিডোরে, তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে। কত হাত যে বাড়ানো ছিল, কোনওটি ছোঁয়া হয়েছে, কোনওটি হয়নি। মেয়েরা এক

একজন আনন্দে কাঁদে এমন অবস্থা। পিটারকে দেখলাম এক পলক, জার্মানি থেকে এখানেও এসেছে। হ্যালো বলা ছাড়া আর কোনও কথা হয়নি। ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে পিটার। পরে শুনেছি জার্মানি থেকে কোর প্রকাশনীর মালিকও এসেছিলেন, পুলিশ ভেতরে ঢুকতে দেয়নি। কোর প্রকাশনী আমার লেখা নিয়ে টিশার্ট করেছে। আমাকে লেখা লেখকদের খোলা চিঠি ছাপিয়েছে। সকাল থেকে জায়গা নিয়ে বসে ছিল দর্শকরা।

হাজার মানুষের ভিড় আমাকে এক পলক দেখার জন্য। ভিতরে বাইরে। হাত উঁচিয়ে জিকির করছে মানুষ *তসলিমা তসলিমা* বলে। একবার স্পর্শ চায়। পুলিশ আমাকে ওদের কাছে যেতে দেবে না। কিন্তু পুলিশের বাধা না মেনে আমি এগিয়ে গেলাম। শত হাত এগিয়ে এল আমার হাত স্পর্শ করতে। কাছ থেকে আমাকে দেখার আনন্দ ঝলমল করছে সবার চোখে মুখে। এরা সব ফরাসি নারী পুরুষ। সাদা ত্বক। বাদামি বা সোনালি চুল এদের। চোখ নীল বা সবুজ। সামান্যক্ষণই কেবল স্পর্শের স্বাধীনতা পেলাম। আমাকে আবার নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে সরিয়ে নেওয়া হল। ঠাসা ভিড় ভিতরে। বাইরে বিশাল মনিটর রাস্তার দিকে মুখ করা। অনুষ্ঠান আয়োজন করেন নগরের মেয়র। তাঁরা সারাক্ষণই থাকেন পাশে।

এরপর ফন্যাক পরিচালকের ঘরে বসে বইএ সই পর্ব চললো। প্রচুর বই। সই করেছি পাঁচশর মতো বই। বইয়ের পাতা উল্টে সামনে এগিয়ে দিচ্ছে একজন। সই হতেই আরেকজন টেনে নিয়ে নতুন বইয়ের জন্য জায়গা করে দিচ্ছে। হু হু করে বই ফুরোচ্ছে। মারি, ফাবিয়ান, ক্লদ, প্যাট্রিসিয়া, ক্যারোলিন, এডিথ, জ্যাকলিন, নিকল, ভেরোনিক, দোমিনিক, মোরিস.. এসব নামের বানান আমার পক্ষে লেখা অসম্ভব। ফরাসি বানান উচ্চারণের থেকে যোজন দূরে। নামগুলো কেউ লিখে দেয়। ক্রিশ্চান বা কেউ। আমার সামনে এসে বইয়ে সই করতে কাউকে দেওয়া হয় না।

এরপর রেস্তোরাঁয় স্ট্রাসবুর্গ ফন্যাকের আয়োজনে দুপুরের খাবার। মারসেইএর স্পেশাল খাবার। ফরাসি দেশের অঞ্চলগুলোর নিজস্ব খাবারের সুনাম খুব। আমার জিভে বাঙালি খাবারই রোচে বেশি। রেস্তোরাঁয় খাবারের পর প্রেস কনফারেন্স। ইওরোপীয় পার্লামেন্টে অপেক্ষা করছেন মানবাধিকার বিভাগের প্রেসিডেন্ট। অতএব যাওয়া হল, কথা হল। মুক্তি নেই। ওখানেও ছোটখাটো প্রেস কনফারেন্স। ক্লান্তি লাগছিল খুব। ওখান থেকে বিমান বন্দরে যাওয়ার পথে ক্যাথিড্রাল। এপ্রিলে যখন স্ট্রাসবুর্গ আসি, জিল বলেছিল ক্যাথিড্রালটা দেখো, তখন সময় হয়নি দেখার। আর এখন, রাত্তিরে, ক্রিসমাসের ছোট ছোট দোকান বসে গেছে ক্যাথিড্রালের পাশে, আলোকিত ক্যাথিড্রাল দেখা হল। লোক অপেক্ষাই করছিল, দেখালো ভেতরে, বাইরে। অসময়ে ভেতরটা খোলা রাখা হয়েছিল দেখতে আসবো বলে।

প্যারিস থেকে স্ট্রাসবুর্গ চলে এসেছিল আমেরিকার এক সাংবাদিক। প্যারিসে আমার সময় নেই বলে চলে আসা, যদি বিমানে যেতে যেতে কিছু কথা বলি। প্যারিসে পৌঁছে আবার সেই সামনে পিছনে প্যাঁ পুঁ মটরসাইকেল আর গাড়ি নিয়ে পুলিশ বাহিনী। ট্রাফিক ছিল, সকল গাড়িকে ছাড়িয়ে, ট্রাফিক না মেনে প্যাঁ পুঁ এগিয়ে চললো সবার আগে।

২৯.১১

উড়ছি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। উড়ছি স্ট্রাসবুর্গে। উড়তে হচ্ছে মার্সেইয়ে। যেতে হয় স্ট্রাসবুর্গের ফন্যাকে। ওখানকার মেয়র আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মার্সেই মেয়রের আমন্ত্রণে মার্সেইএ। তিনটি ফন্যাকেই হাজার মানুষের ভিড়। এক পলক দেখার ভিড়। আমাকে একটু ছোয়ার ভিড়। একটু কথা বলার, ব্রাভো বলার ভিড়। অটোগ্রাফের জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে জনতা।

সকালে অরলি এয়ারপোর্ট। সারারাত সারাদিন হোটেলের সামনে বন্দুক উঁচিয়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তা বন্ধ। কোনও গাড়িঘোড়া চলতে পারে না সামনের রাস্তায়। যতসব অদ্ভুত ব্যাবস্থা। যাচ্ছি মারসেই। ফ্রান্সের দক্ষিণে। ফন্যাকের দল ছিল, ভাড়াটে অনুবাদকও। বিমানবন্দরে আবার সেই পুলিশি তল্লাশি। ভূমধ্যসাগরের পাড়ে মারসেই। মারসেইএর পুলিশ রাস্তায় দাঁড়ানো বিশেষ করে ওখানকার ফন্যাকের দুমাইল পথ অব্দি। একটি দৃশ্য দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। গাড়ি যখন চলছিল আমার, ওরকম প্যাঁ পুঁ করে উর্দ্ধশ্বাস গাড়ি দেখে কিছু লোক হতভম্ব রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রাস্তার পুলিশ তাদের ধাককা দিয়ে সরিয়ে দিতে গেলে লোকগুলো পড়ে যায় মাটিতে। বড় মায়া হয় আমার। পুলিশের অতিরিক্ত কাণ্ড দেখে বড় বিরক্ত।

ফন্যাকে প্রথম হল প্রেস কনফারেন্স। পরে হল পাঠকের সঙ্গে কথা বলা। উপস্থাপনা করলেন মেয়র। প্রচুর পাঠক, হলঘর উপচে পড়েছে, দাঁড়াবারও জায়গা নেই। পাঠকের একটিই কথা, *তসলিমা আমরা তোমার সঙ্গে আছি।* মারসেইএর মেয়েরা সহযোগিতার কথা জানিয়ে একটি বই তৈরি করেছে, সেটি দিল আমাকে। বয়স্ক কজন মহিলা বললেন, *এই নাও আমার ঠিকানা, আমার বাড়ি তোমার জন্য রইল, আমি তোমাকে সারাজীবন রাখবো।*
ফুলে আর উপহারে আমি ভরে উঠলাম। এরপর রেস্তোরাঁ। মেয়রের ডাকা পার্টি। গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা। প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী এলেন দেখা করতে। ছবি তুললেন। মুখে ধন্য হওয়ার হাসি। রেস্তোরাঁ থেকে বেরোতে গিয়ে দেখি রেস্তোরাঁয় বসা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। আমি হাঁটতে চেয়েছিলাম, হাঁটার ব্যবস্থা করলো পুলিশ। ফটোসাংবাদিকরা দাঁড়িয়ে ছিল রেস্তোরাঁর বাইরে। বুঝি না, প্রেস কনফারেন্সের প্রচুর ছবি তুলেও তাদের আবার ছবি তোলার কেন দরকার হয়। আমরা যাচ্ছি সামনে হেঁটে। আর পঞ্চাশজনের মতো ফটোসাংবাদিক পেছন পেছন হেঁটে। একজন তো পেছোতে পেছোতে থামে লেগে উল্টে পড়ে গেল, উঠে আবার ক্লিক ক্লিক। ক্লিক ক্লিকের জ্বালায় শেষ অব্দি গাড়িতে উঠে পড়তে হল। বিমানবন্দরে যাবার পথে

শহরের বাইরে জেলেদের নৌকো দাঁড়ানো। গাড়ি থামিয়ে নৌকোর পাশ দিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে হাঁটছি। হঠাৎ এক জেলে আমাকে দেখে দৌড়ে এল হাত মেলাতে। ফরাসিতে বললো, *আমি ঈশ্বরকে দেখলেও বোধহয় এত খুশি হতাম না!* প্রচার মাধ্যম মানুষকে কোথায় কতদূরে পৌঁছে দিতে পারে, কেবল অনুভব করলাম। মারসেইএর শহরতলিতে বিকেলে গল্ফ খেলছিল সমুদ্রের ধারে, হঠাৎ দেখি খেলা ছেড়ে সব দাঁড়িয়ে আছে আমাকে দেখবে বলে। হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাবে বলে। ফ্রান্সের ৬০ মিলিয়ন মানুষই বোধহয় আমাকে চেনে।

প্যারিসে হোটেলে এক ফাঁকে ভারতের রাষ্ট্রদূত এসে দেখা করে যান। বারে বসে এক গ্লাস ওয়াইন পান করতে করতে সামান্য কথা হয়। বারের নাম আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। এই বারে বসে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তাঁর প্যারিস-জীবনে মদ খেতেন।

৩০.১১

সকালে এডিশন স্টক। ওখানে বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সাংবাদিকরা আসে। দুঃখ হয় তাদের জন্য সময় বাঁধা পাঁচ মিন্টি করে। আমার সময় যে এত মূল্যবান আগে জানা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছেলে মেয়ে আসে কথা বলতে। ওদের জন্য দেওয়া হয় দুমিনিট। ওখান থেকে রেডিও। রেডিওর প্রথম কর্তা আমাকে রিডেওর গেট থেকে রিসিভ করেন। অবশ্যই পেছনের রাস্তা। সব দালানকোঠার যে পেছনের একটি রাস্তা থাকে, যাতায়াত না করলে কোনওদিন জানা হত না। ফ্রান্স ইন্টার জার্নাল। বেশ গুরুগম্ভীর আলোচনা অনুষ্ঠান। আরও রেডিও আরও আগে সাক্ষাৎকার নিয়েছে। এটা আলাদা। আলোচনা শেষে হোটেলে ফেরা। ফন্যাক থেকে দিয়ে গেছে হোটেল রুমে পাঁচশর ওপর বই। সই করতে হবে। পুলিশেরা বই কিনে রেখেছে, ওগুলোতেও সই করিয়ে নিল। পুলিশের এক বাহিনীকে আমার রুমের পাশের রুমে থাকতে হচ্ছে। ওরা আমার সঙ্গে বাইরে বেরোয় না। ওদের কাজ আমার রুম পাহারা দেওয়া। সে রুমে আমি থাকি বা না থাকি।

প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আমন্ত্রণ। নারীবাদী জিশেল আলিমি, মিশেল পেরো, জুলিয়া ক্রিস্টেভা থেকে শুরু করে এখনকার নারীবাদীতে ছেয়ে যায় মঞ্চ এবং দর্শকাসন। যে যত বড় নারীবাদী হন না কেন, আমি যত ক্ষুদ্র পিপীলিকা হই না কেন, আমাকেই মধ্যমণি করে অনুষ্ঠান হয়। আমি বিব্রত বোধ করি। আমার এই বিব্রত বোধ করাটি অনেকেরই নজরে পড়ে। হঠাৎ হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে পড়া আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় এই বলে যে *এখানকার নারীবাদীরা থিওরি ভালো জানে। তারা বড় বড় বই লিখেছে। তুমি কিন্তু অন্য কাজ করেছো। খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। পিছিয়ে থাকা রক্ষণশীল মুসলিম একটি সমাজের পিঠে তুমি চাবুকাঘাত করেছো, তুমি হয়তো জানো না তুমি কী করেছো। জানো না। হিস্টিরিয়া তোমাকে নিয়ে বোকা লোকেরা করছে না। তারা সবাই উচ্চশিক্ষিত, ইন্টেলেকচুয়াল। মন্ত্রীরা মনে করছো খামেকা লাইন দিচ্ছে তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য? সাধারণ মানুষের মধ্যে তোমার জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া।*

ক্রিশ্চানকে হতাশ হয়ে বলি, *আমাকে বলতে বলা হচ্ছে, বলছি ঠিকই, আমি তো কিছুই ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারছি না।*

--শোনো, বক্তৃতা দেওয়ার লোক আছে অনেক। তুমি বক্তৃতাবাজ নও। এ তোমার কাজও নয়। তুমি লেখক। সেটাই তোমার পরিচয়। লোকে রাস্তাঘাটে, এখানে ওখানে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তোমাকে দেখার জন্য, সামনে থেকে দেখা। এ দেখেই তারা তৃপ্ত।

সন্ধেয় পুরস্কার। ফরাসি সরকার দেবে এই পুরস্কার। নাম প্রি-দ্য-দ্রোয়া-দে-লোম, সোজা বাংলায় *মানবাধিকার পুরস্কার।* সাধারণত বেসরকারি সংগঠনগুলো এমন মানাধিকারের পুরস্কার দিয়ে থাকে। কিন্তু কোনও সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়, ভাবতে খুব ভালও লাগে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কার্যালয়ে, , আসলে কার্যালয় বললে কার্যালয়ের অপমান হয়, বলা উচিত প্রাসাদে, ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যালেন জুপে আমাকে দিলেন মানবাধিকার পদক। অ্যালেন

জুপে কমাস পরই ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসবেন, কে জানতো। আমি হাতে নিলাম সোনার মেডেল। নিলাম এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ। পররাষ্ট্রমন্ত্রর বক্তৃতার পর শুধু শুকনো ধন্যবাদ জানালাম।

সোনার পদকটি নিয়ে প্যারিস ইউনিভার্সিটিতে। আমার ওপর বক্তৃতা করলেন ফরাসি বিশেষজ্ঞগণ। কেউ দর্শনের, কেউ সাহিত্যের, কেউ সমাজতত্ত্বের, কেউ ইতিহাসের। বিখ্যাত সব অ্যাকাডেমিকদের পর নিজে মিনমিন করে সামান্য কিছু বক্তব্য রাখলাম। আসলে আমার বলারই বা কী আছে। আমার লড়াই আমার জীবন আমার লেখা সম্পর্কে গবেষণা তো ওঁরাই করছেন। আমি শুধু হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। দর্শকে পূর্ণ ছিল অডিটোরিয়াম। দর্শক সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা।]

রাতে লা মেজোতে ডিনার। চমৎকার কাচের রেস্তোরাঁ। মাছের সঙ্গে সাদা ওয়াইন, মাংসের সঙ্গে লাল। ফরাসি নিয়ম মেনে খাবারে কামড় দিচ্ছি, গ্লাসে চুমুক দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি নেপোলিয়ানের সমাধিতে আলো জ্বলছে। ইফেল টাওয়ারে এইডস বিরোধী প্রতীক লাল রিবন টানানো হয়েছে। আমি অ্যান্টনি আর ক্রিশ্চান। জিল এল। একসময় সংস্কৃতিমন্ত্রী তুবো এলেন রেস্তেরাঁয়। আমি রেস্তোরাঁয় আছি খবর পেয়ে এলেন দেখা করতে। স্ত্রী নিয়ে এসেছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন।

১.১২

কানাডা থকে রেডিওতে সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। কানাডার আরেক রেডিও এসে গেছে ফ্রান্সে। তারা এল, তাদের সঙ্গে দোভাষী হয়ে এলেন ফ্রান্স ভটাচার্য। ফ্রান্স আমার কবিতার প্রাথমিক অনুবাদ করেছেন। শেষে দেখে দেবেন একজন ফরাসি কবি। ফ্রান্স ভালো বাংলা বলে।

আমার বিশ্বাস ভালো অনুবাদও তিনি করেন। কোথাও আটকালে স্বামী লোকনাথকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারেন, এটিও বড় সান্ত্বনা।

দৌড়োতে হবে মিতেরোঁর সঙ্গে দেখা করতে। মিতেরোঁ বসেছিলেন তার এলিজে প্রাসাদে, প্রেসিডেন্টের বাসভবনে। মিতেরোঁ ফরাসিতে কথা বললেন। একজন দোভাষী ছিলেন ফরাসি ইংরেজির। মিতেরোঁ জিজ্ঞেস করলেন বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে। জানতে চাইলেন আমার লেখালেখি সম্পর্কে। এখন কোথায়, এখন কীভাবে। এরশাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন। জেলে পড়ে থাকা এরশাদের জন্য মিতোরোঁর খানিকটা মায়া হল ! কে জানে। বললেন তিনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন এক বন্যার সময়। বাংলাদেশ মানেই বোধহয় বন্যা খরা অভাব আর খুন জখম!

ঘরে আনতোয়ানেত ফুক ছিলেন। মিতেরোঁকে সম্ভবত ফুক বলেছিলেন, তাঁর অতিথি হয়ে ফ্রান্সে এসেছি আমি। মিতেরোঁ অসুস্থ, প্রোসটেট ক্যানসারে ভুগছেন। চলাফেরা বেশি করেন না। বাড়িতেই থাকেন। বারবারই ফুককে ধন্যবাদ জানালেন আমার যত্নআত্তি করছেন বলে। ফুক বিনয়ের সঙ্গে সেই ধন্যবাদ গ্রহণ করলেন। মিতেরোঁ যখন আমার সামনে বসে আছেন, ছোটখাটো মানুষটিকে খুব সাধারণ একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। মনেই হচ্ছিল না ফ্রান্সের মতো দেশের রাষ্ট্রপতি তিনি। অথচ সাধারণ যে কোনও মানুষের মতোই তার অঙ্গভঙ্গি, তাঁর হাসি, তাঁর কৌতূহল। এবং সাধারণ যে কোনও মানুষের মতোই তাঁর অসুস্থতা এবং দূর্বলতাবোধ। মানুষ তো সবই এক, যখন খোলস বা মুখোশ বা বা অভিনয়টি বা পরিচয়টি খুলে নেওয়া হয়।

যখন এলিজি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসছে। বাইরে ভিড় করে ছিল পিপীলিকার মত সাংবাদিক। না, দাঁড়াইনি। দাঁড়াবার সময় কী করে থাকবে, যখন ওড়ারই সময় নেই।

৬২ টা মানবাধিকার সংগঠন সম্বর্ধনা দিল আমাকে। প্রচুর দর্শক ছিল। তুমুল হাততালি যথারীতি। এখানেও মেডেল।

হোটেল দ্য ভিলেও অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান মানে আমার বক্তৃতা। প্যারিস নগর তার আয়োজক। গণ্যমান্যরা আমার কথা কতটুকু বোঝেন না বোঝেন আমি জানি না। প্রচুর হাততালি জোটে যখন ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলি। কিন্তু লক্ষ করেছি, ক্রিশ্চান মৌলবাদী বা ক্রিশ্চান ধর্মের বিরুদ্ধে সেদিন বলার পর কোনও হাততালি পড়ছে না। আমাকে যারা সমর্থন করছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তবে কি আছে যারা কেবল ইসলামের বিরুদ্ধে বলেছি বলেই আমাকে সমর্থন করছে! তারা নিশ্চয়ই জানে যে নারীর অধিকারের কথা বলতে গিয়ে আমি সব ধর্মেরই সমালোচনা করি। নাকি জানে না! তারা তবে আমাকে সবসময় পছন্দ করে না। কিছু সময় করে, কিছু সময় করে না। তারা কি বন্ধু কোনও আমার? নিশ্চয়ই নয়। তবে অনেকে আছে, ফরাসি ক্রিশ্চান বা ইহুদি, কেবল ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে বললে সন্তুষ্ট নয়, নিজেদের ধর্মের মৌলবাদের বিরুদ্ধে চায় আমি জোর প্রতিবাদ করি। আমার প্রতিবাদের তারা বলে মূল্য আছে।

এরপর ফরাসি নারী-সাংবাদিকদের ঘরোয়া অনুষ্ঠান। ওখানে গল্প জমে উঠলো। বাংলাদেশের মেয়েদের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলতে হল আমাকে। আমাকে সদস্য করে নিল ফরাসি নারী সাংবাদিক সংস্থার। এক সাংবাদিক লন্ডনের টাইম পত্রিকার জন্য আমার সারাদিন কী করে কাটে তা লিখতে চাইছে। সামান্য সময় চায়। আজ নয়ত কাল। আমার সময় কী আছে, কতটুকু আছে। তা আমার চেয়ে বেশি অন্যরা জানে। ক্রিশ্চান বেসএর হাতের কাগজে আমার মিনিটের হিসেব।

২.১২

সকালের নাস্তা সিমোন ভেইল, নারীকল্যাণ মন্ত্রীর আয়োজনে। বিখ্যাত নারীবাদীদের ডেকেছিলেন। দেশে আমার মামলার ব্যাপারে কী করা যায় এ নিয়ে ভাবছেন।

সিমোন ভেইলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমার সময় নেই। লাঞ্চে নেই। ডিনারে নেই। অতএব সকালের নাস্তা খাওয়ার আমন্ত্রণ সিমোন ভেইলএর সঙ্গে। সিমোন ভেইল অসাধারণ এক মানুষ। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প আউসউইৎজ থেকে বেঁচে ফেরা মেয়ে। ওই ক্যাম্প থেকে খুব কম মানুষই ফিরেছে। সিমোন ভেইলএর মা ফেরেননি, বোন ফেরেননি। এই সিমোন ভেইল মন্ত্রী ছিলেন সত্তর দশকে, স্বাস্থ্য মন্ত্রী। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত। এবং সিমোন ভেইলই ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রথম মহিলা কেবিনেট মন্ত্রী। ফ্রান্স লাইক সমাজ। লাইক মানে ধর্মহীন। কিন্তু ক্যাথলিক মৌলবাদীদের উৎপাত এখানে কম নয়। এখন না হলেও তখন ছিল। ওই সময় রীতিমত কঠিন লড়াই করে তিনি গর্ভপাত বৈধ করেছেন এ দেশে। ১৯৭৫ সালের ১৭ জানুয়ারি। দীর্ঘ বছর ইওরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল অবদি। আমাদের নাস্তার টেবিলে আলাপ হল নারী বিষয়ে, দোভাষীর মাধ্যমে। সিমোন ভেইল ইংরেজি জানেন না। সুতরাং সরাসরি কথা বলার কোনও সুযোগ নেই। যত মন্ত্রী মেয়রের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সকলেই দোভাষী ব্যবহার করেছেন। বাংলা ফরাসির জন্য সারা ফ্রান্স খুঁজতে যাবে ওরা, তখন আমি নিজেই বলেছি ইংরেজি ফরাসি হলেই ঠিক আছে। রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানগুলোয় বলে দিয়েছি কোনও আনাড়ি খুকি না নিয়ে বরং ভালো অনুবাদক খুঁজে নিতে।

সাক্ষাৎ এবং সাক্ষাৎকারের জন্য ছুটোছুটি চলছে মানুষের। বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে অনেক। ক্যানেল প্লুসএর মতো টেলিভিশনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানকেও সস্তা বলে প্রায় বাতিল করে দিচ্ছিলাম। এটা ঠিক, অনেক জনপ্রিয় ম্যাগাজিন বা পত্রিকাকে সস্তা বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারের সও ওদিকে যায়ান। *প্যারি ম্যাচ* নামে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন প্রচুর ঘুরেও কোনও সুযোগ পায়নি আমার সঙ্গে দুমিনিট কথা বলার। আমি কী বনে গেছি? আমি যে সে

তারকা নই। কেবল উচু মানের ইন্টেলেকচুয়ালরা সুযোগ পাবেন আমার সঙ্গে কথা বলার, মত বিনিময় করার। বাকিরা অস্পৃশ্য। আমি চিনতে পারি না আমাকে। ফন্যাক আমাকে দিয়ে গেল ভলতেয়ারের ভাস্কর্য। ক্রিশ্চান বললেন, *খুলে দেখ, এ তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ভাস্কর্য।* সত্যি বলতে কি, না বলে দিলে এ ভলতেয়ার, বুঝতামই না যে এ ভলতেয়ার। এমনই অশিক্ষিত আনকুথকে দেওয়া হচ্ছে সর্বকালের সর্বজ্ঞানীর সম্মান। তাও আবার ফ্রান্সের অতিবিজ্ঞজন দ্বারা।

স্বর্গে নাকি সাংঘাতিক আরাম আয়েশের ব্যবস্থা আছে। কোনও চুড়ান্ত ধার্মিক এসেও আমার রিৎজ হোটেলের খাওয়া দাওয়া নাওয়া শোওয়ার আরাম দেখে বলতে বাধ্য হবেন যে অত আরামের কল্পনা স্বর্গের বেলায়ও তিনি করেননি। সব আরাম ভুলে, একফোঁটা সময় পেলেই হোটেল রুম থেকে ফোন করে বসি ঢাকায়, ময়মনসিংহে, কলকাতায়। এত দামী হোটেলের রুম থেকে ফোন করা মানে গলা কাটা। সে আমার মাথায় ঢোকার কোনও অবকাশ নেই। ক্রিশ্চান একবার শুধু মিনমিন করে বলেছিলেন। সেটুকুই। পরে আমার প্রকাশনীই পয়ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ শুধু কদিনের ফোন বিল মিটিয়েছে। প্রকাশনী অনেক কিছুই করছে। আমার জন্য বাজারের সবচেয়ে লেটেস্ট মডেল ল্যাপটপ কম্পিউটার কিনে ইংলেন্ড থেকে পাঠিয়েছে। যেহেতু আমার অপারেটিং সিসটেম ইংরেজিতে চাই, তাই প্যারিস থেকে লন্ডনে গিয়ে কিনে পেন এর রাইটার্স ইন প্রিজন কমিটির প্রেসিডেন্ট জোয়ান লেডারম্যান কে দিয়ে পাঠিয়েছে স্টকহোমে। অবশ্য পাঠিয়েছে বলা ঠিক হবে না, জোয়ান আমার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন। উঠেছিলেন গ্রান্ড হোটেলে। আমাকে শুধু ল্যাপটপ দিয়ে দু কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমি উদভ্রান্ত। কারও সঙ্গেই কথা বলতে আমার ভালো লাগছিল না তখন। এরকম হয়। জগতের যাবতীয় কিছু থেকে সব আগ্রহ ফুড়ুৎ করে উবে যায়। চারদিকের ঘটনাগুলো এত ধোঁয়া ছড়ায়, যে, নিজেকে ওর মধ্যে আর চিনতে পারা যায় না। অথবা ঘটনার ঘনঘটায় নিজের চোখের সামনেই একটি স্তর বা আস্তর পড়ে, দেখছি, কিন্তু সব দেখতে পাচ্ছি না।

ফ্রান্সে আমি অনেকটা রোবোটের মত। যা যা বলা হচ্ছে, করছি। পালন করছি বড় তারকার কর্তব্য এবং দায়িত্ব। একশটা অনুরোধ উপরোধ বাতিল করে চলছি। সব ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে প্যারিস শহরে হাঁটতে। বালিকার মত। আমাকে বালিকা হতে কেউ দেবে না। সময় পাল্টে গেছে। কে পাল্টে দিয়েছে সময়? মৌলবাদীরা! তা নয়তো কে! আমি তো যে আমি, সেই আমিই আছি! পাল্টে তবে দিল কে! আমার ওই দুমাসের অন্ধকারের জীবন! মৃত্যুকে সামনে নিয়ে বেঁচে থাকা! পৃথিবীর কত শত বিপ্লবী আমার চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি দুঃসহ জীবন কাটিয়েছেন! কই, তাদের নিয়ে আদিখ্যেতা তো হয়না মোটেও। আসলে, যা করতে বলা হচ্ছে, তা করছি বটে, কিন্তু বুঝি যে আমাকে এসব মানায় না। এক অনুষ্ঠান থেকে আরেক অনুষ্ঠানে দৌড়োনোর মাঝখানে ক্রিশ্চান বেস দুদিন বলেছেন, *ডার্লিং তোমার নাকে কি একটু পাউডার লাগাবে?* সঙ্গে সঙ্গে আমি নাকে হাত দিয়ে বুঝতে চেয়েছি কোনও গন্ডগোল হল কি না। আমি দুদিনই সাফ সাফ বলে দিয়েছি, না, নাকে পাউডার লাগানোর কোনও দরকারই আমার নেই। পরে, অনেক পরে আমি জেনেছি যে নাকে পাউডার লাগানোর মানে হচ্ছে পেচ্ছাব পায়খানায় যাওয়া। মেয়েদের জন্য এই নিয়ম। ছেলেদের জন্য হল, *হাত ধুয়ে আসা।* তো, আমি পশ্চিমের সভ্যতার নিয়ম জানবো কী করে। কোথাও পেচ্ছাবখানায় যেতে হলে, সোজাসুজি বলে যাই যে *পেচ্ছাবখানায় যাচ্ছি।* যে সমাজে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বা গলায় দড়ি দিয়ে যে সব এলাকায় আমাকে ঘোরানো হচ্ছে, সে সমাজে আমি যে বেমানান, তা আমি যত না বুঝতে পারছি, তারা নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারছে।

বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির পুরস্কার নিজে হাতে গ্রহণ করার সময় নেই। সকাল থেকে রাত অবদি ব্যস্ততা। কথা দেওয়া আছে লাইসিটি ইন ইওরোপে। ইওরোপের সেকুলার মানববদী সংগঠন। ক্রিশ্চান ওদের আগেই বলে দিয়েছিল পনেরো মিনিটের বেশি একটি মিনিটও নয়। সকলে অপেক্ষা করছিল একটি কনফারেন্স রুমে। আমাকে তড়িঘড়ি ফুল দিয়ে পদক দিয়ে

ব্রোঞ্জের মূর্তি দিয়ে সম্বর্ধনা সম্মান পুরস্কার যা দিতে ইচ্ছে ওদের, দেওয়া হয়। ফুলে আর উপহারে ডুবে যাই। সকলে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে করমর্দন করছে একজনের পর আরেকজন। সময়ের অভাবে সবার সঙ্গে করমর্দন হয়ে ওঠেনি আমার। এক মেয়ে কেঁদে বলে যায়, *তুমি আমাদের, তোমার লড়াই আমাদের লড়াই।*

লা হিউমানিতে পত্রিকার সম্পাদক এলেন। কম্যুনিস্ট পত্রিকা বলেই খানিকটা খাতির করে সময় দিয়েছি আলাদা। দুপুরে ইফেল টাওয়ারের সবচেয়ে চুড়োয় জুল ভার্ন রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ। ওখানে এক তুড়িতেই আমরা যাচ্ছি। ওখানে খেতে চাইলে নাকি বেশ কয়েকমাস অপেক্ষা করতে হয়। পৌঁছে দেখি সাধারণ পাবলিককে ইফেল টাওয়ারের ধারে কাছে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। আমার জন্য খালি করা হয়েছে পুরো ইফেল টাওয়ার। টিভির ক্যামেরা বসানো হয়েছে ইফেলের চুড়োয়। টিভির খবরে খানিকটা কথা বলতে হবে। ক্রিশ্চানের ওপর রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছি। সারাক্ষণ এত সাক্ষাৎকার আমার অসহ্য লাগছে। কিন্তু প্রকাশকরা ভিষণ রকম পছন্দ করে এসব। আমি তো প্রকাশক নই। ক্রিশ্চানরা লেখকরাও চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকে, জোটে না। ক্রিশ্চানকে জিজ্ঞেস করলাম, ফরাসি লেখকদের কথা বলছো? মাথা নেড়ে বললো, আর কার কথা!

ইফেল টাউয়ারের সবচেয়ে উঁচুতে রেস্তোরাঁ জুল ভার্ন। একেবারে শীর্ষে গিয়ে দেখলাম পুরো প্যারিস। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহর। স্বপ্নের শহর। ওই শীর্ষেও ক্যামেরা আলো সব বসিয়ে রাখা আছে আমার জন্য। আমি শুধু একবার সামনে গিয়ে বসবো। দুটো প্রশ্ন আছে আমাকে করার। কারণ আজই জঁ-দার্ন আলিয়ে নামের এক লেখক বলছেন, যে, *বাংলাদেশে নারীর অবস্থা খুব ভালো, কারণ নারী ও দেশে প্রধান মন্ত্রী, নারীরা নির্যাতিত বলে যে খবর আমি পশ্চিমে দিচ্ছি, তার সবই মিথ্যে। আমি নিজে লেখক নই, আমি কখনও বই লিখিনি। লজ্জা বইটিও অন্যের লেখা। তিনি নিজে সম্প্রতি ঢাকায় গিয়েছিলেন, দেখে এসেছেন ওখানে নারী পুরুষের সমান অধিকার, এবং ওদেশের নারীরা পশ্চিমের নারীর চেয়েও বেশি স্বাধীন।*

বাংলাদেশে অনেক ভালো সাহিত্যিক আছে, আমি সাহিত্যের কিছুই জানি না। ফতোয়ার কথা মিথ্যে। কেউ কোনও ফতোয়া দেয়নি, কেউ মাথার মূল্য ঘোষণা করেনি।

টেলিভিশনের ক্যামেরা আমার সামনে। আলো আমার মুখে। আলো চোখেও। যেন আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আমি আসামি। আমি মিথ্যুক। উমহাহাহাহা এবার কী জবাব দেবে, সুন্দরী! আমি শুধু বলি, *অভিযোগগুলো মিথ্যে। আমি যা বলেছি, সত্য কথা বলেছি। আমার বই আমি নিজে লিখি। তিনি বাংলাদেশের যেটুকু দেখেছেন, তা সবটুকু নয়। আর প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধীদলের নেত্রী মহিলা, তার মানে এই নয় যে মেয়েদের অবস্থা সমাজে খুব ভালো। আমি কখনও বলিনি বাংলাদেশে আমি খুব বড় কোনও সাহিত্যিক। কেউই কি বলেছে কোথাও তা? আমি সাধারণ একজন লেখক। সাধারণ হলেও আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছে। মাথার মূল্য ধার্য হয়েছে। বিশ্বের সাংবাদিকরাই এসব দেখেছেন, খবর লিখেছেন, তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। আমি করিনি কিছুই। আমি কীকরে বিশ্বসুদ্ধ খবর ছড়াবো? আমি তো কোনও রিপোর্টার নই।*

মন বিষণ্ন হয়ে ছিল। আমার উদ্বিগ্নতা আর বিষণ্নতাকে উড়িয়ে দেয় ক্রিশ্চান বেস। বলে, *লোকটার দুর্নাম আছে এসবের জন্য। উদ্ভট সব কথা বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। কেউ ওকে বিশ্বাস করবে না, ভেবো না।* কিন্তু দৃষ্টি তো আকর্ষণ কারও না কারওর করছে।

শোনো, ক্রিশ্চান বলে, *বেশি জনপ্রিয় হলে দুএকটা শত্রু পয়দা হবেই। নিজের দেশের কথা ভাবো। লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে সবাই তোমাকে সমর্থন করেছে? হিংসে করেনি কেউ?*

--আমি তো ফরাসি নই। ফরাসি ভাষায় আমি লিখিও না। আমি তো ওই লোকের প্রতিদ্বন্দ্বী নই, তবে কেন হিংসে করবে?

--হিংসে করবে, কারণ, কোনও লেখককে নিয়ে এমন উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না। কোনও লেখক এমন তারকার জনপ্রিয়তা পায় না। সমস্ত আকর্ষণ তোমার দিকে। লোকটা তোমাকে নিয়ে কথা বলবেই। ওলোটপালোট করে দিতে চাইবে। লোকটা আগাগোড়াই পলিমিক।

তাহার বেন জেলুন নামে মরক্কোর এক লেখক জঁ আলিয়েরের তসলিমা বিরোধীতায় যোগ দেন। কে এই তাহার বেন জেলুন? তাহার বেন জেলুন উত্তর আফ্রিকার এক সফল উত্তর আধুনিক লেখক। কী তাঁর অভিযোগ? মূলত একই। তাঁর ভাষ্য, *ফ্রান্সের মত দেশে কোনও মহিলা প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না। কোনও সম্ভাবনাই নেই। সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা। শুধু তাই নয়, বিরোধী দলের প্রধানও একজন মহিলা। সুতরাং তসলিমা গোটা বিশ্বকে বোকা বানাতে চাইছে এই বলে যে বাংলাদেশে নারীরা নির্যাতিত।*

এই মানুষগুলো, আশ্চর্য হই, কী করে বুদ্ধিজীবী হন, যদি মনে করেন, নারীরা তখনই প্রধানমন্ত্রী হতে পারে, যখন সমাজে নারীর সমানাধিকার থাকে। কজন নারীর, বাংলাদেশে, রাজনীতি করারই বা সুযোগ আছে? নারীদের যদি রাজনীতি-সচেতন হওয়ার এবং রাজনীতি করার সুযোগ হয়, তবে তিরিশ ভাগ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখতে হয় কেন! বাংলাদেশে   শতকরা আশি ভাগ নারী লেখাপড়া জানে না, আর, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী যে চরমভাবে বৈষম্যের শিকার--এই তথ্যটি ফরাসি শিক্ষিত লোকেরা পাননা! দীর্ঘ একটি শ্বাস ফেলি। ফ্রান্সকে ভেবেছিলাম বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা, এ বুঝি স্বপ্নের রাজ্য। এখন দেখছি, এখানেও ঘাঁপটি মেরে একটি বাংলাদেশ লুকিয়ে আছে।

ইফেল থেকে রিৎজে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে পমপিডুতে। এর আরেক নাম মডার্ন মিউজিয়াম। মডার্ন মিউজিয়ামে সাহিত্যের শিল্পের স্থাপত্যের বিখ্যাত লোকেরা সম্বর্ধনা দিলেন আমাকে। আমার লেখা সম্পর্কে আলোচনা করলেন সকলে। আমি বললাম অগত্যা লেখালেখি করতে এসে আমাকে কী রকম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল তার কথা। শ্রোতাদের প্রশ্নের উত্তরও দিতে হল। একটি প্রশ্ন অনেকে করে, ফ্রান্সের মুসলমান মেয়েদের পর্দা সম্পর্কে কী মত আমার। পর্দার বিরুদ্ধে যখন বলি, মেয়েদের জোর হাততালি শুরু হয়।

টেলিভিশনের ক্যানেল প্লুস-এ অনুষ্ঠান। টেলিভিশনের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। জনপ্রিয় বলেই আপত্তি করেছিলাম। জনপ্রিয় মানে সস্তা, এরকম একটি ধারনা মাথায় ছিল। পরিচালকরা। আমাকে ক্যানেল প্লুস-এ নিয়ে যাবার জন্য সে কী কাণ্ড। আগের অনুষ্ঠানগুলোর কপি এনে আমাকে একের পর এক দেখাতে লাগলেন। কেবল রাজি করাবার জন্য। জনপ্রিয় মানে সস্তা, এরকম একটি ধারনা মাথায় ছিল। *ক্যানেল প্লুস হাস্যরসের অনুষ্ঠান, সিরিয়াস অনুষ্ঠান নয়,* আমার এই ভুল ধারনাকে মুছে দেবার জন্য ক্যানেল প্লুসের বড়কর্তারা চলে এসেছেন আমার হোটেলে। ক্রিশ্চান বেসও আমার পায়ের কাছে বসে আমাকে খুব নরম কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে না মোটেও ফালতু অনুষ্ঠান নয়। তারা হাসি ঠাট্টা করে এটা ঠিক, কিন্তু সিরিয়াস বিষয়ে। পাসকোয়া যখন আমাকে ফ্রান্সে ২৪ ঘন্টার জন্য ভিসা দিয়েছিলেন, এই ক্যানেল প্লুসই পাসকোয়ার কার্টুন এঁকে তাঁকে তীব্র নিন্দা করেছে। এসময়ে, অস্বীকার করার উপায় নেই, যে, এটিই টিভির সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। রাজি হই ওদের ঘন্টাতিনেক বোঝানোয়। দুঘন্টা অনুষ্ঠান। লাইভ। আমার ওপর অনুষ্ঠান হচ্ছে শুনে সিমোন ভেইল এলেন অনুষ্ঠানে। তিনি বললেন। ভাষার অসুবিধের জন্য আমি ভালো ভূমিকা রাখতে পারি না কখনও। ক্যানেলের লোকেরা খুব যত্নআত্তি করলো। উপহার দিল। নানা উপহারে আমার হোটেল ঘর উপচে উঠেছে।

রাতে ক্রিশ্চানের বাড়িতে পার্টি। ওখানে জমে উঠলো মধ্যরাত অব্দি আড্ডা। ক্রিশ্চান বিশাল ধনী। বাড়ি অ্যান্টিকে বোঝাই। বাড়ি তো নয়, ছোটখাটো একটি মিউজিয়াম। ক্রিশ্চান প্রকাশনী সংস্থায় কাজ করে নিতান্তই শখে।

৩.১১.

এই প্রথম দেবী থেকে মানুষ হলাম। বেরোলাম জিলকে নিয়ে। জিলের বোন দোমিনিক আর ওর মা এসেছে গ্রোনোবল থেকে দেখা করতে। দেখা করলাম। গেলাম আমাদের আগের

সেই, সেই এপ্রিলে এসে ভিক্টর উগোর বাড়ি দেখতে গিয়ে খোলা পাইনি, সেখানে। সাধারণ মানুষের মতো এপ্রিলে খেয়েছিলাম এমন একটি সাধারণ রেস্তোরাঁয় বসলাম। এখানেও অটোগ্রাফের ভিড়। ভিড় থেকে রেহাই নেই আমার। হোটেলে ফিরে দেখি ক্রিশ্চান আমার বইপত্র, উপহারসামগ্রি সবই প্যাকেট করে রেখেছে। আমরা, আমি জিল ক্রিশ্চান ফ্রেডেরিক অসংখ্য পুলিশসহ রওনা হলাম রসি অথবা শাল দ্য গোল বিমান বন্দরের দিকে।

আমার ফ্রান্স ভ্রমণ ফুরোলো। কিন্তু নটে গাছটি কি আসলে মুড়োলো!

জঁ অ্যালিয়েরের নিন্দার কারণে ফ্রান্সে আমার জনপ্রিয়তায় কতটুকু ভাটা পড়েছে, আদৌ পড়েছে কী না তার খোঁজ আমার রাখা হয়নি। আমার ফরাসি প্রকাশক ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠলেন আমার বই প্রকাশ করার জন্য। বেস্ট সেলার লিস্টে ফ্রান্সের জনপ্রিয় বইয়ের তালিকার মধ্যে প্রতিদিন লজ্জা শোভা পাচ্ছে। এতদিন হয়ে গেল, এখনও। লজ্জা হার্ড কভার, পকেট, সেমি পকেট, সেমিসেমি পকেট, আরও কত রকম আকার আকৃতিতে যে বেরোচ্ছে! প্রচুর অর্থ উপার্জন হচ্ছে সুতরাং আমার ওপর খুব স্বাভাববিকভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়ল *এডিশন স্টক।* কী লেখা আছে নতুন, দাও। *নতুন নেই কিছু। নতুন বই লেখা হলে দেব।* আমার এই দেব শব্দটিকে কেউ তেমন বিশ্বাস করলো না। দাও, তোমার পুরোনো লেখা যা আছে দাও। পুরোনো লেখার মধ্যে নির্বাচিত কলাম, ও থেকে খামচি দিয়ে এডিসঁ দ্য ফাম বই ছাপিয়েছে, *ফাম মেনিফেস্টিভু।* সুতরাং ও বই চলবে না।

--উপন্যাস নেই?

--উপন্যাস? আর বোলো না।

--আর বোলো না মানে? হেঁয়ালি রাখো।

--ঠিক কথা বলছি। যা কিছু লিখেছি, প্রকাশকের চাপে লিখেছি। উপন্যাস বলতে কিছু হয়নি। দেখি কখনও হয়ত ওগুলোকে একটু বড় করে লিখবো। মানে উপন্যাসের মত কিছু একটা করতে চেষ্টা করবো।

--কবে করবে?

--করব।

--তোমার এখন এত ব্যস্ততা। এখন তুমি বসে উপন্যাস লেখায় হাত দেবার সময় পাবে না।

--কিন্তু তোমাকে তো অপেক্ষা করতেই হবে। এ ছাড়া উপায় নেই।

--উপায় নেই কেন? ওগুলোই দাও, ছাপাবো।

--তুমি কি পাগল হয়েছো? ওগুলো ছাপালে তোমার প্রকাশনীকে লোকে মন্দ বলবে, আমাকেও মন্দ বলবে, বলবে ও লিখতেই জানে না। তাছাড়া ওসব বিক্রিও হবে না।

--সে আমি দেখবো।

--তুমি এখন বুঝতে পারছো না।

--ঠিকই বুঝতে পারছি। তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত দিয়ে দাও তো এ অবদি যা যা উপন্যাস লিখেছো।

--শোনো যদি ছাপাতেই চাও আমার কবিতা ছাপাও, উপন্যাস ছাপিও না।

--কবিতাও ছাপাবো। যদিও এডিশন স্টক কারওর কবিতার বই এ অবদি প্রকাশ করেনি। কিন্তু তোমারটা করবো।

--বল কি! ফ্রান্সকে তো জানি কবিতার দেশ হিসেবে।

--ওসব ফালতু কথা।

--ফালতু কথা হবে কেন?

--কবে কোনকালে কবিতা লিখেছিল কারা। এখন সে দিন নেই। কোনও প্রকাশকই আর যাই ছাপুক, কবিতার বই ছাপায় না।

--তাহলে কি বাজারে কোনও কবিতার বই নেই বলতে চাও?

--তা পাবে। সেই পুরোনো কবিদেরই কবিতার বই। সরকার ফি বছর কবিতা সপ্তাহের আয়োজন করে। কিছু প্রকাশক   খুব কম খরচে কিছু কবিতার বই ছাপায়, ছাপার খরচটা সরকারের কাছ থেকে পায়।

বল কী! এই বাক্যটি বলারও আমার ক্ষমতা থাকে না। এতটাই বিমূঢ়। বিস্মিত এতটাই। ফরাসি কবিতার যদি এই হাল তবে আমার কবিতা ছাপাতে চাইছো কেন? এ প্রশ্নটি আমি করতে চেয়েও করি না। কারণ উত্তর দিতে গিয়ে আমার মনে হচ্ছিল ক্রিশ্চান বেস অস্বস্তিতে পড়বে। কারও অস্বস্তি হবে বলে আমি কোনও জরুরি কথা সাধারণত লুকিয়ে রাখি না। কিন্তু বিদেশ আমাকে একটু একটু করে গিলতে শেখাচ্ছে অনেক কিছু।

হুড়মুড় করে যা ছিল আমার পুরোনো বই, ফেরা, শোধ, ভ্রমর কইও গিয়া, অপরপক্ষ এসব হাবিজাবি বইগুলোর, আমি সামান্যও বুঝে ওঠার আগেই ফরাসি অনুবাদ হয়ে গেল। অনুবাদ বলতে আদৌ ওগুলো কিছু হল কি না, তা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। হাতে বই আসে। ঝকঝকে বই। নেড়েচেড়ে রেখে দিই। কে অনুবাদ করেছে, সে কী আদৌ বাংলা জানে, সে কী ফরাসি জানে আদৌ , তার কিছুই আমি জানি না। রাতে রাতে হঠাৎ জেগে উঠে ভাবি, আমার বই বিক্রি হচ্ছে, নাকি আমি বিক্রি হচ্ছি? আমার জীবনের গল্প বিক্রি হচ্ছে? আমার শ্বাসকষ্ট হতে থাকে। চারদিক অন্ধকার লাগে।

*

শীত বিঁধছে গায়ে। বরফে ছেয়ে আছে চারদিক। উৎসব শুরু হয়ে গেছে গোটা ইউরোপে। ক্রিসমাসের উৎসব। আলোয় ঝলমল শহর, নগর, গ্রাম। দোকানপাটে ভিড়। মানুষ উন্মাদের মতো উৎসবে মেতে আছে। আমি অসহায় দাঁড়িয়ে এই উন্মাদনা দেখি। দেখি আর কষ্ট পাই। কষ্ট পেতে থাকি।

মন্দির নিয়ে যেমন ভারতে, মসজিদ নিয়ে যেমন সৌদি আরবে, ইরানে, মিশরে, পাকিস্তানে,
গির্জা নিয়েও তেমন এখানে, ইউরোপে বড় বাড়াবাড়ি হয়।
ক্যাথিড্রাল হচ্ছে শহরের মাথা,

এখনও লোকে ভিড় করে গির্জায়, যিশুর জন্মদিনে ঘরে ঘরে পাইন গাছ সাজায়,

বাচ্চারা চিঠি লেখে নর্থ পোলে সান্তাক্লসের নামে,

এখনও তারা মানুষ নয়, এখনও ক্রিশ্চান।

পৃথিবীর পথে হাঁটতে গিয়ে কেবল মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চান, ইহুদি দেখছি..

মানুষ দেখছি না।

*

(বৃষ্টির কবিতা)

অস্ট্রিয়ার নারী কল্যাণ মন্ত্রী ইওহানা ডোনালের আমন্ত্রণ। ভিয়েনার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল আমার। ভিয়েনার নাম শুনেছি অনেক, ভিয়েনা দেখা হয় প্রথম। ওই একই চিত্র। কড়া নিরাপত্তারক্ষীদের সামনে পিছনে ডানে বামে নিয়ে হাঁটতে হয়। উঠতে হয় সবচেয়ে বড় হোটেলের সুইটে। ভিয়েনার প্যালেস কবুর্গ-এ। উনবিংশ শতাব্দির নিও ক্লাসিক্যাল হোটেল। চোখ ধাঁধা করে, মনে হয় না আমি ঠিক এই জগতে আছি। দূর থেকে দালানবাড়ি দেখে ভিতরে যে না এসেছে ধারণা করার সাধ্য নেই কী আছে। খেতে হয় সবচেয়ে দামি রেস্তোরাঁয়, খেতে হয় মন্ত্রীদের আমন্ত্রণে। নারী বিষয়ক মন্ত্রী ইওহানা ডোনাল সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির এবং শিক্ষামন্ত্রীর। আমার সীমিত জ্ঞান নিয়ে জানতে চাই অস্ট্রিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, নারীদের সার্বিক অবস্থার কথা। খেতে খেতে ইওহানা ডোনাল আমাকে বলেন সব। যখন নতুন কিছু শুনি, যখন নতুন কিছু দেখি, যখন কিছু বুঝি,

নতুন কিছু শিখি, তখনই আমি দেখেছি আমার আনন্দ সবচেয়ে বেশি হয়। ওই লাল গালিচা সম্বর্ধনা যে আনন্দ দেয়, তার চেয়ে কয়েকশ গুণ বেশি। দানিয়ুব নদীর তীরে ছোট্ট শহর ভিয়েনা, অনেকটা রাজকীয়, কান পাতলেই ধ্রুপদী সঙ্গীত। মোৎজার্ট আর বিঠোফেনের শহর দুচোখ ভরে দেখি। ব্যারোক স্থাপত্য দেখি শনোবুন প্রাসাদে, দেখি ভিয়েনা মোৎসার্ট অর্কেস্ট্রা মুজিকফেরাইনের গোল্ডেন হলে। দেখি আরও ধ্রুপদী মুর্চ্ছনা সেই ১৮৬৯ সালে মোৎসার্টের ডন গিয়োভানি যেখানে দেখানো হয়েছিল, সেই স্টেট অপেরা হাউজে। একটি ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি, ধ্রুপদী সঙ্গীত শুনতে বা অপেরা দেখতে মানুষ খুব সেজেগুজে আসে। বেশির ভাগ ধনীরাই দেখে এসব। আমিই একমাত্র অ-সাদা একজন। যদি সাদা ধনী বেষ্ঠিত এবং সম্মানিত হয়ে ঢুকি, ঢুকেই বুঝি যে আমি নিশ্চিতই বেমানান এ জায়গায়। এত সাদার স্তূপের মধ্যে থাকতে থাকতে অনেক সময় অবশ্য ভুলে যাই যে আমি সাদা নই। রাস্তায় কোনও কালো বা বাদামি রঙের কাউকে দেখলে লক্ষ করি, চলে যেতে থাকলে পিছন ফিরে দেখি। সাদার রাজ্যে হঠাৎ ওই কালো বা বাদামিকে আমার বেমানান লাগে। নিজে যে বেমানান তা মনে থাকে না। এরপর হঠাৎ যখন খেয়াল হয় যে আমি মানুষটি নিজে কিন্তু সাদা নই, তখন আপনাতেই নুয়ে আসে চোখের পাতা।

দর্শক শ্রোতাদের নানা রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে আপাদমস্তক পরীক্ষা করে ঢোকানো হয়েছে কোনও বোমা বা কিছু বহন করছে কী না দেখতে। সন্ধেয় অনুষ্ঠান। বিকেলেই ঢুকে গেছে অতিথিরা। আমন্ত্রণপত্র ছাড়া কেউ ঢুকতে পারেনি। অনুষ্ঠান বলতে সাধারণত যেমন অনেক কিছুর মিশেল থাকে, তা নয়। ইয়েহানা ডোনাল উপস্থাপনায়। চ্যান্সেলর ফ্রানজ ভ্রানিৎজকিন দুকথা বলবেন। আমার যা বলার, তা বলার পর শুরু হবে প্রশ্নোত্তর পর্ব। ইংরেজি জার্মান। যেটুকু সম্ভব হয় বলার, বলি। অনেক কিছু অবলা থেকে যায়। যথারীতি শত শত সাংবাদিকদের ভিড়। সরাসরি টিভি সম্প্রচার। কাগজপত্রে লেখালেখি। আমার কাছে এগুলো আর অবাক করা বিষয় নয়। সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে আমাকে থাকতেই হবে যেন। একটু আড়াল হতে পারা আমার কাছে এখন একজোটিক ব্যাপার। সম্ভবত

টেলিফোনহীন টয়লেটই আমার একমাত্র প্রাইভেট জায়গা। চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সবসময় প্রশ্ন ছোঁড়া হয় না, অনেক সময় শুধু মন্তব্য। মনের কথা প্রকাশ করেন অনেকে। তারা কী রকম সুখী আমাকে দেখে! কী হুমকির মধ্যে, কী সমস্যায়, কী আশংকায় আর কী দুর্ভাবনায় আর কী দুঃসহ যন্ত্রণায় যে ছিলাম, আর তা শুনে জেনে তারা নিজেরা কত সুখে আছে, কত সুযোগ-সুবিধের সমুদ্রে আছে, তা হাড়ে মজ্জায় অনুধাবন করলেন। আমাকে দেখে তাদের মনের জোর অনেকটাই বাড়লো আগের চেয়ে। কোত্থেকে এত সাহস আমি পেলাম, কে আমার আদর্শ এইসব প্রশ্ন তো আছেই, যেগুলোর কোনও উত্তর হয় না। কিন্তু অন্য রকম একটিই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। পৃথিবীর যত সমস্যা আছে, তার সব সমাধান আমার কাছে চাইছে কেউ কেউ। নিজের অতীত বর্তমান, আদর্শ, বিশ্বাস, নিজের শিল্প সাহিত্য, চিন্তা ভাবনা এসবের বাইরে জগতের সব জটিলতা নিয়ে হাজির হলে আমার তো সাধ্য নেই সমাধান দেওয়া। যদি দিতে পারি না উত্তর, বুঝি যে প্রশ্নকর্তার চোখে আমাকে লাগছে আস্ত একটি গরু। অস্ট্রিয়ায় নিওনাৎসি কেন বাড়ছে, এর পিছনের কারণ যখন জানতে চাইল, আমি চুপ হয়ে ছিলাম। এসব আমি, সোজা কথায়, জানি না। না জেনে অনেকেই নানা রকম ভাবে জোড়াতালি দিয়ে কিছু একটা বলে দেয়। আমি সেরকম কিছু একটা করার পক্ষপাতি নই।

দর্শকশ্রোতা মূলত সাদা অস্ট্রিয়ান। শুধু দুজন ছাড়া। প্রশ্নোত্তর পর্বের পর যখন অটোগ্রাফ নেবার পালা, বাদামি দুটো মেয়ে উঠে লম্বা লাইনে দাঁড়ালো। আমার চোখ বারবার ও দুটো মেয়ের মুখে। যখন ওরা মুখোমুখি দাঁড়ালো, নিজেরাই বললো, ইংরেজিতে, যে, জন্ম তাদের বাংলাদেশে। পালক আনা হয়েছিল যখন এক দেড় বছর বয়স। বয়স এখন উনিশ কুড়ি। কখনও আর ফিরে যায়নি দেশে। আমি, চোখের সামনে এই যে আমাকে দেখছে, আমিই তাদের কাছে দেশ।

কোত্থেকে এনেছিল তোমাদের?

অনাথ আশ্রম থেকে। দুজনই বলল।

কী চমৎকার দুটো মেয়ে। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ বলতে সত্যি যা বোঝায়, তা ওদের চোখ। নিজেদের মধ্যে বিশুদ্ধ অস্ট্রিয়ান ভাষায় কথা বলছে। বললো দুজনই লেখাপড়া করছে কলেজে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হয় দেশের জন্য কোনও টান ওরা অনুভব করে কী না। প্রশ্নটি খুব কঠিন ওদের কাছে। করে এবং করে না এ দুটো উত্তরের মধ্যে ওরা দোলে। ওদের দেখলে কেউ তো ওদের অস্ট্রিয়ান বলবে না, অথচ ওরা অস্ট্রিয়ার ভাষা ও সংস্কৃতি যে কোনও খাঁটি অস্ট্রিয়ানের মতই জানে। বাংলাদেশেও যদি ওরা যায়, ওদের কেউ বাঙালি বলবে না, কারণ ওরা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কিছুই জানে না। আত্ম পরিচয়ের প্রশ্নটি কখনও কি ওদের ভোগায় না! আমি অপলক তাকিয়ে থাকি দুই তরুণীর দিকে। ওদিকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য অপেক্ষারত, অভিবাদন জানানোর জন্য অপেক্ষারত সাদারা ছটফট করতে থাকে। ভ্রুক্ষেপ নেই আমার। ভাবি, বাংলাদেশের অনাথ আশ্রমে থেকে কি ওরা এমন আধুনিক হতে পারতো। আধুনিকতা কখনও আমার কাছে পোশাক বা চলনবলন ভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মনকে পচা পুরোনো কুয়ো থেকে বের করে আনা হচ্ছে সত্যিকার আধুনিকতা। সুযোগ পেলে মানুষ কী না হতে পারে। পশ্চিমের রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, সুপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে হাজার রকম সুবিধে দেয় স্বয়ম্ভর হিসেবে এবং দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার, সুবিধে দেয় নিজের অতুল সম্ভাবনাগুলোকে বিকশিত করার। অথচ পৃথিবীর কত শত দারিদ্র ও ধর্মপীড়িত দেশে সম্ভাবনাগুলোর করুণ মৃত্যু হয়।

এই পৃথিবীরই মানুষ আমরা, কারও জন্ম এখানে হয়েছে বলে খাবে ভালো, পরবে এবং পড়বে ভালো, স্বাস্থ্য শিক্ষা ভালো হবে, জন্ম ওখানে হয়েছে বলে এগুলো পাবে না। এ কি জন্মের দোষ! জন্ম তো কখনও দোষের নয়। আমি চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, সামনে একটি ভয়ঙ্কর বৈষম্য দোদুল দোলায় দোলে। বৈষম্যটির গায়ে কাপড় নেই।

দর্শকরা লাইন ধরে অনেক কিছুই দিয়ে যায় হাতে। একজন চেয়েছিল সময়, কিছু কথা বলার জন্য। সময় নেই, পাশ থেকে ইয়োহানা ডোনালের সেক্রেটারি জানিয়ে দেয় । ঠিকানা চেয়েছিল, না, ঠিকানাও দেওয়া হয়নি। তবে তাঁর দেওয়া তাঁর নিজের লেখা বইটি গ্রহণ করা

হয়েছিল। একটি বই। উপহার সামগ্রীর মধ্যে একটি বই। সাধারণত কিছুই খুলে দেখার পড়ার সময় হয় না। *পিয়ানো টিচার* বইটিও দেখিনি খুলে। কাগজপত্রের স্তূপে বইটি পড়ে থাকে। পড়েই ছিল, প্রায় একযুগ পর বইটি হাতে পড়ে। এলফ্রিডে ইয়েলিনেকের লেখা। সাহিত্যে সে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে।

*

ডিনার পার্টিতে সকলের হাতে তখন শ্যাম্পেন অথবা হোয়াইট ওয়াইনের গ্লাস।
রথী মহারথীরা লাইন ধরে হ্যাণ্ডশেক করছে আর অভিবাদন জানাচ্ছে।
কেউ আসছে গল্প শুনতে কেমন করে পুরুষের গুহা থেকে বেঁচে বেরিয়েছি,
কেউ সই নিতে, কেউ আসছে কপালে চোখ তুলে সাবাস বাহবা বলতে, কেউ
চুমু খেতে, কেউ আবার হাত ভরে ফুল দিতে..
এর মধ্যে এক সোনালি চুলের মেয়ে কাছে এসে হাত বাড়ালো না, সই নিল না,
কোনও গল্পও শুনতে চাইল না, কেবল বলল --
আমি তোমার সঙ্গে একবার কাঁদব বলে এসেছি।
বলতে বলতে মেয়েটির চোখ ভরে উঠল জলে।
আর আমার চোখেও তখন বুকের বাঁধ ভেঙে পুরো এক ব্রহ্মপুত্র উঠে আসছে।

আমি পূবের, মেয়েটি পশ্চিমের,
কিন্তু আমাদের বেদনাগুলো একইরকম গাঢ়।
আমি কালো, মেয়েটি দুধে আলতা সাদা,
কিন্তু আমাদের দুঃখগুলো একইরকম নীল।
কাঁদবার আগে আমাদের কোনও গল্প জানতে হয়নি পরস্পরের।
আমরা তো আমাদের গল্প জানিই।

আমার তো আর জীবন যাপন হচ্ছে না। হচ্ছে আকাশ যাপন। আকাশে আকাশেই কাটছে। না, মাটিতে আমার আর থাকার বেশি সুযোগ হয় না। আমার আকাশ জীবন শুরু হয়। আকাশপারেই থাকি বেশির ভাগ সময়। একই তারিখে যদি চারটে দেশে আমন্ত্রণ থাকে, আমাকে পছন্দ করতে হবে একটি। আমার পছন্দ আপাতত সুইৎজারল্যান্ড। সুইৎজারল্যান্ডে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুইস সরকার, ডেকেছে মানবাধিকার সংস্থা।

সুইৎজারল্যান্ড থেকে সুইডেনে চলে এল নিরাপত্তা বাহিনী, আমাকে নিয়ে যেতে। পুরো প্রথম শ্রেণী সবকটি আসন নিজেদের করে নিয়ে। পিছনের ইকনোমিক শ্রেণীর যাত্রীরা উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে। বেশির ভাগই চিনে ফেলে কে আমি, যারা চিনতে পারে না, তাদের বলে দেয় পাশের যাত্রী আমি কে, এবং আমি কেন। এভা কার্লসন নামটি আমি এখনও চেষ্টা করেও বাদ দিতে পারিনি। নামটি একাই আমার স্বাধীনতা হরণ করে নেয় অনেকটা। নিরাপত্তা বাহিনী আমাকে একটি বস্তুতে পরিণত করে। হ্যাঁ সত্যিই তাই। যখন আমাকে নিয়ে বাহিনীর এক দল গাড়িতে ওঠে, কোনও একটি গন্তব্যের দিকে যেতে থাকে, দলের প্রধান জানিয়ে দেয় তাদের কেন্দ্রে, ওপরতলায়, যে, বস্তু এখন যাচ্ছে সেই নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, যে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে যাওয়ার কথা ছিল। বস্তু বলছে যে সে ডানে না গিয়ে বাঁয়ে যাবে। বস্তু হঠাৎ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে একটি ক্যাফেতে নামতে চাইছে। আমি আদপেই আক্ষরিক অর্থেই আপাদমস্তক বস্তু। বস্তু হলে তো পদার্থ হয়, মাঝে মাঝে নিজেকে আমার বড় অপদার্থ বলে মনে হয়।

জুরিখ বিমান বন্দরে নেমেই দেখে বন্দরে কোনও প্রাণী নেই। বন্দর ঘিরে আছে বিশাল বিশাল কালো কালো সব কামান। নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না। ঘিরে থাকা নিরাপত্তার একজন রক্ষীকে জিজ্ঞেস করি, *বন্দরে কামান কেন, কী হয়েছে?*

প্রথমে ভেবেছিলাম কামান গোলার প্রদর্শনী হচ্ছে হয়ত। নিরাপত্তার লোক বললেন, *আপনার নিরাপত্তার জন্য।*

--আমার নিরাপত্তার জন্য, কামান?

--হ্যাঁ

হাত দুটো শক্তিহীন হয়ে পড়ে। ফাজলামো করার আর কি জায়গা পাচ্ছে না এরা! চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত পিষি। সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সবাই। সীমা ছাড়াচ্ছে আমার সহ্যশক্তি। আমি চিৎকার করে বলতে থাকি *---এত ভয় পান কেন আপনারা, বলুন তো! কিসের ভয়! এত নিরাপত্তা নিশ্চিন্তির মধ্যে জীবন যাপন করেন যে কোথাও কাউকে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছে শুনলেই থরথর কাঁপতে থাকেন। এগুলো, এই মৃত্যুর হুমকি আমাদের গরিব দেশে প্রতিটি মানুষের ওপর প্রতিদিনই থাকে। দয়া করে আপনারা থামান কামান। কামান থামান।*

বলতে বলতে আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। পা চলছে না। পা চলছে না কারণ মাথা চলছে না। মাথা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যায়। যা ছিল সব যেন এক ফুৎকারে উড়ে গেছে কোথাও। দেহরক্ষীগুলোকে বলতে থাকি, যেন দোষ সব ওদেরই*---আপনারা কী বলতে চাইছেন, আমার নিরাপত্তার জন্য এই জুরিখ শহরে এত এত সত্যিকার কামান এনে বন্দর ঘিরে রাখতে হবে? দেখে তো মনে হয় বুঝি যুদ্ধ লেগেছে।*

---এটা ওপরতলা থেকে সিদ্ধান্ত। লোক বলে।

---আপনাদের ওপরতলা কি দুনিয়ার সেরা বুদ্ধু নাকি সেরা পাগল, শুনি? আমি চেঁচিয়ে উঠি।

---দেখে তো মনে হয় কত বুদ্ধি ধারণ করেন। আর এই সোজা জিনিসটা কেন মাথায় আপনাদের ঢোকে না যে এই ধরনের নির্লজ্জ নিরাপত্তার দরকার আমার নেই! আমাকে, বাংলাদেশের যে মোল্লাগুলো মারতে চায়, তারা কি মনে করছেন এখানে, এই জুরিখে আসবে? তারা কি জানে সুইৎজারল্যান্ড দেশটি কোথায়? তাদের বাপের জন্মেও কেউ কি কোনওদিন জানবে যে আমি আজ এখানে? জানবে না। প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমাকে এইভাবে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত নিরাপত্তা দিলে এ আমার আপনার কিছু নয়, এ মূলত ওদেরই জয়!

ফাজলামো করার আর কি জায়গা পাচ্ছে না এরা! একা একাই আস্ফালন করি। আমার রাগ হয়। আমার ভয় হয়। ভয় হয় আমার মত সাধারণ মানুষের জন্য অসাধারণ কিছুর ব্যবস্থা হলে। আমার গ্লানি হতে থাকে। আমার জন্য রাষ্ট্রের কত খরচ হচ্ছে ভাবলে আমার ভয়ানক অস্বস্তি হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের জানিয়ে দিই, যেন তাদের ওপরতলায় বলে দেয় যে আমার কোনও নিরাপত্তার দরকার নেই। খবর শুনে নিরাপত্তাবাহিনীর সবচেয়ে ওপরের লোকটি চলে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে, অনুনয় বিনয় করে বলে যে সুইৎজারল্যাণ্ডে যতদিন আমি আছি ততদিন আমি যেন করুণা করে হলেও গ্রহণ করি নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

--- *মশা মারতে কামান দাগানো দেখানো হয়েছে। এবার কামান বন্ধ করুন। কমিয়ে দিন নিরাপত্তার উৎপাত। এত গাড়ির দরকার নেই। প্যাঁ পুঁ অতি বিচ্ছিরি।*

উদ্যোক্তারা আগেই দিয়েছিলেন আমাকে কেন্দ্র করে কখন কী অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে তার বৃত্তান্ত। আবারও দিয়ে যান ফাইল-বন্দি করে। অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র, সংগঠনের উদ্দেশ্য বিধেয়, পেপারক্লিপিংস, নানাবিধ নথিপত্র। ফাইল দূরে ঠেলে বাথটাবে গরম জলের ফেনা করে চোখ বুজে শুয়ে থাকি। এই সময়টুকু আমার নিজের। কিন্তু এই সময়ও নিজের থাকে না, ফোন বেজে ওঠে। বাথটাবে শুয়েই ঝোলানো ফোনে কথা বলি। আমাকে আর পনেরো মিনিটের মধ্যেই তৈরি থাকতে হবে। দুপুরের খাবার খেতে যেতে হবে। জুরিখের মান্যগণ্য ভদ্রলোকেরা, রাজনীতির, সাহিত্যের, সংস্কৃতির, থাকবেন সঙ্গে। বড় বড় লোক দেখতে দেখতে এখন আর কাউকে বড় বলে মনে হয় না। বাথটাব থেকে উঠে সাদা ধবধবে বাথরব গায়ে জড়িয়ে তুলতুলে সাদা বিছানায় ছুঁড়ে দিই নিজেকে। ঘুম চলে আসে। পনেরো মিনিটে আমার তৈরি হওয়াও হয় না। না হলেও উদ্দোক্তারা অস্থির পায়চারি করে লাউঞ্জে। নিরাপত্তাকর্মীরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করে। দরজায় দেহরক্ষীরা মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। সবাই তারা পৃথিবীর অন্যতম ধনী দেশ সুইৎজারল্যাণ্ডের নাগরিক। আমি কোথাকার কোন হতদরিদ্র বাংলাদেশের, ততোধিক দরিদ্র ময়মনসিংহের একটি সাধারণ মেয়ে। নিয়ম মেনে বিয়ে হলে এতদিনে পাঁচ ছটি বাচ্চাকাচ্চা বিইয়ে স্বামীর দাসি বাঁদি হয়ে ঘর সংসার

করতাম। আর আমি কি না এখানে, আমাকে রক্ষা করার জন্য বন্দরে কামান নেমে আসে। হাসবো কী কাঁদবো বুঝি না। দিন দিন আমি নিরেট যন্ত্র হয়ে যাচ্ছি না তো!

যন্ত্র নিজেকে তুলে অবশেষে যায় রেস্তোরাঁয়। দাঁড়িয়ে থাকা গণ্যমান্যদের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে ঢোকে। যন্ত্রের জন্য ছাপানো মেনুকার্ড। যন্ত্রের জন্য ফুলে সাজানো টেবিল। এক একজন যার যার আসন থেকে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানায় যন্ত্রকে। এক এক জন কৃতার্থ হয়। দোভাষীর হাত পা তিরতির করে কাঁপে স্নায়ুতন্ত্রের চাপে, কেবল যন্ত্রের পাশের আসনে বসেছে বলে। দোভাষীর শুধু নয়, বড় বড় বক্তাদেরও কাঁপন দেখেছি ওরা যখন আমার পাশে বসে শ্রোতার উদ্দেশে বক্তৃতা করেন।

টেবিলে গণ্যমান্য বাদ দিয়ে দোভাষীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই। আচ্ছা, সুইৎজারল্যান্ড দেশটা কেমন? দেশটা কেমন, তা বর্ণনা করতে উন্মুখ গণ্যমান্যগণ। জুরিখ এত বেশি চেনা নাম, জুরিখকেই ভাবতাম বুঝি সুইৎজারল্যান্ডের রাজধানী। অথচ এটি রাজধানী নয়, রাজধানী বার্ন। সুইৎজারল্যান্ড সীমান্ত জুড়ে ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ইতালি আর তিরিশ হাজার জনসংখ্যার একটি ছোট্ট দেশ লিসটেইনস্টাইন। ভাষা এখানে অনেকগুলো। জার্মান, ফরাসি, ইতালিয়ান, রোমানস। যে জার্মান ভাষাটি এখানে বলা হয়, সেটি ঠিক আধুনিক জার্মান নয়, একধরনের জার্মান ডায়লেক্ট। ফরাসিও ঠিক ফ্রান্সে যে ফরাসি বলা হয় সেরকম নয়, একটু অন্যরকম, পুরনো। কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে, রোমানস ভাষাটি কি। ভাষাটি, বলা হয়, সম্ভবত ল্যাটিন ভাষার অপভ্রংশ। সুইৎজারল্যান্ডে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার মানুষ এই ভাষায় কথা বলে।

দেশটি ইওরোপে থেকেও ইওরোপে নেই। না এটি রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য, না এটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য। বিশ্বের রাজনীতির সাতে পাঁচে নেই। দেশটি দুটো বিশ্বযুদ্ধেও নাক গলায়নি। তুমুল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বেশ গা বাঁচিয়েই ছিল। দেশটির নিজস্ব কোনও সংস্কৃতি নেই। পাশের দেশের সংস্কৃতিই এঁকে বেঁকে এখানে এসে সুইস সংস্কৃতি হিসেবে নাম নিয়েছে। ধনী দেশ। ধন গড়ে উঠেছে ব্যাংকের ব্যবসায়। এই ব্যাবসা করে যে

ধনী দেশ হয়ে ওঠা যায়, লুক্সেমবার্গ তার একটি উদাহরণ। জুরিখ দেখি বেশির ভাগই গাড়ির জানালা দিয়ে। জুরিখে দেখার কিছু নেই। কলকারখানার শহর। ব্যাংকের শহর। দেখার আছে বার্নে। *এখানে কিছু নেই, যা আছে সব ওখানে আছে। ঘাস দেয়ালের ওপারেই বেশি সবুজ।* ইওরোপের বেশির ভাগ মানুষই এরকম ভাবে।

আমাকে বার্ন যেতে হবে, রাজধানীতে। বিমানের টিকিট আমার হাতে।   বলে দিই, বিমানে যেতে আমার ভালো লাগে না।

আমি ট্রেনে যাবো।

ট্রেনে তো যাওয়া যাবে না।

কেন যাওয়া যাবে না।

সিকিউরিটির ব্যাপার।

ধুর, কিচ্ছু হবে না।

ওরা ঠিক করল, আমাকে হেলিকপ্টারে নিয়ে যাবে। আল্পস পর্বত দেখতে দেখতে যাবো। প্রস্তাবটির তুলনা হয় না। কেবল জুরিখ আর বার্নের পথে যেটুকু আল্পস পড়ছে, তা নয়, আরও যতদুর একটি আধুনিক সশস্ত্র হেলিকপ্টারের পক্ষে সম্ভব যাওয়া, তত দূর অবদি যায়, আমাকে দেখাতে দেখাতে প্রকৃতির অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য। গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে যাই, জীবনের প্রথম গ্লেসিয়ার। এর আগে কাশ্মীর গিয়েছি, আল্পসের চেয়ে উঁচু পাহাড়ে উঠেছি। কিন্তু এভাবে ওপর থেকে পাখির চোখে দেখা হয়নি পাহাড় পর্বত। ওপর থেকে দেখার অভিজ্ঞতাই আলাদা। আমি আল্পস পর্বতে হেঁটে হেঁটে এই বিশালতা পেতাম না। এটি মনকে অনেক বড় করে, সমুদ্র যেমন করে। সমুদ্রের কাছে গেলেই হাড়ে মজ্জায় টের পাই, জীবন যে খুব ক্ষুদ্র, তা। জীবন ক্ষুদ্র বলেই মন সেই ক্ষুদ্রতা থেকে বেরিয়ে এসে   বৃহৎ হয়ে ওঠে। জীবনকে খুব বড় মনে হলে মন সেই বড় জীবনের কানাগলিতে কেবল আশ্রয় খুঁজবে। বেরিয়ে আসার কথা ভাববে না।

বার্নে আমার ইচ্ছে হেঁটে বেড়াবো। হেঁটে বেড়াই। ঘড়ির টাওয়ার জাইটগ্লকেনট্রুমটি বড় একটি ল্যান্ডমার্ক। বার্ন স্টাড-থিয়েটারে ধ্রুপদী সঙ্গীত শুনতে হল। দীর্ঘ দু তিন ঘন্টা বসে থাকা ঠাঁয়। বেশির ভাগই আমার চোখ চলে যায় মানুষের আচার আচরণের দিকে, আর একটা কাঠি নিয়ে কনডাকটরের তুমুল ঝাঁকুনির দিকে। পশ্চিমী ধ্রুপদীর সুর, সত্যি বলতে কী, আমার হৃদয় খুব স্পর্শ করে না। শুনে দেখেছি মোৎসার্ট, বিঠোফেন, শপাঁ, সুমান, চাইকোভস্কি, ভিভালডি, বাখ, রাখমানিনভ। যেভাবে পশ্চিমীরা আবেগে আপ্লুত হয়, আমি পারি না। ধ্রুপদী শুনতে হলে আমার ভারতীয় চাই। আমার হরিপ্রসাদ চাই। আমজাদ আলি খান চাই।

বার্নে কাণ্ড হয় বটে। আমার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন বার্নের গভর্মেন্ট হাউজে। সময় এক ঘন্টা? না। বড়জোর আধঘন্টা। পনেরো মিনিট হলে আরও ভালো হয়। একরোখার সময় কমাতে থাকি। সাংবাদিকদের কৌতূহল এখন হাড়ে হাড়ে চিনি আমি। প্রশ্নের জন্য মুখ খুললেই বুঝি কী প্রশ্ন করতে যাচ্ছে কে। প্রশ্ন সিকিখানিক করলেই উত্তর দিয়ে দিই পুরোটার।

বার্নের সংসদ ভবনটি একটি সুন্দর প্রাসাদ। কী তার ডোমের কাজ,, কী তার জানালা দরজা! আমি যখন হাঁটি ওই প্রাসাদে, আমার মনে হয় না আমি ঠিক এই পৃথিবীতে আছি। হাঁটি যখন, পা মাটির ওপরে ওপরে চলে। এত ঘটছে এসব, এত দেখছি, তারপরও মাঝে মাঝে মনে হয় ঘটছে না বোধহয়, বোধহয় স্বপ্ন দেখছি। আমার সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রীকূল। মন্ত্রীদের সঙ্গে আমার জরুরি বৈঠক। সবার হাতে তসলিমা নাসরিন লেখা হৃষ্টপুষ্ট ফাইল। শিক্ষামন্ত্রী, বিচারমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে ঘিরে বসেছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীই মূলত কথা বলেন। প্রশ্ন, খুব সাধারণ প্রশ্ন, পাশ্চাত্যের অনেকেই যে প্রশ্নটি করছে, *আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন।*

--আপনাদের সমর্থন পেয়েছি, এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে! আমি কৃতজ্ঞ।

--তবু কিভাবে আপনার সাহায্যে আমরা লাগতে পারি, বলুন।

--আমাকে আর সাহায্যের কী আছে। আমি ভালোই আছি। আমি যে সুযোগ সুবিধে পেয়ে বাংলাদেশে বড় হয়েছি, তার কণা পরিমাণ সুবিধেও বাংলাদেশের বেশির ভাগ মেয়ে পায় না। আমি ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছি, যে সুযোগের কথা কোটি কোটি মেয়ে কল্পনাও করতে পারবে না। বাংলাদেশের আশি ভাগ মেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে, শিক্ষা নেই। স্বাস্থ্য নেই। যদি তাদের সাহায্য করেন, তবেই আমার লড়াইয়ে সত্যিকার সাহায্য করা হয়।

আমি যা বলছি তা সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলছে মন্ত্রীর সেক্রেটারি। ঘন্টাখানিক আলোচনার পর আমি বের হই। নিজেকে বড় নির্ভার লাগে। নিঃস্বার্থ হওয়ার মত তৃপ্তি বুঝি আর কিছুতে নেই। বাইরে বেরিয়ে বড় একটি শ্বাস নিই। পৃথিবীটাকে বড় সুন্দর মনে হয়। সুইৎজারল্যান্ডের সরকার বাংলাদেশের জন্য যে সাহায্য দান করে, সেই সাহায্যকে দ্বিগুণ করবে কি না জানি না। হয়ত করবে হয়ত না। কিন্তু ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করতে চাওয়া হাতটিকে আমি সরিয়ে দিয়ে বললাম, ওদের করো, আমাকে করার প্রয়োজন নেই। এই যে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের সরকারকে, পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশের দেশহীন ঘরহীন মেয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যত সামনে নিয়েও যে ফিরিয়ে দিতে পারলো, তার একটি অহংকার নেই বুঝি! আমাকে আনন্দ দেয় আমার এই আত্মাভিমান।

আমাকে দৌড়োতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। নারীবাদী আর মানববাদী সংগঠনের আমন্ত্রণে। অচেনা মানুষ চেনা হচ্ছে প্রতিদিন। সুইৎজারল্যাণ্ড বিষয়ে জ্ঞান যত জানতে চাইছি, তত দেওয়া হচ্ছে। হচ্ছে, কিন্তু ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা সুইৎজারল্যান্ডের মত নিঁখুত দেশটির একটি তথ্য শুনে বাকরুদ্ধ বসে থাকতে হয়। এ দেশে মেয়েরা ভোটের অধিকার পেয়েছে উনিশশ একাত্তর সালে। এই সেদিন। এর আগে মেয়েদের এ দেশে ভোট দেবার অধিকার ছিল না। রাস্তা ঘাটে আপিসে দোকানে যখন আলট্রা স্মার্ট মেয়েদের ব্যস্ততা দেখছি, দেখছি তাদের স্বনির্ভরতা, স্বকীয়তা -- তখন মনে হচ্ছে এই এদেরও পুরোটা অধিকার নেই মানুষ হিসেবে বাঁচার। এরাও নির্যাতিত হয়। হয়ই তো, তা না হলে ওই মেয়েটি, জুরিখের অনুষ্ঠানে যে

মেয়েটি এসে আমার সঙ্গে কাঁদলো, সে কি আমার কষ্টেই কেবল কেঁদেছে, নিজের কষ্টে কাঁদেনি?

যে কোনও দেশেই দেখেছি, ছবির মত সুন্দর দেশগুলোতেই, তুলনা হয় না জাতীয় প্রশংসা শুনে যখনই নারীবাদীদের সঙ্গে কথা বলেছি, পেয়েছি পুরুষতান্ত্রিকতার বিভৎসতা। কেন এমন? কেন সুইৎজারল্যান্ডের মেয়েরা এত দেরিতে ভোটাধিকার পেল? উনিশ শতকের শুরুর দিকেই তো ইওরোপের অনেক দেশেই মেয়েরা ভোটাধিকার পেয়ে গেছে। সবার আগে পেয়েছে নিউজিল্যান্ডে, ১৮৯৩ সালে। ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ১৯১৮ সালে অস্ট্রিয়া, ১৯১৯ সালে জার্মানি, ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ১৯২৮ সালে যুক্তরাজ্য, ১৯৪৪ সালে ফ্রান্স, ১৯৪৫ সালে ইতালি। কিন্তু সুইৎজারল্যান্ডের মতো দেশে ভোটাধিকার পেতে ১৯৭১ লেগেছে। নারী আন্দোলনের নেত্রীরা কী করছিল? কী করছিল এক এক করে শুনি। আঠাারো শতক থেকে থেকে দাবি জানাচ্ছে মেয়েরা কিন্তু ওদের দাবির দিকে ফিরে তাকায়নি কেউ। উনিশ শতকের প্রথম থেকে কথা উঠেছে, কিন্তু মেয়েদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত কী উচিত নয় এ বিষয়ে জেলায় জেলায় ভোট হয়, ভোটে *উচিত নয়*এর ভাগে লোক সংখ্যা বেশি থাকে। রক্ষণশীল পুরুষেরা তো মেয়েরা ভোটাধিকার পাক এটা চায়নি, এমনকী অনেক মেয়েও চায়নি। বারবার মেয়েরাই চিৎকার করেছে, মেয়েদের ভোটাধিকার চাই না, চাই না। কেবল ১৯৭১ সালেই ভোটাধিকার পেয়েছে সুইস মেয়েরা, এটা কি খুব অবাক করা ব্যাপার। আর এটা শুনলে কেমন লাগবে যে সুইৎজারল্যান্ডে পারিবারিক আইনে নারী পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার থাকতে হবে এই আইনটি পাশ হয়েছে ১৯৮৫ সালে। চাকরি ক্ষেত্রে প্রসূতিদের জন্য যে ছুটি বরাদ্দ আছে, সে ছুটি এখনও বিনে পয়সার ছুটি।

বল কী? আমার আর্তস্বরে ওরাও চমকে ওঠে।

সুইৎজারল্যান্ডের মেয়েটির কথা ভেবেছি, ভেবে একান্তে বসে তাকে ভেবেই কবিতা লিখেছি। কবিতাটি কতটুকু কবিতা হল, তা নিয়ে ভাবিনি। তবে লিখে আমি স্বস্তি পেয়েছি, যে স্বস্তি মন্ত্রীদের বলে পেয়েছিলাম, যে, ওই দরিদ্র মেয়েদের সাহায্য করুন, যারা শিক্ষা পায়

না, চিকিৎসা পায় না, অন্ন বস্ত্র পায় না, যাদের সাহায্যের প্রয়োজন। সুইৎজারল্যান্ডের বাকি ছবিগুলো হালকা হয়ে আসে, কেবল ওই সোনালি চুলের সাদা মেয়েটির চোখের জলে ভাসা মুখটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওই মুখটিই ছাড়া আর সব কিছুকে বড় কৃত্রিম বলে মনে হয়।

*

স্ট্রাসবুর্গের রাস্তায় মধ্যরাতে আমরা চার বন্ধু
হাঁটতে হাঁটতে পুরনো শহরের গলিতে
কালভার্টে বসে চুমু খাওয়া যুগল দেখে হঠাৎ তৃষ্ণা বোধ করি
আর শুনতে থাকি শব্দ
জলের, শীতের পাখিদের, শুকনো পাতার।

সারারাত শ্যাম্পেন পান করে রেস্তোরাঁ থেকে রেস্তোরাঁয়
ফ্রেডেরিক, আমি, জিল, জিল, ক্রিশ্চান আর আমি আমাদের ক্লান্তিগুলো ভুলে যাই,
আমাদের বেদনাগুলো।
সারারাত এক জীবন থেকে আরেক জীবনে গড়াতে গড়াতে ভুলে যাই আমাতের নাড়ি-নক্ষত্র
পরস্পরকে কথা দিই আমরা আর বাড়ি ফিরবো না
কথা দিই গোটা আল্পস একদিন তুলে আনবো হাত বাড়িয়ে
আর মাটি খুঁড়ে আটলান্টিকের জল।
ভালবাসতে বাসতে শ্যাওলা দূর হবে আমাদের বয়সের, শ্যাওলা দূর হবে আর
চার বন্ধু রোদে আর জ্যোৎস্নায় ভিজে জীবনভর চন্দ্রমল্লিকা ফোটাব,
ফোটাব স্ট্রাসবুর্গে।

আমরা ভুলে যেতে থাকি উড়োজাহাজ বন্দরে দাঁড়ানো
আর আগামিকাল ভোরেই কেউ চলে যাবে উত্তরে, কেউ দক্ষিণে---

পেয়েছি শাখারভ পুরস্কার। ১৯৯৪ সালের শাখারভ পুরস্কারটি পেয়েছি আমি। সোভিয়েত বিজ্ঞানী আন্দ্রেই শাখারভের নামে এই পুরস্কারটি দিচ্ছে ইওরোপীয় পার্লামেন্ট। পুরস্কারটি দেওয়া হয় ডিসেম্বরের দশ তারিখে। যে তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের বা জাতিসংঘের *ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস* সই করা হয়েছিল। পুরস্কারটি তাঁদেরই দেওয়া হয়, যারা স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে।

উনিশশ আটাশি সালে প্রথম দেওয়া হয় পুরস্কার। সে বছর পেয়েছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা আর আনাতোলি মার্চেনকো, পরের বছর আলেকজান্ডার দুবেক, ১৯৯০ সালে আং সান সু চি, ৯১ সালে আদেম দেমাচি, ৯২ সালে আর্জেন্টিনার মাদারন অব দ্য প্লাজা দে মায়ো, ৯৩ সালে অসলোবাডেনি শাখারভ পুরস্কার সম্পর্কে একটা কথা বলা হয় যে এই পুরস্কার পাওয়া মানে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী নেতা ম্যান্ডেলা আর বার্মা বা মায়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী সুচি পেয়ে গেছেন নোবেল। আলেকজান্ডার দুবেক চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন, আটষট্টিতে রাজনৈতিক রিফরমেশন চেয়ে যে প্রাগ স্প্রিং নামের যে বিখ্যাত বিপ্লব, সেই বিপ্লবের নেতা দুবেক। ৮৯ সালে কমিউনিজমের পতন হলে তিনি ফেডারেল অ্যাসেম্বলির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। আদেম ডেমাচি যুগোশ্লাভিয়ায় থাকা সংখ্যালঘু আলবেনিয়ান। সংগ্রাম করেছেন যুগোস্লাভিয়ায় বা সার্বিয়ায় তাঁর থাকার অধিকার নিয়ে। তাকে কসোভোতে, যেখানে বেশির ভাগ আলবেনিয়ানদের বসত, চলে যেতে বলা হয়েছিল, তিনি যাননি। তিনি প্রিস্টিনাতেই থেকে গেছেন। সংগ্রাম করছেন কসোভোর স্বাধীনতার জন্য। অসম সাহসী আদেম দেমচি মৃত্যুকে ভয় পান না। জেল খেটেছেন ২৯ বছর। তিনি বলেন, *তুমি যদি বলো যে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছো, কিন্তু এদিকে স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত নও তুমি, তবে হয় তুমি নিজেকে মিথ্যে বলেছো অথবা অন্যকে মিথ্যে বলেছো।* অসলোবোডেনি হল

সারায়েভোর পত্রিকা। যুদ্ধের সময় এই পত্রিকা প্রতিদিনই বের হত। সাংবাদিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খবর সংগ্রহ করতেন, এবং প্রতিদিনই ছাপাতেন।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের আমন্ত্রণে স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ইংলেন্ড সবখানে মানবাধিকারের প্রসঙ্গে বক্তৃতা না ছাই দিয়ে মানুষকে মানবতার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছি-- অ্যামনেস্টির কর্তাকর্ত্রীদের এই শান্তি স্বস্তি দিয়ে ইংলেন্ড থেকে উড়ে আসি ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে। ইওরোপিয় পার্লামেন্ট দুটো শহরে বসে। একটি বেলজিয়ামের ব্রাসেলসএ, আরেকটি ফ্রান্সের স্ট্রাসবুর্গে। স্ট্রাসবুর্গেই ইওরোপিয় পার্লামেন্ট আমাকে পুরস্কার দেবে, শাখারভ পুরস্কার। দেড় লাখ ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ। বিমান বন্দরে নেমেই দেখি সারি সারি নিরাপত্তা পুলিশ আমাকে স্বাগত জানিয়ে ওদের গাড়িতে তুলে নিয়েছে। নামিয়েছে যথারীতি সবচেয়ে বড় হোটেলের বিশেষ সুইটে। যথারীতি আমাকে তৈরি হতে হবে, যেতে হবে সবচেয়ে বড় রেস্তোরাঁয়, বসতে হবে বড় বড় গণ্যমান্য আয়োজকদের সঙ্গে, খেতে হবে সবচেয়ে উন্নতমানের ফরাসি ওয়াইন, এবং সবচেয়ে উপাদেয় খাবার। এরপর আমাকে বলে দেওয়া হবে কী আছে অনুষ্ঠান আর। প্রথম দিন বিশ্রাম, দ্বিতীয় দিন পুরস্কার অনুষ্ঠান। তৃতীয় দিন শহর দেখা। চতুর্থ দিন চলে যাওয়া।

স্ট্রাসবুর্গে আমার এবার নিয়ে তিনবার আসা। এ বছরের এপ্রিল মাসে আর্তে টেলিভিশনের প্রেস ফিডম অনুষ্ঠানের আলোচনা সভায়, দ্বিতীয় খুব বেশিদিন আগে নয়, ফন্যাক আর মেয়রের ক্যাথারিন ট্রটমানএর আমন্ত্রণে। এর আগে স্ট্রাসবুর্গে যখন এসেছি, তখনই ইওরোপিয় ইওনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং নানা মন্ত্রী এবং মানবাধিকার শাখার কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎএর আমন্ত্রণ ছিল। অথচ এবার আমি ইওরোপিয় ইউনিয়নের শাখারভ পুরস্কার পাচ্ছি, এবার সেরকম সাক্ষাৎএর আয়োজন নেই। খানিকটা থমথমে পরিবেশ। কারণটি আমি জেনে যাই প্রথম দিনই। যার দায়িত্বে আমার রক্ষণাবেক্ষণ, তিনি হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে আসেন রেজেন্ট পিতিত ফ্রান্স হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে। লোকটি

ইংরেজ। কাজ করছেন ইওরোপীয় পার্লামেন্টে। কাল কখন কীভাবে অনুষ্ঠান শুরু হবে, সব গড়গড় করে বলে দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে, এরপর বললেন *আপনি কি জানেন যে আপনার বিরোধী কিছু লোক প্যারিস থেকে এই স্ট্রাসবুর্গে এসেছে। তাঁরা কাল একটা প্রেস কনফারেন্স করছে এখানে। তাঁরা এই পুরস্কার আপনাকে না দেওয়ার জন্য ইওরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্টের কাছে আর্জি জানাচ্ছে।*

আমার মাথা থেকে পা অবদি একটি ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

তাহলে কী..?

কী বলতে?

দেওয়া হচ্ছে না পুরস্কার?

লোকটি হেসে বললেন, *নিশ্চয়ই দেওয়া হচ্ছে। তবে কাল আপনি কোনও অশোভন ঘটনা ঘটলে যে ঘাবড়ান, সেজন্য সতর্ক করে দেওয়া হল।*

কী নাম ওদের?

ওরা লিফলেট ছেড়েছে। নাম জঁ দার্ন আলিয়ে আর তাহার বেন জেলুন।

ও। ওই ওরাই।

আমাদের নিয়ম অনুযায়ী যে এই শাখারভ পুরস্কারটি পায়, তার দেশের রাষ্ট্রদূতকে আমন্ত্রণ জানাই। আপনার ক্ষেত্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে। তারা জানিয়ে দিয়েছে যে তারা আসছে না। লোকটি এবার তাঁর হাত থেকে মুক্ত করলেন একটি দলিলের ফটোকপি। সেটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, *এটি বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।*

এই দলিলটি বাংলাদেশ দূতাবাসের সিল সই সহ কনফিডেনসিয়াল ডকুমেন্ট।

বাঁ পাশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। মাঝখানে তারিখ ০৮. ১১.১৯৯৪. এবং নম্বর ১৪২৬২। ডান পাশে

EMBASSY OF BANGLADESH

29-31 RUE JACQUES JORDAENS

1050 BRUSSELS, BELGIUM

TEL 640 55 00 – 640 56 06

No. BEB/HR/5/94

তারপর লেখা শুরু, তসলিমা নাসরিনকে শাখারভ পুরস্কার না দেবার আকুল আবেদন। এক দুই করে লেখা হল বাংলাদেশে প্রত্যেক নাগরিকের মুক্তচিন্তার এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে তার বিবরণ। বাংলাদেশে কোনও ধর্মীয় মৌলবাদী নেই। নারীর ওপর কখনও কোনও নির্যাতন হয়নি। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা একশ ভাগ আছে। তসলিমা লেখক হিসেবে অত্যন্ত নিম্নমানের লেখক। তার লেখা পর্নোগ্রাফি ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য সে করে। বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান খুব স্বস্তি শান্তিতে বাস করছে। তার মূল উদ্দেশ্য রাতারাতি নাম করা। বিশ্বের চোখে বাংলাদেশের সম্মান নষ্ট করার জন্য সে বদ্ধ পরিকর। নারী আন্দোলনে তসলিমার কোনও স্থান নেই। বাংলাদেশে অনেক নারী সংগঠন আছে, কোনও সংগঠনই তসলিমাকে নারীবাদী বলে মনে করে না। এই পুরস্কার, সুতরাং, মাননীয় ইওরোপিয় পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট, তসলিমাকে দেবেন না। দিয়ে বাংলাদেশকে অপমান করবেন না।

লোকটি, ম্যাথিউ, প্রায় ধাতব কণ্ঠে বললো, *কাল খামে একটি চেক থাকবে। একশ পঞ্চাশ হাজার ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁ। চেকটি কি আমরা আপনার ব্যাংকে জমা দিয়ে দেব নাকি আপনি নিজেই দেবেন?*

আমার মাথায় চেক এবং টাকাপয়সার সামান্য ভাবনাও ঢোকে না। আমার লজ্জা হতে থাকে নিজের জন্য, নিজের এই পাওয়া পুরস্কারটির জন্য।

--*আচ্ছা, এরকমও তো করা যায়, যে আমাকে না দেওয়া হল পুরস্কার!*

--*কেন?*

--*আমার ভালো লাগছে না। নিশ্চয়ই ইওরোপিয় পার্লামেন্টের সবার আমার ওপর রাগ খুব।*

--*আপনি এসব কী বলছেন!* ম্যাথিউ হেসে বলল, *আপনি তো অনেক পথ পেরিয়ে এসেছেন। হাজার হাজার মানুষ আপনাকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। আপনি নিশ্চয়ই অভ্যস্ত এইসব নিন্দায়।*

--*কিন্তু এঁরা তো বড় সাহিত্যিক। এঁরা তো মৌলবাদী নন।*

--*ইওরোপিয় পার্লামেন্ট অনেক ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপনাকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য। নোবেল পুরস্কারের বেলাতেও লোকে আপত্তি করে একে দিচ্ছ কেন, ওকে দিচ্ছ কেন, তাই বলে কি দেওয়া বন্ধ হয়? যাকে দেওয়ার কথা ভাবা হয়, তাকেই দেওয়া হয়। আপনাকে এত নরম মনের মানুষ বলে আমরা কেউ ভাবি না। সকলে আপনাকে শ্রদ্ধা করি আপনার সাহসের জন্য।*

ম্যাথিউএর ধাতব কণ্ঠ আর ধাতব থাকে না। ক্রিশ্চান পুরোহিতের মতো শোনায়। লোকটি যত যাই বলুক, সারারাত আমি সেই পালক নরম বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছি। ঘুমোতে পারিনি। পুরস্কারের দিন আমাকে শক্তপোক্ত সব দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে স্ট্রাসবুর্গের ইওরোপিয় পার্লামেন্টে ঢুকতে হয়। দরজায় অপেক্ষা করছিলেন পোলিন গ্রীন। তিনি সোশালিস্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট। পোলিন গ্রীন নিজে ইংরেজ। ওদিকে আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরও সংসদ সদস্য। আমি হাঁটি, আমার দু পাশে বড় বড় কাঁধের ক্যামেরা হাঁটে। ক্ষণে ক্ষণে দৌড়ে যেতে থাকে সামনে। যেন কী ভীষণ কিছু আমার এই হাঁটা। আমার এদিক ফেরা ওদিকে চাওয়া যেন হারালে গর্দান যাবে তাদের। পোলিন গ্রীন জানালেন, সোশালিস্ট পার্টি থেকে নাম প্রস্তাব করা হয়েছে আমার। একজন অস্ট্রিয়ান সংসদ সদস্য প্রস্তাবটি করেছে। সোশালিস্ট পার্টির যে সভাঘর সেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন পোলিন গ্রীন। ওখানে ছোটখাটো ধন্যবাদ জাতীয় বক্তব্য পেশ হল। আসলে আমি ঠিক বুঝে পাই না, কোথায় কী করতে হবে। বুঝে পাই না, কোনটি কোন সভা। আমাকে তো নিয়ে শুধু দাঁড় করিয়ে দেয় সবাই। এসব কী হচ্ছে এখানে, আমাকে কী করতে হবে এগুলো কানে কানে জিজ্ঞেস করে নিতে হয়। আমার মনে হয়, যারা আমাকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করছে, মনে

করছে এখানকার নিয়ম কানুন সবই বুঝি আমার নখদর্পণে। নিয়ম কানুনের তোয়াককা করি না, যখন হাঁসফাস লাগে সব দুহাতে ঠেলে বেরিয়ে যাই। তবে পোলিন গ্রীন এবং সোশালিস্ট পার্টির আন্তরিকতা আমাকে নাড়িয়েছে, বিশেষ করে সেদিন যদি আলিঙ্গন এবং করতালি পাই, যেদিন আমার পুরস্কার পাওয়ার বিরুদ্ধে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছে

এরপর সময় হলে সবচেয়ে বড় যে সভাঘরটি আছে, মূল সংসদ যেখানে বসে, সেখানে। দর্শকাসনে সংসদ সদস্য। গ্যালারির ডানদিকে বসে ডানপন্থী, বাঁদিক বামপন্থী। আজ ডানপন্থীদের উপস্থিতি কম। ইওরোপে উগ্র ডানপন্থীরা আর্য রক্ত চায়, সাদা সোনালি রঙ চায়, তারা বাদামি আর কালো খেদিয়ে ইওরোপকে শুদ্ধ পবিত্র করতে চায়। এরা না থাকা মানে আমার জয়, আমার এতকালের মানবতার পক্ষে লড়াই করার জয়। আনুষ্ঠানিকভাবে আমাকে পুরস্কার দেওয়া হল। মানপত্রে লেখা, **European Parliament**. **The Sakharov Prize for Freedom of Thought** is awarded for the year 1994 to **Taslima Nasrin** in recognition of her work to further the advancement of women's rights, of her stand against intolerance and of her contribution to the promotion of freedom of expression. পুরস্কার হাতে নিয়ে আমাকে একটি বক্তৃতা করতে হয়, সেটি করলাম। আমার বলা কথা স্প্যানিশ , ডেনিস, জার্মান, গ্রিক, ইংরেজি, ফরাসি, ইতালীয়, ডাচ, পর্তুগিজ, ফিনিশ আর সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাচ্ছে, যা বলছি সব। সকলের টেবিলেই শোনার যন্ত্র আছে, কানে দিয়ে এক দুই নম্বর ঘোরালেই ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ।   বক্তব্যে আমি লেইলা জানার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জানিয়েছি। আনতোয়ানেত ফুককে কথা দিয়েছিলাম, জানাবো। শাখারভ পুরস্কার আমি পাচ্ছি এই খবরটি পাওয়াতক ফুক বলেই চলেছেন লেইলা জানাকে যেন আমি আমার পুরস্কারটি দিয়ে দিই।

--*মানে?* আমি স্তম্ভিত।

--তোমার শাখারভ পুরস্কারটি ঘোষণা করে দাও তুমি নিচ্ছ না, যেন ওটি লেইলা জানাকে দেওয়া হয়। আনতোয়ানেত খুব শুভাকাঙ্খীর মতো উপদেশটি দেন।

আমি কিছুক্ষণ ভেবে বলি*--আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এ কাজটি করা আমার উচিত হবে কী না।*

--লেইলা জানা জাতিতে কুর্দ, তিনি গত বছর তুরস্কের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। লেইলা আমেরিকায় গিয়ে কুর্দদের ওপর তুর্কীদের অত্যাচার সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে আসার পর তুরস্কের সরকার তাঁকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছে। অনেকদিন বন্দি করে রাখার পর পনেরো বছরের জেল দেওয়া হয়েছে তাকে। এই তো মার্চ মাসের দু তারিখে জেল হয়ে গেছে। এ সময়ে তুমি তোমার পুরস্কারটি লেইলা জানাকে দিয়ে দিলে লেইলা জানার ব্যাপারটি সকলে জানতে পারবে। আর জানো তো শাখারভ পুরস্কারের জন্য তোমার নাম আমিই কিন্তু প্রস্তাব করেছিলাম ইওরোপিয়ান পার্লামেন্টে।

আনতোয়ানেত অপেক্ষা করেন আমার উত্তরের। আমি চুপ করে থাকি।

--যদি নাই চাও পুরো পুরস্কারটি দিয়ে দিতে। অন্তত তার সঙ্গে ভাগ করে নাও পুরস্কারটি।

আমার লজ্জা হয় বলতে যে পুরস্কারটি আমি লেইলা জানাকে দেব না। নিজেকে খুব লোভী লোভী লাগছে কী! হ্যাঁ লাগছে বটে। কিন্তু চিনিনা জানিনা এমন একজন মানুষের গল্প শুনেই এতবড় একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার যুক্তিও আমি দেখি না খুব। লেইলা জানার সঙ্গে আমার কোনও পরিচয় নেই। এই প্রথম আমি তার নাম শুনলাম। আমি একটি বড় পুরস্কার পেলাম, পুরস্কারটি একটি ফোন আসার পরই আমি বাতিল করে দেব, ব্যাপারটিও কেমন অদ্ভুত লাগছিল। *ঠিক আছে, আমি ভেবে দেখি* বলে আপাতত ফোন রেখে ক্রিশ্চান বেসকে ফোন করি।

-- আনতোয়ানেত ফুক বলছেন পুরস্কারটি লেইলা জানাকে দিয়ে দিতে।

শুনে ক্রিশ্চান চিৎকার করে উঠলেন, *পাগল হয়েছো? ওই বেটি তোমার মাথাটা পাগল করে দেবে। তোমার পুরস্কার তুমি অন্যকে দেবে কেন? এ আবার কেমন আবদার?*

--বলছে যেন অন্তত ভাগ করে পুরস্কারটা নিই।

--কেন নেবে? তোমার পুরস্কার তুমি ভাগ করবে কেন? ভাগ করতে হলে ইওরোপিয় পার্লামেন্টই ভাগ করতো। এখন ভাগ করা বা অন্যকে পুরস্কার দিয়ে দেবার মানে হচ্ছে তুমি পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তকে সম্মান করলে না। তুমি ফুকএর কথা ছেড়ে দাও, খুব স্বার্থপর মহিলা। এই যে তোমার বই ছাপিয়েছে, টাকা পয়সা দিয়েছে কিছু?

--আমার নাম নাকি উনি প্রস্তাব করেছেন পুরস্কারের জন্য..

--আমার মনে হয় না, করলে সে লেইলা জানা না কী বললে নাম, তার নামই প্রস্তাব করতো। এখন তুমি পুরস্কার পাওয়ার পর ক্রেডিট নিতে চাইছে। তোমার মনে নেই বেনার্ড পিভোর অনুষ্ঠানে তোমার পাশে বসার জন্য কী রকম অসভ্যের মত লোভ করছিল !

ক্রিশ্চান পই পই করে বলে দিলেন, *--এখনও মানুষ চিনতে শেখো তসলিমা। আর বোকামো করে না।*

ক্রিশ্চান কঠিন কথা বলেছেন। কিন্তু, লেইলা জানা সম্পর্কে আরও কিছু জেনে আমার বড় মায়া হয়। তাঁকে আমার দান করা হয় না আমার পুরস্কারটি, ভাগ করাও হয় না কিন্তু তাঁর কথা আমি আমার বক্তব্যে উল্লেখ করি। তাঁকে আমার অকুণ্ঠ সমর্থন জানাই। পুরস্কার অনুষ্ঠানের পর যথারীতি সাংবাদিক সম্মেলন অপেক্ষা করছে আমার জন্য। প্রেসিডেন্ট ক্লাউস হান্স আমাকে নিয়ে গেলেন সাংবাদিক সম্মেলনে। ওখানে প্রশ্ন এলো, *--আপনি কি জানেন ফরাসি দুজন বুদ্ধিজীবী আজকে আপনার বিরুদ্ধে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেছে।*

--হ্যাঁ শুনেছি।

--কিছু বলবেন এ বিষয়ে?

--তাদের স্বাধীনতা আছে তাদের মত প্রকাশ করার।

--আপনার নামে যে বইটি বেরিয়েছে, লজ্জা। সেটি কার লেখা?

--আমার।

--না। আপনার লেখা নয়। দাবি করা হচ্ছে অন্য কেউ লিখে দিয়েছে আপনার বই।

--মিথ্যে কথা। বইটি আমার লেখা। লজ্জা এমন কোনও উন্নতমানের বই নয় যে আমি তা লিখতে পারবো না।

--কী করে প্রমাণ করবেন যে লজ্জা বইটি আপনার লেখা?

--আমার প্রমাণ করার কিছু নেই।

--বলা হচ্ছে আপনি লেখক নন, কিন্তু পশ্চিমে এসে পরিচয় দিচ্ছেন একজন লেখকের।

--ঠিক আছে তাহলে আপনারা খুঁজে বের করুন কে লজ্জা লিখেছে। খুঁজে বের করুন কে তসলিমা নাসরিন, যাকে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে বলে আপনারাই একসময় প্রচার করেছেন।

আমার বিবমিষা লাগে এসব প্রশ্নে। উত্তর জুৎসুই বটে। কিন্তু ভিন ভাষায় কতটুকু তা বোঝাতে পেরেছি! অভিমানে পাথর হয়ে থাকলে খুব কি তাণ্ডব করা যায়!

জিল আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে স্ট্রাসবুর্গে। ক্রিশ্চান সলমনও আসে, ইন্টারন্যাশনাল পার্লামেন্ট অব রাইটার্সের সেক্রেটারি। ফ্রেডেরিক লেফ্রয় আসে, যে যুবক আর্তে টেলিভিশনের জন্য তথ্যচিত্র করছে আমার ওপর। হোটেলে সুটিং করলো, লিখছি। কাগজ কলম এগিয়ে দিলে আমি লিখেছি, যা কিছুই লিখেছি, লিখেছি বাংলায়। জিল এসেছে বলে আমার খুব আনন্দ হয়। অনেক রাত অবদি আমরা স্ট্রাসবুর্গের রাস্তায় হাঁটি। সেই বিখ্যাত ক্যাথিড্রালটি আবার দেখি। গোথিক ডিজাইন। দেখলে কেবল দেখতেই ইচ্ছে হয়, যত দেখি বিস্ময় ফুরোয় না। ক্যাথিড্রাল পেরিয়ে আমরা ক্যানেলের পাড় ধরে হাঁটি। রাস্তার রাজার মতো হাঁটি। কিন্তু রাজারও তো দুর্ভাবনা থাকে। জঁ দার্ন আলিয়ের কথা নিজেই পাড়ি। জিল আর ফ্রেডেরিক আলিয়েয়ের আদ্যোপান্ত। আমার কণ্ঠে বিষণ্নতা, *যদি বলত যে তসলিমা অত বড় লেখক নয়, ওকে অত বড় পুরস্কার দিও না। ঠিক ছিল। কিন্তু চ্যালেঞ্জ করছে লজ্জা আমার লেখা বই নয়। তো কার লেখা, বল!*

জিল আর ফ্রেডেরিক দুজনই বলল, *তুমি এই পাগল লোকের পাগলামো নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন!*

--আমি মাথা ঘামাচ্ছি সাধারণ মানুষকে নিয়ে। যারা আমাকে এখানে সমর্থন করতো, যারা আমাকে শ্রদ্ধা করতো। তাদের কাছে নিশ্চয়ই খটকা লাগছে। তাদের মনে একটি অহেতুক প্রশ্ন তৈরি হল। তারা হয়তো ভাবছে যা রটে, তা কিছুটা বটে।

--বাদ দাও তো, কারও মনে কোনও প্রশ্ন তৈরি হবে না। সবাই বুঝবে ওরা কী জন্যে এসব করছে।   তোমার জনপ্রিয়তা পাহাড় সমান।

মনে মনে বলি, পাহাড় সমান জনপ্রিয়তাও সামান্য ধ্বসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

রাতে এক বার থেকে আরেক বারে গিয়ে ওয়াইন খাওয়া একধরনের নিয়ম এখানে। আমরাও যথারীতি নিয়মটি পালন করতে থাকি।   প্রতিটি বারএ ভিড়, রাত যত বাড়ে, ভিড় যেন তত বাড়ে। অনেক রাতে আমরা একটি রেস্তোরাঁ বেছে নিলাম ডিনার করার জন্য। রেস্তোরাঁ পছন্দ করতেই ফ্রান্সের এক একটি অঞ্চলে এক একেক রকম খাবার। আঞ্চলিক খাবারের জন্য সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমিও আঞ্চলিকে মাতি। সেই রেস্তোরাঁয় খাচ্ছি আড্ডা দিচ্ছি। আমি, জিল, ফ্রেডেরিক। আর আশেপাশের টেবিল থেকে আমাদের টেবিলে একটু পর পরই ওয়াইনের বোতল আসতে থাকে উপহার। কেন? আশেপাশের মানুষগুলো আমার অনুরাগি, ভক্ত। তাই। এসে একসময় কেউ আলাপ করে যায় অথবা দূর থেকে হাত নাড়ে। আমাদের খাবারের যা বিল হয়, তাও ফরাসি কোনও ভক্ত আগেই মিটিয়ে দিয়ে আমাদের অবাক করে দেয়। এক রেস্তোরাঁপূর্ণ ভক্তকুলমাঝে এক ভদ্রলোকের আবেগ আমাকে তাজ্জব করে দেয়। সে এসেছে রিইউনিয়ন নামের আফ্রিকার একটি অঞ্চল থেকে, রিইউনিয়ন আফ্রিকায় হলে কী হবে, আইনত ফ্রান্সেরই অংশ। সাদা ফরাসিরাই বাস করে ওখানে। ফ্রান্স ম্যালা টাকা পয়সা খরচা করে রিইউনিয়নকে টিকিয়ে রাখছে। এক টেবিল বন্ধু নিয়ে বসে থাকা রিইউনিয়নের লোকটি তার টাই খুলে আমাকে উপহার দিয়ে বলে, *আমার কাছে এ ছাড়া আর কিছু নেই।* আমি যতই বলি আমাকে কিছু দিতে হবে না, ততই লোকটি বলে, *আমি কিছু দিতে চাইই। এটি আপনি গ্রহণ করলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। সারাজীবন আমি মনে রাখবো আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার এই দিনটির কথা।*

টাইটি নিই শেষ অবদি। গলায় পরে থাকি। জীবন হয়তো বদলে যাবে। জীবন কোথায় কতদূর অবদি যাবে, জানি না। কিন্তু এইসব মুহূর্ত জীবনের কিছু আর অপূর্ণ রাখে না। আমি যত সংগ্রামই জীবনে করি না কেন, পুরস্কার আমার জুটেছে প্রাপ্যের চেয়েও বেশি।

বেরিয়ে আসার পর জিল বলে, *দেখলে তো! মানুষ কেমন ভালোবাসে তোমাকে! দেখলে তো কোন সুদূরে রিউনিয়ন, পৃথিবীর ওইপারে, সেখানের মানুষও তোমাকে চেনে।*

--হ্যাঁ দেখলাম, এরকম ভালোবাসা দেখে মন ভরে যায়।

জিল বলে --*বড় বড় রাজনীতিবিদরা যখন তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য লাইন দেয়, সেসব টিভিতে দেখানোর জন্য, পত্রিকায় ছাপানোর জন্য। ওদের স্বার্থ আছে। ওরা আজ তোমার* ***নাম*** *না থাকলে কেউ তোমাকে চিনবেও না। কিন্তু এই যে সাধারণ লোক রেস্তোরাঁয়, এদের ভালোবাসা খাঁটি।*

একটি প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে, *নাম* না থাকলে সাধারণ লোকরাও কি ওসব করতো, যা করেছে? প্রশ্নটি ইচ্ছে করেই আর করি না। ওই প্রশ্ন করলে আরেকটি প্রশ্ন আগের প্রশ্নের পিঠে পিঠেই আসে, এই যে জিল এসেছে স্ট্রাসবুর্গে আমার সঙ্গে দেখা করতে। এ দেখা কি সে করতে আসতো যদি আমার এক ফোঁটা নাম না থাকতো!

আমি যদি নামহীন যশহীন মানুষ হতাম, কিন্তু উদার একটি মন থাকতো, গভীর একটি হৃদয় থাকতো, সততা থাকতো অঢেল, খুব বন্ধু পরায়ন হতাম, সহিষ্ণু হতাম, স্বশিক্ষিত হতাম -- কোনও বন্ধু কি জুটতো না আমার, সত্যিকার বন্ধু? আমার বিশ্বাস, আমি সেই সত্যিকার বন্ধু পাওয়ার সুযোগটি হারাচ্ছি। কারণ আমার আসল আমিটি ঢাকা পড়ে গেছে চোখ ধাঁধানো *নামি আমি*র আড়ালে।

*

সে বলে সে সুখে থাকে পরবাসে।
মাঝে মাঝে হাসে
উন্মাদের মতো, একে ওকে ভালোবাসে,
বেসে শেকড় ছড়িয়ে দেয় ঘাসে।
ঘাসে কি শেকড় ডোবে, বোকা!
গভীরে না গিয়ে কখনও কি হয় শোঁকা
জীবনের ঘ্রাণ! পাথরে রোপণ করে স্বপ্নের চারা, জল ঢেলে চোখের
কখনও কি কোনওদিন কমেছে ছায়া, শোকের!

জীবনে কখনও আমি ব্যক্তিগত বিমানে চড়িনি। এই প্রথম। ব্যক্তিগত বিমানটি স্টকহোমের বরফ ছাওয়া ব্রোম্মা বিমানবন্দর থেকে ভোরে রওনা হল জার্মানির দিকে। পৌঁছোলাম কুক্সহেভেন। সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পিটার আর নরওয়ে থেকে হান্স শিল্ডে। দুজনই জার্মান। হান্স তথ্যচিত্র করছে আমার ওপর। জার্মান টেলিভিশন এই দায়িত্ব দিয়েছে হান্সকে, আর পিটার তার বিশাল ক্যামেরা নিয়ে গল্ফ মাঠ থেকে সোজা উড়ে এসেছে স্টকহোমে। পিটার আবার শখের গল্ফ খেলোয়াড়, বয়স পঞ্চাশের ওপর, ক্যালিফোর্নিয়ায় আছে আজ প্রায় পঁচিশ বছর। আমার অনেক দেশের ভ্রমণ হান্স ক্যামেরাবন্দি করেছে, জার্মানি-ভ্রমণটা করলেই তার শখের ষোলোকলা পূর্ণ হয়। তথ্যচিত্রটি যেহেতু জার্মান ভাষায় হচ্ছে, জার্মানির কিছু অংশ ওতে না থাকলে অপূর্ণ রয়ে যাবে। কুক্সহেভেনের আকাশে যখন উড়োজাহাজ, ঝকঝকে রোদ তখন। শীতকালে রোদ পাওয়া যে কী আনন্দের, তা দীর্ঘদিন মাইনাস দশ কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াসে থেকে বেশ বুঝতে পারি। কুক্সহেভেন এয়ারফোর্স ফিল্ডে বিমান নামলো। দেখি ক্যামেরা হাতে দাঁড়িয়ে আছে কিছু লোক। হান্স বললো, সাংবাদিক। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আগেই তাকে বলে রেখেছিলাম, নো প্রেস, নো মিটিং, নো পুলিশ। হান্স খুব মজার মানুষ। অনর্গল কথা বলে। বেশির ভাগ কথাই অবশ্য লোক হাসানোর জন্য। অনেক শপথ সে করে যার প্রায় কোনওটাই রাখে না। কুক্সহেভেনে দেখি আমাকে

অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে আছেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। অ্যাডমিরাল আমাকে নিয়ে এলেন কফি পান করতে বিমানবাহিনীর অফিসে। যখন আসছিলাম সৈনিকদের পথ ধরে, বিমানবাহিনীর লাল সাদা পতাকা ওড়ানো গাড়িতে, দেখছিলাম মাঠের সাবমেরিন ডিটেকটর বিমানগুলো। বিমান বাহিনীর এটি ঘাঁটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। এখান থেকেই ডেনমার্ক আর নরওয়ে দখল করার যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্র গিয়েছে। প্রচুর যুদ্ধবিমান, সাবমেরিন এখন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যুদ্ধশেষে এই এলাকা আমেরিকার দখলে ছিল। পশ্চিম জার্মানিকে তিন ভাগ করে তিন মিত্রশক্তি আমেরিকা ফ্রান্স আর যুক্তরাজ্য বসেছিল পশ্চিম জার্মানিতে, সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন থেকে দেশটিকে রক্ষা করার জন্য। জার্মানরা এখনও সতর্ক কখন নর্থ সীর তল দিয়ে আবার রাশান সাবমেরিন এসে জার্মানি দখল করবে। সুইডিশরাও দেখেছি সমুদ্রে কিছু একটা দেখেই আঁতকে ওঠে, ওই বুঝি রাশান সাবমেরিন আসছে। গল্পগুলো অনেকটা বাংলাদেশের দৈত্যদানোর গল্পের মতো। ছোটবেলায় মা আমাকে ঘুম পাড়াতেন *দৈত্য আসছে, ঘুমো* বলে। মা জার্মান হলে নিশ্চয় বলতেন, *ওই রাশান সাবমেরিন আসছে, ঘুমো শিগ্রি।*

অ্যাডমিরাল আমার ওভারকোট খুলে রাখলেন। বসে যখন দুজন কথা বলছি, ঘরে ঢুকলো এক যুবক আর এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ। যুবকটির হাতে ফুল। পলকহীন তাকিয়েছিল আমার দিকে। বলল ওঘরে তোমার হ্যাট দেখেই চিনতে পারলাম যে ওটি তোমার হ্যাট। জার্মানির কুক্সহ্যাভেনের লোক অবদি চেনে আমার হ্যাট। চমৎকার যুবকটিকে দেখে আমার আগ্রহ হয় জানতে কে সে। নাম নোরবার্ট প্ল্যামবেক। বয়স আটত্রিশ। এই বয়সেই বিলিওনিয়ার। নোরবার্টের হাতের ফুল আমার আর হাতে নেওয়া হয় না। আমরা চা কফি পান করে আবার বিমানে উঠি। সঙ্গে নোরবার্ট আর ওল্ফগাং। পাইলট নোরবার্টের বাবা অটো প্ল্যামবেক। উড়োজাহাজটি নোরবার্ট প্ল্যামবেকের। কুক্সহেভেনের ধনী ব্যবসায়ী। নোরবার্টের সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার কথা নয়। কিন্তু হয় হান্সএর কারণে।

কুক্সহ্যাভেন থেকে গেলাম বন। বনে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্লাউস কিনকেল। দরজার বাইরে সাংবাদিকের ভিড়। প্রেস ফটোগ্রাফারদের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চোখ জ্বালা করে ওঠে। ফটো তুলবার খানিক সুযোগ তাদের দিয়ে আমাকে নিয়ে হেঁটে গেলেন বড় একটি ঘরে। হাঁটতে হাঁটতে মন্ত্রী বললেন, *ভেবেছিলাম আপনি জার্মানি আসছেন, হঠাৎ শুনি সুইডেনে নেমে গেলেন। থাকার কথা জার্মানিতে। কিন্তু সুইডেনে থেকে গেলেন যে!* এর উত্তর আমি কী দেব বুঝে পাই না। নরওয়েতেও তাই বলা হয়েছিল, কেন আমি নরওয়েতে থাকছি না! নরওয়ে থাকতে হলে কী কী করতে হবে তা তো আমাকে জানতে হবে। আমি হাত পা বাঁধা মানুষের মত এসে সুইডেনে পড়েছি। তোমাদের ইচ্ছে হলে নিয়ে যাও আমাকে। সুইডেন নরওয়ে বা জার্মানিতে আমি কোনও পার্থক্য দেখি না। সবগুলোই আমার কাছে *বিদেশ।* কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করছে আমি রাজনৈতিক আশ্রয় চাইছি না কেন সুইডেনে বা অন্য কোনও দেশে। শুনে আমার রাগ হয়েছে খুব। আশ্রয় চাইব কেন! আমি কি ভিখিরি নাকি! কী দায় পড়েছে করজোড়ে আশ্রয় চাইবার কারও ঘরে! নিজের বুঝি ঘর নেই আমার! ফিরেই তো যাবো দেশে, আজ নয় কাল নয় পরশু। রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে আমার পাসপোর্ট নিয়ে নেবে ওরা, আমাকে অন্য দেশের নাগরিক বানিয়ে দেবে। আমি যা নই, আমাকে তা হতে হবে। এ আমি মেনে নিতে পারি না। আমি বাংলাদেশের নাগরিক, এ নিয়ে গৌরব করি। হোক সে দরিদ্র দেশ, হোক সে দেশে মৌলবাদীরা মাথাচাড়া দিয়েছে, দেশটিকে সুস্থ সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য, দেশটির মানুষ যেন সুখে স্বস্তিতে থাকে, অন্যায় বৈষম্য যেন দূর হয়, তার জন্য শুধু স্বপ্নই দেখি না, শ্রমও দেব বলে পণ করেছি। জীবনে অন্য কোনও আকাঙ্খা নেই, কোনও স্বামী সন্তান, কোনও জমিজমা, কোনও হজ উমরাহ। ক্লাউস কিনকেলের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা আমার ছিল। এই ক্লাউস কিনকেলই ঘোষণা করেছিলেন, ইওরোপিয়ান ইউনিয়ন আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে। তাঁর সমর্থন, যখন লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল দেশে, ছিল খুব বড় একটি ঘটনা। ক্লাউস কিনকেল আমার সঙ্গে জার্মান ভাষায় কথা বললেন। ওখানেও ওই একই জিনিস, দোভাষী

উপস্থিত। একটি হৃষ্টপুষ্ট নথি নিয়ে সহযোগী উপস্থিত। আমাদের আলাপ ফলপ্রস কী ফলপ্রসু নয় তার খবর সম্ভবত নথিভুক্ত হয়ে যাবে আজই। যখন মন্ত্রীরা আমার সঙ্গে কথা বলেন, লক্ষ্য করেছি তসলিমা নাসরিন লেখা একটি ফাইল থাকে তাঁদের সামনে। মাঝে মাঝেই ফাইলটি তাঁরা নাড়েন। আমার খুব ইচ্ছে হয় কী আছে ফাইলে দেখি। হ্যাঁ, ক্লাউস কিনকেলের সঙ্গে দেশ বিদেশ, রাজনীতি সমাজ, শিল্প সাহিত্য, ধর্ম মৌলবাদ ইত্যাদি নিয়ে বিস্তর আলাপ হল। ক্লাউস কিনকেল বললেন তাঁর কথা, মানবাধিকারের জন্য তাঁর অবদান কী কী, এবং কেন এই সময় তা সমর্থন করা জরুরি। তিনি আমার জন্য কী কী করেছেন, তারও বর্ণনা শুনলাম। এরকম সমর্থন করা তাঁর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও তিনি তা করে যাচ্ছেন, সালমান রুশদির জন্যও করেছিলেন, সালমানও কমাস আগে আমি যে চেয়ারে বসে আছি, সেই একই চেয়ারে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেছেন। তিনি সারায়েভো যাচ্ছেন সেদিনই, সেখানকার মুসলমানদের সমর্থন জানাতে। শরণার্থিদের পক্ষে তিনি যা যা করেছেন, তাতে অনেকেই তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হলেও তিনি পরোয়া করেন না, এবং কেন পরোয়া করেন না তা বিস্তারিত বললেন। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অবস্থা কী, আমাকে তিনি কী করে সাহায্য করতে পারেন, জানতে চাইলেন। আমি আমার অবস্থা নয়, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, মোল্লাদের উত্থান, মোল্লারা নারী প্রগতির বিরুদ্ধে কী করছে তারই কিছু বর্ণনা করলাম। কিছুটা কৃতজ্ঞতাও জানালাম তাঁকে। কারণ এ তো ঠিক, অমন বিপদের দিনে তাঁর সমর্থন ছাড়া আমার পক্ষে হয়তো বাঘের থাবা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হত না। বললেন, *জার্মানির দরজা তোমার জন্য সবসময় খোলা।* জার্মানিতে শরণার্থির সংখ্যা এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করা, প্রয়োজনে আরও শরণার্থিদের আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা করা, তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, নয়া নাৎসিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা-- এত সব করায় তাঁর নিজের ভূমিকার কথা বললেন। সারায়েভো না গেলে তিনি বড় একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারতেন আমার সম্মানে, বললেন। আর সকলে যেমন জানতে চায় যে কেন ইসলামি মৌলবাদ বাড়ছে, তিনিও জানতে চাইলেন। সকলের মতো এও জানতে চাইলেন কী

করে এর নিস্পত্তি সম্ভব। আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা কুলোয়, তা-ই উত্তর করি। আমার জন্য বেশ কটি সভা তিনি করেছিলেন ইওরোপীয় সংসদে, শেষ অবদি দায়িত্বটি নিয়েছে স্ক্যানডিনেভিয়া। বেশ সুখ্যাতি করলেন সুইডেন সরকারের। বনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বেরিয়ে আবার ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে। জাহাজে বসে বড় একটি সালমন মাছ খাওয়া হল ছুরিতে কেটে কেটে খাওয়ালো নোরবার্ট। কুক্সহ্যাভেন পৌঁছে নিরাপত্তা পুলিশের গাড়িতে করে সোজা টাউন হল বা সিটি হল বা রাথহাউজ। ওখানে মেয়র দাঁড়িয়ে ছিলেন সম্বর্ধনা দিতে। মেয়র একসময় সবার সঙ্গে চিয়ার্স, জার্মান ভাষায় প্রস্ত বলেন। এবং জানান *কী রকম তিনি এবং তাঁর শহর আনন্দিত আমার মতো ব্যক্তিত্বকে তাদের মধ্যে পেয়ে। সমগ্র বিশ্বে মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম আমি করেছি, যে ত্যাগ আমি করেছি, শুধু আজ নয়, দূর ভবিষ্যতের মানুষও আমাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।* কোনওখানের কোনও সরকারি কিছুই আর আমার কাছে নতুন বলে মনে হয় না। তার চেয়ে বরং একা একা রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে অনেক নতুন কিছু দেখি। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলেও অনেক নতুন আনন্দ জোটে। মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখতে, খুব ব্যক্তিগতভাবে দেখতে আমার চিরকালই ভালো লাগে খুব। মেয়রের সম্বর্ধনা শেষে প্রেস কনফারেন্স। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল এই আয়োজন দেখে। প্রচুর সাংবাদিক অপেক্ষা করছিল হোটেলের লবিতে। অবাক হলাম, কুক্সহ্যাভেন জার্মানির একটি ছোট শহর, এখানের সাংবাদিকরাও আমার সমস্ত খবরই রাখে। এরপর হোটেলের ব্যংকোয়েট রুমে ইন্টারন্যাশনাল অপ্টিমিস্ট অরগানাইজেশনের সম্বর্ধনা। এটি মূলত নারী সংগঠন। দুশ জন জার্মান মহিলা ছিলেন। পান হল শ্যাম্পেন। কবিতা পড়লাম বাংলায়, অবশ্য অনুবাদ করে শোনাতে হল। অসংখ্য প্রশ্ন ওদের, কী করে ওরা সাহায্য করবে আমাকে। আমি আমাকে নয়, বাংলাদেশের নির্যাতিত মেয়েদের সাহায্য করবার জন্য ওদের পথ বাতলে দিই। এনজিওর মাধ্যমে ইচ্ছে করলেই সাহায্য সহযোগিতা ওরা করতে পারে। এরপর গাড়ি করে রাত ছোঁয়া। শহর কুক্সহেভেনে চককর, মাছের আড়ত ছিল এককালে, এখন পর্যটকের আস্তানা, গ্রীস্মে শহর ভরে যায় লোকে, ন্যাংটো হয়ে সব শুয়ে থাকে সৈকতে।

বড় কোনও রেস্তোরাঁ! সোজা বলে দিলাম, না। তবে? টিপিক্যাল কুক্সহ্যাভেন পাব? পারফেক্ট। এই তো চাই। বড় বড় রেস্তোরাঁয় যথেষ্ট পানাহার করেছি। এবার ঢুকতে চাই অন্দরে অথবা অন্তরে। একশ বছরের পুরোনো পাব। কেউ জুয়ো খেলছে, কোথাও হুল্লোড় হচ্ছে, এর মধ্যে আমরা ছোটখাটো দল বসে গেলাম বড় একটি টেবিল দখল করে। এটি, নোরবার্ট বলল, তার প্রিয় পাব। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যেয় বিয়ার খেতে আসে সে। নোরবার্ট, ওল্ফগাং, হান্স, হান্সের মা, অটো, ইভা, একটু পর পর জড়ো হয় আরও দুচারজন। ঘন্টাখানিক থেকে ইভা আর হান্সের মা চলে যায় বাড়ি আর আমাদের আড্ডা চলে রাত দেড়টা অবধি। হান্স চুড়ান্ত আড্ড াবাজ। সবাইকে তুঙ্গে তুলে রাখে সারাক্ষণ। পাবের ঘড়ি উল্টোদিকে ঘোরে, মাতালদের জন্য এ বেশ সুখকর বটে। ওরা বিয়ার পান করতে থাকে বড় বড় গ্লাসে।নোরবার্ট আমার সঙ্গে ঘন হয়ে বসেছিল। আমি মদ খেতে অভ্যস্ত নই। কিন্তু ওর পিড়াপিড়িতে চুমুক দিতেই হল কিছু না কিছুতে। শ্যাম্পেন আর ওয়াইন ছাড়া আর কিছু নিই না। নোরবার্ট লাস্ট অর্ডার দেয় মোট ছবার। নোরবার্টের শখ আমাকে মিসক্যারেজ নামে একটি ককটেল খাওয়াবে। সবার জন্য মিসক্যারেজ আসে। ওটি ওই পাবের স্পেশাল, ওয়াইন কফি দুধ মিশিয়ে ককটেল। কালো পানীয়ে সাদা ক্রিম এমন ভাবে ছেড়ে দেয় যে ছত্রখান হয়ে যায়। দেখে মনে হয় সত্যি সত্যি বুঝি মিসক্যারেজ। ভ্রুণ বুঝি এই মাত্র ডিমের কুসুম ভাঙার মতো ভেঙে গেল। আড্ডায় মেতে থাকি মাতালের মতো। একসময় আমার অনুরোধেই সকলকে উঠতে হয়। তুমুল হল্লা করে আমরা হোটেলে ফিরি। নোরবার্টরা চলে যায় বাড়িতে। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে দেখি কুক্সহ্যাভেনের সংবাদপত্রের অর্ধেক পাতা জুড়ে ছাপা হয়েছে আমার ফটো ফিচার, কী করে জাহাজ থেকে নামছি, নেমে কী করছি। বড় স্টোরি নাকি বেরোবে কাল। কাগজটি কারা যেন নিয়ে চলে গেল। পৃথিবীর কত পত্রিকায় কত কিছু বেরোচ্ছে এই তুচ্ছ তসলিমাকে নিয়ে, লোকে ভাবে যে এগুলো দেখার সময়ই বুঝি আমার নেই।

হোটেল থেকে বিমানবন্দর। আজ আবার বন। বনের রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন পিটার্সবুর্গ হাউজে রাষ্ট্রীয় অভ্যর্থনা। বন শহরে আছে সাতটি পাহাড়, ওর একটিতে পিটার্সবুর্গ হাউজ। এটি

সরকারি অতিথিশালা। সংসদ সদস্যরা এটি ব্যবহার করে তাঁদের অতিথিদের জন্য। আমার জন্য দরজায় অপেক্ষা করছিলেন পিটার হ্যান্স। সংসদ সদস্য। ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট। সরকারি রাজকীয় লাঞ্চ পরিবেশন করা হল। রাজনীতিক তো আছেনই, হোমরা চোমরা প্রাইভেট টেলিভিশন এন আর ডির মালিক জাতীয় লোকও আছেন। বহু শতাব্দি-সাধনার পর সভ্য হওয়া দেশের সভ্য মানুষদের সভ্যতম আচরণের সঙ্গে আমি এখন চলছি ফিরছি বলছি পান করছি খাচ্ছি। বাহ। পিটার হ্যান্স বন্যার রাইন নদীর বন্যার অবস্থার বর্ণনা করেন। তাঁর বাড়িও ডুবেছে জলে। ধনী দেশে বন্যা হচ্ছে, এ কেমন যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু ঘটনা এই, বন্যায় মোট দশ হাজার লোক ভুগছে জার্মানিতে। চুক চুক করে তাঁর সঙ্গে আমিও দুঃখ করি। পরে যখন ব্যক্তিগত উড়োজাহাজে চড়িয়ে রাইন নদীর বন্যা দেখানো হল, বন্যা বলে মনে হয়নি। প্রকৃতির অভাবনীয় সুন্দর কোনও দৃশ্য দেখে পুলক লেগেছে মনে। দেশের বন্যাকে বন্যা বলে মনে হয়, কারণ মানুষের কষ্ট জড়িয়ে থাকে ওতে। আর জল যদি উপচে ওঠে কোথাও, মানুষের দুর্ভোগ না মেশে এসে, ওকে বন্যা বলে মনে হয় না, বরং জলে জলকেলির সাধ জাগে। জল দেখে জার্মান বন্ধুদের চোখে জল, আমার চোখে প্রকৃতির স্বাদ নেওয়া তিরতিরে সুখ। যত বন্যা দেখি, তত আনন্দ হয় আমার। ধনী দেশের লোকেরা গরিব দেশে বন্যা দেখতে যায়, আর গরিব দেশের একটি মেয়ে ধনী দেশে বন্যা দেখছে। এ এক রকম মজাই বটে। বন্যাগুলো বুঝি স্থানপরিবর্তন করছে। এরপর খরা, অনাহার, মহামারি? কে জানে! ইদানীং নাকি বেকার সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে এদিকে।

পিটার হ্যান্স আমাকে রুপোর একটি ফলক উপহার দিলেন। সালভাদর দালির আঁকা জার্মানির প্রথম প্রধানমন্ত্রী কোনার্ড এডিনায়ুর এর মুখ। জার্মানির গণতন্ত্রের রূপোর ফলক উপহার পাওয়া, সুটেড বুটেড জার্মানদের হাসি হাসি বিগলিত চেহারা। কে এসে একটুখানি কথা বলবে, কে এই সুযোগটুকু পাবে তার জন্য অস্থিরতা লক্ষ্য করি সবার মধ্যে। সুযোগ বড়রা দামিরা পায়। আমি কে! এক ছোটখাটো দেশের ছোটখাটো লেখক, পরনে ঢাকার বঙ্গবাজার থেকে কেনা বেসাইজের জিন্স, দুসাইজ বড় কড়া-সবুজ রঙের সার্ট, ছোটদার

পুরোনো একটি সাদা কালো ছককাটা কোট। লাঞ্চে সময় চলে গেল অনেক। এনআরডির লোকেরা দুটো ভিডিও ক্যাসেট দিল আমাকে। আমার ওপর কখনও তারা বানিয়েছিল দুটো তথ্যচিত্র। একজন তো প্রকাশনী থেকে বাঁধানোর আগেই আমার বই নিয়ে পড়ে ফেলেছে। আমাকে দেখালোও না বাঁধানো বই। পিটার্সবুর্গ হাউজ থেকে বিদায় নিয়ে মিউনিখ। ওখানে শেরাটন হোটেলে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন জার্মান লেখক মার্টিন ওয়ালসার। তিনি আমার পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন জার্মানিতে। আমার পৌঁছোতে দেরি হচ্ছিল বলে তিনি একটি চিঠি লিখে রেখে স্টুটগার্ড ফিরে যাচ্ছিলেন। এর মধ্যেই আমি। আমি এলে আলোচনা। টিভিতে আমার সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ বক্তব্য। মার্টিন ওয়ালসারকে আমার খুব আন্তরিক একজন মানুষ বলে মনে হল। তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিলেন, যে কোনওদিন যে কোনওসময় তাঁর বাড়িতে যেন দ্বিধাহীন উঠি। রাতে ফোকাস অফিসে সম্বর্ধনা। বিশাল বারো তলা অফিস। আমার জন্য ম্যাগাজিনের সকলে অপেক্ষা করছিলেন। সকলের অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হল। এর মধ্যে হফমান এণ্ড কাম্পের তানিয়া শুলজ এল হামবুর্গ থেকে, জার্মান ভাষায় আমার সদ্য বেরোনো বই লজ্জা নিয়ে। বাজারে যাবার আগেই নাকি প্রথম সংস্করণ শেষ। বেশ কজন প্রকাশনীর মালিক এলেন বই প্রকাশের আবদার নিয়ে। কেউ এলেন আমন্ত্রণ জানাতে জার্মানিতে। কেউ কনফারেন্সে আমন্ত্রণ জানাতে। কেউ কাঁদতে। হ্যাঁ কাঁদতে। একটি মেয়ে তার কান্না আটকাতে পারেনি। আমি আমার কাজের জায়গায় কেমন দেখেছি মেয়েদের, এর একটি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে লেবার রুমে মেয়েরা মেয়ে-বাচ্চা জন্ম দিলে চিৎকার করে কাঁদে, কারণ সমাজ মেয়ে-বাচ্চা চায় না। এটুকু শুনেই মেয়েটি রোধ করতে পারেনি তার কান্না। বলল, তসলিমা এই সমাজটাকে আমার সহ্য হয় না। পুরুষেরা আসলে সব সমাজেই এক। আমরা চল কিছু করি যাতে মেয়েদের আর লেবার রুমে কাঁদতে না হয়। বলতে বলতে মেয়েটি কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতেই বলল আমি আর এখানে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারছি না। তোমাকে আমি ভালোবাসি। বলে আমার গালে একটি চুমু খেয়ে চলে গেল চোখ মুছতে মুছতে। আমিও এরকম সময়গুলোয় চোখের জল রোধ করতে পারি না। কিছু একটা লুকিয়ে

থাকে আমার ভেতরে নিশ্চয়। মেঘ? কেবল আভাস পেলেই ঝরি। বোধহয়। অথবা নদী, জল দেখলেই ফুঁপিয়ে উঠি।

ফোকাস ম্যাগাজিনের অফিস থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বড় একটি রেস্তোরাঁয়। ওখানে আবার আমার সম্মানে দীর্ঘ ডিনার। নোরবার্টকে একটি বই দিই ভালোবাসা লিখে। ও যে কী বিষম খুশি হয়। ও কি বোঝে যে একটু একটু করে ওকে ভালোবাসছি আমি। খুব চাই ও এসে পাশে বসুক। কিন্তু ফোকাসের পরিচালকরা বসেন আমার দুপাশে। তাঁরা হোস্ট। তাঁরা এই আসন ছাড়বেন কেন! ডিনার শেষে আবার শেরাটনের লবিতে মধ্যরাত অব্দি আড্ডা। নোরবার্ট সারাক্ষণই সঙ্গে। গা ঘেষে।

তানিয়া আমার সঙ্গে প্রকাশনা বিষয়ে জরুরি কথা সেরে ফিরে যায় হামবুর্গ। আমি সকালে আবার নোরবার্টের উড়োজাহাজে। পূর্ব জার্মানির দিকে যাত্রা। বিমানবন্দরে নেমেই দেখি প্যাঁ পুঁ সহ দাঁড়িয়ে আছে আটটি গাড়ি। গাড়ি করে টিভি স্টেশন, জিডিএফ। মাইনজ এরপর থকে তিনটে টিভি সরাসারি সাক্ষাৎকার নিল। কোনওটি আবার লাইভ প্রোগ্রাম। এরপর গভরমেন্ট হাউজ। স্বরাষ্টমন্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন আমার জন্য। হেইনজ এগারট। সেক্সোনিয়ার জনপ্রিয় নেতা, ছিলেন গির্জার পুরোহিত। পুরোহিতরাই আন্দোলন করেছিলেন কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরনে কোট টাই নেই। প্রোটোকল মানেননি। সম্ভবত কম্যুনিস্ট আমলে সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন, স্বভাব যায়নি। জার্মানির গদিতে ৪৩ ভাগ ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক ৭ ভাগ লিবারেলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোশাল ডেমোক্রেটিকদের হটিয়ে দিয়েছে। প্রভাবশালী নেতারা সব ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক দলের। ক্লাউস কিনকেল অবশ্য লিবারেল দলের। সেক্সোনিয়ায় কম্যুনিস্ট শতকরা ১৩ ভাগ। বাকিটা বেশির ভাগ ক্রিশ্চান ডেমোক্রেটিক আর সোশাল ডেমোক্রেটিক। আমার অস্বস্তি হচ্ছিল এসব ক্রিশ্চান লোকদের সঙ্গে কথা বলতে। ক্রিশ্চান ধর্মের অঢেল সমালোচনাও করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ধর্মে ভালো যে কিছু আছে, তাও আকারে ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন কম্যুনিজম, মৌলবাদ, তৃতীয় বিশ্ব ইত্যাদি নিয়ে অনেক কথা। নিজের কথা বললেন কুর্দদের পক্ষে কী কী

কাজ এ অবদি তিনি করেছেন। কুর্দদের কথা উঠতে লেইলা জানার কথা তুললাম। তুরস্কের সংসদ সদস্য, পনেরো বছরের জেল হয়েছে কুর্দদের পক্ষ নেওয়াতে, পারলে যেন ওকে সাহায্য করেন সেক্সোনিয়ার লোকেরা ইংরেজি শেখেনি, শিখেছে রাশান। মাতৃভাষার বাইরে তাদের দ্বিতীয় ভাষাটি রাশান। হেইনজ এগারট আমার সঙ্গে কথা বলতে দোভাষীর সাহায্য নিয়েছেন। ক্লাউস কিনকেলও নিয়েছিলেন ভালো ইংরেজি জানা সত্ত্বেও। সরকারি কাজকর্ম কথাবার্তা আলাপ আলোচনা সবই মাতৃভাষায় করার নিয়ম বলেই দোভাষী নেওয়া। সেক্সোনিয়া। কী আছে দেশটিতে? শতকরা ১৫ জন লোক বেকার। কাচের দোকান উঠছে। ঝলমলে জিনিসপত্র ওতে। পলেস্তারা খসে পড়া বাড়িঘরে রং হচ্ছে। বিমানবন্দরের সামনে বিস্তর অঞ্চল জুড়ে রাশান সৈন্য ছিল, বিদায় নিয়েছে। পশ্চিম জার্মানির পাহাড়ায় ছিল মৈত্রী শক্তি। পূর্ব জার্মানির পাহাড়ায় রাশা। সেক্সোনিয়ার লোকেরা বলে পাঁচ বছর আগে এখানে ঘটেছিল শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, পিসফুল রেভ্যুল্যুশান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে গির্জাটি ভেঙে পড়েছিল, চল্লিশ বছরের কম্যুনিস্ট-শাসনে সেই গির্জা নতুন করে নির্মাণ হয়নি। এখন সমাজতন্ত্রের পতনের পর নির্মাণ কাজ চলছে গির্জার। এই তবে আন্দোলনের পরিণতি? গির্জা নির্মাণ। দলে দলে পুরোহিতরা এখন গিয়ে উঠেছে ক্ষমতায়। আন্দোলন কোথায় শুরু হয়েছিল? গির্জায়। চরম ধর্মবাদীরাই এই আন্দোলনের মূলে। কী ছিল অপ্রেশন? কথা বলবার স্বাধীনতা ছিল না, দেশের বাইরে যাবার স্বাধীনতা ছিল না, কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা করলে পদোন্নতি ছিল না। স্কুলে ধর্মচর্চা নিষিদ্ধ ছিল। আর কী? বাড়াবাড়ি করলে জেলে পোরা হত। বেকার সমস্যা ছিল? না, তা ছিল না।

হিলটন হোটেলে ছিলাম, দুপুরে লাঞ্চ খেতে গিয়ে দেখি লোক ভিড় করছে গির্জা দেখতে। একবিংশ শতাব্দির প্রায় গোড়ায় এসে গির্জা তৈরি হচ্ছে। সভ্যতার তবে এই নমুনা! ধর্মের দালান তোলা! দেশে বেকার রেখে মুক্তবাদীরা এখন গির্জা নির্মাণ করছে। ভেতরে আমি কাতরাই বেদনায়। ইরিনার কথা মনে পড়ে। রাশিয়ার মেয়ে। জেলে ছিল চার বছর। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে কবিতা লিখত। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, *তুমি কি নারীবাদী?* ইরিনা

বলল, *না আমি ক্রিশ্চান। আমি রাশান অর্থোডক্স চার্চের সদস্য।* লন্ডনের ন্যাশনাল থিয়েটারে ওর কথা শুনে আমি আঁতকে উঠেছিলাম। এই হল কম্যুনিস্টবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী। তিনি মানুষ নন, তিনি ক্রিশ্চান। পরে লাঞ্চে ইরিনার স্বামীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বিশ্বাস নিয়ে সম্ভবত। সোশালিজম অথবা ক্যাপিটালিজম। কিসে বিশ্বাস? বেশ অহংকারের সঙ্গে তিনি বললেন, *আমি যেসাস ক্রাইস্টে বিশ্বাস করি, আর কিছুতে নয়।* আমার সঙ্গে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লেবার পার্টির এক নেত্রী ছিলেন। দুজনই আমরা হো হো করে হেসে উঠি। হেসে উঠি বটে, কিন্তু যেসাস ক্রাইস্ট বনাম কম্যুনিজম -- ব্যাপারটি আমার মাথায় একটি ছোটখাটো আস্তানা গাড়ে। সেক্সোনিয়া রাজ্য আমাকে সেই আস্তানায় আবার ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

সরকারি প্রোটোকল অফিসার সকাল থেকেই আমার পেছনে। তিনি ড্রেসেডেন দেখাতে দেখাতে নিয়ে গেলেন ন্যাশনাল মিউজিয়ামে। মিউজিয়ামের পরিচালক দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়। ঘুরে ঘুরে দেখালেন সব রত্নরাজি। হিরে মুক্তো পান্না চুনির যেন মেলা বসেছে। এশিয়া আফ্রিকা থেকে চুরি ডাকাতি করে আনা রত্ন ইওরোপের রাজারা মুকুটে লাগাতো। গলায় বাহুতে আঙুল পরতো। রাজাদের হিরে মুক্তোর অলংকার দেখতে দেখতে একটি বিশাল রত্নখচিত দরবার দেখে থমকে দাঁড়ালাম। বিশাল এক রাজদরবার। আওরঙ্গজেবের জন্মদিনের উৎসব হচ্ছে। এটি করতে শিল্পীর নাকি দশ বছর সময় লেগেছে। হাতি ঘোড়ায় চড়ে অতিথি আসছে। কালো কালো নেটিভ ভারতীয়রা মাল ঠেলছে, পাখা টানছে। স্বয়ং আওরঙ্গজেব গদিতে বসা। উপঢৌকন আসছে আর্য আর অনার্যের ভিড়। দেখে আমার প্রশ্ন জাগে ভারতের একটি বদ সম্রাট আওরঙ্গজেবের জন্মউৎসব নিয়ে কেন এত দূরের এই ড্রেসেডেন নামের ছোট্ট শহর? শাসকরা বোধহয় সব দেশের শাসকদের সমীহ করে, খাতির করে, জন্মউৎসবও ঘটা করে পালন করে। মিউজিয়ামের গোল্ডেন বইএ সই করে যেতে হল সংসদ ভবনে। সেখানেও গোল্ডেন বইয়ে সই। সম্বর্ধনা জানালেন সংসদের ভাইস প্রেসিডেন্ট। হ্যাঁ *রাষ্ট্রীয় অতিথি* পায় সংসদ থেকে সম্বর্ধনা। দীর্ঘ রাজনৈতিক আলোচনা চলল বিশাল

টেবিলে বসে। জার্মানির রাজনীতি জোর করে ধরে গুলে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। পরম আগ্রহে আমি এ শিক্ষায় মনোনিবেশ করি। সেক্সোনিয়ার দুয়ার আমার জন্য খোলা। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় তারা অত্যন্ত আনন্দিত ইত্যাদি। চলে আসবার আগে নোরবার্ট জার্মান ভাষায় কিছু বলল ভাইস প্রেসিডেন্টকে। পরে জানলাম, বলেছিল --*এরকম মুখের সহযোগিতা কোনও সহযোগিতা নয়। তসলিমার জন্য কংক্রিট কিছু কর।*

রাতে আমার সম্মানে পার্টি। পার্টি দিচ্ছেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আর নারীকল্যাণ মন্ত্রী। শিক্ষা মন্ত্রী, সংস্কৃতি মন্ত্রী, নারী মন্ত্রী সব ঘিরে থাকে আমাকে। অনেক সরকারি মান্যগণ্য লোক আমন্ত্রিত ছিলেন। আমার ডান পাশে বসেছিলেন ক্যাথলিক গির্জার পুরোহিত। তথাকথিত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বা পিসফুল রেভ্যুলুশন সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমার বাড়ে। কী করে রাজনীতিতে এসেছেন, এর উত্তরে ম্যাথিয়স, সংস্কৃতিমন্ত্রী বললেন, *আমি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম না, তবে গির্জার সঙ্গে ছিলাম।* নারী কল্যাণ মন্ত্রী ছিলেন নার্স, তিনিও ওই গির্জার ফসল। এই ধর্মবাদীরাই এখন ক্ষমতায়। ম্যাথিয়স ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, কলেজে পড়াতেন, কিন্তু বড় প্রফেসর পদ কখনও পাননি, কারণ তিনি কম্যুনিস্ট ছিলেন না। ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে বললেন, কম্যুনিস্টদের তিনি খেদিয়েছেন, এ সোজা কথা নয়। শতকরা সত্তর ভাগ ভোট পেয়ে জিতেছেন। আমার প্রশ্ন কম্যুনিস্ট বিরোধী আন্দোলন যারা করেছিল, শুধু তারাই কেন আজ ক্ষমতায়? যে মানুষটি সংস্কৃতিমন্ত্রী, তার সঙ্গে সংস্কৃতির কোনও সম্পর্ক নেই। স্বরাষ্টমন্ত্রী ছিলেন গির্জার পুরোহিত। এঁরা রাজনীতি অর্থনীতি সমাজ সংস্কৃতির বোঝেন কী! যোগ্য লোক কি ছিল না দেশে! পাঁচ বছর ধরে সবই আবেগের ওপর চলছে। উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ। পিসফুল রেভ্যুলুশানের ইমোশন। কী করে অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূর হবে, এর উত্তরে ইন্ডাস্ট্রিলাইজেশনের কথা বললেন বটে ম্যাথিয়স, কিন্তু কী করে সম্পদ এবং জৌলুসের প্রতি মানুষের লোভ দূর হবে, তার কোনও উত্তর তিনি দিতে পারেননি। সমস্ত সেক্সোনিয়ায় আমি গন্ধ পেলাম ঘৃণার, কম্যুনিজমের প্রতি ঘৃণা। ডিনার শেষে আমাদের ছোট দলটি সংস্কৃতিমন্ত্রী সহ গেলাম পুরোনো একটি পাবে। ড্রেসেডেনের স্পেশাল পাব। ট্রামের মতো করে সাজানো

পাবটি। পাব থেকে আমাকে ছোটখাটো সম্বর্ধনা দিল কনডাকটর- মালিক। তাঁর স্ত্রী বেশ কটি গান গাইল আমাকে উদ্দেশ্য করে। অর্ধনগ্ন মেয়ে যখন গাইছিল গান, আমাকে বারেবারেই চোখ শরীরে নিতে হচ্ছিল। বুঝি নগ্নতাও তারা অর্জন করেছে পিসফুল রেভ্যূল্যুশানের মাধ্যমে। আড্ডা বিয়ার শ্যাম্পেন ধুমপান ধুমসে চলে। একসময় অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়, দেয়ালে লিখতে হয় কিছু, সঙ্গে সই। বিখ্যাত লোকদের সই রাখে তারা দেয়ালে। আমি কাতরাচ্ছিলাম বেদনায়। নতুন সরকার কম্যুনিস্টদের খেদাচ্ছে চাকরি থেকে। আর যারা কম্যুনিস্ট বিরোধী আন্দোলনে জড়িত ছিল তাদের দেওয়া হচ্ছে চাকরি। এও তো একধরনের অপ্রেশন, নির্যাতন, তর্ক করলাম প্রাণ ভরে। ওদের যুক্তি, কম্যুনিস্টরা তাদের আমলে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে চাকরি পেয়েছে, তাই এদের বাতিল করা হচ্ছে। আমার একটি ধারণা হয়, কম্যুনিস্ট খেদিয়ে সুপ্ত ক্রিশ্চান মৌলবাদ বিস্তার করছে তার ডানা, এরই ফলে ক্রুদ্ধ মুসলিম মৌলবাদ সাপের মতো ফণা তুলছে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ। জিজ্ঞেস করি, *আপনি তো টেকনোলজির লোক, কালচারের কী বোঝেন?* ফ্যাক ফ্যাক হেসে ম্যাথিয়স বললেন, *এডুকেশনের দিকটা দেখছি।* তা দেখছো বটে। স্বজনপ্রীতি করে যাচ্ছো। কম্যুনিস্টরা যা করেছিল, তাই যদি কর, তবে আর বদল কী ঘটলো রেভ্যুলুশনে? আর, কোনও কম্যুনিস্ট যদি যোগ্য হয় কোনও কাজে, সে কি কাজটা পাবে? কী, পাবে ম্যাথিয়স? আমার কিন্তু মনে হয় না। রাত একটায় পাব থেকে উঠে পড়ি। ম্যাথিয়স আমাকে গাড়িতে তুলে দেন।

ড্রেসেডেনের একটি রাস্তার নাম এখনও কার্ল মার্ক্স রোড। গির্জার লোকেরা এখনও রাস্তার নামটি আস্ত রেখেছে। সহনশীলতার পরিচয় কিনা কে জানে। তবে এটা ঠিক গির্জা এখন ক্ষমতায়, নতুন বোতলে পুরোনো মদ। বোতল ভিন্ন হলেও ভেতরে জিনিসটি একই, নেশা হয়। আফিমে যেমন নেশা হয়, তেমন। নতুন একটি গির্জা নির্মাণ করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। এসব সবই আমাকে হতাশ করে। আজকাল প্রিস্টরা পুরোনো গির্জার নিয়ম

কানুনের খুব সমালোচনা করেন। নিজেদের বেশ আধুনিক বলে দাবি করেন। কিন্তু মৌলভী পাদরি পুরোহিতরা আবার আধুনিক হয় কী করে? গোঁড়াতেই তো প্রাচীনতা, অন্ধতা।

ড্রেসেডেন খুব দুঃখী শহর। শহরের আশি শতাংশ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নয়তো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। কার্পেট বম্বিং হয়েছিল এই ড্রেসডেনএ, উনিশশ পয়তাল্লিশ সালের তেরো চৌদ্দ ফেব্রুয়ারিতে, সেদিন। আমেরিকার কোনও প্রয়োজন ছিল না ড্রেসডেনকে গুঁড়ো করে দিতে। এখন ড্রেসডেনের যেসব ভাঙা গির্জা সব নাকি কোটি কোটি টাকায় সারাই হবে। কেন? গির্জা দিয়ে কী হবে? জার্মানির পূব পশ্চিম মিলে এক হয়ে গেছে। গির্জাতেই কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলন করেছিল তারা। কমিউনিজমের পতনের পর তাই আন্দোলনকারীরাই এখন সিংহাসনে। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বললেন, এখন ধরে ধরে কমিউনিস্টগুলোর চাকরি খাওয়া হচ্ছে। কেন? উত্তর হল, কমিউনিস্টরাও তাদের আমলে কমিউনিস্টবিরোধীদের চাকরি খেত।

পূর্ব জার্মানিতে ধর্ম লকলক করে বাড়ছে। বেকারত্ব বাড়ছে। বেশ্যাবৃত্তি বাড়ছে। কেউ কেউ বলে, *পূব আর পশ্চিমের যে মিলন হয়েছে তা সত্যিকার মিলন নয়। পূব বিক্রি হয়ে গেছে পশ্চিমের কাছে। সমাজতন্ত্র বিক্রি হয়ে গেছে পুঁজিবাদের কাছে।*

পঙ্গপালের মতো এক ঝাঁক আশংকা, অন্ধ বাদুরের মতো কালো কালো দুঃস্বপ্ন আমার মাথার ওপর চককর খেতে থাকে।

রাতে হিলটনে আমার রাজকীয় সুইটে বসে কথা হল নোরবার্ট আর ওল্ফগাংএর সঙ্গে। হান্সের কাণ্ডকারখানায় বিরক্ত আমরা। তাকে বাদ দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব টিকে থাকবে -- এরকমই প্রস্তাব ওরা করল। গ্রীস্মকালে আসবো, নোরবার্টের প্রাসাদে থাকবো। নোরবার্টের স্ত্রী ইভা, আর নোরবার্ট আমাকে পেলে খুবই খুশি হবে, বলল নোরবার্ট। আমি ম্লান হাসি। সুদর্শন এই যুবকটির জন্য একধরনের ভালোবাসা পুষছিলাম গোপনে। যেভাবে ড্রেসেডেনের রাস্তায় নোরবার্ট বাহু বাড়িয়ে দিয়েছিল, সে বাহুতে আমার হাত নিয়ে হাজার লোককে দেখিয়ে হেঁটেছিল গর্বিত যুবকের মতো! আমি কি ভালো না বেসে পারি সেই প্রেমিক-যুবককে! যে

চোখে তাকিয়েছিল বার বার আমার দিকে। সে চোখে কি আমি কোনও কাঁপন দেখিনি! সবই কি তবে ক্ষণিকের জন্য, কেবল ওই কটা দিনের স্মৃতির তরেই! হয়তো তাই। আমার এরকমই হয়, হঠাৎ হঠাৎ কোনও দূর দেশের কাউকে মুহূর্তে ভালো লেগে যায়। নরওয়ের হালফতানকে যেমন লেগেছিল। প্যারিসে জিল বা বের্নার্ড হেনরি লেভিকে। পর্যটকের জীবন আমার, দেশে দেশে কেবল স্মৃতি ফেলে আসছি। কোথাও কোথাও অল্প সল্প প্রেম জেগে উঠছে। নদীর ওপর চর জেগে ওঠে যেমন, যেন বসত চাই কোথাও, কোনও হৃদয়ে। বসত বোধহয় আমার জন্য নয়।

সকালে যেতে হবে থুরিনজন, ওখানে প্রাইম মিনিস্টার আমার জন্য নাকি অপেক্ষা করছেন। একসঙ্গে নাস্তা সেরে যাবো বাইমারে, ওখানে গ্যোটে হাউজে লাঞ্চ এবং বিকেলের আড্ডা। কিন্তু নোরবার্টের বিমানটি থুরিনজন নামতে পারলো না, পাম্পে হঠাৎ কী একটা গোলমাল, অগত্যা ফিরতে হল ড্রেসেডেনে। নিরাপত্তা বাহিনী সবসময়ই আছেই সঙ্গে। জার্মান পুলিশদের খুব বোকা বোকা লাগে। আড়াল থেকে ক্লিক ক্লিক করে ছবি তুলে যাচ্ছে আমার। যদি বলি, কাছে এসে ছবি তোলো, ওরা খুশিতে কাঁপে। পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্টের হাতও দেখেছিলাম কাঁপছিল যখন অজস্র ক্যামেরার সামনে পুরস্কার দিচ্ছিলেন আমাকে। একটি মেয়ে কুক্সহ্যাভেনের প্রেস কনফারেন্সে দোভাষী হয়ে এসেছিল, ইংরেজি থেকে জার্মান বলবে বলে। মেয়েটির গলা এত কাঁপছিল যে শেষ পর্যন্ত ও আর পারেনি অনুবাদ করতে, পরে হান্সকে কাজ চালাতে হয়েছে। নান্ত সিটিতেও দেখেছিলাম দোভাষীর স্নায়ুর দুর্বলতা। আর আমি? একটি ছোট্ট দেশের ছোট্ট মানুষ। যুদ্ধ খরা বন্যা রক্তপাত দেখে অভ্যস্ত, পৃথিবীর কোনও কিছু দেখেই স্নায়ু দুর্বল হয় না। ড্রেসেডেন বিমানবন্দর থেকে আমি লুফথানসায় স্টুটগার্ট হয়ে ফিরে এলাম স্টকহোমে। নোরবার্টরা চলে গেল কুক্সহেভেনে।

বার্লিনের চাঁদ

এ যেন ঠিক পুকুরপাড়ের হাসনুহেনা গাছের ধারের চাঁদ।
ফুলবাড়িয়ায় যেতে যে বাশঝাঁড়,
সেই ঝাড়ের দিকে পা বাড়ালেও
ঘাড়ের ওপর হেলে পড়বে ঠিক এরকম চাঁদ।

বার্লিনের এই মাটি শুঁকলে গন্ধ আসে পচা মাংস-হাড়ের
স্মৃতিগুলো হিটলারের
এখানে কিছু সেখানে কিছু, মনে ও মস্তিস্কে কিছু।
কলকারখানার ধোঁয়া,
আকাশ ছোঁয়া
ভাঙা গির্জা, নতুন দালান-সব ডিঙিয়ে চাঁদ উঠেছে।
এ যেন ঠিক বড়ুয়াদের পোড়ো বাড়ির চাঁদ
দিনের বেলা মাছ কুটেছে
বটির মত বটি আছে,

আঁশগুলোও পাশে, কিশোরিরা চাঁদের জলে গা ধুতে যায়
মধ্যরাতে ছাতে।
এ যেন ঠিক আমলাপাড়ার পড়ার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা পাড়ার সুশান্তদার হাসি,
লোকে বলত সুশান্তটা পাগল!
ধুর, পাগল বুঝি বাজায় এমন পাগল করা বাঁশি?

চাঁদের কোনও পূব পশ্চিম নেই, আকাশ তার উঠোন-মতো
কেবল মানুষেরই যত
মন্দ ভালোর সাদা কালোর ওপার এপার।
চাঁদ আসলে তার, যার হৃদয় ভরা আলো আর অঙ্গ গাঢ় আঁধার।

বার্লিনে চাঁদ হাতে পাই। বিশেষ করে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার অবসান হওয়ার পর। আমার এই অহেতুক জীবনে আমি কিছুতেই সইতে পারছিলাম না আমার জন্য একশ সজাগ প্রহরী। বেশ অনুভব করতে পারি যে আমাকে কেউ খুন করার জন্য কোথাও কেউ বসে নেই। একসময় খুন করার জন্য যারা উন্মাদ হয়ে উঠেছিল, তারাও ধীরে ধীরে ভুলে গেছে আমাকে। সময় কত কিছু বদলে দেয়। আমি কি এখন তবে দেশে ফিরতে পারি! পারি কিন্তু যতবারই দেশে যাওয়ার জন্য পথ খুঁজি, পথে কাঁটা। দেশের দরজা আর কারও জন্য না হলেও আমার জন্য বন্ধ। বিদেশি শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শ একটিই, *কে জানে কখন কী হয়, তুমি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এভাবে হটিয়ে দিও না।* অন্যের পরামর্শ মেনে জীবন চলার পক্ষে আমি প্রায় নেই বললেই চলে। নিরাপত্তা বাহিনীর সবচেয়ে উচ্চপদে যে মানুষ আছেন, তাঁকে আবেদন জানিয়ে এই ব্যবস্থা বন্ধ করতে বলি। বিদেশি সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ লেগেই আছে, একটি কথা প্রতিটি দেশকে এখন জানিয়ে দিই, নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকলে যাবো না। অনেক দেশই নিরাপত্তা ছাড়া আমাকে স্বাগতম জানায় না। তাতে কী, আমি ফিরে তাকাই না। অনেক দেশই অনুনয় করে নিরাপত্তারক্ষীর পরিমাণ কম করার শর্ত দিয়ে আমাকে রাজি

করায়। বিমান বন্দরে নেমেই ঝাঁক ঝাঁক পুলিশ আমাকে ঘিরে ধরবে, সঙ্গে সঙ্গে আর একশটা যাত্রীর চেয়ে যে আমি পৃথক তা প্রমাণ হয়ে যাবে। এবং তখন থেকেই সকলের দৃষ্টি আমার মুখে। আমার প্রতিটি পেশিতে। আমার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অক্ষরে। আমার পদক্ষেপে আমার হস্তক্ষেপে। না, এ রীতিমত নির্যাতন, নিজের ওপর নির্যাতন। তারও ওপর এ যদি সত্যি জরুরি হত, মেনে নিতে পারতাম। জরুরি না হলে কেন আমি রুখে উঠবো না এই অহেতুক নিরাপত্তার বিরুদ্ধে? আমি উঠি। কর্তরা বিবেচনা করেন। গাড়ির ব্যবস্থাটি বন্ধ হয়, এই যা ক্ষতি। লাভ অনেক। সবচেয়ে বড় লাভ, স্বাধীনতা। না, আমাকে পরাধীন করে কখনও ওরা রাখেনি। বলেনি, তুমি যে জায়গায় যেতে চাইছো, সে জায়গায় পারবে না যেতে, এটা করতে পারবে না বা ওটা করতে হবে, এমন কিছু। কিন্তু এই যে ঘাড়ের কাছে সারাক্ষণ অনুভব করেছি কারও শ্বাস প্রশ্বাস, এটিই আমাকে পরাধীন করে রেখেছে। কোথাও গিয়ে কোনও সবুজ মাঠে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে সারাদিন, কিন্তু শুয়ে থাকছি না, কারণ ওদের হয়তো সারাদিন ঘাসে শুয়ে থাকা ঘুমিয়ে থাকা আমার চারকিনারে বসে থাকতে ভালো লাগবে না বলে। আমার এরকম ভাবনা যে আমাকে পিছিয়ে দেয় যা ইচ্ছে তাই করা থেকে, সেটিকেই পরাধীনতা বলি। প্রাণ বাঁচানোর প্রয়োজনে পরাধীন হতেই পারি। দেশে অন্ধকারের দুটো মাসে স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না আমার। কিন্তু একবারও আমার মনে হয় নি পশ্চিমের কোথাও, সে যদি বাংলাদেশ না হয়, বা কোনও মুসলমান প্রধান দেশ না হয়, অথবা জঙ্গী মুসলমান অধ্যুষিত শহর না হয়, আমার প্রাণের ওপর আদৌ কোনও হুমকি আছে। জার্মানি ধনী দেশ, তাদের কোনও অসুবিধে নেই আমার জন্য অজস্র সরকারি কর্মকর্তা এবং কর্মচারি নিয়োগ করতে। ধনী দেশ হয়েছে বলেই কি এই অপচয় আমাকে মেনে নিতে হবে। না, ধনী দরিদ্র যে কোনও দেশের জন্যই এই অপচয় মানতে আমার বাধে। তার চেয়ে ওরা, নিরাপত্তাকর্মীরা সেখানে তাদের শক্তিক্ষয় মেধাক্ষয় করুক যেখানে প্রয়োজন। আমি তুচ্ছ মানুষ। আমার জন্য এত বিশাল আয়োজন অর্থহীন। এত অর্থ অপচয় অর্থহীন।

বার্লিনে চাঁদ হাতে পাই। যেমন ইচ্ছে তেমন চলা, একা চলা। ভিড়ে মিশে যাওয়া। *যে কোনও মানুষ* হওয়া। *সাধারণ মানুষ* হওয়া। ট্যাক্সি চড়া, মেট্রো চড়া। বাসে ট্রামে চড়া। ঘোড়ায় চড়া, ভেড়ায় চড়া। সবচেয়ে বড় আনন্দ, মানুষ দেখা। মানুষের দুঃখ সুখ। দেখতে দেখতে দেখি মানুষ জগতে সব এক। মানুষের ভাষা ভিন্ন হতে পারে, ত্বকের রং, চোখের রং, চুলের রং ভিন্ন হতে পারে, বাড়িঘর, খাবার দাবার, পোশাক আশাক ভিন্ন হতে পারে, আচার আচরণ ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মানুষের দুঃখগুলো এক, সুখগুলো এক। হিংসেগুলো এক, অহিংসেগুলোও এক। বোধ এক। প্রকাশ হয়তো ভিন্ন। অনেক সময় অনেক কিছুর কারণ ভিন্ন হতে পারে। আমি যে কারণে অভিমান করবো, সে কারণে অন্যজন নাও করতে পারে। যে জন্য আনন্দ পাবে সে, আমি হয়ত সে জন্য পাবো না। কিন্তু ভালোবাসা সবখানেই ভালোবাসা, সকলে একে যে কোনও মূল্যেই চায়। ঘৃণা সবখানেই ঘৃণা, মানুষ অন্যকে ঘৃণা করুক না করুক, নিজে কারও ঘৃণা পেতে চায় না। কুৎসিত কুটিল, ঠগবাজ, ঢপবাজ, খুনি বদমাশও চায় না।

বার্লিনে চাঁদ হাতে পাই। দৌড়োতে দৌড়োতে দেয়ালের কাছে থমকে দাঁড়াই। এখানেই সেই দেয়াল ছিল। এখন ভাঙা। গ্রাফিতি আঁকা। এদিকে বাবা, ওদিকে কাকা। দুদিকে দুবোন। এরকমই ছিল জীবন এখানে। এদিকে টাকা। ওদিকে ফাঁকা। দেয়াল ভেঙে কী হল? পূব থেকে পশ্চিমে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ এসেছে, এসে কলা কিনে নিয়ে গেছে। কলার ছোকলায় ভরে গেছে পূবের ফুটপাত। রঙিন টেলিভিশন কেনার ধুম পড়েছে। এদিকে ঝকঝকে তকতকে দোকানপাট। একশ রকম সাবান, দুশ রকম শ্যাম্পু --দেখে পলক পড়ে না পুবের মানুষদের। ওদিকে ঝটাঝট পূবের কারখানা গুলো বন্ধ হয়ে গেল। নিমেষে মানুষের চাকরি চলে গেল। নার্সারি ইস্কুলগুলো বন্ধ হয়ে গেল। ডে-কেয়ার বন্ধ। বেকার ইস্কুল শিক্ষিকা সন্ধে হলে রাস্তায় নামে সেজেগুজে। হাড় কাঁপা শীতে মিনিস্কার্ট পরা লম্বা লম্বা ঠ্যাং ভাঙা দেয়ালের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে, কোনও লাফাঙ্গার মাতাল ভোগের জন্য মাংস কিনতে এলে সস্তায় বেচবে সে।

বার্লিনের চাঁদ তাকিয়ে তাকিয়ে দেয়ালের যাদু দেখে। দেয়াল কাউকে দিগ্বিজয়ী করলো, কাউকে দেউলিয়া করলো। কেউ দগ্ধ হল। কেউ দখল পেল।

দেয়ালের কাছেই খুলেছে চেক পয়েন্ট চার্লি। পূবের সমাজতন্ত্র কী করে মানুষকে পীড়ন করতো তারই গল্পগাছা এখানে। কেউ এ দেশে থেকে ও দেশে সিঁদ কেটে পালিয়েছিল, কেউ বাক্সের ভিতর নিজেকে পুরে এনেছিল, কেউ গাড়ির লেজে ঢুকে এসেছিল। আহা নরক থেকে স্বর্গে আসার জন্য কী যে ব্যাকুল ছিল ওপার! নরকের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানগুলো কী রকম কড়াকড়ি করতো কাউকে যেতে আসতে দিতে, তারও নথিপত্র সাজানো।

কেনেডি যেদিন মারা গেলেন, যে মানুষটি এসে এই পশ্চিমে, এই দেয়ালের কাছে, বলে গিয়েছিলেন ভুল উচ্চারণে, *ইখ বিন আইন বারলিনার।* বলে গিয়েছিলেন দেয়ালের, বিভেদের বিরুদ্ধে। সেই কেনেডি মারা গেলে পশ্চিমের বাড়িতে বাড়িতে যেমন শোকে জ্বলেছিল মোমের আলো, ওদিকে পূবের জানালা গুলোতেও কিন্তু জ্বালানো হয়েছিল মোম। মানুষ চেয়েছিল এক হতে। বাবা কাকার এক হওয়া, দুবোনের এক হওয়া। সবচেয়ে বড় এক হওয়া একই ভাষার একই সংস্কৃতির একই জাতের মানুষের এক হওয়া। এক হওয়ার জন্য পশ্চিম যেমন লাফিয়েছে, পূবও লাফিয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে কুড়ুল শাবল এনে দেয়াল তো গুঁড়োনো হলো, সব তো মিলিয়ে দেওয়া হল। এখন কেমন আছো তোমরা? পূব এবং পশ্চিম? আমাদের মিলছে না। কোথায় মিলছে না? মনে মিলছে না। আর তোমরা? ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি পূবের লোকদের বেকারত্ব আর বোকামো ঘোচাতে। সত্যি সত্যি মাইনে থেকে পূবের উন্নতির জন্য টাকা কাটা হচ্ছে পশ্চিমের সবার কাছ থেকে। পশ্চিম যদি জানতো অবস্থা এমন দাঁড়াবে, তবে সে রাতেই রাজমিস্ত্রি লাগিয়ে পারলে ভাঙা দেয়াল জোড়া দিয়ে আরও দু বিঘৎ উঁচু করে দিত। এদিকের মানুষের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই সাধ করে ঘাড়ের ওপর দশ মণি বোঝা বইবে। দেখেছি ঘুরে ঘুরে পূবের অবস্থা, দেখেছি অনেকটাই পূর্ব জার্মানি। আচমকা মনে হয়েছে বুঝি তৃতীয় বিশ্বের কোনও দেশে এসে পৌঁচেছি। মলিন ঘরবাড়ি ঝুরঝুর করে

ঝরে পড়ছে। রাস্তায় ট্রাবান্ট নামের কুখ্যাত গাড়ি, যে গাড়ি পঞ্চাশের দশকে সাধারণের জন্য সস্তায় বানানো হয়েছিল। ট্রাবান্টের নাম শুনে পশ্চিম ইওরোপের মানুষ মিনিট পাঁচেক আগে হেসে নেয়, তারপর ও সম্পর্কে বলে। ট্রাবান্ট এখন চলে যাচ্ছে যাদুঘরে। বার্লিনে যাদুঘর দেখা হয়েছে বিস্তর। প্যারিসের মতই বার্লিন, যাদুঘরের শহর। ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে হিসেব করলে প্রায় দুশর কাছাকাছি যাদুঘর বার্লিনে। পশ্চিমের জার্মানির-ইতিহাস-যাদুঘর-এ লেনিন যেমন আছে, হিটলারও আছে। পূবে প্যারগামোন যাদুঘর। গ্রীসের অ্যাক্রোপলিস মনে হয় পুরোটাই উঠিয়ে নিয়ে ওখানে রাখা হয়েছে। বডে যাদুঘর, মিশরীয় যাদুঘর, ভারতীয় যাদুঘর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ, এমনকি যৌন-যাদুঘরও দেখা হয়। যৌন-যাদুঘর এক আশ্চর্য জিনিস। বিআটে উসে নামের এক জার্মান ভদ্রমহিলার উদ্যোগে এই যাদুঘরটি বানানো হয়েছে।   যৌনতা যে সুন্দর এক শিল্প, তাই বোঝাতে এই যাদুঘর। প্রাচীন ভারতের, চিনের জাপানের এবং আরও আরও দেশের যৌনশিল্পের প্রদর্শনী। নিচতলায় যৌনসামগ্রীর দোকান আর ছোট ছোট ঘর, যে ঘরে পর্নোছবির ভিডিও চলছে। ছবি দেখ, হস্তমৈথুন করো। অথবা পছন্দের কাউকে নিয়ে ঘরে ঢোকো। শরীর যা চায়, তা করো।

কেবল যাদুঘর নয়, বার্লিন শহরের এ মাথা ও মাথা   চষে বেড়িয়েই ক্লান্ত হই না, টিয়েরগারটেনে হারিয়ে যাওয়া, শহরের বাইরে পটসডাম রাজপ্রাসাদ সাঁ সুসির উঠোনে চা খাওয়ার গোল ঘরটি দেখে উচ্ছসিত হওয়া, যুদ্ধশেষের দুনিয়ায় কী হবে না হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে যে বিখ্যাত সভাটি হয়েছিল,   ট্রুম্যান, চার্চিল, আর স্টালিনের, পটসডামের সেই সভাকক্ষের সামনে এসে থমকে যাওয়া। সাহিত্য চর্চা বাদ দিয়ে বার্লিন চর্চা চলতে থাকে আমার। ক্রেয়জবার্গ অ্যানারকিস্টদের দেয়াল লিখন পড়েই দিন কাটিয়ে দিই। ক্রেয়জবার্গ মিছিলে ওস্তাদ। মিছিলেও নামি জার্মান শ্রমিক, সমকামী, সমতায় বিশ্বাসী সকলের সঙ্গে। এই বার্লিনেই শুনি মিছিল হয়েছিল মেয়েদের। মিছিলে সবার পরনে ছিল টিশার্ট, টিশার্টে জার্মান ভাষায় লেখা ছিল, আমি তসলিমা। তখন আমার ফাঁসির দাবিতে মিছিল হচ্ছে প্রতিদিন বাংলাদেশে। তখন আমার পক্ষে বাংলাদেশে কেউ টুঁ শব্দ করেনি,

করেছে মানুষ বিদেশে। ভাবলে কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। ইওরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বিদেশি নারীবাদী মানববাদী এবং শিল্পী সাহিত্যিক। কেবল আন্দোলনের জন্য টি শার্ট নয়, এই জার্মানিতে এক জার্মান প্রকাশনী হোমার, ব্রেখট, হাইনে, গ্যাটের লেখার উদ্ধৃতি লেখা টি শার্ট তৈরি করে। বেশ উন্নতমানের শিল্প। আমার হাতে যখন আমার উদ্ধৃতি, জানি না কোত্থেকে উদ্ধার করেছে, সম্বলিত একটি নীল টি শার্ট হাতে আসে, শার্টের সামনে একটি মুখের ছবি, আর পুরোটা শরীর জুড়ে লেখা জার্মান ভাষায়, *ডিজে ফারডমটে গেজেলশাফট গ্লাউবট ভেন মেইডশেন আউফ বয়মে স্টাইগেন ডান স্টিআরবট, ডেয়ার বাউম,* মানে হচ্ছে জঘন্য এই সংস্কার বলে যে মেয়েরা গাছে উঠলে গাছ মরে যায়। নিচে আমার নাম। পিছনে ঘাড়ের দিকে দুটি চোখের ছবি আর আমার সই। আমার খুব ভালো লাগার কথা, বিস্ময় মুগ্ধ চোখ নিয়ে তাকিয়ে থাকার কথা। কিন্তু টি শার্ট টি যে কোনও টি শার্টের মত পড়ে থাকে। আমি অন্যমন। কোনও কিছুতেই যেন আমার কোনও কিছু যায় আসে না।

বার্লিনে আসার পর থেকে নানারকম সম্বর্ধনা সম্মান লেগেই আছে। নারীবাদী এবং মানববাদীরা সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর লেখককূল ধীরে ধীরে উপস্থিত হন। জার্মান দার্শনিক অ্যান মেরি শিমেলের শান্তি পুরস্কার পাবার বিরুদ্ধে জার্মান লেখক এবং মানববাদীরা ভীষণ ক্ষেপে ওঠে। ক্ষেপে ওঠার দলে আমাকে কেন্দ্রে রাখা হয়। জার্মান লেখক পিটার স্নাইডার, আমি এবং আরও কজনের সই সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়। বার্লিনের বড়সড় মঞ্চে প্রতিবাদ অনুষ্ঠান জমে ওঠে। অ্যান মেরি শিমেল পাচ্ছেন ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় জার্মান সরকারের দেওয়া শান্তি পুরস্কার। পুরস্কারটি যথেষ্ট বড় পুরস্কার। পাচ্ছেন যিনি, তাঁকে ইসলাম-বিশেষজ্ঞ বলে বিশ্ব জানে। শিমেল বিশ্বাস করেন ইসলাম শান্তির ধর্ম, তিনি প্রচার করছেন যে, মুসলমান মেয়েরা ইওরোপীয় মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি মর্যাদা পায়, তারা অনেক বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করে। তিনি উদাহরণ হিসেবে তুরস্ক পাকিস্তান ইরান এসব

দেশের নাম উল্লেখ করেছেন। সালমান রুশদি এবং তসলিমা নাসরিনকে তিনি মুর্খ বলে ঘোষণা করে বলেছেন, যে, তারা ইসলামের কিচ্ছু জানে না। মেয়েদের পর্দাপ্রথার পক্ষে খুব ভালো যুক্তিও তিনি খুঁজে বার করেছেন। ইসলামের এই গুণগান যাদের পছন্দ হচ্ছে না, তারা ইসলামবিরোধী নয়, তারা যে কোনও ধর্মেরই বিরোধী, তারা মনে করে কোনও ধর্মই শান্তির ধর্ম নয়। ইসলামের কারণে নারীরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, এই খবর জানার পর কোন বিশুদ্ধ মানববাদী ইসলামের পতাকা উত্তোলন করতে আগ্রহী হবে! ধর্মের গুণগান গাইলে শান্তি পুরস্কার জোটা উচিত নয়, এই হল আমাদের মত। সরকার জানিয়েছে এই পুরস্কারটি পশ্চিমি এবং ইসলামি বিশ্বের মধ্যে সম্পর্ক ভালো করবে। না, সম্পর্ক ভালো করার পদ্ধতি এ নয়। আমাদের সাফ কথা হল, সমস্ত কূপমণ্ডুকতাকে, সমস্ত কুসংস্কারকে বাহবা দিয়ে আপস করলে আখেরে লাভ হয় না। ধর্মের সঙ্গে অথবা ধর্মবাদী বা মৌলবাদী কারও সঙ্গে আপস চলতে পারে না। এই পুরস্কার শিমেলকে দেওয়ার অর্থ হল, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যারা বলে, সেকুলারিজমের কথা বলে, যারা ধর্মীয় সন্ত্রাস থেকে সমাজকে মুক্ত করতে চায়, তাদের লড়াইএর মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ভালো মচকে দেওয়া হল, তাদের মিছিলের পা ভালো মাড়িয়ে দেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে জার্মান সরকার ইসলামের সঙ্গে আপস করছে। এতে ইসলামি-বিশ্বের সঙ্গে নানা রকম লেন দেনের স্বার্থ জড়িত বলেই করতে হয়।

কিন্তু দেখেছি, আরও দেখছি, বোকা বনে গেছি, আরও বনছি, যখনই ইসলামের সমালোচনা করি, পশ্চিমের বর্ণবাদ বিরোধী, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী যাঁদের সমর্থন আমার পাওয়ার কথা, তাঁরাই মারমুখি হয়ে ওঠেন। আমি নিজে বর্ণবাদ, পুঁজিবাদ, বৈষম্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি ঠিক তাঁদেরই মত, অথচ তাঁরাই কিন্তু আমার বিপক্ষে অনড় দাঁড়িয়ে গেছেন। যে কাজটি তাঁরা পশ্চিমে করছেন, ঠিক একই কাজ আমি পূবে করেছি। তবে বিরোধটি কোথায়? তাঁরা ধর্ম মানেন না, আমিও না। তাঁরা পশ্চিমের প্রধান ধর্ম ক্রিশ্চান ধর্মের সমালোচনা করছেন। আমি সব ধর্মেরই সমালোচনা করি, বাংলাদেশের প্রধান

ধর্ম ইসলামের সমালোচনা করেছি। সমাজকে ধর্মমুক্ত, কলুষমুক্ত, মিথ্যেমুক্ত করার জন্যই তো! তাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ান, যেহেতু পশ্চিমে সংখ্যালঘুরা বর্ণবাদের শিকার। একই রকম আমিও দাঁড়িয়েছি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুর পাশে, যেহেতু তারা সংখ্যাগুরু-মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার। কিন্তু আমাদের মধ্যে পার্থক্য হল, সংখ্যালঘুকে সমর্থন করতে গিয়ে সংখ্যালঘুর ধর্মকে আমি সমর্থন করতে যাই না, সেই ধর্মের যাবতীয় কুসংস্কার আর কদাচার আমি সমর্থন করি না। বরং যে ভাষায় সংখ্যাগুরুর ধর্মের সমালোচনা বা নিন্দা করি, ঠিকই একই ভাষায় সংখ্যালঘুর ধর্মকেও করি। অসুবিধে দেখলে সুবিধোভোগী রাজনীতিকদের মতো আমি মুখে কুলুপ আঁটি না। পশ্চিমের এই প্রতিবাদী বুদ্ধিজীবিরা আমি তাঁদের সতীর্থ হলেও আমার বিরুদ্ধে বিষোদগারণ করতে দ্বিধা করে না। কোথাও বিরোধ! আছে, তাঁদের যুক্তি হল, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ যেহেতু বর্ণবাদী, যেহেতু পশ্চিমী সংস্কৃতিকে অধিকতর ভালো বলে মনে করছে পূবের সংস্কৃতির চেয়ে, সেহেতু সংখ্যালঘুর সমালোচনা করলে সমূহ বিপদ, এতে আস্কারা পাবে উগ্র ডানপন্থী দল, নিও নাৎসি দল, এবং সংখ্যালঘু খতম করে কেবল সাদার জন্য সাদা রাজ্য বানাতে ক্রুশ মাথায় নিয়ে নেত্য করবে। বুঝি এই সমস্যা। কিন্তু সংখ্যালঘুর পক্ষে দাঁড়াতে গেলে যদি সংখ্যালঘুর ধর্মের পক্ষেও দাঁড়াতে হয়, তবে কিন্তু সব্বনাশ। সব্বনাশ বাম বুদ্ধিজীবিদের নয়, সব্বনাশ ওই সংখ্যালঘুদেরই। ওই গোত্র ধর্ম আঁকড়ে যেভাবে বেঁচে আছে, সেভাবেই বেঁচে থাকবে, অশিক্ষায় আর অন্ধকারে। আলোর মুখ তাদের আর দেখা হবে না। মৌলবাদ হিশহিশ করে বাড়বে। ধ্বংস করবে কেবল নিজের সম্প্রদায়ের মানুষদের নয়, গোটা সমাজকেই, গোটা দেশকেই। তোমার রাজনীতির সুবিধের জন্য তুমি মৌলবাদ পোষো না, বাছা।

যেখানে যে-দেশেই যাই আমি সে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক, লৈঙ্গিক, সমস্যার গভীরে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে খুলে খুলে দেখানো হয় আমাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং আমাকে উদ্বুদ্ধ করা হয় প্রতিবাদ করতে। কানাডাতে কিইবেক অঞ্চল চাইছে

আলাদা হতে, কিইবেকের মন্ত্রীকূল বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদগ্ধ শিল্পী সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রীকূল আমাকে ইংরেজিভাষীদের বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ করে বোঝালো যে কানাডা থেকে ফরাসিভাষী অধ্যুষিত কিইবেককে না সরিয়ে নিলে কিইবেকের অস্তিত্ব বিপণ্ন। এখন আমাকে এই অস্তিত্বের পক্ষে কিছু অন্তত বক্তব্য রাখতে হবে। আমাকে তাদের আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে। আমি বাইরের মানুষ, কিন্তু আমাকে মানুষ, আমি দেখছি, পৃথিবীর যে কোনও আন্দোলনে, প্রতিবাদে, লড়াইএ কাছে পেতে চায়। এ আমার জন্য বড় পাওয়া। এ নিশ্চয়ই বড় পাওয়া। এ আমাকে কোনও না কোনও ভাবে তাদের দলের একজন করে ফেলে। ফ্রান্সে মাত্র তিন ভাগ নারী ফরাসি সংসদে আছে, সুতরাং আন্দোলন করছে ফরাসি মেয়েরা, যেন এই তিন ভাগকে আরও বাড়ানো হয়। প্রস্তাব হচ্ছে নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনয়ন পত্রে যেন পঞ্চাশ ভাগ নারীকে মনোনয়ন করা হয়। এটিকে আইন করতে হবে। ইওরোপ জুড়ে মেয়েদের বেতন কম, একই কাজ করে ছেলেদের বেতন বেশি, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আমাকে ডাকা হয়। আমার কণ্ঠস্বরকে তারা প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে মানে। জগতের নারী সমস্যায় আমাকে যুক্ত করে তারা নিজেদের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালি করতে চায়। সুইডেনের মত স্বর্গেও অবিশ্বাস্য কাণ্ড হয়। সুইডেনের সংসদে পঞ্চাশ ভাগ নারী। হলে কী হবে, প্রশাসনে, বানিজ্যে নারীর সংখ্যা নগণ্য। নারীর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু অর্থ নেই। অধিকাংশ নারীই কোম্পানির কর্মচারি, মালিক নয়। আরও একটি লজ্জার ঘটনা হল, এই সুইডেনে প্রতি সপ্তাহে একজন নারী খুন হয়। খুন করে মূলত স্বামীরা। বলার চেষ্টা চলে যে স্বামী মাতাল থাকে তাই। নারী সংগঠন প্রমাণ করেছে যে না, মদ কোনও কারণ নয় এর পিছনে। কী তবে কারণ? সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম? উহুঁ, প্রবলেম সোশিওলোজিক্যাল।

আলজেরিয়ায় মৌলবাদীরা লেখক সাংবাদিকদের গলা কাটছে। এবার আমাকে সোচ্চার হতে হবে। বেলজিয়ামে শিশু ধর্ষনের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়েছে, প্রতিবাদ চাই। আমেরিকায় ক্রিশ্চান মৌলবাদীরা গর্ভপাতের বিরুদ্ধে চিৎকার করছে, এই মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে

আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। আন্দোলন বলতে লেখালেখি সভাসমিতি, বক্তৃতা। বক্তৃতা বলতেই দেশের যে চিত্র ভেসে ওঠে, তা হল মাঠে একটি উঁচু মঞ্চ, সামনে অগুনতি মানুষ, মঞ্চ এবং মানুষের মাঝখানে অনেকটা ফাঁকা, মঞ্চের মানুষের সামনে মাইক, চিৎকার করে কথা, অবিরাম কথা, কথা এক লাফে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে, কথায় উত্তেজক শব্দ, কথা মানুষের হাততালি পাওয়ার জন্য, কথার অনেকটাই বানানো। দর্শক শ্রোতাদের অনেককে জোর করে আনা, পয়সা দিয়ে আনা। তারা অনর্গল নিজেদের মধ্যে কথা বলে, কেউ শোনে, বেশির ভাগই শোনে না। এবং বেশির ভাগই বোঝে না কী বলা হচ্ছে। পশ্চিমের বক্তৃতা অন্যরকম। রাজনৈতিক বক্তৃতাও মূলত মাঠে ময়দানে নয়, হয় চারদেয়ালের ভিতরে। লিখিত বক্তৃতা। বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর। আলোচনা। নানা মত। উৎসাহী দর্শক শ্রোতার ভিড়। আমি রাজনীতির কেউ নই। রাজনীতির বুঝিও কম। কিন্তু আমার বক্তব্যকে লক্ষ করেছি, পশ্চিমে রাজনৈতিক বক্তব্য বলে ধরা হয়। সমাজ পরিবর্তনের জন্য বলছি। হ্যাঁ গো, সেটাই তো রাজনীতি। সমাজ সমাজের মতো আছে, থাকুক। তোমার মাথা ব্যাথা কেন, মাথা ব্যাথা যখনই হচ্ছে, যখনই মুখ খুলছো, তখনই তুমি রাজনীতির জগতে ঢুকে যাচ্ছো।

আমাদের শিমেল-বিরোধি আন্দোলনে লাভ হয়নি, প্রচণ্ড সমালোচনার মধ্যেও অ্যান মেরি শিমেল পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার পাবার বিরোধিতায় পুরো জার্মানিতে যে দলটির ভূমিকা সবচেয়ে বড় ছিল, সেটি জার্মান মানববাদী সংগঠন। দলটির সভাপতি ক্রিশ্চান জন। ওর সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে বার্লিনে বাস করার শুরু থেকে। দেখতে ক্রিশ্চান আগাগোড়া ঘোর সাদা, সোনালি চাদরে মোড়া। মাথা থেকে পা অবদি শুধু চুল নয়, ভুরু চোখের পাতা সবই সোনালি। গায়ের প্রতিটি লোমই সোনালি। সেই সোনালি ক্রিশ্চান এবং তার সংগঠনের আমাকে সম্বর্ধনা দেওয়া, আমাকে ফুলে ও উপহারে ভরিয়ে নৌকো ভ্রমণ করিয়ে সংগঠনের নতুন রেস্তোরাঁ আমাকে দিয়ে উদ্বোধন করিয়ে, আচমকা আমার জন্মদিন পালন করে, আমার নিজেরই যেখানে মনে ছিল না যে সেদিন আমার জন্মদিন, আমাকে শুধু চমকেই দিল না, ভাসালো সুখের সাগরে।

চৌদ্দ বছর হলে প্রতিটি ক্রিশ্চান ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অনুষ্ঠান হয়, অনুষ্ঠানের নাম কনফারমেশন। এটি গির্জায় গিয়ে করতে হয়। কিন্তু এই চৌদ্দ বছর বয়সের একটি উৎসব অনুষ্ঠান ধর্মহীনভাবে করার উদ্যোগ নেয় জার্মান মানববাদী সংগঠন। সংগঠনটিই বেশ কয়েক বছর ধরেই এভাবে করছে কিশোরকিশোরীদের চতুর্দশী-উৎসব। আমাকে অনুষ্ঠানের প্রধান বা বিশেষ অতিথি রাখে প্রেরণা দিতে সেই সব কিশোর কিশোরীদের যারা এই অভিনব অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। প্রায় বারোশ কিশোর কিশোরীদের অভিবাদন জানাই, তারা যে এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে ভুল করেনি, সেটিই বলি। বলি যে এটিই মুক্তির পথ। এটিই সত্য ও স্বাধীনতার পথ। উৎসবে নাস্তিকতা এবং মানবতার জয়গান গাওয়া হয়। হিউম্যানিস্ট অথবা মানববাদী সংগঠনের কাজই হল ধর্মহীন রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা। জীবন থেকে ধর্ম দূর করা। কিন্তু এই আদর্শটি কারওর ওপর চাপানো হয় না, কেউ যদি ইচ্ছে করে সদস্য হতে চায় হবে। এখন এই সংগঠন জার্মনির সরকারি ইস্কুলগুলোয় শিক্ষক পাঠাচ্ছে মানববাদ পড়ানোর জন্য। মানববাদ পড়াতে গিয়ে কেবল মানববাদই নয়, যত ধর্ম আছে পৃথিবীতে, সবগুলো সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়। কিশোরকিশোরীরা সব জাতের আস্তিকতা এবং একই সঙ্গে নাস্তিকতা বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করার পর যে কোনও একটি বিশ্বাসকে বেছে নেবে। তাদের নিজ নিজ ইচ্ছেকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা। যুক্তিবুদ্ধি থাকলে নিজেদের জন্য ধর্ম অথবা ধর্মহীনতা নিজেদেরই বেছে নেওয়া উচিত। বাবা মার ধর্মকে বরণ করে নিতে বাধ্য হতে হবে কেন মানুষকে!

মোট ষাট হাজার সদস্য এই ধর্মমুক্ত মানববাদী সংগঠনে। হাজার কাজে ব্যস্ত। তারা দেখেছে যে কেবল ধর্মহীনতার কথা বলা গেলে মানুষ আকৃষ্ট হয় না। হীনতা ব্যপারটি নেতিবাচক। আস্তিককে নাস্তিক বানাতে গেলে কিছু উৎসবের আয়োজন করতে হয়। মানুষ উৎসব চায়। আনন্দ চায়। ক্রিশ্চানদের বড়দিন আছে, ঈস্টার আছে, গুড ফ্রাইডে আছে, আরও রকমারি উৎসবের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ধর্মহীনদের জন্য কোনও উৎসব নেই। ধর্ম তুলে নেবার ইচ্ছে প্রকাশ করে বসে বসে আঙুল চুষলে চলবে না। কেউ তবে ধর্ম ছেড়ে

কোথাও যাবে না। কিছু নিতে হলে কিছু দিতে হয়। ত্যাগ মানুষ তখনই করতে আগ্রহী, যখন কিছু একটা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। ধর্মের উৎসব ত্যাগ করবে, বিনিময়ে একই রকম চাকচিক্যপূর্ণ কোনও উৎসব কি দিতে পারে না ধর্মহীন গোষ্ঠী! পারেনি। পারেনি বলেই মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। তাই এখন প্রাণপণে চাইছে ধর্মহীনতাকে সাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করতে। গ্রহণযোগ্য করতে হলে উৎসব দাও। তাই এসব উৎসবের আয়োজন। যে পনেরো হাজার কিশোরকিশোরী এসেছিল কনফারমেশনের জন্য গির্জার বদলে মানববাদীদের উৎসবে, সুস্থ সুন্দর সাংস্কৃতিক দার্শনিক আনন্দে মাততে, তাদের নব্বই ভাগ পূর্ব জার্মানির, দশ ভাগ পশ্চিম জার্মানির। কমিউনিস্ট শাসনকালে পূর্ব জার্মানিতে নাস্তিকতা বিরাজ করায় মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই নাস্তিক। পশ্চিম জার্মানির মানুষের মধ্যে নাস্তিকতা সেইভাবে নেই, যেইভাবে থাকলে আবহমানকাল ধরে গির্জা দ্বারা যে ক্রিশ্চান ধর্মে কনফারমেশন রীতির অনুষ্ঠান হয়ে আসছে, সেটিকে অস্বীকার করা যায়। নাস্তিকতায় মানুষকে দীক্ষিত করলেই হবে না, তাদের উৎসব দিতে হবে, তাদেরকে বিকল্প কিছু দিতে হবে। তাই কনফারমেশনের বদলে অধর্ম- উৎসব দেওয়া হল, গির্জায় গিয়ে ধর্মমতে বিয়ে করার বদলে অধর্মমতে বিয়ে করার ব্যবস্থাও চালু হয়েছে। সেটিও মানববাদী সেকুলার সংগঠনই করছে। কেবল জার্মানিতেই নয়, এটি এখন নরওয়েতে, সুইডেনে এবং আরও কিছু দেশে চলছে। অনেক নাস্তিক নারী পুরুষ গির্জায় না গিয়ে ধর্মগন্ধমুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিয়ের আনুষ্ঠানিক উৎসব করতে আসছে। কোনও পুরোহিত থাকবে না, বিয়ে ঘোষণা করবে মানববাদী কোনও একজন, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে নয়, রক্ত মাংসের মানুষকে সাক্ষী রেখে। মন্ত্র পড়ে নয়, প্রেমের কবিতা পড়ে। এখনও সবচেয়ে বড় উৎসব ক্রিসমাস বা বড় দিনের কোনও বিকল্প হচ্ছে না। ২৫শে ডিসেম্বর যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন নয়, যীশুর সত্যিকার জন্ম ১৫ই মে তারিখে ৬ বি.সি.তে। অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৬ বছর আগে যীশু খিস্টের জন্ম হয়েছে। ২৫ ডিসেম্বর তারিখটি আদিবাসীদের উৎসব ছিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এবং অন্ধকারে সূর্যদেবতাকে জাঁক করে ডাকা হত। হলে কী হবে, মানুষের মাথায় যা গেঁথে গেছে তা গেঁথে

গেছে। ২৫ ডিসেম্বরের ইতিহাস বর্ণনা করলেও কিছু যায় আসে না কারওর। কিন্তু এরকম বড় কোনও উৎসব যদি সম্ভব হয় আয়োজন করার, তবে দোষ কী! বড়দিনের বদলে সেই দিনটিকেই মানবে মানুষ।

বার্লিনে এই দলটিই আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ইওরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ার সব মানববাদী দল আমার একরকম ঘরবাড়ি হয়ে ওঠে। আমেরিকার সেন্টার ফর ফ্রি ইনকোয়েরির অতিথি হয়ে বাফেলো যেতে হল। নিতে হল *ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব হিউম্যানিজম* থেকে *হিউম্যানিস্ট লরিয়েট* পদবি। স্যার ইসাইয়া বার্লিন, স্যার হারমান বন্ডি, রিচার্ড ডকিনস, হারবার্ট হপ্টম্যান, ফ্রান্সিস ক্রিকএর মত বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ, চিন্তাবিদ, নোবেল লরিয়েটদের সঙ্গে নিজের নামকে ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। *ফ্রি ইনকোয়েরি* ম্যাগাজিনে আমাকে করা হল সিনিয়র এডিটর। ম্যাসাচুসেস্টস মানববাদী দলের আমন্ত্রণে যাওয়া, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা, লণ্ডনে, আমস্টারডামে, রোমে, লস এঞ্জেলেসে, এবং আরও আরও শহরে সেকুলারিজমের প্রয়োজনীতার কথা বলার আমন্ত্রণ। আমি বুঝি বড় বড় তাত্তিক তার্কিকের চেয়েও আমাকে কেন মূল্য দেওয়া হয়, আমার জন্য দর্শক শ্রোতার হাততালি কেন বেশি থাকে। কারণ একটিই। আর যাঁরা তথ্য তত্ত্ব সম্বলিত জ্ঞানগম্ভীর আলোচনা করছেন, নতুন দিকনিশানা বাতলাচ্ছেন, তাঁরা যতই বড় হোন না কেন, তাঁদের কাউকেই ভুগতে হয়নি আমি যেভাবে ভুগেছি ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে। তাঁদের কাউকে সমাজ সংসার ত্যাগ করতে হয়নি। তাঁদের কাউকে অন্ধকার ধর্মান্ধ সমাজে বাস করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়নি ধর্মবাদীদের বিরুদ্ধে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কারণেই মানুষ আমাকে সর্বোচ্চ স্থানে বসিয়ে দেয়। পশ্চিমের মানুষ এখন তত্ত্ব শুনতে শুনতে অনেকটাই ক্লান্ত। এখন রক্ত মাংসের হিরো চায়। হিরোর তত্ত্ব শুনতে চায় না, হিরোর জীবনের কথাই শুনতে আগ্রহী। ওসবই তাদের কাছে জীবন্ত বেশি, তাদের হৃদয় আছে অনুভব করার অন্যের অনুভব। তারা এখন তাই চায়। পূর্ব যখন তত্ত্ব শুনলে মুগ্ধ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ঢের হয়েছে তাদের, এখন শহুরে হতে চাইছে, এখন নাগরিক হবার তীব্র বাসনা -- তখন গ্রাম্যতা

পেরিয়ে নাগরিকতাও পেরিয়ে হাই টেক এর দেশে, সব পেয়েছির দেশে মস্তিস্কের বোঝা বড় বোঝা, তত্ত্বে তথ্যে ঠাসা মাথাটি বিগড়ে ওঠে। ব্যাকল্যাশ হয় হরে কৃষ্ণ হরে রামে, বৌদ্ধ ধর্মে, পূবের সংস্কৃতিতে, হিপিইজমে, ইসলাম বরণে, বোহেমিয়ানিজমে, এবং তাদের মস্তিস্কে আর কুলোতে চাইছে না শুধুই দর্শন, শুধুই যুক্তি। সরবে ধ্বনিত হয়, *থামো। থামো সো কল্ড সভ্যতা। থামো যন্ত্র। থামো মেশিন। থামো পিশাচ। এবার হৃদয়ের কথা বলো, হৃদয়চর্চা বহুকাল হয়নি।*

তাদের ভালো লাগে না নিজেদের পোশাক আশাকও। তাদের বলতে প্রকৃতিপ্রেমীদের। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারিনি আমার বাড়ি থেকে একদিন দু কিলোমিটার মতো দূরে হাঁটতে হাঁটতে যা দেখেছি। প্রাপ্তবয়স্ক শত শত নারী পুরুষ উলঙ্গ শুয়ে আছে, বসে আছে লেকের ধারে, মাঠে। রোদ তাপাচ্ছে। রোদ তাপানো তো আগে অনেক দেখেছি। সুইডেনে দেখেছি গরমকালে লেকের ধারে নারীপুরুষকে অর্ধউলঙ্গ বসে থাকতে। ইতালিতে, স্পেনে, আয়ারল্যান্ডে, ফ্রান্সে, স্কটল্যান্ডে, ডেনমার্কে অনেক উলঙ্গ শরীর দেখেছি সমুদ্রপাড়ে, নদীর ধারে বা লেকের ধারে। বেশির ভাগই সাঁতারের পোশাকে। কারওর কারওর ওপর খোলা, ওপর খোলা থাকলেও নিচের অংশ ঢাকা থাকে, অন্তত প্রথম দ্বিতীয় সব লিঙ্গকেই সযত্নে ঢেকে রাখার একটি অলিখিত ব্যবস্থা ছিলই। বার্লিনে নারী পুরুষ সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাবা মারা উলঙ্গ। কারও গায়ে একটি সুতোও নেই। মাইলের পর মাইল মানুষ। না ফুরোতে থাকা মাঠ জুড়ে মানুষ। না, এ কোনও ন্যূড ক্লাব নয়। যে কোনও মানুষই মাঠে শুয়ে বসে হেঁটে বেড়িয়ে দিন কাটাতে পারে। উলঙ্গ মানুষগুলো হাঁটছে, যৌনাঙ্গে জঙ্গল। ফিরেও তাকাচ্ছে না কেউ। বুক কারওর শক্তপোক্ত, কারওর ঢলে পরা, কারওর উঠি উঠি, কারওর ফুটে থাকা। পুরুষাঙ্গগুলোর বিচিত্র আকার আকৃতি। কারওর ছোট, কারওর মাঝারি, কারওর বেশ হৃষ্টপুষ্ট। চেয়ে দেখা কি সোজা নাকি! খোলা পুরুষাঙ্গ নিয়ে ওদের কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না, অস্বস্তি হচ্ছে আমার। তাদের লজ্জা নেই, লজ্জা আমার। আড়চোখে

দেখি আর অবাক হই, চারদিকের এত স্তন আর যোনির ভিড়েও একবারও উত্থিত হয় না একটি পুরুষাঙ্গও। পুরুষাঙ্গগুলো আশ্চর্য রকম ভাবে ঘুমিয়ে থাকা। যেন আমি স্বর্গে এসেছি, এরা সবাই দেব দেবী। পিঠে কোনও পাখাটাই বাকি। নারী পুরুষ শুয়ে বসে বই পড়ছে, কেউ দুপুরের হালকা খাবার নিয়ে এসেছে, বাক্স থেকে বের করে খাচ্ছে, আইসব্যাগে পানীয় নিয়ে এসেছে, সেগুলো খাচ্ছে, অথবা খাচ্ছে ফ্লাস্কের কফি। ইওরোপের মানুষ কড়া কফি খায়। দুধ মেশায় না। উত্তর আমেরিকার কফি আলাদা, দুধমেশানো হালকা কফি খাঁটি ইওরোপীয়দের পক্ষে সম্ভব নয় পান করা। এখানকার কিছু জিনিস খুব পছন্দ করে মানুষ। কফি, চকলেট, চিজ। এই তিনটিই আমার ঘোর অপছন্দ। তিনটি শব্দই সি দিয়ে শুরু। বলছি নগ্নতার কথা। ওই উলঙ্গ নগ্ন নেচারিস্টদের সামনে নগ্ন না হয়েও হয়ত কেউ বসতে পারে, শুতে পারে, কিন্তু বড় বেমানান দেখতে লাগে। এই আমিই বিকিনি পরে অনেকক্ষণ বসে থেকেছি, বিকিনিকেই এত বিচ্ছিরি লেগেছে যে লোকে ছি ছি চোখে তাকিয়েছে। শেষ অবদি বিকিনি পরে থাকার লজ্জায় এবং উলঙ্গ না হতে পারার শরমে আমাকে মাঠ ছাড়তে হয়েছে। গরম পড়ল আর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত যে কোনও জায়গায় যখন তখন কাপড় চোপড় সব খুলে ফেলা এক বার্লিনেই দেখেছি, জার্মানির অন্য কোথাও দেখিনি। পৃথিবীর অন্য কোথাও-ও না। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইতালি থেকে কজন সাংবাদিক এসেছিল, ধীরে ওরা বন্ধু হয়ে উঠলে ওদের নিয়ে বাড়ির পাশে হাঁটতে গিয়ে দেখিয়েছি সেই দৃশ্য। ওরাও থ। এমন অদ্ভুত দৃশ্য বললো যে ওরাও ওদের বাপের জম্মে দেখেনি।

বার্লিনের মাঠে ঘাটে প্রকাশ্য দিনের আলোয় হেঁটে বেড়ানো বা শুয়ে বসে থাকা নগ্ন নারীপুরুষেদের কিন্তু আমার কাছে মোটেও অশ্লীল মনে হয়নি। অশ্লীল মনে হয় খুব করে সেজে ছোট ছোট পোশাক পরে সন্ধের আলো আঁধারে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের। মেয়েরা তাদের শরীর বিক্রি করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। পূর্ব ইওরোপের দারিদ্র তাদের এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে পশ্চিম বার্লিনের অলিগলিতে, রাজপথের ফুটপাতে। আমি চোখ ঢেকে রাখি।

রাজনতি যে দারিদ্র রচনা করে, যে নীল নকশা আঁকে বৈষম্যের, দেশে দেশে তার শিকার কেবল নারীই।

বার্লিনের কুরফুরস্টানডাম রাস্তাটি যেতে যেতে শেষ হয় না। স্টর্কভিংকেল থেকে কাডেভে। এই পথটুকুর মাঝখানে একটি ভাঙা গির্জা আছে, গির্জাটি বিখ্যাত। বিখ্যাত, কারণ, গির্জাটিতে বোমা ফেলে ধ্বংস করেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি। গির্জাটি এখন একটি সৌধ। কাডেভে হচ্ছে বার্লিনের গ্যালারি লাফায়েত। কেনাকাটার জায়গা। যেমন নাম, তেমন দাম। খুব সুখ হলে অথবা খুব দুঃখ, এই দুইএ যখন ভুগি, তখন কাডেভে থেকেই যা কেনার কিনি। টাকা পয়সা খরচ করি জলের মতো। কিছুতে, এখন দেখছি, কিছু যায় আসে না আমার। জীবন ধীরে ধীরেই বড় অর্থহীন হয়ে উঠছে। আমার যে কোথাও একটি দেশ ছিল, আমার যে কোথাও একটি জীবন ছিল, তা লক্ষ্য করি কেউ আর মনে করে না। কেউ তো একটি চিঠিও ভুল করে লেখেনা, দেশের কেউ! পুরস্কারের টাকা, বইয়ের রয়্যালটির টাকা -- এত সব টাকা নিয়ে আমি কোন স্বর্গে যাবো! স্বর্গে আমি আর বিশ্বাস করি না। অভিমানে আমার কণ্ঠ দিন রাত বুজে থাকে।

স্টর্কভিংকেলের বাড়িতেই আমার মতো জার্মান সরকারের টাকায় চলা শিল্পী সাহিত্যিকদের সুবিধের জন্য যে সংগঠন ডেআআডে, তার আমন্ত্রণে আমারই মতো এক বছরের জন্য আসা স্টিভ লেসি আর ইরেন এবির সঙ্গে সহসা পরিচয়। তাঁরা যখন শুনেছেন আমি এখানে এই বাড়ির সবচেয়ে ওপরতলায় বাস করি, ছুটে এসে আমন্ত্রণ জানালেন থিয়েটারে, যেখানে জ্যাজ সঙ্গীত হচ্ছে। সেই জ্যাজ শুনতে গিয়ে দেখি ইরেন গাইছে আমার শুভ বিবাহ কবিতাটির অনুবাদ হ্যাপি ম্যারেজ, স্টিভ বাজাচ্ছেন সপ্রানো স্যাক্সোফোন। নিজের লেখা কবিতা কবে গান হল! স্টিভ আর ইরেন জানালেন, অনেকদিন

থেকেই তাঁরা আমার শুভবিবাহ কবিতাটি গাইছেন। গান শুনি, কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমাকে তেমন করে স্পর্শ করে না, না সুর, না কথা। স্টিভের সাক্ষাৎকারে পড়েছি, নিউ ইয়র্কার ম্যাগাজিনে হ্যাপি ম্যারেজ কবিতাটি পড়েই তিনি মুগ্ধ হন এবং তিনি এবং ইরেন সিদ্ধান্ত নেন এটিকে গানে রূপ দেওয়ার। তারপর তো একের পর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়ে যেতে লাগলেন স্টিভ লেসি। আমার আরও আরও কবিতায় সুর দিতে লাগলেন *ম্যাকআর্থার জিনিয়াস পুরস্কার* পাওয়া স্টিভ লেসি, জ্যাজ সঙ্গীতের প্রাণপুরুষ থেলোনিয়াস মংকের সঙ্গে বাজিয়েছেন যে স্টিভ। ১৮৮০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে রাশিয়া ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেওয়া সেই বিশাল ইহুদি দলের একজন ছিলেন স্টিভের পূর্ব পুরুষ। সাহিত্য সাংস্কৃতিক জগতের একটি বড় অংশ এই গোত্রের।

স্টিভ লেসি আমাকে নাগালে পেয়ে এত বেশি উৎসাহী হয়ে উঠলেন যে আরও কবিতা চাইলেন। নিউইয়ক থেকে বের হওয়া আমার কবিতার বই দ্য গেইম ইন রিভার্স বইটি দিই স্টিভকে। বইয়ের অনেকগুলো কবিতাতে স্টিভ সুর দিলেন। ইরেন গাইল সব। স্টিভ সত্যি সত্যি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন। স্বপ্ন আমার সব কবিতা নিয়ে জ্যাজ সঙ্গীত করা। স্রষ্টা সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন। রাতারাতি বানিয়ে ফেললেন একটি দল। জগতের অনেক বাদকই তাঁর চেনা। বিভিন্ন দেশ থেকে সঙ্গীতজ্ঞ যোগাড় করলেন। আমন্ত্রণ জানালেন সবাইকে। হার্পসিকর্ড বাজাবে সুইৎজারল্যাণ্ডের পেটিয়া, স্যাক্সোফোন জার্মানির টিনা, অ্যাকোর্ডিয়ান ক্যাথারিন, এও জার্মানির, বাস গিটার ফ্রান্সের জঁ জ্যাক, ড্রাম বাজাবে ব্রাজিলের পাওলো, ছবি আঁকবে ফ্রান্সের ওয়াণ্ডা, পোশাক বানাবে নরওয়ের ডিজাইনার পিয়া। স্টিভ বাজাবেন সপ্রানো স্যাক্সোফোন, ইরেন গাইবে গান। বার্লিনের নামী হেভেল থিয়েটারে হবে প্রথম অনুষ্ঠান। মহড়া শুরু হল অনুষ্ঠানের। প্রতিদিন মহড়া। শিল্পীরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে গেলেন বার্লিনে। স্টিভ তাঁর এই দলের নাম দিলেন জ্যাম অপেরা। এই গাঁথাটির নাম *দ্য ক্রাই।* খরচপাতি সব ডেআআডের। জার্মান সরকারের।

জনাকীর্ণ হেভেল থিয়েটারে হল অনুষ্ঠান। আমার জন্যও পোশাক তৈরি হয়েছে। আমাকেও সবার সঙ্গে মঞ্চে বসতে বল, কবিতা পড়তে হল। তিন সন্ধে হল একই অনুষ্ঠান। কেবল জার্মানিতেই নয়, ইওরোপের বিভিন্ন দেশের বড় বড় মঞ্চে দ্য ক্রাই অনুষ্ঠিত হল। ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, ফিনল্যান্ড, দ্য নেদারল্যাণ্ডস, যুক্তরাষ্ট্র। আমি ভেনিস অবদি গিয়ে বলে দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করো, তোমরা নিজেরাই যথেষ্ট। সকলে হতবাক। সকলের আমাকে দরকার। বলে, আমি নাকি তারকা। আমার কবিতা বলেই টিকিট কিনে কিনে লোক আসে। বলে দিয়েছি মূলত ব্যাপারটি সঙ্গীত, এখানে আমার উপস্থিত থাকার কোনও অর্থ হয় না। অর্থ হয় না বলেছি বলেছি, পুরো দল আমাকে নেবার শত চেষ্টা করেও পারে না এক বিন্দু টলাতে। আমাকে, আমি নিজেই বুঝি, বড় অসহিষ্ণু মনে হচ্ছে। অর্থহীন উপস্থিতি একটি কারণ বটে। আরেকটি বড় কারণ জ্যাজ সঙ্গীত আমাকে স্পর্শ করে না। ইরেন যখন জানতে চাইল কেমন হচ্ছে গান, আমি সোজাসুজি বলে দিলাম, *তোমাদের সুর আমাকে স্পর্শ করছে না।* একেকজনের বুকে যেন পাথর ছুঁড়ে মারলাম। বিখ্যাত জ্যাজ সঙ্গীতজ্ঞ স্টিভ। ট্র্যাডিশনাল জ্যাজের একমাত্র জীবিত মাস্টার। তাঁর জ্যাজ সুরের মুর্চ্ছণা শুনতে পশ্চিমে মানুষ পাগল। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার কবিতাগুলি ভালো লাগবে ভারতীয় সুরে। শুভ বিবাহ কবিতাটির সঙ্গে বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই আর হরিপ্রসাদের বাঁশি। এর চেয়ে ভালো আর অন্য কিছু হতে পারে না।

পাথর খেয়ে সবচেয়ে বেশি ভেঙে পড়ে ইরেন। ইরেনের জীবনে এটিই সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। বাজাতো বেহালা। কণ্ঠে সুর আছে। সেই সুর নিয়ে যা কিছু করেছে, ছোটখাটোই করেছে। অত বড় করে অত বড় থিয়েটারে, অত বড় বিজ্ঞাপনে, অত বড় অনুষ্ঠানে প্রধান কণ্ঠশিল্পী সে আর হয়নি। তার দরকার ছিল আমার সমর্থন। এমনিতে বন্ধুত্ব আমার জমে উঠেছিল ইরেনের সঙ্গে। চমৎকার মেয়ে। কথা বলে মুগ্ধ করে রাখতে পারে বেলার পর বেলা। ধারালো কথা। সত্যি কথা। অপ্রিয় কথা। রসালো কথা। কিন্তু মাঝে মাঝে আবার

তীব্র হতাশার ঘোলা কাদা জলে তলিয়ে যায় এই ইরেনই। এরা ষাট দশকের মাদকাসক্ত শিল্পী। শিল্পকে ভালোবেসে ধনদৌলত ফেলে রাস্তায় বের হয়ে যাওয়া জেনারেশন। কোনও কিছু এরা কম দেখেনি। স্টিভ অত্যন্ত অমায়িক ভদ্রলোক। অসম্ভব কর্মঠ। মাসে সপ্রানো বাজানোর দশ বারোটি আমন্ত্রণ পান নানান দেশ থেকে। এই স্টিভকে এখনও প্রতিদিনই গাঁজা খেতে হয়। এই এক গাঁজাকে যে কত নামে ডাকা হয়, গ্রাস, জয়েন্ট, পট, ব্লান্ট, হার্ব, হাশিশ। জ্যাজ সঙ্গীতজ্ঞরা সেবনের কারণে পশ্চিমে বিশেষ করে আমেরিকায় বিশ তিরিশের দশকে গাঁজার খুব *নাম* হল। এরপর ষাটের দশকে হিপি আর লেখক শিল্পীরা তুলল গাঁজাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ।

হেঁয়ালি আমি। তা ঠিক। কিছুকে কিছু মনে হয় না। এড়িয়ে যাই। পেরিয়ে যাই। কোথায় যাই জানি না। এই জ্যাজ সুরের অপেরা আমার কাপ অব টি নয়। সুতরাং তোমরা যারা করছো, করো। আমি বাধা দিচ্ছি না। আমি অফ। আমি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীরে ডুবে গেলাম। আমস্টারডামের রাস্তায় একবার বাঁশি বাজাচ্ছিল এক লোক। গাড়ি থামিয়ে দৌড়ে যাই বাঁশি বাদকের কাছে। জিজ্ঞেস করি, *হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার নাম শুনেছেন?* ওলন্দাজ লোকটি হা হা করে বলল, *নিশ্চয়ই শুনেছি, এমনকী আমার কাছে তার একটি সিডিও আছে।* শুনে এত আপ্লুত হই যে একটি অচেনা লোক, তার সঙ্গে বাঁশি নিয়ে আমি ঘন্টা দুই কথা বলি। বসে তার বাঁশি শুনি। দেশীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর আমি এত গভীর করে ভালোবাসিনি, যখন দেশে ছিলাম। পরবাস আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, এই সুর তার অন্যতম। যখন একা, গুমরে কাঁদি খালি ঘরে, বিষাদে বিভুঁইএ, তবু কী এমন কাঁদি আর, আমার চেয়ে দ্বিগুণ কাঁদে হরিপ্রসাদের বাঁশি।

এত আমাকে নিয়ে হৈ চৈ। এত মাথায় তোলা। সাদা মানুষের সঙ্গে জীবনযাপন। তারপরও হঠাৎ হঠাৎ পথে ঘাটে কোনও বাদামি মুখ দেখলে ফিরে তাকাই। আমি নিজেও যে বাদামি তা ভুলে গিয়েই কি তাকাই, নাকি তাকাই জানি বলে যে সে আমারই মতো বাদামি! অথবা সাদা বাদামি কালো হলুদ এসব গায়ের রঙের উর্ধে উঠে গেছি আমি। অনেকটা পাখির

চোখে পৃথিবীর রঙ দেখি, মানুষের রঙও। তবে এ ঠিক, চারদিক যখন সাদায় ছাওয়া, তখন বাদামিকে চোখে পড়ে। ল্যাটিন আমেরিকার বাদামি, মধ্যপ্রাচ্যের বাদামি, ইওরোপ আমেরিকার কালোয় সাদায় মেশা বাদামি, চিনে বাদামি, আর উপমহাদেশিয় বাদামি। ভারতীয় উপমহাদেশের বাদামিতে চোখ আটকে থাকে। দেশি মানুষ বলে মনে হয়। এই *দেশি মানুষ* কেউ ভারতের, কেউ পাকিস্তানের, কেউ নেপালের, শ্রীলংকার, কেউ বাংলাদেশের। খুব ইচ্ছে হয় মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু না, নিয়ম নেই কথা বলার। তুমি জানো না কী আছে ওদের মনে, এড়িয়ে চলাই ভালো। *আমার জন্য যদি নিরাপদ কিছু হয়, তবে তা সাদা মানুষ। কালো নয়, বাদামি নয়।* এই হল নিরাপত্তা রক্ষীদের বিশ্বাস। ধীরে ধীরে আমার ভিতরেও ওই বিশ্বাসটি সংক্রামিত হয়েছিল। বহুকাল কালো বাদামিদের দিকে ফিরে তাকাইনি। চোখ পড়লে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়া হত। তড়িঘড়ি নিস্ক্রান্ত হতাম অন্য কোথাও। দেশে থাকাকালীন পাকিস্তান ভারত শ্রীলংকাকে আলাদা আলাদা দেশ বলে মনে হত। এখন ওসব দেশকে নিজের দেশ বলে মনে হয়, ওসব দেশের মানুষকে নিজের দেশের মানুষ বলে মনে হয়, আত্মীয় বলে মনে হয়।

বার্লিনে আমার সঙ্গে দেখা করতে দাদা আসে, ছোটদা আসে। দাদা ছোটদাদের পেয়ে প্রাণ পাই। ওরা যখন ফিরে যায় দেশে, আমার অনেক জিনিসপত্রই আমি ওদের সঙ্গে দিয়ে দিই। যেন কাল পরশুই আমি ফিরছি দেশে। এসব জিনিসের দরকার নেই বিদেশ বিঁভুইএ, সব দেশেই থাকুক, আমার শান্তিনগরের বাড়িতেই থাকুক সব। নিজের বাড়িতেই নিজের জিনিস থাকা ভালো। ফিরছিই তো দেশে আমি। আমি তো ফিরছিই।

ভূমধ্যসাগরের তীরে

১.

কার নাম আগে নেব? পিকাসো না কলম্বাস? কলম্বাস নিয়ে তর্ক আছে অবশ্য। অনেকে দাবি করে কলম্বাস ইতালির। কেউ বলে কলম্বাস স্প্যানিশ ছিল। বার্সেলোনায় ভূমধ্যসাগরের

তীরে, যেখানে কলম্বাসের মূর্তি, তার নিচে দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্ন জেগেছিল প্রথমেই যে, ডান হাত তুলে কিছু একটা দেখাচ্ছে কলম্বাস, তার আসলে দেখাবার কথা আমেরিকা, কিন্তু সে দেখাচ্ছে একেবারে আমেরিকার উল্টোদিক, ইতালি। তবে কি কলম্বাস বলছে আমাকে স্পেনের রাস্তায় রেখেছো কেন, ওই তো ইতালি আমার দেশ। আসলে মূর্তিটি স্পেনের অপরপ্রান্তে অতলান্তিকের তীরে রাখা উচিত ছিল, কলম্বাস তো আর ভূমধ্যসাগরপথে আমেরিকা আবিস্কার(!) করেনি। তবে ইতালিয়রা যতই কলম্বাসকে নিজের বলে দাবি করুক, আমার মনে হয় কলম্বাস স্প্যানিশই ছিল। তা যাক, পিকাসোকে নিয়ে কিন্তু কোনও তর্ক নেই যে আদৌ সে স্প্যানিশ ছিল কী না। খোদ ম্যালাগায় তার জন্ম। বারসেলোনায় পিকাসোর বাবা মা চলে আসে ছেলের যখন চৌদ্দ বছর বয়স। তার আগেই, বারো তেরো বছর বয়সেই ল্যান্ডস্কেপে হাত পাকানো হয়ে গেছে পিকাসোর। বাবা ছিলেন শিল্পকলার শিক্ষক। সেদিক দিয়ে সুবিধেই ছিল। পিকাসো যখন মায়ের ছবি আঁকছে, মায়ের শরীরের ফিনফিনে সাদা পোশাকের ছবি, সেই বয়সে, তখন কত সন --আঠারোশ বিরানব্বই, তখন ট্রান্সপারেন্সি এত চমৎকার ফুটেছে কী না কারও ছবিতে আমার জানা নেই। বারসেলোনার বাড়ির ছাদে বসে ওই পুচকে ছেলে ভূমধ্যসাগরের চেয়ে বেশি এঁকেছে নাগরিক জীবনের ছবি। প্রথম দিকে ছবির রং,ঢং সবই স্পষ্ট বোঝা যায়, ছিল অ্যাকাডেমিক ----যিশু মেরির ছবি, সাদা আর লাল রঙের বাড়াবাড়ি ব্যবহার, সেন্টারে অবজেক্ট বসানো। অবশ্য পরে এসব পাল্টে যায়। ল্যান্ডস্কেপেও গ্রাম আর পাহাড় চলে আসে। নীল আর গোলাপি সময়ের কিছু ছবি, কিউবিজমের চর্চা, আর চশমাচোখের বন্ধু সেবেরেটেসের মুখ বারবার, বারসেলোনার এই মিউজিয়মে। আমার জন্য মিউজিয়ম স্পেশাল করা হয়েছিল, তার মানে নো পাবলিক। আমি একা দেখব মিউজিয়ম। সঙ্গে থাকবে মিউজিয়মের ডিরেক্টর আর আমার নিরাপত্তারক্ষী। এসব অবশ্য বাড়াবাড়ি। আমাকে নিয়ে ইওরোপের বাড়াবাড়িগুলো এখন অসহ্য লাগে। প্যারিসের লুভর এ যদি প্রাইভেট ভিজিট হয়, তবে বারসেলোনার পিকাসো মিউজিয়াম তো নস্যি। যাই হোক, সাফ কথা আমি বলে দিয়েছি ওদের, যে, বাবা আমি অতি সাধারণ মানুষ,

আমি মানুষের মতো দুপায়ে হাঁটতে চাই রাস্তায়, আমার অত সামনে পেছনে প্রহরী দরকার নেই। কেউ আমাকে এখানে খুন করবে না, খুন যারা করবে তারা ঢাকায় বসে চিল্লাচ্ছে। ওরা, মানে আয়োজকরা রাস্তায় ঘোরার ব্যবস্থা করেছিল ঠিকই, তবে প্রহরী সরায়নি। লা রাম্বলাতে মহা সুখে হাঁটলাম। আগে, অনেক আগে এখানে নদী ছিল, এখন একটি দীর্ঘ পথ সমুদ্র বরাবর-- মধ্যিখানে প্রশস্ত পথ হাঁটার, দুপাশে সরু সরু গাড়ি চলার। শহরে দুটো লা রাম্বলা। একটি ফুল আর পাখির দোকানে ভরা। আরেকটিতে দোকান নেই, কিন্তু মানুষের ঢল মধ্যরাত অবদি। অনেকটা আমস্টারডামের রাস্তার মতো। মানুষ গিজগিজ করছে আর গানের দল বসে গেছে গান গাইতে টুপি বা বাসন ফেলে, এর মানে পয়সা দাও। অদ্ভুত ওই জ্যান্ত মূর্তিগুলো, দঁড়িয়ে থাকে নো নড়নচড়ন, কারও কারও পায়ের কাছে ক্যাসেটে গানও বাজে। লারাম্বলায় আগপাশতলা সাদা রঙে ঢাকা একটিকে পাথরের মূর্তি বলে ভুল করেছি। পাককা দশমিনিট পলকহীন পর্যবেক্ষণের পর বুঝেছি এ জ্যান্ত। বারসেলোনায় রাস্তায় মুগ্ধ হবার মতো একটি জিনিস আমি পেয়েছি, এ অবশ্য লারাম্বলায় নয়, একেবারে গভরমেন্ট হাউজের সামনে। তাঁবু খাটানো, পোস্টার ঝোলানো, ছেলে মেয়েরা কনকনে শীতে রাস্তায় অবস্থান ধর্মঘট করছে। কেন? না তারা নতুন বাজেট মানে না। কারণ এতে তৃতীয় বিশ্বকে সাহায্যের অংক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি মুহূর্তে অনুভব করলাম আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটি আনন্দ নেমে যাচ্ছে শরীরে, আর বুকের মধ্য থেকে একশ গোলাপের ঘ্রাণ ভেসে আসছে, এই পৃথিবীতে তবে মানুষ এখনও আছে, যে মানুষ মানুষের মঙ্গলের দাবিতে ঘরবাড়ি ফেলে তাঁবুতে জীবন কাটায়। এরা দরিদ্র দেশগুলোর জন্য এবারের সরকারি সাহায্য ০.৫ পারসেন্টকে বাড়িয়ে গতবছর যা ছিল, ০.৭ পারসেন্ট -- তাই করতে চায়।

উনিশে ডিসেম্বর রাতে গভরমেন্ট হাউজের সামনের স্প্যানিশ যুবকদের ধর্মঘট দেখার পর হাঁটতে হাঁটতে গথিক দেখা, বা ক্যাথিড্রাল দেখা কিছুতে মন তেমন ভরেনি। লোকে বলে বারসেলোনায় ক্যাথিড্রাল নাকি সাংঘাতিক কিছু। কিন্তু আমার কাছে স্ট্রাসবুর্গের ক্যাথিড্রালকেই মনে হয়েছে সবচেয়ে সবার থেকে অবাক করা। আর গাওদি, গাওদি নিয়ে

এখানে বেশরকম হইহই আছে। নামকরা স্থপতি ছিলেন গাওদি, ষাট বছর আগে গির্জার একটি কাজ ধরেছিলেন --সেটির কাজ এখনও চলছে, লোকে এখনও মাটি খুঁড়ছে, যন্ত্র ঘুরছে ভোঁ ভোঁ করে। প্রথম দেখেই এই ভীষণ উঁচু মতো জিনিসটিকে আমি ভালোবাসতে পারিনি, সেটি গির্জা বলে নয়, একসময় ধর্মের দালানকোঠা দেখার বিষয়ে কোনও উৎসাহ ছিল না আমার, এখন পুরোনো স্থাপত্য দেখায় আগ্রহ বাড়ছে। তাই বলে নতুন করে কোনও গির্জা গড়ার কোনও কারণ দেখি না। গাওদি বলেই যে গির্জাখানার নির্মাণ পুরো করতে হবে অথবা জাপানি ট্যুরিস্টরা এসে ক্লিক ক্লিক করে ছবি তোলে বলে, এ কোনও কথা নয়। গাওদি একটি কাজ করেছিলেন নতুন, গির্জার গায়ে গরু ঘোড়া সাপ মাছ শামুক হাস মুরগি সব সেঁটেছেন, কেবল যে ক্রুশ বিদ্ধ যিশু আর মাতা মেরি দাঁড়িয়ে থাকবে নিস্পাপ মুখে তা তিনি মানেননি। বেঢপ গির্জাটির চেয়ে গাওদির করা বাড়িঘরের ডিজাইন বরং আমাকে মুগ্ধ করেছে। গাওদির এই গির্জাটির সম্পূর্ণ পাবলিকের পয়সায় হচ্ছে, পাবলিক এই স্থাপত্যকে সরকার বা সংস্থার হাতে দেবে না কিছুতেই। পৃথিবীর সর্বত্র আবেগপ্রবণ মানুষের দেখা মেলে, স্প্যানিশ পাবলিক মনে হয় কিছুটা স্পেশাল, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের কাজকে রীতিমত নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিল। গাওদির কাজ আামি দেখেছি দিনের বেলা, কুড়ি তারিখ বিকেলে, সকাল আর দুপুর নানা আয়োজনে অনুষ্ঠানে সভায় বক্তৃতায় কাটিয়ে, পরে। মাদ্রিদ থেকে চলে এসেছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী, চমৎকার মহিলা, জনপ্রিয়ও খুব। বইয়ে সই করিয়ে নিলেন। গালে গাল লাগিয়ে ছবি তুললেন, প্রেস কনফারেন্সে আমাকে সমর্থনের কথা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন। আরও অনেকেই প্রকাশক, সম্পাদক, লেখক আমার বই নিয়ে আলোচনা করলেন, পাঠও করলেন একজন, সিলভিয়া কুরেনি লজ্জার একটি অংশ বার করে বললেন, *বিশেষ করে আমি মুগ্ধ হয়েছি এতে যে সুরঞ্জন বলছে আমি একজন মানুষ ছিলাম, মুসলিম মৌলবাদীরা আমাকে মানুষ থাকতে দিল না, হিন্দু বানিয়ে ছাড়লো।* সিলভিয়ার জন্ম ইতালিতে, কুড়ি বছর আগে বারসেলোনায় এসেছেন, অবশ্যই প্রেমের কারণে, যদিও প্রেম শেষ অবদি টেকেনি, থেকে গেছেন বারসেলোনাকে ভালোবেসে, কাজ করেন *এডিশন বি*

প্রকাশনীতে। বারসেলোনাকে আসলে ভালোবাসার মতো একটি শহর, টগবগ করছে যৌবন। মধ্যরাতেও রেস্তোরাঁগুলোয় দিনের মতো আলো আর জমাট আড্ডা। লন্ডন বা প্যারিস শহরের মতো অমন বড়সড় ব্যাপার নয়, কিছুটা সামুদ্রিক, কিছুটা ঝাল মেশানো -- টিপিক্যাল ক্যাটালান খাবার হচ্ছে মশলা মাখানো ভাত মাছ। ভাত যদিও মোটা চালের খেতে আমাদের বিরুই চালের ভাতের স্বাদ নয়, তবু তো ভাত, ভাত খেয়েছি ভূমধ্যসাগরের ওপর বানানো টিকট্যাকটো রেস্তোরাঁয়। নতুন রেস্তোরাঁ। নতুন একটি শহর গড়ে তুলেছেন বারসেলোনার মেয়র পাসকুয়াল ম্যারাগেল দু বছর আগে, অলিম্পিকের সময়। নতুন বাড়িঘর, হোটেল, রেস্তোরাঁ। সামারে শুনেছি রেস্তোরাঁগুলোয় বসার জায়গা পাওয়া যায় না, এত ভিড়, নরডিক দেশগুলো থেকে বরফে ডোবা মানুষগুলো চলে যায় স্পেনে রোদ পোহাতে। রোদ আমারও পোহাতে ইচ্ছে করে, অবশ্য একা নয়, সঙ্গে তাকে নিয়ে, তাকে তো ইওরোপে আসার পর হারিয়েছি, হারানোর বেদনাকে অবশ্য হারাতে পারিনি, সে থাকে বুকের যে হাড় আছে, তার তলায় লুকিয়ে, মাঝে মধ্যেই। সিগাল উড়ছে সামনে, আর খাচ্ছি অক্টোপাস, ক্যালামার, মংফিস ইত্যাদি ইত্যাদি নানারকম মাছ, বারসেলোনা আসলে মাছের শহর, সঙ্গে কিছু হৃদয়বান মানুষ, গল্প করতে করতে, আমি তখন আসলে ভাবছিলাম আবার আসবো আমি বারসেলোনায়, লা রাম্বলায় হাঁটতে, সমুদ্রতীরে রোদ পোহাতে। আবার আসবো আমি..। আসলে যেখানেই যাই যে কোনও দেশে বা শহরে, মনে মনে বলি আবার আসবো, আবার কী আর আসা হয়!

একদিন ক্যাটালুনিয়ার কালচারাল মিনিস্টার দেখা করলেন। মেয়র আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে সিটি হলে। আমাকে সামারে যেতে বললেন আবার বারসেলোনায়। বললেন, তুমি যদি সামারে আসো, তবে আমি তোমাদের দেশে বেড়াতে যাবো একদিন। লোকটি রোমান্টিক বটে। আমাকে নাকি পেরুভিয়ান লাগে দেখতে। মন্তব্যটি লন্ডনেও শুনেছি। ইংরেজ বন্ধুরা বলে। পেরুভিয়ান? বাদামি হ্যাটটি পরে যখন কোথাও বেরোই, নিজেকেই জিজ্ঞেস করি, কী হে পেরুভিয়ান, কেমন আছো, মনে মনে একচোট হেসে নিই, কোথায় ময়মনসিংহ আর কোথায়

পেরু। জগতটি ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছে। বারসেলোনার মেয়র সোশালিস্ট পার্টির, বেশ জনপ্রিয় এখানে। মেয়র তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। ভাস্কর গারগুয়ালের মেয়েকেও ডেকেছিলেন বাড়িতে। ও এসেছে ফ্রান্স থেকে। গারগুয়ালের কাজ মুগ্ধ করার মতো। বিশেষ করে ব্রোঞ্জ আর কপারে করা নারীর মুখ। গারগুয়াল মারা গেছেন উনিশশ ছত্রিশে। শেষ দিকে তিনি মূর্তির শরীর থেকে গালটুকু বুকটুকু পেটটুকু কেটে বাদ দিতেন। শূন্যতাকে তিনি তাঁর কাজে এমন পুরে দিয়েছিলেন যে মনে হল এই শূন্যতাই তাঁর কাজকে পূর্ণ করেছে বেশি। সিটি হলে তাঁর শেষজীবনের একটি ভাস্কর্য রাখা। গ্রীক পুরানের জিউস ছুটছে ঘোড়ায়, সমুদ্র পথে। ব্রোঞ্জের কাজ। ঘোড়াটির পেট খালি। প্রথমেই চোখ চলে যায় শূন্যতার দিকে। গারগুয়ালের নারীমূর্তিগুলোর উরু খুব মোটা মোটা। মোটো উরুর অর্থ কী হতে পারে! ব্যপারটি কী হতে পারে? মেয়ে বলল, আমার বাবা মেয়েমানুষের প্রতি খুব আসক্ত ছিল। তা ছিল। কিন্তু উরু কেন এমন হঠাৎ গাছের গুঁড়ির মতো মোটা হয়ে উঠলো। বাকি শরীরের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন! নারীকে কর্মঠ এবং শক্তিমান বোঝানোর জন্য? হবে হয়তো। অসলোয় গুস্তাভ ভিগিল্যানের কাজ অনেকটা এমন। স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবতীদের ছড়াছড়ি। পুরো একটি বাগানই তা নিয়ে।

বারসেলোনায় সবচেয়ে ভালো লাগার ব্যাপার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান। প্রথম তেমন গুরুত্ব দিইনি। পরে দেখি এলাহি কাণ্ড। সেদিন ক্রিসমাসের ছুটি হয়ে গেছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা কেউ ক্যাম্পাস ছাড়েনি তসলিমাকে শুনবে বলে। প্রফেসাররা অপেক্ষা করছিলেন। ছাত্রছাত্রীতে কানায় কানায় পূর্ণ অডিটোরিয়াম। বসার জায়গা নেই। দাঁড়িয়ে ছিল মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা। আমার লেখালেখি নিয়ে আলোচনা করলেন চারজন প্রফেসর। এরপর আমার পালা। সামান্য কিছু বললাম। অনুবাদ বিভাগের প্রধান ইংরেজ ভদ্রলোক আমার বক্তব্য ক্যাটালান ভাষায় অনুবাদ করছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের কিছু প্রশ্নের উত্তরও দিতে হল। এরপর এল অটোগ্রাফের ধুম। ইতিমধ্যেই হাতে হাতে আমার স্প্যানিশ লজ্জা। আমার ভিড় থেকে একরকম টেনেই বার

করে নিলেন প্রফেসররা। সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টার ওয়েলকাল তসলিমা। ভূমধ্যসাগরের তীরেও ময়মনসিংহের বাঙাল মেয়েটিকে নিয়ে হৈ চৈ। পৃথিবী কি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে!

স্প্যানিশরা ইংরেজ জানে খুবই কম। সিকিউরিটি পুলিশরা এক অক্ষরও ইংরেজি জানে না। তিন গাড়ি সিকিউরিটি ছিল, বিশাল হোটেলে সিক্রেট রুম ছিল, ঝকঝকে, আস্ত একটি বাড়ি যেন। রুমের সামনে চব্বিশ ঘন্টা নিরাপত্তা প্রহরী। দেখে মায়াই হয় ওদের জন্য। স্পেনে কে আসবে আমাকে মারার জন্য? প্রথম দিন স্পেনের জাতীয় টেলিভিশনে দীর্ঘ যে লাইভ অনুষ্ঠানটি করেছিল, বারসেলোনায় বসে সরাসরি মাদ্রিদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়েছিল আমাকে, সেই অনুষ্ঠানে আমার বক্তব্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। গ্রানাডার ইসলামিক ইউনিভার্সিটির রেক্টর আর স্প্যানিশ বুদ্ধিজীবিরা ছিলেন, ন্যাড়ামাথা মুসলমান আবদুর রহিম মেদিনা বেশ চিৎকার করে ঘোষণা করলেন, মুসলিম ফান্ডামেন্টালিজম বলে জগতে কিছু নেই, সবই ওয়েস্টের বানানো ব্যাপার। সবই কলোনিয়াল ধারণা। গ্রানাডায় প্রচুর মুসলমানের বাস। আমার সন্ধান তারা পেলেও মেরে ফেলার মতো কাজটি করবে কী না আমার জানা নেই।

ক্যাটালান পেন ক্লাব আমাকে ডিনারে ডাকলো একদিন। ক্যাটালান লেখকদের সঙ্গে এক চমৎকার রাত কাটলো। স্ক্যানডিনেভিয়ায় রাতের খাবার খেয়ে নেয় বিকেল পাঁচটায় আর লাঞ্চ এগারোটা বারোটায়। স্পেনে গরম দেশের মতো রাতের খাবার রাতেই খায়। স্পেন আমার কাছে অনেকটা দেশ দেশ লাগে তাই। মানুষগুলোও বেশ আন্তরিক, আমুদে। বারসেলোনায় চেনা গাছপালা, বিশেষ করে খেঁজুর গাছ আর ফনিমনশা দেখে মন ভরে উঠলো, কতদিন দেশের বৃক্ষ দেখা হয় না আমার। চলে আসার আগের দিন রাত দেড়টা অবদি রেস্তোরাঁয় আড্ডা চললো। আমার স্প্যানিশ অনুবাদক দেখতে ধুমসে মতো। বিয়ে করেছে আফ্রিকার মেয়েকে। আমাকে সামারে তার বাড়িতে ওঠার আমন্ত্রণ জানিয়ে বললো, এশিয়া আফ্রিকা আর ইওরোপের তখন মহামিলন হবে। সামারে এসো, নো পুলিশ, নো হোটেল, নো ইন্টারভিউ, নো লেকচার ---- চমৎকার *মানুষের মতো* জীবন কাটাবে, কী বল?

আসলেই মানুষের মতো জীবন আমার কাটানো হয় না অনেকদিন। ইওরোপে এসেছি সেই আগস্টে। সাধারণ মানুষের মতো হাঁটাচলা আমার হয় না। সবসময় রাজা করে রাখা হয়। আমাকে আসলে আমি তো নিতান্তই এক নিরীহ প্রজা। আমি তো ডালভাতের মানুষ। শীতকালে ধনেপাতা দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল রাঁধার আবদার করতাম মায়ের কাছে। আমি তো এখনও সেরকমই আছি। মায়ের মুখটি আজকাল বলে মনে ভাসে। পিকাসো তার মায়ের একটি ছবি একেঁছিলেন সেই বালক বয়সে। পিকাসোর ছবির তলায় তখন সই থাকতো, পাবলো রুইজ পিকাসো। পিকাসো তার মায়ের পদবী। পিকাসো বারসেলোনায় ছিলেন ১৮৯৫ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত। আমার বয়স তখনকার পিকাসোর চেয়ে অনেক বেশি। পিকাসোর মতো আমিও মুগ্ধ হই নিসর্গের সৌন্দর্যে। আমারও পিপাসা মেটে না। পিকাসোর মতো রঙ তুলি নিয়ে আমার বসা হয় না, কিন্তু আমার হৃদয়ে যে ক্যানভাসটি আছে তাতে চোখের কালো রঙ এঁকে যায় জীবন ও জগতের অনেক ছবি।

২.

*কোথায় যাচ্ছ?

সিসিলি।

সিসিলি? সিসিলি কেন?

প্রশ্নে এত বিস্ময় থাকে যে আমিও ভড়কে যাই। জগতে কি যাবার জায়গার অভাব পড়েছে? ব্যাপারটি এমন। ইতালিতে যে বেড়াতে যাচ্ছ, তা রোম ফ্লোরেন্স ভেনিস না গিয়ে সিসিলি যাবে প্রথম, এমন বোধহয় কেউ ধারণা করতে পারে না। তবে বলে আশ্বস্ত করি ওদের, যে, না বাপু সিসিলি থেকেই ফিরে আসছি তা নয়, দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকেও যাচ্ছি মানে ওই লেজ বেয়ে মাথায় গিয়ে ওঠার মতো। *ধ্যাত কোনও সভ্য লোক ওখানে যায়? ওই মাফিয়ার*

দেশে! বন্ধুরা আমার যাবার দিন সকালেও ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছে, *এইরে আসলেই যাচ্ছিস নাকি?*

আসলে না তো কি নকলে?

আলিটালিয়া উড়োজাহাজটি পালেরমো বন্দরে ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো আছাড় খেয়ে পড়ে। হুড়মুড় করে নামতে থাকে যাত্রীরা, পোশাক যেন তেন, মাথার চুল মিশমিশে কালো, বাদামি গায়ের রং, হঠাৎ মনে হয় বুঝি দক্ষিণ এশিয়ার কোনও দেশে নামছি। বড় আপন আপন লাগে। দীর্ঘদিন সোনালি চুল আর সাদা চামড়া দেখতে দেখতে চোখেরও ক্লান্তি ধরে গেছে। হাঁটছি, হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় দুটো ছোকড়া। একজনের মাথার চুল পেছনে দিকে আঁচড়ানো, পরনে জিনসের রংজ্বলা জ্যাকেট, আরেকজনের গায়ে আধময়লা টিসার্ট, তাও আবার ঘাড়ের দিকে ছেঁড়া। বুকের ভেতর দুরুম করে শব্দ হয়, ভরা একটি কলস যেন উপুড় হয়ে পড়ে। মাফিয়ার লোক নয় তো এরা! এমন ত্যাড়া চোখেই বা তাকাচ্ছে কেন? ছোকড়াদুটো ইতালিয় ভাষায় কিছু একটা বলে আমাকে। কে জানে কী বলে! আমি মুহূর্ত না থেমে পাশ কাটিয়ে দ্রুত হেঁটে যাই মানুষের ভিড়ে, ভিড়ে হারিয়ে বুকের ধুকপুক অনেকখানি কাটিয়ে উঠি। একসময় আলগোছে পেছন ফিরে দেখি ঠিক আমার গা ঘেঁসে হাঁটছে ওরা। বিপদ বটে। আমি ডানে গেলে ওরাও ডানে যায়, বাঁয়ে গেলে বাঁয়ে। নিজেকে আড়াল করবার জন্য আমাকে প্রায় ছেলেবেলার লুকোচুরি খেলতে হয়। কিন্তু ও দুটো এতই সেয়ানা যে খপ করে বারবারই আমাকে ধরে ফেলে। মুশকিল আসান বলে একটি কথা আছে, সে সময় দুটো শান্তমতো মেয়ে আমার কাছে প্রায় দৌড়ে আসে, বলে *তোমাকে নিতে এসেছি, আমার নাম আনতোনেলা আর ওর..*

..নাম পরে হবে। আমার পেছনে দুটো বদমাশ লেগেছে, আগে ওদের ছাড়াও, ওরা কী চায় বলো তো! আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বলি।

মেয়েদুটো আঁতকে ওঠে। পেছনের ছোকড়াদুটোকে কিছু একটা বলে। আর সঙ্গে সঙ্গেই কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তল বার করে ছোকড়াদুটো ওই ভিড়ের বন্দরে সকলকে চমকে দিয়ে

কাউকে খুন করার জন্য এদিক ওদিক দৌড়োতে থাকে। বুঝে পাই না ঘটছে কী, মেয়েদুটোর গা প্রায় আঁকড়ে ধরে বলি, *দেখ দেখ এদের হাতে পিস্তলও আছে। এরা আমার পেছন পেছন সেই কখন থেকে....*

ওরা হেসে বলে, *এরা তো তোমাকে পাহারা দেবার পুলিশ।*

--পুলিশ? এরা পুলিশ?

আমার বিস্ময় কাটে না। এরা আবার পুলিশ হয় কী করে, একুশ বাইশ বছরের ছোকড়া, ভুস ভুস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে, হাতে পিস্তল নিয়ে দৌড়োচ্ছে। ইওরোপের পাহারা পুলিশ তো প্রায় একবছর ধরে দেখছি, কখনও এমন বেয়ারা বালক তো দেখিনি।

---*তা এরা পিস্তল বার করেছে কেন?* তখনও আমার উত্তেজনা যায়নি।

---ওই যে বললে দুটো বদমাশ লেগেছে। এরা খুঁজছে ওদের।

বাক্সপেটরা নেবার জন্য মাছের বাজারের ভিড়। তুমুল চিল্লাচিল্লি। সিগারেটের ফিল্টারে, মোচড়ানো কাগজে, থুতুতে বন্দরের মেঝে নোংরা হয়ে আছে। ভাগ্যিস পান বলে কিছু নেই ওদেশে, নয়তো পানের পিকেও লাল হয়ে থাকতো দেয়াল। ধুমপান নিষেধ সাইন আর ডাস্টবিন বলে কিছু নিরীহ জিনিস ঝুলে আছে, লোকে ওদিকে মোটেও ফিরে তাকায় না। ঘন্টা খানিক অপেক্ষা করার পর আমার সুটকেস এল। ভাগ্যিস এল। আমি তো প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। শ্রীলংকার কিছু লোক দেখলাম ওই মাছের বাজারে চিৎকার করছে। প্রচুর তামিল পালিয়ে এসেছে ইতালিতে শুনেছি, সিসিলির দিকেও আসছে। ওরা মাফিয়ায় ভিড়ছে না তো আবার! কারও কারও চেহারা দেখে রীতিমত আশংকা হয়। সুটকেস নিয়ে বাইরে বেরোতে যাবো, কাস্টমসের এক লোক আমার পথরোধ করে। আচমকা কোত্থেকে ছোকড়া পুলিশদুটো প্রায় উড়ে এসে আমাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়। পেছনে কাস্টমসের লোকটি খিস্তি শুরু করে। সব খিস্তিরই আলাদা সুর থাকে। ভিন্ন ভাষায় হলেও ঠিকই আন্দাজ করা যায়। পুলিশদুটো সার্ট উঁচু করে কোমরের বেল্টে ঝোলানো আইডি কার্ড দেখায় দূর থেকে, এ যেন লুঙ্গি তুলে নুন দেখানো। ছোটবেলায় দেখেছি বখাটে ছেলেরা মারামারি লাগলে ওই করে,

বিশেষ করে গায়ের জোরে যে জিততে না পারে তার গোপনাঙ্গই ভরসা। আমাকে ছোকড়াদুটোর গাড়িতে উঠতে হবে। কে জানে এরা আসলেই পুলিশের লোক নাকি মাফিয়ার। আনতোনেলাকে বলি, *ভাই তোমরাও চল আমার সঙ্গে। মরলে একসঙ্গেই মরি।*

মেয়েদুটো আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠতে গেলে ওরা তেড়ে আসে, না আমাকে ছাড়া আর কাউকে তারা গাড়িতে নেবে না। অগত্যা আলাদা গাড়ি করে আসতে হয় বেচারাদের। রাস্তায় অদ্ভুত কাণ্ড করে ছোকড়াদুটো। ট্রাফিক জ্যাম নেই, কিছু নেই, প্যাঁ পুঁ বাজিয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দুশ কিলোমিটার বেগে ধেয়ে যায়। আমি বলি, *তোমরা এভাবে উর্ধ্বশ্বাস ছুটছো কেন? আমার কোনও তাড়া নেই তো!*

কে শোনে কার কথা! ওরা এমনিতে এক অক্ষর ইংরেজি জানে না। আর জানলেও আমার কথায় কান দিত বলে মনে হয় না। গাড়ি ছোটে পাহাড়ের শরীর ঘেঁসে, গাছপালাঘেরা নিবিড় রাস্তা ধরে, গাড়ি ছোটে হোটেলে। আমার জন্য আগে থেকেই হোটেলের ঘর তৈরি হয়ে আছে। চাবি নিয়ে দোতলায় উঠি। পেছন পেছন আসে ছোকড়াদুটো। জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা মাফিয়ার অবস্থা কী রকম এখন বলো তো ? ইংরেজি বাক্যটি না বুঝতে পারলেও মাফিয়া শব্দটি ওরা বোঝে, বুঝে রহস্যময় হাসি হাসে। গড়গড় করে যা বলে, হাত পা নেড়ে যা বোঝাতে চায় কিছুই না বুঝে হেঁটে যাই আমার জন্য বরাদ্দ ঘরটির দিকে। ঘরে আমি ঢোকার আগে ছোকড়াদুটো ঢোকে। হাতে পিস্তল নিয়ে দেয়ালে পিঠ ঘেঁসে হাঁটে, যেন কোনও আততায়ী লুকিয়ে আছে ঘরে, ওদের কাণ্ড দেখে আমার হাসিও পায়, রাগও ধরে। ওরা বাথরুম বারান্দা বিছানার তল আলমারির ভেতর গলা বাড়িয়ে কে জানে কী খোঁজে। ওদের বের করে দরজার সিটকিনি লাগিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। মন ভালো হয়ে যায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভূমধ্যসাগরের দিকে যখন তাকাই। সমুদ্রের মধ্য থেকে পাহাড়গুলো এমন লকলকিয়ে বেড়ে উঠেছে যেন এই মেঘ ছোঁবে, চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সের কিশোররা যেমন হঠাৎ লম্বায় বাপ মাকেও ছাড়িয়ে যায় তেমন। অতল এবং অনন্ত কিছুর সামনে দাঁড়ালে কার না মন ভালো হয়! জল ছিটকে এসে একটি জবা ফুলকে ভিজিয়ে দিচ্ছে, পাথরের ফাঁক থেকে গজিয়ে ওঠা জবা,

দেখে আমি চমকে উঠি। কতকাল পর লাল জবার মুখ দেখলাম। এ যে আমার নানির বাড়ি ছাড়া আর কোথাও ফোটে আমার যেন জানাই ছিল না। হুড়মুড় করে স্মৃতি এসে ভিড় করে, আমরা ন্যাংটো বাচ্চারা পুকুরে জবা ফুল ছেড়ে ঢেউ ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাঝ পুকুরে ভাসিয়ে দিতাম। কোথায় শৈশব, কোথায় সেই নানিবাড়ির তাল পুকুর! ভূমধ্যসাগর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটির কাছ থেকে সব যেন বড় দূরে সরে গেছে, ইচ্ছে করলেও কিছু আর তেমন ছোঁয়া যায় না। বড় জোর হাত বাড়িয়ে চোখের জলটুকুই পারি ছুঁতে।

পুরো একঘন্টা পর মেয়েদুটো ফেরে। আনতোনেলা আর সাব্রিনা। সিসিলি কী এবং কেমন দেখতে এসব নিয়ে ওদের সঙ্গে দীর্ঘ একটি আড্ডা জমে ওঠে।

--ভূমধ্যসাগরে যত দ্বীপ আছে, সবচেয়ে বড় এই সিসিলি।

--তাই নাকি?

--হ্যাঁ দেখতে তিনকোনা বলে গ্রীক আমলে এর নাম ছিল ট্রাইনেকরিয়া।

--আগ্নেয়গিরি ভরা এই দ্বীপটি ভূমিকম্পেও ভুগেছে কম নয়। এই শতকেই দুদুবার ধ্বসে গেছে অনেকখানি।

--ভুগেছে ভিনদেশিদের শাসনে। গ্রীক, স্যারাসেন্স, রোমান, বাইজানটিন, নরম্যান.. তারপর ধরো স্প্যানিশ।

--স্প্যানিশরা কবছর ছিল?

--বিশ্বাস হয়তো করবে না, তিনশ বছরের বেশি।

--সেদিক থেকে আমরা কিছুটা ভাগ্যবান। ব্রিটিশ আমাকে দুশ বছর জ্বালিয়েছে। সিসিলিয়ান ভেসপার্স বলে একটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। ঘটনাটি কি বলো তো! আমি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ইভ সাঁ লরোঁর মেনথলে আগুন ধরাই। আনতোনেলা হেসে ওঠে। সাব্রিনাও। দুজনই হই হই করে বলতে শুরু করে। ঘটনাটি থার্টিন্থ সেনচুরির, সেইন্ট লুইএর ভাই সার্লস ওয়ান তখন পোপের আস্কারা পেয়ে সিসিলি শাসন করতে এসেছে। সিসিলিয়ানরা কিন্তু ওকে দুচোখে

দেখতে পেত না। সিসিলিয়ানরা, ফরাসিদের, যারা ইতালিয় ভাষা বলতে তোতলাতো, নাম দিয়েছিল *তার্তাগ্লিওনি*, মানে তোতলা। ইস্টারের পর এক সোমবার হঠাৎ গির্জার ঘন্টা বেজে ওঠে। কজন ফরাসি সান্তো স্পিরিতো গির্জায় পালেরমোর এক মেয়েকে অপমান করেছিল। সিসিলিয়ানরা এ ঘটনায় ক্ষেপে ফরাসিদের সেদিন একেবারে ম্যাসাকার করে ছাড়ে। *গভর্নরএর বাড়িও ঘেরাও করে।*

বাহ। সিসিলিয়ানরা বেশ সাহসী বটে।

নিশ্চয় নিশ্চয়। আনতোনেলা চিবুক উঁচু করে বলে।

আনতোনেলা আর সাব্রিনা বিছানায় বসে, কখনও কাত হয়ে, শুয়ে, সিসিলির ভালোমন্দের ব্যাখ্যা দেয়। ওদের চোখের তারায় খেলা করে সিসিলি নামের এই দ্বীপটির জন্য এক আশ্চর্য ভালোবাসা। আসলে সিসিলি ইতালির আত্মীয় হয়েও যেন কেউ নয়। যেন একলা একটি দুঃখিনি দেশ। আর আনতোনেলারা শান্ত অথচ উজ্জ্বল দুটো চোখে মুগ্ধ তাকিয়ে থাকি।

সাব্রিনা তাড়া লাগায় -- চল চল।

রাতের নিমন্ত্রণে যাবার সময় হয়ে গেছে। ক্ষিধে তেমন না লাগলেও সিসিলিয়ানদের বাড়ি ঘর কেমন জয়, আঙিনায় ফুল কেমন ফোটে তা দেখবার ইচ্ছেয় রওনা হই। লা মনডেলায় টুরিস্টদের ভিড়, ফুটপাতে নানা জিনিসপাতি নিয়ে বসে গেছে গরিব সিসিলিয়ানরা। সোনালি চুলের নারীপুরুষ কোমর জড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওইসব জিনিসের দিকে কী বড় একটা থামে। আমার তো মনে হয় না। ওরা আসে আসলে রঙ বদলাতে। আজকাল এক ফ্যাশন হয়েছে, গ্রীস্মকালে গায়ের রং তামাটে করা। একসময় গায়ের সাদা রং টিকিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত হত ইওরোপীয়রা, কারণ গরিব জেলে বা কৃষকদের রং ছিল তামাটে, যারা রোদে পুড়ে বাইরে কাজ করত। আর এখন গরমে গায়ের রং তামাটে হওয়া মানে খুব টাকাওয়ালা বলে গণ্য হওয়া। টাকা থাকলে লোকে ছুটিতে বিদেশে যায়, সমুদ্রের ধারে সূর্যস্নান করে তামাটে বানায়। ইওরোপে এখন গরমকালে তামাটে রং শো করবার অদ্ভুত ফ্যাশন চলছে।

যে বাড়িতে আমাদের গাড়ি থামে সেটি আস্ত একটি বাগানবাড়ি। এ বাড়িতে এক মধ্যবয়সী ইংরেজ ভদ্রমহিলা পনেরো বছর ধরে সিসিলিয়ান স্বামী নিয়ে সংসার করছেন। বাড়ি দেখেই অনুমান হয় এদের টাকা পয়সা প্রচুর। সিসিলিতে টাকা পয়সা যাদের আছে মাফিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই, এ কথা আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। আমি অস্থির পায়চারি করি ঘরে বাগানে বারান্দায়।

আনতোনেলা বলে -- *জল টল কিছু খাবে? নাকি ওয়াইন দেব?*

না। আমি খাবো না কিছু।

শরীর খারাপ লাগছে কি?

না।

লিণ্ডা কাছে এসে হেসে বলে -- *এই তো খাবার আর পাঁচ মিনিট লাগবে মাত্র তৈরি হতে।*

আমি ম্লান মুখে হাসি। একসময় সোফায় গা এলিয়ে সাদামাটা গল্প শুরু করি আবহাওয়া বেশ চমৎকার ইতালির, সুইডেনে এখন বরফ পড়ছে, সুইডিশরা বলে গত একশ বছরে এমন কাণ্ড ঘটেনি, মে মাসে তুষার পড়েনি.. ইতালির ভাষায় হ্যালো বা গুড বাই হচ্ছে চাও চাও.. এটি এখন আন্তর্জাতিক সম্ভাষণ.. শব্দটির উৎপত্তি চিয়াভো থেকে। চিঁয়াভো থেকে চিয়াও। চিয়াও থেকে চাও। চিয়াভো মানে আমি তোমার চাকর। কজন জানে চাও শব্দের আসল অর্থ? ঠা ঠা করে হেসে উঠি আমি।

আসল কথা পাড়ি। -- তা ইংলেন্ডে না থেকে সিসিলিতে থাকছেন কেন লিণ্ডা?

সিসিলির প্রেমে পড়ে গেছি যে। লিণ্ডা বোকা চোখে তাকিয়ে থাকেন। প্রেমে পড়লে মানুষকে আসলে বোকাই দেখায়।

--সিসিলির প্রেমে কি কেউ পড়ে! যেমন মাফিয়া এখানে..

আমার কথা শেষ হয় না। লক্ষ করি ঘরের মধ্যে আশ্চর্য স্তব্ধতা নেমে এসেছে হঠাৎ। সাব্রিনা কলকল করে কথা কইছিল, সেও ঠাণ্ডা মেরে গেছে। লিন্ডাও আমার প্রশ্নের উত্তর দেন না। আন্দ্রিয়ানো, লিন্ডার স্বামী আচমকা চেয়ার ঠেলে উঠে যান। আনতোনেলাকে দেখি নখ খুঁটছে।

রুদলাফো আর বারবারা, অ্যামনেস্টির দুজন সদস্য, পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে। ঘটনাটি কী, মাফিয়ার কথায় এরা এমন গুটিয়ে নিল কেন নিজেদের!

আন্দ্রিয়ানো বড় বড় থালায় করে পিৎজা নিয়ে উপস্থিত হন। নানান ধরনের পিৎজা, সকলে অল্প অল্প করে পিৎজা প্রসঙ্গে মুখ খুলতে থাকে। যেমন খুব স্বাদের হয়েছে, বানালো কে এত পিৎজা। আমি দুএক কামড় খেয়ে বলি -- *নাইনটিন্থ সেনচুরিতে মাফিয়ার শুরু এই সিসিলিতে। প্রথম দিকে গ্রামে ছিল এই প্রবণতা. এখন শহরে, তাই না?*

কেউ হ্যাঁ বা না কিছু বলে না।

আন্দ্রিয়ানো বলেন, পিৎজা ভালো লাগছে তো খেতে?

--হ্যাঁ তা লাগছে। ভাবছিলাম জজ ফালকোনের কথা। শুনেছি মাফিয়ার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করে গেছেন। ফালকোনে, তাঁর স্ত্রী আর দুজন পুলিশকে যাঁরা তাঁর গাড়িতে ছিল, তো শেষ পর্যন্ত মাফিয়ার লোকেরা মেরে ফেলেছে। ফালকোনেকে মারার কমাস পর আরেকজন জজ, কী নাম যেন, বোরসেলিনো, ওঁকেও তো মেরে ফেললো। বোরসেলিনো তাঁর মার মঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন, তাই না? আচ্ছা, ফালকোনে মাফিয়া নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন শুনেছি। আমার খুব পড়ার ইচ্ছে। এর কি কোনও ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে?

আন্দ্রিয়ানোর চোখের দিকে সোজা তাকিয়েই প্রশ্নটি করি। চোখ নামিয়ে আন্দ্রিয়ানো ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়েন। বলেন খুব গরম পড়েছে আজ। তোমাদের দেশ তো গরমের দেশ। নিশ্চয়ই তোমার খুব অসুবিধে হবে না এই গরমে। কী বল?

না তা অসুবিধে হচ্ছে না।

ফালকোনের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যাবে কী না এ ব্যাপারে কেউ কোনও কথা বললো না কেন? আমার বড় অস্বস্তি হতে থাকে। তবে কি যা ধারণা করেছি যে এই লোক মাফিয়ার লোক, তাই সত্য! আর সত্য হলে আনতোনেলা আমাকে এ বাড়িতে আনলো কেন? সিসিলিয়ানদের বিত্ত দেখাতে! হারে বোকা। বিত্ত আমার ঢের দেখা হয়েছে। এসব

চকমকিতে আমার মন ভরে না। তখনও সবার খাওয়া শেষ হয়নি। আনতোনেলাকে বলি উঠ চল এবার।

কী বল, এক্ষুনি কী যাবে!

লিন্ডা গোল গোল চোখে তাকিয়ে থাকে।

সকলকে শুকনো গ্রাৎসে বলে বেরিয়ে পড়ি। পুলিশদুটো আঙুলে পিস্তল ঘোরাতে ঘোরাতে গাড়ির দিকে যায়, পেছন পেছন আমি আর আনতোনেলা হাঁটি। আনতোনেলা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে -- *তুমি কি আন্দ্রিয়ানোকে সন্দেহ করছো?*

--*হ্যাঁ করছি।* আমার সোজা সাপটা উত্তর।

আমার একটি হাত চেপে ধরে আনতোনেলা। বলে, আন্দ্রিয়ানো ভালো লোক। ও মাফিয়ার নয়। তবে যে হোটেলে আছো। সেটি খবর পেলাম মাফিয়ার..

প্রায় চেঁচিয়ে উঠি। -- বল কী?

--হ্যাঁ কী করবো বলো, আগে তো জানিনি আমরা।

-- এর কোনও মানে হয়? অন্য হোটেলের ব্যবস্থা কর এখনই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনতোনেলা বলে -- অন্য হোটেল যে মাফিয়ার নয়, তাও বা বুঝবো কী করে! তবে কথা দিচ্ছি, কালই হোটেল বদলাবো। আর রাতটা কোনওমতে কাটাও।

হোটেলে পৌঁছে আমার গা ছমছম করে ভয়ে। রিসেপসোনিস্টের দিকে তাকিয়ে গলা শুকিয়ে যায়। নিঃশব্দে নিজের ঘরে উঠে আসি। যারা এই হোটেলে আছে, তারা কী জানে হোটেলটি মাফিয়ার! তারা কি জানে প্রতিবছর দুশ মতো লোক খুন মাফিয়ায়! তারা কি জানে ড্রাগ চালান, নারী চালান, অস্ত্র চালান, অপহরণ -- অবৈধ সব কাজগুলো অবাধে করে যাচ্ছে এরা! সম্ভবত এই হোটেলের কোনও কোনও ঘরেই এদের সভা হয়, মানুষ মারার নীল নকশা তৈরি হয়! সারারাত আমার ঘুম আসে না। ভূমধ্যসাগরের কান্নার শব্দ শুনি সারারাত।

সকালে মেয়েদুটো এসে আমাকে নিয়ে যায় শহর দেখাতে। ঘন বসতি থেকে থেকে, পলেস্তারা খসে পড়া ভাঙাচোরা দালান -- ওর ঘুপচি ঘরগুলোও মানুষের বাস। সাব্রিনা ঠোঁট উল্টে বলে সারা শহরে পাইপে জলও আসে না দুদিন চারদিন। এ যে ইওরোপের কোনও দেশ আমার বিশ্বাস হতে চায় না। নোংরা বস্তি পেরিয়ে শহরের বড় রাস্তায় গাড়ি চলে। ব্যাংকগুলোর সামনে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ। ট্রিগারে হাত রেখে। ইওরোপের আর কোনও দেশে এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখিনি। আর কোনও দেশের রাস্তায় লোকের হাতে হাতে এত কর্ডলেস ফোন আর ব্রিফকেস দেখিনি। ফোনে মানুষগুলো কার সঙ্গে কথা বলে! ব্রিফকেস নিয়েই বা দৌড়োয় কোথায়! মাফিয়ার লোক নয় তো! পিসযো কামিয়ে কার সঙ্গে কথা বলে! পিসযো হচ্ছে চাঁদা দেওয়ার নিয়ম, প্রায় প্রতিটি দোকান আর রেস্তোরাঁর মালিককে মাসে মাসে চাঁদা দিতে হয় মাফিয়ার লোকদের, না দিলে যে কোনও সময় বোমা মেরে দোকান উড়িয়ে দেয় ওরা।

চমৎকার একটি থিয়েটারের সামনে গাড়ি থামে। আনতোলেনা বলে --এটি হচ্ছে সিসিলির সবচেয়ে বড় থিয়েটার, মাসিমো থিয়েটার। এর রেস্টোরেশনের কাজ শুরু হয়েছে পচাত্তর সালে, আজও কাজ শেষ হয়নি। তুমি তো তোমার দেশের লজ্জা নিয়ে বই লিখেছো। আমাদের সিসিলির অনেক লজ্জা, এটি একটি, যে, কুড়ি বছরেও একটি থিয়েটারের রেস্টোরেশন হয় না।

সারা সিসিলি জুড়ে দালানকোঠায় নরম্যান আর্কিটেকচার, লাইমস্টোনে গড়া গ্রীকদের দৌড়িক টেম্পল ঘোড়ার খুড়ের মতো আর্চ, দেয়ালে বাইজানটিনদের সোনালি মোজাইক। সাব্রিনা বলে, কেবল শিল্প আর স্থাপত্য নয়, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে, দৈনন্দিন জীবনেও ওরা প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে গেছে।

--কী রকম শুনি?

তা আর শোনা হয় না। পিয়াৎসা প্রেতোরিয়া, পিয়াৎসা বোলিনি হয়ে লা মারতোরানা গির্জার সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ওই প্রভাব ট্রভাবের কথা দিব্যি ভুলে যাই। সিসিলির রাজা

দ্বিতীয় রজারের এক অ্যাডমিরাল বানিয়েছিলেন গির্জা, ১১৪৩এ। সোনালি বাইজানটিন-মোজাইকের কাজ দেখে অবাক হতে হয়। তখনকার পেইনটিংএ রাজাদের বাঁধা শিল্পীরা যেমন যিশু কিম্বা মেরির পায়ের কাছে রাজা এবং তাঁর পরিবারের লোকজনের আঁকতো, এই গির্জাতেও দেখি দেয়াল জুড়ে মোজাইক সাজিয়ে বাইবেলের গল্প বলতে গিয়ে এক জায়গায় স্বয়ং যিশু মুকুট পরিয়ে দিচ্ছেন দ্বিতীয় রজারকে, আর অ্যাডমিরাল মেরির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। সিসিলিতে দেখার মতো গির্জা একটি দুটি নয়, অনেক। ধর্মের দালানকোঠা দেখতে যাওয়ার পেছনে কোনও ধর্মানুভূতি আমার ভেতর কাজ করে না, পুরোনো স্থাপত্য এবং ভেতরের চমৎকার শিল্প দেখার ইচ্ছেতেই যাওয়া। দ্বাদশ শতাব্দির সান ক্যাতালদো গির্জার মুরিশ শিল্প আর স্থাপত্য-কাজ কেন দেখতে ইচ্ছে করবে না! টই টই করে গির্জা থেকে গির্জা ঘুরে বেড়াই। গোগ্রাসে গিলি সৌন্দর্য। ক্যাথিড্রাল, ইতালিরা বলে ক্যাতিদ্রালে, এটিও দ্বাদশ শতাব্দির. সিসিলিয়ান-নরম্যান স্টাইলে গড়া। ভেতরে রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আর হুহেনস্টাউফেন, অ্যানগেভিন শাসকদের কবর। হুহেনস্টাউফেন গথিন স্টাইল নিয়ে আসে সিসিলিতে। সাব্রিনাতে জিজ্ঞেস করি, কোন শতকে বল তো!

--তেরো।

শান্ত কণ্ঠে অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের মতো উত্তর করে সাব্রিনা।

সেইন্ট জনের গির্জা আরবীয় স্থাপত্যের। ভেতরের বাইবেলের গল্পের পাত্রপাত্রীদের পোশাকও আরবীয়। পশ্চিমিরা ভূমধ্যঅঞ্চলের যিশু মেরিকে আঁকতে গিয়ে মাথায় বসায় সোনালি চুল আর চোখের রং করে নীল, ওঁদের রীতিমত *পশ্চিমি* বানিয়ে ছাড়ে। ওসব দেখে দেখে হঠাৎ ভিন্ন পোশাকে ভিন্ন চেহারায় নাদুশ নুদুশ দুম্বার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যিশুকে দেখে খটকা লাগে। কেবল গির্জা নয়, ক্যাপুচিন ক্যাটাকম্ব দেখতে ছুটে যাই। চমৎকার জায়গা। প্রায় আট হাজার মমি সতেরো থেকে উনিশ শতাব্দি অবদি ছিল এখানে। মমিগুলো খুব গরম হাওয়ায় রাখা হত। এরপর ছোট দেখতে মধ্যযুগের আঁকা ছবি আর

ভাস্কর্য সাজানো ক্যাটালান-গথিক স্টাইলের রিজিওনাল গ্যালারিতে। ছোট দেখতে মিউজিও আরকিওলজিকো, পালাৎযো দ্য নরম্যানি। নরম্যানির প্রাসাদে এখন লোকাল পার্লামেন্ট বসে। বিশাল দূর্গ, গম্বুজ সবই নরম্যানের সময়কার, নরম্যানের সিসিলি দখল ১০৭২এ, এরপর রাজা দ্বিতীয়-রজার প্রাসাদের নিচতলা বানান আরবীয় ধাঁচে ১১৩০ থেকে ১১৪০ অবদি। দশটি প্রাচীন থামের ওপর ঘোড়ার খুড়ের আকারের আর্চ। ভীষণ দেখতে। দেয়ালে, ডোমে মোজাইকের কাজ এত চমৎকার যে চোখের দেখায় আশ মেটে না. ইচ্ছে করে সারাদিন ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে ওখানে বসে থাকি। দোতলায় রাজা দ্বিতীয় রজারের ঘরে মোজাইকে দাবার ছক। রাজা কি দাবা খেলতে ভালোবাসতেন? বোধহয়। ইওরোপের রাজাবাদশারা শিল্প স্থাপত্যের কদর করে আমাদের বেশ সুবিধেই করে গেছেন। তা নাহলে কোথায় পেতাম এত বিচিত্র পেইনটিং, মোজাইক, ভাস্কর্য, স্থাপত্য!

পালেরমোর নামকরা কোনকা দোরো আর নেই। ঠিক পাহাড় আর সমুদ্রের ধারে লেবু আর কমলালেবুর অরণ্যের নাম ছিল কোনকা দোরো। বাংলা করলে দাঁড়ায় সোনালি শঙ্খ। লেবু আর কমলালেবু গজিয়ে সোনালি হয়ে থাকতো পুরো এলাকা। এখন সোনালি শঙ্খে ধনী সিসিলিয়ানরা বাড়ি তুলে বসত শুরু করেছে। এত জায়গা থাকতে কোনকা দোরায় কেন! সম্ভবত জায়গাটি বরাবরই আকর্ষণীয় ছিল বলে মানুষ নেমে কমলালেবুর চাষ চালান করে দিয়েছে অন্য কোথাও। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় কোনকা দোরোয় মাফিয়ার লোকেরা থাকে। এ নিয়ে আর আনতোনেলাকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কোনকা দোরো নেই, তবে পুরোনো সেই ঘোড়ার গাড়ি এখনও আছে। ঘোড়ার মাথায় রঙিন মুকুট পরিয়ে ঘোড়াকে নানা রঙে সাজিয়ে এখনও সিসিলিয়ানরা দাদার আমলের ঐতিহ্যটি রক্ষা করে চলেছে। টিনের তৈরি সৈন্য সামন্তও ঝোলে দোকানে। হাতে তলোয়ার আর ঢাল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক একখানা বিজয়ী সেনাপতি যেন। কোন যুদ্ধের সৈন্য এরা কে জানে। যুদ্ধ তো কম হয়নি এ দেশে।

আনতোনেলা আমাকে পাহাড়ের ওপর পাথর কেটে বানানো গির্জাটি দেখাতে নেয়। একসময় এই সিসিলিতে মহামারি শুরু হয়। প্লেগ রোগে লক্ষ লোক মারা যায়। গির্জার এক দেবদাসি সিসিলির মানুষকে সেসময় প্লেগের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল কী এক ওষুধ খাইয়ে। এখন গির্জায় সেই দেবদাসির মূর্তির পায়ের কাছে মানুষ টাকা পয়সা গয়নাগাটি ইত্যাদি ফেলে যায়। অসুখে বিসুখে এখনও মানুষের ভরসা এই দেবদাসি। অ্যালুমিনিয়ামের খেলনা হাত পা বিক্রি হয় গির্জার বাইরে। যার পায়ে অসুখ, সে একটি অ্যালুমিনিয়ামের পা কিনে মূর্তির সামনে রেখে আসে, মনে বিশ্বাস নিয়ে যে দেবদাসি ভগবানকে বলে কইয়ে রোগ সারিয়ে দেবে। কুসংস্কার কি কেবল ভারত বাংলাদেশেই!

পাহাড়ের চুড়ো থেকে সমুদ্রের নীল জল, জলের জেলে নৌকো, জলপাইএর পাতার মতো -- দেখে আমার মন ভালো হয়ে যায়। আজকাল পালেরমোতে ফরাসি পর্যটকরা আসে। মেয়েরা বিকিনি পরে ভূমধ্যসাগরে স্নানে নামে। কেউ কেউ বিকিনি খুলে পুরো ন্যাংটো হয়ে শুয়ে রোদ তাপায়। আমি রোদে পোড়া মানুষ। রোদ তাপাবার পর্যটক নই। এসেছি মানুষ দেখতে। জীবন দেখতে মানুষের। কখনও মন খারাপ হলে জলপাই গাছের ছায়ায় শুয়ে আকাশ দেখতেও।

দুপুরে আরেক অ্যামনেস্টি সদস্য মাসিমোদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দেখি মাসিমোরা অনেকগুলো ভাইবোন, চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স, বাবা মায়ের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে। ইওরোপে কোথাও এমন দেখিনি। পনেরো ষোলো বছর বয়সে ছেলে মেয়েরা বাপ মা থেকে আলাদা হয়ে যায় কিন্তু এই সিসিলিতে আলাদা হয় বিয়ের পর। আর খাবারে সাধাসাধি করবার ব্যাপারটিও ইওরোপের অন্য কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। এরা করে। দুপুরে এদের নিয়ম পাস্তা খাওয়া, রাতে পিৎজা আর মাছ। এক দুপুরেই বাড়ির সবাই মিলে পাস্তা পিৎজা মাছ রেঁধে আনলো, বেড়ে দিল পাতে। একেবারে মায়ের আদর। এরা মাছে জলপাই তেল ঢেলে খায়। যে তেল আমরা গায়ে

মাখি, তা দিয়ে এরা তরকারি রাঁধে, মাছমাংসে মাখে। আমার মাকে সয়াবিনের বদলে জলপাই তেল দিয়ে মাছ রাঁধতে বললে মা নির্ঘাত মুর্ছা যাবেন। মা এ শুনেও মুর্ছা যাবেন নিশ্চয়ই যে তাঁর কন্যা এখন শামুক, কাঁকড়া, হাঙর, অক্টোপাস খায়।

মাফিয়ার প্রসঙ্গ আমি না ওঠালেও এমনিতেই ওঠে। মাফিয়া নিয়ে টেলিভিশনের এক সিরিজ লা পিওভারার কথা পাড়ে মাসিমো, ইংরেজিতে এর অর্থ হচ্ছে অক্টোপাস। অক্টোপাস যেমন হাত পা বাড়িয়ে কিছুকে গ্রাস করে, মাফিয়া তেমন সারা পৃথিবীকে গ্রাস করতে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার মাফিয়া ছড়িয়েছে, আরও কত জায়গায় যে ছড়াবে কে জানে।

আনতোনেলা বলে -- *ইতালির ভিন্ন জায়গায় মাফিয়ার এখন ভিন্ন নাম। সিসিলির কাছে ক্যাল্যাব্রিয়ায় এর নাম অ্যানদ্রেনঘেতা, সারদেনগায় এর নাম অ্যানোনিমা সারদা, আর পাদোভায় এর নাম মাফিয়া দেল বেনতা।*

যে প্রশ্নটি আমার মনে প্রথম থেকেই জাগছে, সেটি শেষ অবদি করেই বসি আনতোনেলাকে। মাফিয়া কেন ইতালির দক্ষিণে, কেন উত্তরে নয়?

আনতোনেলা বড় বড় চোখ মেলে আমার দিকে তাকায়। সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে। কারণ উত্তর-ইতালির মতো দক্ষিণ ইতালি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড নয়। এখানে মানুষ গরিব। চাকরি বাকরি নেই। মাফিয়ার লোকেরা সহজে তাই লোক পায় দলে টানার। ওরা পয়সা আর কাজের গ্যারেন্টি দেয় লোকদের। লোক এখন মাফিয়ায় না ভিড়ে করবে কী! মাফিয়া তাই জমজমাট এখানে।

মাসিমোর দু বোন প্যাট্রিচিয়া আর ভ্যালেনটিনা ইতালিয় ভাষায় বেশ ধমকের সুরে কিছু বলে। সম্ভবত মাফিয়ার গল্প ওদের পছন্দ নয়। আনতোনেলা চুপ হয়ে যায়। চায়ের কাপে নিঃশব্দে চুমুক দিই। লক্ষ করি মাসিমোর ভাই লিওনার্দো কিছু বলতে চাইছে, ওর ইংরেজি তেমন ভালো নয়। সাব্রিনা অনুবাদ করে শোনায়। ও বলছে -- *সকলে ভাবে সিসিলির সব লোকই বুঝি মাফিয়ায় জড়িত। আসলে কেউ জানে না আমরা সাধারণ মানুষ কী ভীষণ লড়ছি*

মাফিয়ার বিরুদ্ধে। সরকারের মধ্যেই, মেয়র বল, কমিশনার বল, মাফিয়ার লোক। যাব কোথায় আমরা বল।

মাসিমোর বাবা আদামো কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে ভাঙা ইংরেজিতে বলেন -- *তুমি কি ভয় পাচ্ছো ওই হোটেলে থাকতে? শুনেছি সব আমি। ভেবো না, আমার এই বাড়িতেই বাকি দিনগুলো না হয় থাকো। তোমাকে পেলে আমাদেরও বড় আনন্দ হবে।*

সন্ধে হয়ে এল। টাউন হলে অ্যামনেস্টির সভা, বক্তৃতা করতে যেতে হবে। বক্তৃতা করতে আমার মোটেও ইচ্ছে হয় না। তবু কী আর করা! অনুরোধে অনেকটা ঢেঁকি গেলার মতো অবস্থা আমার। ফ্রানচেসকা নামের নতুন মেয়ে-পুলিশ এসেছে সন্ধের শিফটে। সেও ওরকম পিস্তল ঘোরানো মেয়ে। অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা ছটায়, শুরু হয় সাতটা পাঁচে। যেন বাংলাদেশের নিয়ম। ক্লাওদিয়া, ক্লারা ভ্যালেনটিনা আর আমি নারী স্বাধীনতা নিয়ে গুরু গম্ভীর আলোচনায় মেতে উঠি, দর্শকরাও উত্তেজিত। দর্শকের সারিতে এরেসি, পাওলো, সামান্থা, এলিজাবেথা, আলেকজান্দ্রা, মাসিমো যাদের সঙ্গে এর মধ্যে আলাপ হয়েছে, সকলকে দেখি।

এক ফাঁকে সাব্রিনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করি, *আনতোনেলাকে দেখছি না যে!*

সাব্রিনা বলে, *ওর একটু জরুরি কাজ পড়েছে। বাড়ি গেছে।*

ব্যাপারটি আমার কাছে অদ্ভুতই ঠেকে। এই অনুষ্ঠানের জন্য আনতোনেলা দিনরাত খেটেছে। পোস্টার সেঁটেছে দেয়ালে দেয়ালে, আমন্ত্রণ পত্র বিলি করেছে। অনুষ্ঠানটিতে ওর সভানেত্রী হওয়ার কথা।

আসলেই কি বাড়ির জরুরি কাজ নাকি অন্য কিছু?

অনুষ্ঠান শেষে সাব্রিনাকে আবার ধরি, কী, আনতোনেলা ফিরেছে?

সাব্রিনা বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়ে। ফেরেনি।

অ্যামনেস্টির দল সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে নিয়ে তারা রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে। কিন্তু যে মেয়েটি আমার সঙ্গে সারাদিন কাটিয়েছে, সে আকস্মিক ভাবে অনুপস্থিত থাকবে, আমার মন এতে

সায় দেয় না। কার সঙ্গে কী গোল বাঁধলো কে জানে। আমার বড় রাগই ধরে। ইওরোপের এইসব সভ্য সংগঠনগুলোর ভেতরে ভেতরে যে কত অসভ্য ব্যাপার থাকে, তা এতদিনে কিছুটা বুঝেছিও বটে। আমাকে বিষণ্ন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাব্রিনা কাছে আসে। পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে সামনে।

--কিছু বলবে? বিরক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করি।

সাব্রিনা নিচু গলায় বলে আনতোনেলার ভাইএর বউ বাচ্চাদের মেরে ফেলেছে মাফিয়ার লোকেরা, ঘন্টা দুই আগে। আমরা দুএকজন ছাড়া ব্যাপারটি কেউ জানে না।

কেউ যেন আচমকা পেটে ছুরি বসিয়ে দিল এমন মনে হয়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয় আমার। বলি -

---বলছো কী তুমি?

স্টেফানো, আনতোনেলার ভাই, মাফিয়ার লোক ছিল। কমাস হল পুলিশে ধরেছে। জেলে এখন। সে ঠিক করেছিল বিচারকদের জানিয়ে দেবে মাফিয়া সম্পর্কে যা সে জানে। খবরটি ওরা জেনে ওর বউ বাচ্চাদের খুন করে বিশ্বাসঘাতকতার শোধ নিয়েছে।

সাব্রিনা নিরুত্তাপ কণ্ঠে কথাগুলো বলে। যেন এরকম খুন টুন এখানে ডালভাত। সয়ে গেছে এদের সব। প্রায়ই আত্মীয় কিম্বা চেনা পরিচিতদের মৃত্যুর খবর পায় বলেই কী না কে জানে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি দেয়ালে হেলান দিয়ে। রেস্তোরাঁয় যাবার বা হোটেলে ফিরবার কোনও তাড়া দেখি না নিজের মধ্যে। আনতোনেলা বলেছিল আজ হোটেল বদলাবে। কী লাভ হোটেল বদলিয়ে! কাল সকালেই তো চলে যাবে রোম। সাব্রিনাকে খুঁটি নাটি বিষয়গুলো, কী করে মারলো, কখন মারলো, বাচ্চাদের বয়স কত ছিল, আনতোনেলার বাবা মা করছে কী এখন, স্টেফানই বা কী বলছে, খুনীদের ধরা পড়বার কোনও লক্ষণ আছে কী না, কিছু জিজ্ঞেস করি না। কী লাভ জিজ্ঞেস করে। যারা গেল, তারা তো জন্মের মতোই গেল।

ফ্রানসেসকা পিস্তল হাতে নিয়ে সামনে আসে। বলে -- *চল চল, রেস্তোরাঁয় যাবে।*

--আমি কোথাও যাবো না। আর অত পিস্তল হাতে নিয়ে ঘোরো না তো! আমার দেখতে ভালো লাগে না।

আমি রীতিমতো ধমকে উঠি। এদেরই বা বিশ্বাস কী! যে কোনও সময়, আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমাকেই কিডনাপ করে বসতে পারে। পুলিশের মধ্যে মাফিয়ার লোক নেই তা কে বলবে!

সারারাত আমি কোথাও ফিরি না। রাস্তায় এলোমেলো হাঁটি। সাব্রিনাও হাঁটে আমার সঙ্গে। কখনও কোনও স্কোয়ারে কোনও স্ট্যাচুর বেদিতে শুই, সাব্রিনাও পাশে শোয়। ভোরবেলা ও হোটেল থেকে আমার সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে আসে। কারও সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে সাব্রিনাকে যে শেষ কথা বলবো ভালো থেকো, তাও বলি না। ওর জন্য, আনতোনেলার জন্য, সিসিলির সবার জন্য আমার মায়া হতে থাকে আমার।

এই লেখাটা লিখেছিলাম নিখিল সরকারের অনুরোধে।

বলেছিলেন, *এত যে দেশ ভ্রমণ করছো, এত যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কিছুই তো লিখছো না!*

--লিখতে ইচ্ছে করে না। নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর আমার।

--লেখার চেষ্টা করো। লেখালেখির জন্য দেশ ছাড়তে হল। আর নির্বাসনে গিয়ে লেখাই যদি বন্ধ করে দাও, তবে বাঁচবে কী করে! লেখাই তোমাকে বাঁচাবে। লিখতে তোমাকে হবেই।

--লেখাটেখা আমার দ্বারা আর হবে না।

---হবে না বুঝলে কী করে। ছোট হলেও কিছু লেখ। এর মধ্যে কোথাও গেলে?

---সিসিলি থেকে এই এলাম।

---সিসিলি নিয়েই লেখ না।

--এ নিয়ে লেখার কিছু নেই। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অনুষ্ঠান ছিল। .. গেলাম। বক্তৃতা করলাম। ঘুরলাম। এই দেখলাম। সেই দেখলাম। চলে এলাম। এসব লেখার কী আছে! তাছাড়া মাফিয়ার দেশ নিয়ে তো কাব্য করার কিছু নেই।

---এসবই লেখ। যদি এর মধ্যে সামান্য কল্পনা মেশাও, তাহলে বেশ মজাদার একটি লেখাও হতে পারে। গল্পের মতো।

---আমি কল্পনা মেশাতে পারি না। কল্পনা শক্তি আমার কম বলেই উপন্যাস লিখতে পারি না।

--মাফিয়া নিয়েই সামান্য কল্পনা যোগ করে তোমার ভ্রমণের ওপর একটি লেখা তৈরি করে ফেলো। নিখিল সরকার বললেন।

লিখলাম। পাঠালাম। তিনি বললেন, *সবই তো সত্যি মনে হচ্ছে। কল্পনা তবে কোথায়?*

ম্লান কণ্ঠে বললাম, *শেষের দিকটা ঠিক ওরকম ছিল না। আনতোনেলা বিমানবন্দরে এসেছিল। গালে আমার চুমু খেয়ে বলেছে, তুমি চলে যাচ্ছো, খুব খারাপ লাগছে। আবার আসবে তো? ভুলে যাবে না তো?*

৩.

হারিয়ে যাওয়া একটি চিঠি যদি হঠাৎ করে চোখে পড়ে! চিঠিটি নিয়ে বসে থাকি অনেকক্ষণ। চিঠিটি তখন আর চিঠি নয়। চিঠি হয়ে পড়ে ছবির মতোন কিছু। তেমন একটি চিঠি, অসম্পূর্ণ চিঠি কাগজের জঙ্গল থেকে মেলে। চিঠিটি এমন---

কতকিছু ঘটছে, আপনাকে কিছুই জানানো হচ্ছে না। ডিএইচএলে দুমাসে দু পাতা চিঠি পাঠিয়ে জীবনের সবকিছু জানানো যায় না। আর ফোন ফ্যাক্সে দেখেছি লক্ষ টাকা খরচা হয়, কাজের কাজ কিছু হয় না। অকাজই কিন্তু আমার আসল কাজ। আপনার সঙ্গে আমার অন্তরের

যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি, আর আপনার সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছে সবচেয়ে কম। কতবার যে ইচ্ছে হয়েছে আপনাকে তুলে নিয়ে এসে পুরো জগত ঘুরি, কিন্তু যেভাবে বটবৃক্ষের মতো শেকড় গেড়েছেন শহর কলকাতায়..!

এখন আমাকে নিয়ে হৈ চৈ অনেকটাই কমে এসেছে। সুইডেনে পুলিশ প্রহরা নেই আর। আমি এখন একা একাই বাসে ট্রেনে চড়ি, রাস্তায় হাঁটি। এক বছরে পুলিশ প্রহরায় যা জেনেছিলাম, একা সাতদিনে তার চেয়ে বেশি জেনেছি। এই জীবনটির স্বাদ অন্যরকম, নিজেকে চিড়িয়া জাতীয় কিছু মনে হয় না, মানুষ মনে হয়। আর মানুষের ভোগ দুর্ভোগ বইতে আনন্দও তো কম নয়। দুদিন পর ইতালি যাচ্ছি, গভরমেন্ট প্রচুর পুলিশ দেবে, আমি বলেছি ওসবের দরকার নেই। কে শোনে কার কথা! এরা হয় বোকা, নয় বেশি চালাক। জুনে আবার ব্রাসেলসে যেতে হবে। ওখানে ইওরোপিয়ান পার্লামেন্টে একটি অনুষ্ঠান আছে। গতবার বেলজিয়ামে চার গাড়ি পুলিশ ছিল, সারা এয়ারপোর্টে বন্দুক তাক করে ইউনিফর্মড পুলিশেরা দাঁড়িয়ে ছিল, আমি যাবো বলে আবার এসবের ব্যবস্থা হবে -- ভাবলেই অস্বস্তি হয়। জার্মানিকে বলেছি আমার কিন্তু পুলিশ লাগবে না। ওরা বলেছে, তোমার হয়তো পুলিশ দরকার নেই, কিন্তু তোমাকে পুলিশ দেওয়া জার্মান সরকারের দরকার। অনেক হল পুলিশের আলাপ। এখন এক লেসবিয়ানের গল্প বলি। এক র‍্যাডিক্যাল লেসবিয়ান ফেমিনিস্ট। কানাডার মেয়ে। ফ্রাংকোফোন। কিউবেকের। থাকে প্যারিসে। আমার যত পাবলিক মিটিং হয়েছিল প্যারিসে, ওকে দেখতাম প্রথম সারিতে বসে থাকতে, চমৎকার চমৎকার প্রশ্ন করতে। পুলিশের বাধা ডিঙিয়ে কারও সঙ্গেই আমার কথা বলবার জো ছিল না। তবু মেয়েটির সঙ্গে শেষ মিটিংএ কয়েক সেকেন্ড কথা বলি, সেই খুশিতে একদিন সে চলে আসে স্টকহোমে, সাতদিন আমার বাড়িতেই ছিল। এবার আবার এল, ছিল পনেরোদিন। চমৎকার মেয়ে। নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার ভাবনা যেমন, ওরও ঠিক তেমন, তবে ও আবার এক কাঠি এগিয়ে। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেসবিয়ানিজম ওর কাছে পলিটিক্যাল স্ট্রাগল। এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্ক হয়েছে। আমি যে ওর মতামত পুরো মেনেছি তা নয়। পশ্চিমে মিলিট্যান্ট ফেমিনিস্ট

আন্দোলন মার খেয়েছে। লেসবিয়ানরাও বিপদে আছে। সেদিন কজন গে আর লেসবিয়ানকে চাকরিচ্যুত করা হল ব্রিটেনের নৌবাহিনী থেকে। পশ্চিমে এক্সট্রিম রাইট উইং ধীরে ধীরে পপুলার হচ্ছে, ফ্রান্সে লিপেন পনেরো পার্সেন্ট ভোট পেল, এ কিন্তু কম ভোট নয়। স্কিন হেড বাড়ছে, নিও নাৎসি বাড়ছে, এরা ইমিগ্রেন্ট, হোমোসেক্সুয়াল আর নারী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। পশ্চিমের ভালোটা দেখছি, মন্দটাও। প্রতিবাদ করছি। কেন নয় বলুন তো! মানুষের কোনও সীমানা থাকবে কেন! আমি এখন সীমানা এবং সীমা দুটোই ছাড়িয়ে যাচ্ছি। মা বলতেন, তুই কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিস। এখনও সাবধান হ। আমার জীবনে এ কাজটি কখনও করিনি, সাবধান হইনি। আসলে লেখালেখির চেয়ে জীবনের খুঁটিনাটি স্বাধীনতাতেই আমি মগ্ন থেকেছি বেশি। তা না হলে বলুন, বাংলাদেশের মতো দেশে কী করে বাড়িভাড়া নিয়ে একা থাকতে শুরু করেছি একটি মেয়ে! কারুকে তোয়াককা না করে এমন সব কাজ করেছি যা সমাজ একেবারে সয় না।

ইতালি থেকে ফিরে এসেছি। এখন ট্রেনে আমি বার্লিনের পথে। ট্রেনে যাওয়াই স্থির করেছি কারণ প্লেন আমার অসহ্য লাগে। প্লেনের টিকিট আছে। ও টিকিট থাকার পরও শখ করে ট্রেনের টিকিট নিয়েছি। এখানকার ট্রেনগুলো তো আর ভারত বাংলাদেশের ট্রেনের মতো নয়, যেন পাঁচতারা হোটেলে বসে আছি ট্রেনে তাই মনে হয়। আসল আনন্দ হচ্ছে জানালায় নিসর্গ দেখা। শুধু মেঘ দেখতে, শুধু শূন্যতা দেখতে আমার ভালো লাগে না। আমাকে দেওয়া হোক ফার্স্ট ক্লাস ফ্লাইট টিকিট, আর যেন তেন ট্রেন টিকিট। আমি ট্রেন টিকিট নেবো। মুশকিল হল, এই অপশানটা কেউ দেয় না আমাকে।

ইতালিতে যে এত কান্ড হবে ভাবিনি। পালেরমোতে ল্যান্ড করলাম ২৬ মে। সিসিলির সবচাইতে সুন্দর নগরী পালেরমো। সিসিলি কিন্তু আবার মাফিয়ার কেন্দ্র। পাহাড় আর সমুদ্রের প্রায় মধ্যিখানে আমার থাকার ব্যবস্থা মনডেলায় লা ট্যুর হোটেলে। চমৎকার, ব্যালকোনিতে দাঁড়ালে মন ভালো হয়ে যায়, সমুদ্র চিরকালই আমাকে মুগ্ধ করে, বিশেষ করে এর

সীমাহীনতা। বিছানায় পাশ ফিরে শুলে সামনে সমুদ্র, সারাক্ষণই সমুদ্রের শব্দ, মন উতল জলে ভাসে। মনে পড়ে কক্সবাজারের সিবিচে কী ভীষণ হুল্লোড় করেছি উত্তরকৈশোরে। আমার কৈশোর যৌবন সব যেন খুব দূরের দূরের, এখন ব্যালকোনির ইজিচেয়ারে শুয়ে এককাপ চা হাতে নিয়ে উদাস হয়ে যেতে হয়, বিভিন্ন লোক আসে কখন কী লাগবে কোনও অসুবিধে হচ্ছে কী না জিজ্ঞেস করতে, খুব জটিল জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলতে-- বুঝতে। আমি যেন আগের সেই আমি নেই, গোল্লাছুট খেলার আমি -- নদী বা সমুদ্র দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আমি। বয়স বাড়ছে কী! আমি তো জানি আমার মনের বয়স মোটে বাড়ে না। ব্যালকোনির ঠিক নিচে পাথরের কিনার থেকে বেড়ে ওঠা একটি লাল জবা ফুলের গাছ দেখে হঠাৎ চমকে উঠি। জবা ফুলের সঙ্গে আসলে আমার কৈশোর যৌবন নয়, রীতিমত শৈশব জড়ানো। অ্যামনেস্টির মেয়েরা আসে। দুটো পোস্টার দেখায়। বেশ সুন্দর পোস্টার ছেপেছে ওরা কনফারেন্সের জন্য। তসলিমা নাসরিন ভাষণ দেবেন পালেরমো সিটি হলে। আহা কোথাকার কোন তসলিমা, মানুষের বাড়ি বাড়ি আশ্রয়ের জন্য ঘুরেছে এই সেদিন, ধর্মান্ধ পুরুষগুলোর খোলা তলোয়ার গলার পাশ দিয়ে পোচ মেরে গেঝে, প্রায় মরতে মরতে একেবারে বুড়িগঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ছাড়িয়ে ম্যাডিটেরিনিয়ান সির ওপর।

এখন বার্লিনে। বেশ ভালো আছি। বেশ ভালো। একা থাকতে মন্দ লাগছে না। আগের মতো এখন আর ঘন ঘন ভাত খাই না, ঘন ঘন ডায়াল ঘোরাই না টেলিফোনের। অনেকটা সয়ে গেছে। বার্গার স্যানডুইচ বা পিৎজায় খুব একটা অসুবিধে হয় না। আজ পুলিশ সাইট সিয়িংএ নিল। জলঘড়ি, পুরোনো জার্মান পার্লামেন্ট, পাশের ফুটপাতে রাশান জিনিসপত্র বেচা মায় লেনিন পর্যন্ত, বার্লিন দেয়াল, যুদ্ধে ধ্বসা চার্চ, পূর্ব বার্লিনের মিউজিয়াম, সিটি হল, থিয়েটার, মনুমেন্ট ইত্যাদি দেখে ঘরে ফিরেছি। বার্লিন একটি সুন্দর সবুজ শহর। এর গল্প না হয় পরে হবে, আগে ইতালির গল্প বলি। সিকিউরিটি পুলিশগুলো খুব উদ্ধত, হাতে পিস্তল নিয়ে

ঘোরে। রাস্তার ব্যাংক পাহারা দেয় ইউনিফর্মড পুলিশ। ট্রিগারে আঙুল রেখে পথচারীদের দিকে বন্দুক তাক করে। ভয়াবহ। সকালে আমার যাবার সময়। আমি যাই রোম হয়ে এনকোনার দিকে। এনকোনা এয়ারপোর্টে আমার রিসিভ করতে আসে অ্যামনেস্টির মেয়েরা। পুলিশ সহ ওরা গাড়ি করে নিয়ে যায় শহরের মাঝখানে গ্র্যান্ড হোটেলে। সামান্য বিশ্রাম নেবার পর প্রেসের লোকের সঙ্গে কথা বলতে নামতে হয় নিচে। আসলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলা, এ আমার একেবারে পছন্দ নয়, রাজি হতে হয়েছে অ্যামনেস্টির কারণে। বেচারারা বড় নির্ভর প্রেসের ওপর। আমার কারণে ওদের যদি কিছু পাবলিসিটি হয়! ওদের আতিথেয়তায় ইতালি ঘুরছি, এটুকু ওদের জন্য করা সংগত বলেই করি। এরপর শহর ঘোরার পালা। সত্যি বলতে কী, এই আমার আসল কাজ। একটি পুরোনো বিশাল দেখতে সেইলিং বোট মানুষ ভিড় করে দেখছে। ভিড় সামলাতে পুলিশ নেমেছে পোর্টে। চলে গেলাম পাহাড়ে। জাহাজের আকৃতির চার্চ। ধ্বংসাবশেষ রোমান থিয়েটারের। ওখানে দাঁড়ালে এখনও যেন ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে আসে। বিকেলে কনফারেন্স। সাহিত্য সংস্কৃতির বিল্ডিং। বেশ আধুনিক। বসলো আমার সঙ্গে গভরমেন্টের নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নেত্রীরা। মূল বক্তা, মূল আকর্ষণ তসলিমা। অতএব তারা সামান্য সময় বলে ফ্লোর আমাকে দিয়ে দেয়। আমার বক্তব্যের পর আলোচনা শুরু হল। দর্শকরা মঞ্চে এসে প্রশ্ন করছে, তাদের মতামত জানাচ্ছে। দীর্ঘক্ষণ জমজমাট ছিল আলোচনা। ইন্টারেস্টিং বটে। ধর্ম সমাজ রাজনীতি নারী স্বাধীনতা নিয়ে খোলা মন্তব্য। দর্শকের মধ্যে এক ইতালিয়ান ছিলেন, বাংলাদেশে পনেরো বছর ছিলেন মিশনারিতে, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে প্রফেসারি করেছেন দীর্ঘদিন, অনর্গল বাংলা বলেন -- আলাপ হল অনেকক্ষণ। অনুষ্ঠান শেষে মানুষের ভিড় অটোগ্রাফের জন্য, অনেকের হাতে আমার ইতালিয়ান লজ্জা। ওখান থেকে রাতের খাবারে যাওয়ার আগে আবার শহর দেখা। মেডিটেরিনিয়ান সি, টিপিক্যাল মেডিটেরিনিয়ান বুশ, হিলি এরিয়ায় গাড়িতে ঘোরা, ওপারে ফরমার যুগোশ্লাভিয়ায়, এনকোনার লোক ওদেশটি নিয়ে ভাবে, দুঃখ করে, ওরা তো জলজ প্রতিবেশি। এনকোনা শহরটি পালেরমোর মতো গরিব নয়। পোর্ট এরিয়া। এতেও পাহাড় ও

সমুদ্রের মিশেল। তবে প্রাকৃতিক পালেরমো এনকোনার চেয়ে আকর্ষণীয় বেশি। সবচেয়ে নামকরা মাছের দোকানে এলাম। কতরকম মাছ যে খাওয়া হল তার হিসেব দিতে পারবো না। ২৫ জনের মতো অ্যামনেস্টির লোক আমার জন্য এই মাছ ভোজনের ব্যবস্থা করলো।

পরদিন রোম হয়ে ভেনিস উড়ে গেলাম। ভেনিস শহরে না গিয়ে আমাকে পাদোভার দিকে নিয়ে যাওয়া হল। লা রেসিডেন্ট বলে একটি হোটেল যেখানে আমাকে রাখা হল, সেটি চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। বিশাল অবস্থা। ছোটখাটো একটি অ্যাপার্টমেন্ট যেন আমার জন্য। অবাক হই অ্যামনেস্টি কী করে এত খরচ দিচ্ছে। ব্রিটিশ অ্যামনেস্টি তো আমার পেছনে এর একশ ভাগের এক ভাগও খরচা করতে পারেনি। যাই হোক, ক্রিস্টিনা আর রিকারডো আমাকে রাতে পাদোভায় নিল খেতে। অ্যামনেস্টির অনেকে অপেক্ষা করছিল। সকালে পাদোভার সিটি হলে প্রেস কনফারেন্স। টিভি রেডিও পত্রিকার প্রচুর সাংবাদিক। আমার বড় ক্লান্ত লাগছিল। পা ফুলে গেছে হাঁটতে অসুবিধে হয়। সকালে পাদোভার সিটি হলে প্রেস কনফারেন্স। এক নারীবাদী সাংবাদিক তার পত্রিকা নিয়ে এলেন, দেখি প্রচ্ছদে আমার ছবি, পাদোভা ইউনিভার্সিটির এক মেয়ে আমার ওপর থিসিস লিখছে জানিয়েছিল, একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে হাতে একতোড়া ফুল দিয়ে বললো আমি সেই মেয়ে যে তোমাকে ডিসটার্ব করেছি স্টকহোমে, মেয়েটি লিখছে থিসিস, এ বুঝি আমাকে ডিসটার্ব করা হল! আমি ওর চিঠির উত্তরই দিইনি, বোধহয় তাই ভেবেছে ডিসটার্ব। মেয়র এলেন, কিছু বই উপহার দিলেন পাদোভার ওপর, একবার অফিসে যেতে বললেন যাবার আগে। দুটো টিভি সেদিন ন্যাশনাল নিউজের জন্য ইন্টারভিউ নিল। মেয়রের রুমে গিয়ে দেখি মিটিং হচ্ছে। কালো কালো মানুষ। মেয়র পরিচয় করিয়ে দিলেন মোজাম্বিকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। বেরিয়ে এসে এক তেহরাসে (রেস্তোরাঁ বা ক্যাফের বাইরে চেয়ার পাতা জায়গা) বসে খেলাম। জুতো কিনলাম আশি হাজার লিরা দিয়ে। কী জুতো? সাদা কাপড়ের জুতো, ইতালির ইয়ং মেয়েদের মধ্যে এই ফ্যাশন খুব চলছে মোজা ছাড়া কাপড়ের জুতো পরা, আমাদের দেশে ভিখিরিরা যেমন পরে। আমার পঞ্চাশ হাজার লিরার নোটটি কোথায় হারিয়ে গেছে, অ্যামনেস্টির এক ছেলে পঞ্চাশ

হাজার লিরা ধার দিল। ওখান থেকে পাদোভার সবচেয়ে পুরোনো চার্চ, বিভিন্ন স্কোয়ার, মূর্তি মনুমেন্ট দেখে হোটেলে ফিরলাম। সুন্দর স্নিগ্ধ শহরটিকে আমার ভালো লেগেছে বেশ। রাতে নানারকম পিৎজা খাবার আয়োজন। প্রতিবার অ্যামনেস্টির দশ বারোজন থাকছেই। তারপর বড় এক কালাচারাল সেন্টারে কনফারেন্স। দর্শক শ্রোতা ছিল পাঁচশর ওপর। জমেছিল অনুষ্ঠানটি। শেষে রাত দেড়টা অব্দি আড্ডা চললো এক রেস্তোরাঁর বিশাল তেহরাসে। মধ্যবয়স্ক এক ইতালিয়ান মহিলা, বেশ আমুদে, এক বাঙালি সিভিল সার্ভেন্টের সঙ্গে তিন বছর ৬৭/৬৮ সালে প্রেম করেছিলেন জেনেভায়, তার স্মৃতি চারণ করলেন। উপভোগ করার মতো, কিছু বাংলা গান কিছু কথা ভুল উচ্চারণে বলে গেলেন। সোমালিয়ার এক মেয়ে, পঁচিশ বছর ইতালিতে থাকে, শিক্ষিত, সে আমার পিছ ছাড়লো না। কত কত মানুষ যে এসে বইয়ে সই নিল, দেখে অবাক হলাম। পরদিন সকালে সাবেনা নামের সুন্দরী মেয়েটি এল, থিসিসের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারি কি না। আমি যেরকম আলসে উদাসিন, আমি যে কিছুই আসলে করবো না সে আমি জানি, কিছু লোকের নাম দিয়ে দিলাম ওদের কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য। এরপর আমরা গাড়ি করে ভেনিস। সাবেনাও গাড়ি করে এল, পথে যদি কিছু কথা বলা যায় আমার সঙ্গে। ভেনিসে দাঁড়িয়ে ছিল পুলিশ এবং অ্যামনেস্টির লোকেরা। আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল ভেনিস পৌঁছে, কত শুনেছি ভেনিস শহরের কথা। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম জল-ট্যাক্সি করে, প্রথমেই সিটি হল, আমাকে সম্বর্ধনা দিল লোকাল পার্লামেন্ট, ভেনিস শহরের পেইন্টিং দিল উপহার, পুলিশগুলো এমন সিরিয়াস যে আমি হাঁটতে গেলে মানুষকে ঠেলে সরিয়ে জায়গা করে। সবাই খুব অবাক চোখে তাকায়। আমার এত লজ্জা হয় যে অ্যামনেস্টির ছেলে সিমোনকে বলি পুলিশকে বলতে পথচারি পর্যটকদের যেন ধাককা দিয়ে না সরায়। এখানে কেউ আমাকে খুন করবে না। এরপর জল-ট্যাক্সি করে ভেনিসের সৌন্দর্য দেখা, বাড়িঘরে প্রচুর দৈন্য, রেস্তোরেশন হচ্ছে না, ভেনিসকে আরও নিঁখুত আশা করেছিলাম বোধহয়.. কিন্তু সবকিছুর পরও এটি যে একটি ইউনিক শহর, জলের ওপর ভেসে ওঠা বাড়িঘর, দেখে যা কিছুই বলি না কেন মুগ্ধ হতেই হয়। ছোট ছোট

ক্যানেলগুলোর জল নোংরা, কখনও কখনও পচা জলের গন্ধও বেরোয়। বিশেষ করে সামারে। ওইসব ক্যানেলে জল থাকে স্থির, হবে না কেন! প্যালেস আর প্রিজন পাশাপাশি। প্যালেস থেকে বিচার শেষে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হত প্রিজনে, কেবল একটি ব্রিজ পার হতে হত তাদের, ব্রিজটির নাম ব্রিজ অব সাই-- দীর্ঘশ্বাসের সাঁকো। বন্দিরা প্রিজনে যাবার আগে শেষবার দেখে নিত লেগুন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলত। মনে আছে বায়রনের কবিতা, আই স্টুড ইন ভেনিস, অন দ্য ব্রিজ অব সাইস, এ প্যালেস এন্ড এ প্রিজন অন ইচ হ্যান্ড: আই স ফ্রম আউট দ্য ওয়েভ হার স্ট্রাকচারস রাইজ.. ।

গেলাম দুপুরে বিখ্যাত মাছের রেস্তোরাঁয়। কত রকম মাছ যে খাওয়া হল। সিমোন (সিমোন ভেনিস অ্যামনেস্টির প্রেসিডেন্ট)সিফিস খেল না। খেল না কারণ সে ইহুদি। অবাক হলাম, সমুদ্রের ওপর যার জন্ম সে কী করে সমুদ্রের মাছ না খেয়ে জীবন কাটাতে পারে! আর আমি, মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে শুয়োরের মাংস তো খাচ্ছিই, ভেনিসে বসে নানারকম শামুক, ঝিনুক, অক্টোপাসও বাদ দিচ্ছি না কিছু। সবচেয়ে অস্বস্তিকর ব্যাপার, ভেনিসে পৌঁছার পর থেকে পাঁচজন ক্যামেরাম্যান সারাদিন ফলো করছে আমাকে, পাগলের মতো হাজার হাজার ছবি তুলে যাচ্ছি, এত ছবি দিয়ে কী করবে ওদের পত্রিকা আমি জানি না। ওদের এত যে থামতে বলেছি, মোটেও থামার কোনও লক্ষণ নেই। চিবুচ্ছি, গিলছি তারও ছবি তোলা চাই। খেয়ে দেয়ে জল-ট্যাক্সি করে আর হেঁটে শহর দেখা এবং স্কোয়ারে, থিয়েটারে হাঁটাহাঁটি আর ঘেটোর গল্প শোনা। ঘেটো শব্দটি কোত্থেকে এসেছে জানো তো! ভেনিসের এই এরিয়ার নাম ঘেটো। এখানে ইহুদিরা থাকতো। নেপোলিয়ন ভেনিসে আসার আগে ইহুদিদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতো ভেনিসের রাজা। ওদের প্রায় বন্দি করে রাখা হত ঘেটো এরিয়ায়, বাইরে বেরোতে দেওয়া হত না। রাতে এরিয়ার গেট বন্ধ করে দিয়ে জল-পুলিশ থাকতো পাহারায়, কোনও ইহুদি বেরোলে তাকে মেরে ফেলা হত। গাদাগাদি করে ইহুদিরা ওখানে থাকতো বলে আজ বসিআতর নাম ঘেটো। নেপোলিয়ান এসে ইহুদিদের মুক্ত করে।

টেলিভিশন ক্যামেরা দাঁড়িয়েছিল, আমার সাক্ষাৎকার নেবেই নেবে। ভেনিসের টেলিভিশন নিউজে তা দেওয়া হবে। ভেনিস শহরটি একশটি দ্বীপ নিয়ে গড়া। আরমেনিয়ানরা পুরো একটি দ্বীপের মালিক। ওদের কনভেন্ট, চার্চ সেই দ্বীপে, আরমেনিয়া থেকে প্রচুর লোক আসে এখানে পড়তে, সেই আরমেনিয়ানদের কালচারাল সেন্টারে আমার কনফারেন্সের আয়োজন। প্রচুর দর্শক শ্রোতা। আমার ওপর বললো এক নারীবাদী, আরেকজন ফিলোসফির প্রফেসর, তিনিও লেখক, তিনি লজ্জা সম্পর্কে বললেন, ট্রান্সলেশন করছিল একজন -- - শুনে অবাক হই এই ভেনিস শহরে বসে, এই দূর দূরান্ত লেগুনে লজ্জা বইটির সিরিয়াস আলোচনা। অতপর আমার বক্তব্য। প্রশ্নোত্তর পর্বও বেশ জমল। সিরিয়াস সব শ্রোতা। বিশ্বে নাম হয়েছে বলে চেহারা দেখতে আসা নয়। বামপন্থী কিছু ছেলে ছিল, ওদের প্রশ্ন শুনে বেশ ভালো লাগলো। অনুষ্ঠান শেষে যখন অটোগ্রাফ আর বই সই করবার পালা, মধ্যবয়স্ক এবং বেশ কিছু যুবক বললো তারা ভেনিস শহরের নয়, আমার অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে সেন্ট্রাল ইতালি থেকে এসেছে প্লেনে। এক যুবক বললো, বইএ যেন তার নাম আর তার লাভারের নাম লিখে দিই, নিজেই বললো, আমার লাভার আসতে পারেনি এখানে, তুমি ওর নাম লিখলে ও খুশি হবে। তারপর যে নাম বললো তা একটি ছেলের নাম, নিজেই আবার বললো আমি হোমোসেক্সুয়াল। কী সহজ স্বীকারোক্তি, শুনে মুগ্ধ হলাম। অনুষ্ঠানের পর খানিকটা বিশ্রাম হোটেলে। এরপর রাতের খাওয়া অ্যামনেস্টির বেশ কজন মেম্বারের আমন্ত্রণে, এরপর আবার রাতের ভেনিস দেখা। রাস্তায় কিছু লোক মরককোর জিনিসপত্র বিক্রি করে, পুলিশ এত সিরিয়াস যে এক মরককান আমার দিকে তাকিয়েছিল বলে ধমক দেয়, এরপর সে লোক আসে পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাতে। সাদা পোশাকের পুলিশ, বোঝা তো যায় না বাইরে থেকে যে পুলিশ। একদফা মারামারি হয়ে যায় ওদের মধ্যে। রীতিমত নাক ভাঙা চোয়াল ফাটা মারামারি। আর মেয়ে-পুলিশ যেটি ছিল সে আমাকে দ্রুত সরিয়ে নিয়ে আসে। চার্চ আর প্রাসাদের সামনে চারকোনা বিল্ডিং করে যে বিশাল স্কোয়ারটি তৈরি করা হয়েছে, তা দেখে নেপোলিয়ান

বলেছিলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ড্রইংরুম এটি। এভাবে এক্সপ্লোর, এক্সপ্লোর। ডুবে যাই স্মৃতিতে, নিমগ্ন হই ইতহাসে, ঘ্রাণ নিই ১৫/১৬ শতাব্দির। লিখি --

জলে ভাসা পদ্ম আমার, ভালো আছিস
ভেনিস?
লোকে তোর রূপ দেখে আর আমি দেখি দীর্ঘশ্বাস।
ঘোলা জলে সাঁতার কাটিস
পালক-খসা বুড়ি হাঁস।

মাঝ রাতে কার কান্না শুনে জেগে, দেখি তুই,
জলের খাঁচায় আটকে পড়া রুপোলি মাছ।
কেউ বোঝে কি? কেউ করে না আঁচ।

যুবতীদের স্তন দেখতে সকলেরই আনন্দ হয়
কজন জানে তার তলে কী ক্ষয়!
তোর শরীরে ভাসবে সবার গ্রীস্মসুখের ভেলা--
ওসব ভেবে কী হবে আর, ভালো থাকিস
ভেনিস।
ইচ্ছে হলে খেলিস
আমার সঙ্গে বাকি জীবন কষ্ট-মোচন খেলা।

পরদিন ভোরবেলা প্লেন, রোম হয়ে টুরিন। রোম পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমার নির্ধারিত প্লেন আমার জন্য অপেক্ষা না করে ছেড়ে চলে যায়। বসে থাকতে হয় এয়ারপোর্টে দীর্ঘ চার ঘন্টা।

অবশেষে টুরিন পৌঁছি। টুরিনে অপেক্ষা করছিল অ্যামনেস্টির লোক, পুলিশ। সবসময় আমি যেখানেই যাই সূর্যালোক নিয়ে যাই, টুরিনে বৃষ্টি নিয়ে এলাম। এয়ারপোর্টের রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেলাম, পুলিশ বিল দিল, পুলিশকে এত মানবিক হতে খুব কম দেখা যায়। ওখান থেকে রিকার্ডো, আলেজান্দ্রা আমাকে নিয়ে গেল টুরিন দেখাতে দেখাতে হোটেলে। বিশাল হোটেল, চমৎকার রুম। ওরা বললো সাংবাদিকরা কথা বলতে চায় অনুষ্ঠানের আগে। আমি বললাম আমি বিশ্রাম নিতে চাই, টায়ার্ড। অ্যামনেস্টির প্রেস অফিসার ছিল হোটেলে, সাংবাদিকরা অপেক্ষা করছিল। আলেজান্দ্রা বলে দিল ইন্টারভিউ সম্ভব নয়, তসলিমা টায়ার্ড। শেষ পর্যন্ত ইতালির সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পত্রিকার একজন সাংবাদিককে ওরা কথা বলার জন্য পাঠালো আমার আধঘন্টা বিশ্রামের পর পাঁচ মিনিটের জন্য। সামনে পেছনে দুগাড়ি পুলিশ আর মাঝখানে আমাদের গাড়ি। পৌঁছলাম কনফারেন্স হলে। বিশাল হল। লোক বসা। গভরমেন্টের মহিলারা স্টেজে। আমি স্টেজে ঢুকলেই হাততালি শুরু হয়। অতপর আলোচনা, সকলে আমাকে নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর বেইজিংএর জাতিসংঘ মিটিং নিয়ে দু কথা। নারীবাদী এক মহিলা তো কাঁদলেনই শেষে আমার হাত চেপে ধরে। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকরা ছোট ছোট ইন্টারভিউএর জন্য ভিড় করলো। দিয়ে, সকলে দাঁড়িয়েছিল রাতের খাবারের জন্য বুক করা রেস্টুরেন্টে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য, এদিকে আলেজান্দ্রা মন খারাপ করে আছে ওদের ব্যাবহারে, কারণ ওরা আমার বিশ্রামের দিকে খুব একটা নজর দেয়নি. তাই ও চাইছিল দলের আমন্ত্রণে না গিয়ে দুতিনজন মিলে কোনও রেস্টুরেন্টে খেতে। ওর কথায় রাজি হলাম। অতপর গাড়িতে ঘুরে টুরিন দেখা। বিভিন্ন স্কোয়ার, একটি সেনেগগ, যেটি সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার টুরিনে, জুইসরা খরচ পোষাতে না পেরে সরকারকে দিয়ে দিয়েছিল। টুরিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি, বেশ পরিচ্ছন্ন। একসময় এ শহরটি ইতালির রাজধানী ছিল। রোমান কিছু স্মৃতি এখনও আছে। আছে চমৎকার প্যালেস, যা ফরাসিরা দখল করেছিল। অনেক রাত অব্দি শহর দেখে ফিরে আসি হোটেলে। পরদিন ভোরে টেক্জন। ট্রেন জার্নি আমি পছন্দ করি। আকাশ-পথ আমার একদমই ভালো লাগে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, ট্রেনে চলার

সুযোগ আমার নেই বললেই চলে। ইতালিতেই প্রথম সম্ভব করেছি আকাশ থেকে মাটিতে নামতে। ট্রেনে গেলাম ফ্লোরেন্স। এলিজাবেথা দাঁড়িয়েছিল, সঙ্গে আমেরিকান ট্রান্সলেটর নিয়ে। হ্যাঁ শুরু হল ফ্লোরেন্স দেখার পালা। এলিজাবেথা এত চমৎকার মেয়ে, সারাক্ষণই আমাকে ইতিহাসের গভীরে নিয়ে যাচ্ছে, সারাক্ষণই বিশাল বিশাল কিছুর সামনে দাঁড় করাচ্ছে। মেয়েটি পাগলের মতো আমাকে নিয়ে মেতে রইল। হোটেলে পৌঁছে জিনিসপত্র রেখে খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম প্রথমেই প্যালেস, যেটি এখন মেয়রের অফিস। প্রচুর সাংবাদিক সেখানে ভিড় করেছে। মেয়র আমার জন্য অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দিলেন, প্রেসিডেন্ট অব ফ্লোরেন্স পার্লামেন্ট, নাম দানিয়েলা, ইতালিয় ভাষায় একটি স্টেটমেন্ট তিনিও দিলেন, ইংরেজেতে তার তর্জমা হল, ফ্লোরেন্স সিটি তসলিমাকে পেয়ে গর্বিত, আনন্দিত। ফ্লোরেন্স সিটি তাকে যে কোনও রকম সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। ফ্লোরেন্সের দরজা তসলিমার জন্য সবসময় খোলা। তসলিমাকে সম্মান জানিয়ে এই আর্ট কালচারের শহর ফ্লোরেন্স নিজেকেই সম্মানিত করলো। মেয়র আমাকে দিলেন একটি মেডেল। এরপর প্যালেসটি দেখানোর ব্যবস্থা। খুলে দেওয়া হল একটির পর একটি ঘর, যেখানে রাজ-আকিঁয়েরা ছবি আঁকত, ফ্রান্সিস ওদের একজন, সেই ছবি আঁকার ঘর থেকে কোনও দুর্যোগ এলে চোরা পথে কী করে পালাতে হবে তারও সিঁড়ি ফিড়ি আছে, গোপন কুঠুরি, খুলে দেওয়া হল মধ্যযুগের সেই পৃথিবীর মানচিত্র আঁকার ঘর। বিচিত্র সব মানচিত্র দেখে আপনাকে বড় মনে পড়ছিল। আপনার নিশ্চয় খুব ভালো লাগতো দেখে পৃথিবীর জিওগ্রাফি-অনুমান আগে কেমন ছিল, আপনি তো লিখেছেন কেবল ভারতের অনুমান নিয়ে। আপনাকে পাঠাবার জন্য মানচিত্র বিষয়ে কোনও বই আছে কি না জিজ্ঞেস করলাম।বলল একটি বই শিগরি বেরোবে। অজস্র ভাস্কর্য, বিশাল হলঘর যেখানে আগে রাজাদের বৈঠক হত, কী ভীষণরকম উজ্জ্বল। সবচেয়ে মজার হল, সেই পেলেৎজা ভৎসা থেকে গোপন পথে শহরের এক কোনা থেকে আরেক কোনার দুর্গে পৌঁছে যাওয়া যায়। শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য ওরা সবাই প্রস্তুত থাকতো।

ডেভিডের একটি কপি রাখা প্যালেসের দরজায়। ডেভিড. আমার প্রিয় ভাস্কর্য। ওর হাত ও মাথা যদিও প্রোপরশন মানেনি, ওর নিস্পাপ মুখ আর ঘৃণা ছুঁড়ে দেওয়া শত্রুর দিকে-- সে অপূর্ব। পরে অবশ্য অরিজিনাল ডেভিড দেখেছি মিকেলেঞ্জেলোর মিউজিয়ামে, মিউজি উফিজির একটি অংশে। মিকেলেঞ্জেলোর অন্য কাজগুলো --বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার সংগ্রাম বেশ ভালো লেগেছে। ভিঞ্চির ছবি দেখলে বোঝা যায় তিনি কী করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন গোতো, ফিলিপিনো লিপি, ফ্রান্সেসকো, বটিচেলির আবহাওয়া থেকে। ভিঞ্চির রিলিজিয়াস ছবিগুলোয় এঞ্জেলদের ডানা পাখির ডানার মতো হত, সোনালি স্বর্গীয় নয়, মেরিকে আঁকলে পায়ের নিজের ঘাসগুলোই জীবন্ত হত বেশি মেরির চেয়ে। ফ্লোরেন্সের আর্ট এক্সপার্ট মিউজিয়ামগুলোয় আমার সঙ্গে ঘুরেছেন। তিনশ ট্যুরিস্টের লম্বা লাইন তোয়াককা না করে আমাকে সোজা ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং নিয়ম ভেঙে মেডেসির ১৬ শতাব্দির বাগানে ঢোকা। অপূর্ব।

হাঁটলাম ৮০০ সালের সেই বিখ্যাত ব্রিজে, যেখানের দোকানগুলো এখনও আগের মতো, যেন কাঠের বাক্স। না নিখিলদা, ফ্লোরেন্স আমার বলে বোঝাবার উপায় নেই। যদি কখনও সম্ভব হয়, ফ্লোরেন্স দেখতে যাবেন। এ না দেখলে জীবন পূর্ণ হয় না। ফ্লোরেন্সের মানুষগুলোও অসাধারণ। প্রতিদিন যাদের সঙ্গে আমার লাঞ্চে ডিনারে কথা হয়েছে, এরা পারলে জীবন দিয়ে দেয়। এলিজাবেথা তো একাই আমার টেলিফোন বিল দুলক্ষ লিরা, যা যা কিনতে ইচ্ছে করে আমার, সবই দুহাত ভরে দিল, আমাকে এক পয়সা খরচা করতে দিল না। আবার কবে ফ্লোরেন্স আসবো, তাই নিয়ে পীড়াপীড়ি। ফ্লোরেন্সে কনফারেন্স হল সিটি হলে। দুদিন ছিলাম। শেষ দিন আড়াইশ ইতালিয়ান কেবল অ্যামনেস্টি ফ্লোরেন্সের নয়, ফ্লোরেন্সের পাশের এক সিটির মেয়র, এবং ফ্লোরেন্স মেয়র, পার্লামেন্ট প্রেসিডেন্ট আমাকে রিসিপশন দিল যৌথভাবে। দিল মেডেল, গিফট। তাসকুনিয়া--অনেকগুলো সিটি নিয়ে বড় একটি রিজন, ফ্লোরেন্স যার একটি সিটি, সেই প্রেসিডেন্ট আমাকে সম্বর্ধনা জানালো, দিল মেডেল, নাৎসি বিরোধী এক মেডেল। পরদিন ট্রেনে গেলাম রোম। স্টেশনে সবাই এসেছিল। ওরা প্রায়

কাঁদো কাঁদো আমাকে ছেড়ে। রোমে অন্য অবস্থা। অযথা পুলিশের বাড়াবাড়ি। অ্যামনেস্টির সব প্রোগ্রাম চেঞ্জ করা হল। হোটেল, কনসার্ট, এয়ারলাইন, সময়। পুলিশগুলো সারাক্ষণই পিস্তলের ট্রিগারে আঙুল রেখে আমার সঙ্গে চলেছে। ঘটনা হল, বাংলাদেশ অ্যামবেসি থেকে ফোন পেয়েছে অ্যামনেস্টি, ইতালিতে বাস করা কিছু বাংলাদেশি নাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। অ্যামনেস্টি সরকারকে জানিয়েছে এসব খবর। এখন মিনিস্ট্রি থেকে কড়া পাহারা দেবার হুকুম এসেছে। যাই হোক, ভ্যাটিকান থেকে শুরু করে রোমের ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো দেখা হয়েছে। মিউজিয়াম দেখার সুযোগ ছিল না। ফ্রান্সেসকা চমৎকার মহিলা, প্রেসিডেন্ট অব ইটালিয়ান অ্যামনেস্টি, যথেষ্টই যত্ন আত্তি করলেন। জানালেন মেয়র শিগগির ডিক্লেয়ার করছেন আমাকে সিটিজেন অব রোম, অফিশিয়াল ডিশিসান হয়ে গেছে। পরদিন সকালে রোমের ন্যাশনাল টিভির লাইভ অনুষ্ঠানে আমার ইন্টারভিউ। তা শেষ করে ঘুরে বেড়ানো, পথে দেখলাম বাংলাদেশিরা চশমা মালা ইত্যাদি বিক্রি করছে, এক বাঙালি অটোগ্রাফ নিতে আমার কাছে আসতে চাইলে পুলিশ ধাককা দিয়ে ফেলে দেয় তাকে। মায়াই হয় খানিকটা।

বর্ণ

পাশ্চাত্যের উঁচু শ্রেণী আমাকে মিষ্টি হাসি শেখাচ্ছে, অচেনা অপরিচিত হলেও তাদের দিকে কৃত্রিম হলেও একটি হাসি ছুঁড়ে দেওয়া শেখাচ্ছে, ধন্যবাদ বলতে শেখাচ্ছে, অকারণে ধন্যবাদের ফোয়ারা ছুটিয়ে অন্যকে স্নান করা শেখাচ্ছে, তারা আমাকে সভ্যতা শেখাচ্ছে। না, আমি তার সবটা কিছুতেই শিখতে পারছি না। অন্যকে বেফাঁস কথা বোলো না, অন্যের প্রতি যদি অভিযোগ থাকে, ঘৃণা থাকে, তা মনে পুষে রাখো, কিছুতেই প্রকাশ কোরো না। এই হল নীতি। দক্ষিণের দেশে তত না হলেও উত্তরের দেশের সংস্কৃতিই এই। উত্তুরে হাওয়া আমার গায়ে লেগেছে এ কথা আমি জোর দিয়ে বলি না। কিন্তু বিচ্ছুর মত কামড়ে ধরেছে। পশ্চিমে যা ভালো, তা অবশ্যই গ্রহণ করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কৃত্রিমতাগুলো আমি চাই না ধারণ করতে। আসলে আমি পারি না। খোলস বা মুখোশ বরাবরই খসে পড়ে আমার গা থেকে। কিন্তু তারপরও হঠাৎ হঠাৎ নিজেকে দেখে বেশ ভয় লাগে আমার, আমি লক্ষ করি যখন প্রতিবাদ করা উচিত আমি করছি না। আমি চুপ হয়ে আছি। আমি শুনছি। অন্যের কথা শুনছি। অন্যের কথা যদি পছন্দ না হয়, তবুও চুপ হয়ে শুনে যেতে হবে। এর নাম অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। একজন যখন কথা বলছে শেষ না হওয়ার আগে তুমি কথা বলতে পারো না। তুমি পুরোটা শোনো সে কী বলতে চাইছে, তারপর তোমার মত প্রকাশ করো। এই হল অতিশীতল অতিআপোসকামী অতিগণতন্ত্রের দেশের নিয়ম। নিয়মটি হঠাৎ একদিন কোনও একটি ঘটনা থেকে আমি শিখিনি। ধীরে ধীরে কুইনাইন বড়ির মত আমাকে গিলতে হয়েছে। গিলতে ভালো না লাগতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটি একসময় আমার যৌক্তিক বলেই মনে

হয়েছে। প্রতিবাদ করতে গেলে গলার স্বর নরম করে করতে হবে। হ্যাঁ খুব নরম করে। আমি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি, ব্যাপারটি যেন কোনওভাবেই তেমন না হয়। মালিন নিশ্চয়ই কোথাও ফোন করে বিল তুলেছে, তা না হলে তিন মাসে ছাপাণ্ন হাজার টাকা বিল আসে কী করে? মধ্যবিত্ত সুইডদেরই পাঁচশ টাকার মধ্যেই থাকে টেলিফোন বিল। দেশে আমি যা ফোন করি, তাতে এত বিল ওঠার কথা নয়। আগের মাসের অভিজ্ঞতা আমার এরকম নয়। লিলিয়ানার সেই দ্বীপের বাড়িতে এক মাসের ফোন বিল আট হাজার ছিল। না, মালিন সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। তুমি তো জানো না মালিন নিজের কাজে ফোন করেছে কী না। নিশ্চয়ই সে তোমার কাজ ছাড়া অন্য কিছু করেনি। আমাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে যেতে হয়। লিডিঙ্গোর বাড়িওয়ালি যখন আমাকে হঠাৎ করে বলল, বাড়ি ছাড়তে হবে। আগে থেকে নোটিশ যে দিতে হয়, তা না দিয়েই। আমাকে যে কথা দিয়েছিল অন্তত এক বছর আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারি, সেই শর্ত মুখের ওপর ভেঙে দিয়ে যে বলল বাড়ি ছাড়ো। আমি এখন হঠাৎ কোথায় যাবো, থাকার জায়গা কোথায় পাবো? সে নিয়ে বাড়িওয়ালির যে কোনও মাথা ব্যাথা নেই। তার কী হবে? প্রতিবাদ হবে না? না। হবে না। যখন এটি আমি সুয়ান্তে ভেইলর কে জানালাম, আমার নিরাপত্তা বাহিনীকে জানালাম, এবং অভিযোগ করলাম যে বাড়িওয়ালি তো শর্ত ভঙ্গ করছে। দেখলাম সুয়ান্তে বাড়িওয়ালির শর্ত ভঙ্গ নিয়ে একটি টুঁ শব্দ করলো না। আমার এই অভিযোগ করাটি কারওর পছন্দ হয়নি। সকলেই মিনমিন সুরে বললো, *নিশ্চয়ই তার হঠাৎ কোনও দরকার পড়েছে বাড়িটির।* এ কী কোনও কথা হল? আইনত যে সময় এখানকার বাড়িওয়ালি বা ওয়ালারা সব ভাড়াটেদের দেয়, তা তো দেবে আমাকে? না তা দেবে না। হঠাৎ বলল, সাতদিন পর আমার বাড়ি দরকার। বাড়ি ছাড়ো। এ আচরণ তোমাদের সঙ্গে করলে তোমরা মানতে? চুপ। আমি নিশ্চিত তোমরা তা মেনে নিতে না। তোমরা প্রশ্ন করতে। তোমরা আইন দেখাতে। তাই না? নাকি সেই মহিলা তোমাদের সঙ্গে এ আচরণ করত না, আমি বলেই করেছে? এ প্রশ্নটি আমি করি, এবং ওদের কাছ থেকে

কোনও উত্তর জোটে না, তবে একটি উত্তর আমি পেয়ে যাই খুব গভীরে কোথাও আমার। না, করত না। মহিলা ওই আচরণ এখানকার সুইডদের সঙ্গে করতো না।

আমাকে ওরা শিখিয়েছে, *তোমার অভিযোগগুলো তুমি প্রকাশ করো না। কারণ অভিযোগ করা কখনও শোভন নয়। অন্যকে শ্রদ্ধা করো।*

--এমনকী অন্যায়কারীকেও?

--হ্যাঁ তাকেও। কারণ সেও মানুষ। সে যে অন্যায় করছে, নিশ্চয় তার কোনও কারণ আছে। কারণটি খুঁজতে হবে। কারণের চিকিৎসা করা উচিত।

সবই খুব চমৎকার। মহিলার কোনও চমৎকার কারণ আছে সাতদিন পর ভাড়াটে উঠিয়ে দেবার। সাতদিনের নোটিশে বাড়ি ছাড়ার আদেশটি আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে আপাতত। এ-ই আমাকে অনেকটা চেপে ধরে শেখালো আমার উপদেষ্টা এবং নিরাপত্তা বাহিনী। মালিন হঠাৎ ঘরের যা ছিল সব কাপড় কাচার মেশিনে ঢোকাতে শুরু করল। যে লেপ ব্যবহার করা হয়নি, সেই লেপও ঢোকাচ্ছে সে মেশিনে। কেন গো? এরকমই নিয়ম। কিন্তু কেউ তো ও লেপ ব্যাবহার করেনি! না করলেও সবই পরিস্কার করতে হবে। ব্যবহার না করলেও ধুতে হবে, কাঁচতে হবে, এর মানেটা কী মালিন, আমাকে বোঝাবে? বোঝানোর কিছু নেই। এ নিয়ম। ঘর পরিস্কার করে দিয়ে যেতে হবে। এক ফোঁটা ধুলো নেই কোথাও, সবই সাজানো, গোছানো, তারপরও ধুলো ঝাড়ার মেশিন চলছে তো চলছেই।বিরামহীন চলছে কাপড় কাচার মেশিন । চারদিকে মেশিন আর মেশিনের বিকট আওয়াজ। না, এ বাড়িতে আমি তারকা নই। আমি বুঝি যে এখানে আমি তৃতীয় বিশ্ব থেকে আসা এক অশিক্ষিত অসভ্য মেয়ে। এখানে তোমরা আমাকে জ্ঞান দেবে। আর ঘরের বাইরে বেরোলেই আমাকে মঞ্চে তুলে দিয়ে আমার কাছ থেকে জ্ঞান নেবার ভান করবে। আসলে আমি ভানই বলবো। কিছু কি সত্যিই শিক্ষা নাও? আমার অভিজ্ঞতার গল্প শুনতে শুনতে গায়ে তোমাদের কাঁটা দিয়ে ওঠে। ও মা, ওখানে বুঝি ওসব হয়?

ওখানের ওসবের দ্বারা নির্যাতিত বলে আমার জন্য তোমরা হাততালি দাও। ওসবের প্রতিবাদ করেছি বলে আমাকে বাহবা দাও। কিন্তু তোমাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ আমার করা নৈব নৈব চ। আমি করতে চাইলে চোখ কুঁচকে উঠবে তোমাদের। ভাবটা এমন যে এখানে কিছু হলে সে প্রতিবাদ তোমরা করবে, আমার করার দরকার নেই। বিশাল জ্ঞান নিয়ে কথায় কথায় তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করে ফেলো যে, *আচ্ছা তুমি বলেছো তুমি ডাক্তারি পড়েছো?*

--হ্যাঁ তা পড়েছি।

--কী ধরনের ডাক্তার তুমি?

--কী ধরনের মানে? ডাক্তার তো ডাক্তারই। মানুষ অসুস্থ হলে চিকিৎসা করি।

--নানা রকমের ধরন তো হয় ডাক্তারের। ধরনটা বলো। তোমাদের দেশিয় চিকিৎসার ডাক্তার নিশ্চয়ই।

--দেশিয় চিকিৎসা বলতে কী বোঝাচ্ছো?

--ট্রাডিশানাল চিকিৎসা। ধর ওই ঝাড়ফুক, কবিরাজি, আয়ুর্বেদি.. কী যেন বলে ওসবকে।

--না। আমি ওসবের ডাক্তার নই। আমি অ্যালোপেথিক ডাক্তার।বিজ্ঞানভিত্তিক ডাক্তার।

-- তুমি তো তাহলে ওয়েস্টার্ন মেডিসিনের কথা বলছো?

--মেডিসিনের যে ওয়েস্টার্ন ইস্টার্ন আছে, তা তো জানতাম না !

--তা তো আছেই। ওই মেডিসিন তো আমাদের তৈরি।

--তোমাদের মানে? তোমাদের দেশের?

--আমাদের, মানে পশ্চিমের। ওয়েস্টের।

--ও।

--কোন দেশে লেখাপড়া করেছো? ইংলেণ্ডে?

--না।

--তাহলে কোন দেশ থেকে ডিগ্রি নিয়েছো?

--আমার দেশ থেকে। বাংলাদেশ থেকে।

--বাংলাদেশে.? ওখানে ডাক্তারি পড়ানো হয়?

--নিশ্চয়ই হয়।

ওখানে মানুষ লেখাপড়া জানে?

--নিশ্চয়ই জানে।

তোমরা শুনে আকাশ থেকে পড়। গ্যাবি যেমন আমি কমপিউটারে লিখি জেনে প্রশ্ন করেছিল, *ও মা, ওদেশে কমপিউটার আছে?* এই জ্ঞান এই বিদ্যে কিন্তু লালিত হয় বেশ। কেউ দ্বিমত পোষন করে না।

দারিদ্র আছে সে আমি অস্বীকার করছি না। দেশকে কোনও কারণে খামোকা প্রশংসা করার বা খামোকা নিন্দা করার আমি কিছু দেখি না। যে কোনও দেশেই নানারকম দারিদ্র আছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক। কোথাও মননের, শিক্ষার, কোথাও চিন্তার। যদিও চিন্তার দারিদ্র সবচেয়ে বড় দারিদ্র, একে কী আর ভাবা হয় দারিদ্র বলে! অর্থনৈতিক উন্নতিকেই আজকাল উন্নতির মাপকাঠি বলে ধরে নেওয়া হয়, সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি যতদিন না হয়েছে আমার দেশ, ততদিন আমি ঠিক তাদের কাতারে পড়ি না। আমাকে পড়তে দেওয়া হয় না। আমি তারকা হতে পারি, সে মঞ্চে, মঞ্চের বাইরে নয়। এই লিডিঙ্গোর বাড়িতেই যখন ঢুকি, একটি নতুন টেলিফোন নম্বর পেতে গেলে দশ হাজার ক্রাউন জমা দিতে হবে, বলে দেওয়া হল। কেন, আমি যেহেতু এ দেশের নাগরিক নই। কিন্তু কোনও নাগরিক যদি মুচলেকা লিখে দেয়, তবেই আমার নামে আমি টেলিফোন পেতে পারি। মুচলেকা লিখে দেওয়ার জন্য আমি নিশ্চিত আমার প্রকাশক প্রস্তুত। অথচ অবাক কাণ্ড, সুয়ান্তে ভেইলর আমাকে মুচলেকা লিখে দেয়নি। দশ হাজার ক্রাউন নগদ জমা দিয়ে আমাকে একটি টেলিফোন নম্বর পেতে হয়েছে। তারপর তো একদিন তার চোখের সামনেই টেলিফোন বিল ছাপান্ন হাজার টাকা এক দফায় দিতে হল। তার আগে প্রশ্ন করেছিলাম, *আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, টেলিফোন কোম্পানি কোনও ভুল বিল দিল না তো।* একবাক্যে সুয়ান্তে বলল,

আরে না, তা হতে পারে না। তার মানে আমি ভুল করতে পারি, কোম্পানীর কোনও ভুল হতে পারে না। যদি একই প্রসঙ্গে আমি বাংলাদেশের টেলিফোন কোম্পানীর কোনও ভুলের কথা বলতাম, মাথা নেড়ে সায় দিত যে হ্যাঁ ওরা ভুল করেছে। সুইডেনের কোম্পানি কোনও ভুল করতে পারেনি। এরা নির্ভুল। এরা নিষ্পাপ। এরপর আমাকে গোপন রাখতে হয়েছে গ্যাবির টেলিফোনের সঙ্গে আমার টেলিফোনের মিল করে দেওয়ায় কোনও অমিল হল কি না, তার টেলিফোনের বিল আমার টেলিফোনের বিলে যুক্ত হল কি না-- আমার এই সংশয়টির কথা। আমাকে সংশয় সন্দেহের উর্ধে উঠতে হবে, আমার কোনও সংশয় করা চলবে না। এটি মনে মনে নিজেকে বলি। তোমার গলা যদি কেউ কাটতে চায়, তবে নিঃশব্দে তুমি গলাটা কাটতে দেবে। সে যে গলা কাটতে চাইছে, নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে গলা কাটার, তাই কাটতে চাইছে। সুতরাং তুমি শব্দ করো না। নড়ো না চড়ো না। যে গলা কাটতে চাইছে, তাকে বিরক্ত কোরো না। সে সুইড। ধনী দেশের লোক। সাদা। অশিক্ষিত হলেও, চোর বদমাশ গুণ্ডা হলেও সে সুইড। এই পরিচয় অনেক বড় পরিচয়।

সুইডেনের দেওয়া কুর্ট টুখোলস্কি পুরস্কারের টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ক্রোনার, প্রায় ন লক্ষ টাকা, ফুরিয়ে যায় সুইডেনেই। তিন চার মাসেই। কী করে ফুরোয়, কেন ফুরোয়, বুঝি না। তবে ফুরোয়। টাকার হিসেব করতে কোনওদিনই আমি জানিনি। এখনও জানি না।

এ দেশে লোকে জানালায় জানালায় পতাকা লাগায়। প্রথম যখন চোখে পড়ে, সুইডিশ বুদ্ধিজীবিদের শুধিয়েছিলাম, *আজকে তোমাদের কী?*

--আজকে কী মানে?

--আজকে কি বিশেষ কোনও দিবস? কোনও জাতীয় দিবস?

--না তো!

--তবে যে বাড়িতে বাড়িতে পতাকা।

--ও এমনি।

--এমনি মানে? কোনও কারণ ছাড়া? কোনও দিবস ছাড়া?

--হ্যাঁ সারাবছরই ওড়ে অমন।

--বাড়িগুলো সরকারি আপিস বা কিছু?

--না। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নিজেদের বাড়িঘর।

এই পতাকা ওড়ানো ওয়ালাদের বলা হয় জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তাবাদ শব্দটি মন্দ। হিটলার বিশ্বযুদ্ধ শুরু না করলে জাতীয়তাবাদ ভালো শব্দের কাতারে দাঁড়াতে পারতো। কিন্তু কট্টর জাতীয়তাবাদী হলেই নিজের জাতকে রাখবো, অন্য জাতকে ঘৃণা করবো ধরনের একটি অসহিষ্ণু মন তৈরি হয়। যে মন ছিল হিটলারের। গোটা ইওরোপ জ্বলেছে জাতীয়তাবাদের আগুনে। এখন ভিতরে ভিতরে সেই আগুনের প্রতি পক্ষপাত থাকলেও নিজেকে জাতীয়তাবাদী হিসেবে পরিচিত করা মোটেও পলিটিক্যালি কারেক্ট নয়।

--নিজেদের ওরা কি তবে জাতীয়তাবাদী বলছে? ইচ্ছে করেই?

--আসলে..

--আসলে কী?

--আসলে কিছু নিও নাৎসি ওরকম পতাকা টাঙাতো। ওদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণ মানুষও এখন পতাকা টাঙায়..

--কেন, এটা বলতে যে তারা সবাই নিও নাৎসি?

--না, এটা বলতে যে পতাকা উত্তোলনে আমরা দেশপ্রেম প্রমাণ করবো, জাতীয়তাবাদ নয়।

-- দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ এদুটোর মধ্যে পার্থক্য কী ?

--পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে।

--আমার মনে হয় গভীর সম্পর্কও আছে।

সম্পর্ক না থাকলে কালো বাদামী মানুষগুলো, যারা এই দেশে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আশ্রয় নিয়ে এ দেশের বাসিন্দা হয়েছে, তাদের কেন রিংকিবি নামের একটি শহরতলিতে থাকতে হয়?   সাদা সুইডরা   ভিতরে ভিতরে বর্ণবাদী বা জাতবাদী না হলে নিশ্চয়ই

পাশাপাশিই বাস করতে পারতো। এ দেশের নোংরা কাজগুলো করার জন্য কালো বাদামি লোকদের নামিয়ে দেওয়া হয়। ভালো কাজগুলো করবে সাদা লোকেরা। শিক্ষিত লোক, যোগ্য লোক, কিন্তু ত্বক যদি সাদা না হয় চাকরি পাবে না। অযোগ্য হলেও চাকরি পাবে সাদারা। এই চলছে নিরন্তর। অথচ বলা হচ্ছে এই দেশ মানবাধিকার রক্ষায় বিশ্বের এক নম্বর। পিছনে কারণ দুটো, হয় ভীতি, নয় সোশাল ডারউইনিজম।

সোশাল ডারউইনিজম। ডারউইন তত্ত্বের অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়। হারবার্ট স্পেনসার নামে উনবিংশ শতাব্দির এক ইংরেজ দার্শনিকের তথাকথিত দার্শনিক, ধার্মিক, আর্থসামাজিক তত্ত্ব ছিল *সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট* / স্পেনসারের এই তত্ত্বের সঙ্গে ডারউইনের *অরিজিন অব দ্য স্পেসিস* তত্ত্বের মিল করিয়ে বাজারে ছেড়ে দেওয়া হল, আর গোটা ইউরোপ, কেবল ইউরোপ নয়, আমেরিকাও লুফে নিল। সেই সময়ের সমাজের উঁচু তলার মানুষ, তাত্ত্বিক, সমাজবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ সকলের কাছে সোশাল ডারউইনিজমের ভীষন জনপ্রিয়তা। কেউ দ্বিমত করেনি, প্রতিবাদ করেনি। উনবিংশ আর বিংশ শতাব্দি জুড়ে সোশাল ডারউইনিজমের জনপ্রিয়তার ফসল ক্রীতদাস প্রথা, ঔপনিবেশিকতা। শুধু তাই নয়, সামাজিক ডারউইনবাদ দিয়ে শ্রেণীভেদ, জাতভেদ, আর লিঙ্গভেদকেও যৌক্তিক বলা হয়েছে। আমি উঁচুতে, তুমি নিচুতে। এর মানে আমি ওপরে উঠতে পারি, তোমার ওপরে ওঠার ক্ষমতা নেই। তুমি আমার চেয়ে বুদ্ধি অনেক কম রাখো, তোমার মস্তিস্কের চেয়ে আমার মস্তিস্ক উন্নত। সুতরাং বেঁচে থাকার যোগ্যতা তোমার চেয়ে আমার বেশি। দুর্বল প্রাণী মরে যায়, সবল প্রাণী বেঁচে থাকে, অথবা দুর্বল প্রাণীকে সবলের অধীনে বেঁচে থাকতে হয়, এই যুক্তিকে মানুষের বেলায় জাত ভিত্তিতে প্রয়োগ করেছিল পশ্চিমের দার্শনিকরা। এশিয়া আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার মানুষজাত দুর্বল, ইওরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সাদা মানুষের জাত সবল। সবল বলেই যা কিছু শিক্ষা, যা কিছু আবিস্কার সবই ইওরোপ আমেরিকাতেই হচ্ছে। তাই কালো বাদামীদের ক্রীতদাস বানাতে বা কৌশলে এদের সম্পদ করায়ত্ত করে এদেরই নাকে দড়ি লাগিয়ে ঘোরাতে, পায়ে পিষতে কেউ

কোনও আপত্তি করেনি। মানুষ হিসেবে কালো এবং বাদামিরা নিম্নমানের, নিম্নজাতের --- এই শিক্ষা পশ্চিমের লোকেরা মস্তিস্কের কোষে কোষে শতাব্দি জুড়ে লালন করছে। এ সহজে বিলুপ্ত হবার নয়। সমাজে কেউ ওপরতলায় কেউ নিচতলায়, এর পিছনে রাজনীতি কাজ করতে পারে, চতুর অর্থনীতি কাজ করতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে প্রজাতির ভেদ থাকবে কেন! এই সামাজিক ডারউইনবাদে এমনই আচ্ছন্ন ছিল পশ্চিমের উঁচু শ্রেণীর মানুষ যে, মানুষের মধ্যে জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা না ঘটিয়ে প্রতিযোগিতা ঘটিয়েছে। মিলনের বদলে মিলিটারি বাড়িয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ এই নয় কিন্তু। ডারউইনের মতে প্রাণীকূলের ভিতরেই পরিবর্তন ঘটে, প্রতিকুল পরিবেশটিকে অনুকুল করতে, বেঁচে থাকাকে সহজতর করতে। যারা অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে না, তাদের বেঁচে থাকা হচ্ছে না। মানুষের বেলায় এই অনুকূল পরিবেশটি না থাকার কারণ প্রাকৃতিক নয়, না থাকার কারণ মানুষেরই তৈরি করা মানুষের কুৎসিত রাজনীতি।

১৮৭০ সালে মধ্য-আফ্রিকার আদিবাসি পিগমি মানুষদের জাল দিয়ে শিকার করে নিয়ে এসেছিল ইংরেজ বিজ্ঞানীরা। চিড়িয়াখানায় পুরে রেখেছিল। না, মানুষ বলে ওদের ওরা মনে করেনি। হাজার হাজার মানুষ কালো বর্ণের বেটে মানুষদের দেখতে ভিড় করতো চিড়িয়াখানায়। মানুষ তো নয়, ওরা ছিল সাদা লম্বাদের কাছে জন্তু। সামাজিক ডারউইনবাদ তত্ত্ব তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। কালো রঙের বেটে মানুষগুলো যে *মানুষ* ছিল, *জন্তু* ছিল না, তা বুঝতে ইওরোপিয়দের বহুকাল সময় লেগেছে।

বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোশাল ডারউইনিজমের জনপ্রিয়তা চলে গেছে। চলে গেছে না কচু, সামাজিক শরীরতত্ত্বের মধ্যে নির্ঘাত বিবর্তিত হয়ে এসেছে। হার্ভার্ডের বিখ্যাত সামাজিক শরীরতত্ত্ব বিশারদ এডওয়ার্ড উইলসন বলেছেন, অনেকটা এরকম যে, *একটি পিঁপড়েকে বুঝে কোনও লাভ নেই, বুঝতে হবে পিঁপড়ের পুরো কলোনিকে। কোনও ব্যক্তির ডিএনএ-এর চেয়ে মূল্যবান সেই ব্যক্তির যে জাত, তার ডিএনএ।* তাই যদি হয়, তবে কোনও একটি জাতের কোনও একটি ব্যক্তি অপরাধ করলো, তাহলে তাকে শাস্তি

দিতে হলে গোটা জাতিকেই শাস্তি দিতে হয়। হ্যাঁ, উইলসনের তত্ত্ব অনুযায়ী তাই হয়। এশিয়া আফ্রিকার সঙ্গে ইওরোপের মানুষদের তফাৎ বোঝাতে উইলসন অনেক ছল চাতুরির আশ্রয় নিয়েছেন। অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলেছেন ইওরোপের মানুষেরা উন্নতমানের। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসিরা যেহেতু সভ্যতা গড়ে তুলতে পারেনি, যেমন সভ্যতা গড়েছে ইওরোপিয়রা, তাই সেই আদিবাসি জাতটাই নিম্নমানের। ভারতের কোনও একটি প্রাণী মাথামোটা, তো গোটা ভারতই মাথামোটাদের জায়গা।

হল্যান্ডে নামার আগে পশ্চিমের বর্ণবাদের এত কুৎসিত রূপ আমার দেখা হয়নি। পশ্চিমের যে কোনও দেশে ভ্রমণ করতে গেলেই আমার পাসপোর্টে ভিসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইওরোপের ধনী দেশগুলোর কারওর পাসপোর্টে ইওরোপ আমেরিকায় যেতে ভিসা লাগবে না। এই নিয়মটি কেন? এ নাকি বিশ্বায়নের যুগ! ইওরোপের কিছু বুদ্ধিজীবীকে প্রশ্ন করেছিলাম, *আপনাদের ভিসা লাগছে না, আমার লাগছে কেন?* প্রশ্নটির উত্তর তাঁরা জানেন, কিন্তু উত্তর দেন ঘুরিয়ে, বলেন, *এক একটা দেশের জন্য এক এক রকম নিয়ম।*

আমি হেসে উঠি ---*নাকি এক একটা জাতের জন্য এক এক রকম নিয়ম?*

---কেন, আমাদের তো ভিসা লাগে ভারত যেতে গেলে। বাংলাদেশ যেতে গেলে!

---তা লাগে। গরিব দেশ ভিসা দিয়ে কিছু টাকা উপার্জন করে।

-- টাকা নেওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য..

---ধনীদের কাছ থেকে গরিব দেশ যদি ভিসার মাধ্যমে কিছু টাকা রোজগার করে ক্ষতি কী! কিন্তু ইওরোপ আমেরিকার ধনী দেশগুলো গরিবদের কাছ থেকে কী করে কাড়ি কাড়ি টাকা নিচ্ছে! ধনীদের কাছ থেকে কিন্তু নিচ্ছে না। ধনী দেশের মানুষের কোনও ভিসার দরকার হয় না। ভিসার জন্য আবেদন করতে গেলেই টাকা দিতে হয়। অনেককে ভিসা দেওয়া হচ্ছে না, তাদের কিন্তু টাকাও আর ফেরত দিচ্ছে না। গরিব দেশে তো এ হয় না। ধনীদেশের কাউকে বাধা দেওয়া হয় না গরিবদেশে ঢুকতে।

হয় তাঁরা তখন বলেন যে ---*নিশ্চয়ই দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে।* অথবা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে নেন আলোচনা।

বিলেতে দু বছরে অন্তত পঁচিশবার আমন্ত্রণ পেয়েছি। গিয়েছি বারো বার। লন্ডন থিয়েটারের কবিতা পড়া, লন্ডন পেন এর আমন্ত্রণ, ব্ল্যাকপুলে সমাজতান্ত্রিক দলের কনভেনশন, ডিলান টমাসের শহর সুয়েনসিতে বাৎসরিক কবিতা উৎসব, অক্সফোর্ডে বক্তৃতার আমন্ত্রণ, হাউজ অব কমনসে বক্তৃতা এরকম অনেক। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের অতিথি হয়ে পুরো ব্রিটেন ভ্রমণ। নটিংহাম, নিউক্যাসেল, এডিনবরা, বেলফাস্ট। নটিংহাম আর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মৌলবাদী ছাত্রছাত্রীদের রোষের মুখে পড়েছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে বলতে গেলেই এই সমস্যা, ওখানে বিভিন্ন দেশের ছাত্র ছাত্রী পড়াশুনা করে। মুসলিম ছাত্রদল নামের একদল তরুণ জঙ্গী প্রায় সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে মেলে। কানাডার মত শান্তশিষ্ট দেশেও সমস্যা হয়েছিল আমার। কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টার ছেয়ে গেছে বিজ্ঞাপনে। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল। মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের মিছিল। তারা কিছুতেই আমাকে দেবে না কোনও সভা করতে। আমার কোনও দুশ্চিন্তা নেই এসব শুনে। আমাকে ঘিরে আছে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। নিরাপত্তা রক্ষীতে ছেয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিটি দর্শক শ্রোতাকে চিরুনি তল্লাশি করে ঢোকানো হচ্ছে বিশাল সেই অডিটোরিয়ামে। কিন্তু হলে কী হবে। আমার বক্তৃতার মধ্যেই বিষম চিৎকার শুরু হল। মঞ্চ থেকে নামিয়ে নিল আমাকে পুলিশ। দ্রুত সরিয়ে নিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বর থেকে। মৌলবাদ ইসলাম ধর্মে যেমন আছে, অন্যান্য ধর্মেও তেমন আছে। ইসলামি মৌলাবাদের কথা বা ইসলামের কথা আমি বেশি বলি কারণ এর মধ্যে আমার বেড়ে উঠেছি। এসব আমি নিজ চোখে দেখেছি এবং নিজে ভুগেছি। যখনই ক্রিশ্চান ধর্মের সমালোচনা করি, দেখেছি ইসলাম ধর্মের সমালোচনায় হাততালি দেওয়া ক্রিশ্চানগুলোর মুখ চুন হয়ে আছে। দেখেছি তাদের ধীরে ধীরে সভাকক্ষ ত্যাগ করতে। সবসময় সবাইকে আমি এ কথাটি জানিয়ে দিতে চেয়েছি যে আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করছি, আমি কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করিনি। ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলার আমার দরকার হত না যদি দেখতাম নারীর স্বাধীনতায় ধর্ম বড় একটি অন্তরায় নয়। সব ধর্মই নারীকে অবমাননা করে, এ কথা আমি জোর গলায় বলি, বলছি। এতে কারও মন খারাপ হলে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যদি বাংলাদেশ থেকে না বেরোতাম, যদি পশ্চিমে এত দীর্ঘকাল না কাটতো আমার, ওই সমাজের গভীরে চলাফেরা না হত,   তবে হয়তো কখনও আমার জানা হত না ক্রিশ্চান মৌলবাদ বা ইহুদি মৌলবাদের চেহারা। না বেরোলে জানা হত না পশ্চিমের বীভৎস বর্ণবাদ। আমার মত তারকারই যদি এই হাল, তবে অসাদা সাধারণ মানুষকে কী সইতে হয়, ভেবে আমি শিউরে উঠি।

আমার সঙ্গে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা রক্ষী। আমি তারকা। কিন্তু যুক্তরাজ্যের   দূতাবাসের কেরানিকুলের বেশির ভাগই আমাকে তারকা হিসেবে চেনেই না। আর চিনলেও তারা পররাষ্ট্র নীতিতে শক্ত থাকে। আমি ভিসা চাইতে এসেছি, আমাকে স্বাগতম জানাবার কোনও অভিপ্রায় ওদের নেই। ভিসার দরখাস্ত হাতে দিলে ছবি লাগবে এই লাগবে সেই লাগবে, টাকা লাগবের পর যেটা লাগবে বলে, কেন যেতে চাইছি, তার কারণ।   একবার আমি বলেছিলাম, যাচ্ছি, বেড়াতে।

বেড়াতে? চোখ বড় বড় করে তাকিয়েছিল মহিলা।

হ্যাঁ বেড়াতে।

না.. না। বেড়াতে যেতে দেওয়া যাবে না।

কেন, বেড়াতে যেতে বুঝি ও দেশে কাউকে দেন না?

নির্ভর করে কোন দেশের পাসপোর্ট।

আমার দেশের পাসপোর্টধারীরা বেড়াতে যাওয়ার অধিকার পাবে না?

না। যুক্তরাজ্য থেকে কারওর আমন্ত্রণ পত্র লাগবে। কোথায় যাচ্ছি, কোথায় থাকবো, কেন আমন্ত্রণ, কারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তাদের চিঠি লিখতে হবে দূতাবাসে কারণ দর্শিয়ে, ওখানে খরচ কে দেবে, আমার টাকা পয়সা কত আছে, কত নিয়ে যাচ্ছি, কবে ফিরবো তার টিকিট দেখাতে হবে,   সব জানাতে হবে, সবকিছুর কাগজপত্র দেখাতে হবে। এই এদেশে আমি যে

আছি, আমার স্ট্যাটাস কী তাও দেখতে হবে। সব দেখে সব বুঝে তারপর যদি তাদের মনে হয় আমাকে ভিসা দেওয়া যায়, তবেই আমি ভিসা পাবো, নয়তো নয়।

কোনও সুইডিশ পাসপোর্টে ভিসার দরকার পড়ে?

না।

নরওয়ের পাসপোর্টে?

না।

বেলজিয়ামের?

না।

সুইৎজারল্যাণ্ডের?

না।

হল্যাণ্ডের?

না।

অস্ট্রিয়ার?

না।

ডেনমার্কের?

না।

আমেরিকার?

না।

কোনও ফরাসি পাসপোর্টে?

না।

কেন লাগে না ওদের পাসপোর্টে ভিসা, বলতে পারেন?

এরকমই নিয়ম।

নিয়ম তারা নিজেদের জন্য তৈরি করেছে। সুন্দর নিয়ম। *আমরা আমরা, তারা তারা। আমরা বিশ্বায়নের কথা বলব। আমাদের মাল ওদের কাছে বেচব। আমরা জগত ঘুরে বেড়াবো। কিন্তু ওদের দেব না ওদের জায়গা থেকে নড়তে। এই হল আমাদের নিয়ম।* ফরাসিরা ইংরেজদের জন্মের শত্রু ছিল। ফরাসিরা ইংরেজের দেশে যখন ইচ্ছে যেতে পারবে, কোনও ভিসার দরকার হবে না। কিন্তু যে উপমহাদেশটি ইংরেজরা দুশ বছর শাসন করে এসেছে, লুটে পুটে সর্বনাশ করে এসেছে, সেই মহাদেশের মানুষদের ভিসা লাগবে ইংরেজের দেশে যেতে। কেন লাগবে, কারণ তারা গরিব, তারা ওদেশে থেকে যেতে পারে। তোমাদের কি ভিসার দরকার পড়েছিল যখন ভারতবর্ষে নাও ভেড়াতে? না। দরকার পগেনি। ওরা তো কালো কালো ক্লীব ছিল, ওদের দেশে গিয়েই ওদের ধন্য করতে। সে বহু পুরোনো কথা। কিন্তু এখনও কি সেই মনোভাবটি নেই, নিজেদের উঁচু ভাবার, এবং আফ্রিকার এশিয়ার কালো কালো মানুষদের নিচু ভাবার? আছে। আমি স্পষ্ট দেখি ওইসব চোখে যে আছে, যে চোখগুলোই আমার সামনে এসে দাঁড়ায় বোঝাতে -- আমার কী কী তথ্য তাদের প্রয়োজন দেখার।

--দেখুন আমি আপনাদের দেশে থাকিয়া যাইব না। আমি কাঙাল নহি। আমার পাসপোর্টে সুইডেন নামের একটি ধনী দেশ নিয়মিত থাকার অনুমতি সীল দিয়া আসিতেছে। সুতরাং আমার এই দেশেই বহু আরাম হইতেছে। এই আরাম ফালাইয়া আপনার দেশের আরাম ভোগ করিবার মোটেও আমার ইচ্ছা নাই। যাহারা আমাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে, তাহারা খুব বড় সংগঠন। তাহাদিগের সহিত যোগাযোগ করিয়া জানুন যে তাহারা আদৌ আমার মত কালো এবং দরিদ্রকে চাহে কিনা। তাহারা অতীব আবেগের সহিত আমাকে চাহিতেছে। এমন নহে যে আমি তাহাদের চাহিতেছি। আমি তাহাদের চিনি না। তাহারা আমাকে চেনে। বুঝিয়াছেন?

--টিকিট কোথায়? ফেরার টিকিটসহ টিকিট।

--টিকিট তাহারা পাঠাইবে। কিন্তু আগে ভিসা না হইলে টিকিট পাঠাইয়া কী লাভ? পরে যদি আপনার বিচার বিবেচনা করিয়া দেখেন যে আপনারা আমাকে ভিসা দিতে অপারগ, তখন বেচারা টিকিটের কী হইবে? তাহাকে কোন শালার পো ফেরত নেবে?

টিকিট চাই। ব্যাংকের কাগজ চাই। ব্যাংকে আমার কত টাকা আছে, তাদের দেখা চাই। আমি যে কদিন থাকবো তা পোষানোর খরচ আমার কাছে আছে কি না তাদের জানা চাই। সুইডেনের নাগরিকের আমার সম্পর্কে চরিত্র-সার্টিফিকেট চাই। ইংলেণ্ডের ঠিকানা চাই। ঠিকানা হোটেল। সেই হোটেলের ঠিকানা দিতে হবে। হোটেল বুকিং দেখাতে হবে। শুনে আমার গায়ে আগুন জ্বলে। টিকিট নিয়ে, ব্যাংকের কাগজ ইত্যাদি নিয়ে অনিচ্ছে সত্ত্বেও আবার আমাকে আবার যেতে হল দূতাবাসে। এসব দেবার পরও আমার নাকি সাক্ষাৎকার হবে। সাক্ষাৎকারে মনোবিশেষজ্ঞ এসে বুঝবে আমার গোপন ইচ্ছেটা কি, ধনীর দেশটির মাটি কামড়ে আমার থেকে যাওয়ার ইচ্ছে আছে কি না।

ঠিক এরকম না হলেও অনেকটা এরকমই ভোগান্তি আমার হয়েছে অন্য যে কোনও দেশের ভিসা নিতে গিয়েই। বেলজিয়ামের দূতাবাস থেকে একবার আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। নিয়ে গিয়েছি গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্র। আমি পাচ্ছি *সাম্মানিক ডকটোরেট।* আমার পাসপোর্টটি নেড়ে চেড়ে, অনেকগুলো দেশের ভিসা আছে দেখেও, যেহেতু পাসপোর্টটি বাংলাদেশের, বলে দিল *ভিসা হবে না।*

--তবে কি ওই ডকটরেটটা নিজে হাতে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না?

--না

ছোট্ট ঘুলঘুলি জানালাটি ধরাস বন্ধ করে দিল মুখের ওপর। এই হল আচরণ। এই আচরণই দুদিন পর পুরো পাল্টে গেল। ওই জানালার মুখটিতে প্রসন্নতা। ওই জানালার মুখটিই দরজা খুলে দিল। দরজায় এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং রাষ্ট্রদূত। আমাকে ভিতরের ঘরের দামি সোফায় বসালেন। জানতে চাইলেন আমি কী পান করতে চাই। চা না কফি।

আমি বললাম, *কিছুই পান করতে চাই না।*

এবং একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, *আজ হঠাৎ আমাকে ভিতরে আনলেন যে! আমাকে তো সেদিন ভিসা দেবে না বলে বিদেয় করে দেওয়া হয়েছিল?*

আমরা খুবই দুঃখিত। সত্যিই খুবই দুঃখিত। বুঝতে পারিনি আপনি এসেছেন। আমাদের কাছে আজই বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর চিঠি এসেছে। এখন আর কোনও অসুবিধে হবে না ভিসা দিতে।

আমার পাসপোর্ট নিয়ে ভিসা করিয়ে আমার হাতে দিয়ে হেসে বললে, *আশা করি বেলজিয়ামে আপনার খুব ভালো সময় কাটবে। আপনার ডকটোরেট পাবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। সত্যিই এটি খুব সুখবর। আশা করি প্রধানমন্ত্রীর আয়োজিত অনুষ্ঠান আপনার খুব ভালো কাটবে। ......*

পাসপোর্ট নিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবি লোকটির আসল আচরণ কোনটি! আসল আচরণটি যে আমার চেহারা দেখার পর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া, তা বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হয় না। লোকটির চোখে, সে চোখ যত অভিনয়ই করুক না কেন, বিশ্বাস করে যে আমি নিচু বর্ণের, নিচু জাতের।

সুইৎজারল্যাণ্ডের ভিসা নিতে গিয়ে দেখেছি দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত একেবারে আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসিয়ে খাতির যত্ন করে ভিসা দিয়ে গাড়ির দরজা অবদি হেঁটে এলেন। এর একটিই কারণ, সুইৎজারল্যান্ডের সরকার থেকে তার এসেছে দূতাবাসে যে আমার ভিসা চাই। যে সব দেশে সরকারি আমন্ত্রণ, সে সব দেশের দূতাবাসে না হয় এমন যত্ন জুটলো, কিন্তু তা ছাড়া রক্ষে নেই। আমার মত *তারকা*কে তারা পোছে না। আমি *তারকা* হই বা যা-ই হই, উৎসটা দেখতে হবে, উৎসে গন্ডগোল থাকলে বা বর্ণে নিচতা থাকলে বলা যায় না কার দেশের পবিত্র মাটিতে গিয়ে কামড় বসাই। আর, যতই হোক প্রথম বিশ্বের কল্যাণে অথবা হস্তক্ষেপে তৃতীয় বিশ্ব থেকে এসে *তারকা* বনেছে, তৃতীয় বিশ্বের তারকারা প্রথম বিশ্বে

এসে প্রথম প্রথম ধরাকে সরা জ্ঞান করবেই, এরপর প্রথম বিশ্ব স্ক্রু একটু আঁটো করে দিলেই ব্যস, সব ঠিক। তারকাখ্যাতি ততদিনই, যতদিন তা প্রথম বিশ্ব দেবে।

জার্মানির ডয়েশ্চার অ্যাকাডেমিশ্চার আউসটাউশ ডিয়েনস্ট-এর আমন্ত্রণে যখন আমি এক বছরের জন্য বার্লিন চলে যাই, তার ঠিক আগে আগে সুইডেনের নিরাপত্তাবাহিনী ঠিক করলো আমার নিরাপত্তা শিথিল করা হবে, আমার একা চলতে কোনও অসুবিধে নেই বলে দেওয়া হল। অবশ্য তার আগে একা চলতে পারি কি না, কী করে একা চলতে হয়, তা তারা দেখিয়ে দিতে চায়। আমাকে তারা প্রথম বাসে চড়ালো, তারপর মেট্রোতে চড়ালো। কী করে কী করতে হয় সবকিছুর তালিম দিল। আমি একা পথ চলতে দিয়ে তারা দূরে দূরে থেকে কিছুদিন দেখলো। এই তো চেয়েছিলাম আমি। নিরাপত্তা তুলে দিয়ে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার জন্য একা পথ চলতে দেওয়ার জন্য দিনের পর দিন আবেদন জানিয়েছি। স্বাধীনতার জন্য এই তো ছিল কামনা। কিন্তু টের পেতে থাকি অন্য কিছু। যখন রাস্তাঘাটে দোকানপাটে আমি, আমার পরিচয় পথচারিদের কাছে আমি বাদামি রঙের মেয়ে, আমি কোনও এক দরিদ্র দেশের মেয়ে, অর্থনৈতিক সুবিধে পাবার জন্য, উন্নততর জীবন যাপন করার জন্য এদেশে এসেছি, নিশ্চয়ই আমি এদেশি কারও চাকরি ছিনতাই করেছি, নিশ্চয়ই আরও কুমতলব আমার আছে। এরকম সবাই অবশ্য ভাবে না, অনেকে দৌড়ে আসে অটোগ্রাফ নিতে। অনেকে চিনে ফেলে সম্ভাষণ জানায়। এগিয়ে এসে কথা বলতে চায়, নিরাপত্তার কারণে এ আমার অনেকটা অভ্যেসের মত, যখন জিজ্ঞেস করে, *আপনি কি তসলিমা?*

আমি বলি, *না।*

--আপনাকে তসলিমার মতো দেখতে।

--হ্যাঁ আমি জানি আমি তসলিমার মত দেখতে। অনেকে বলে।

হনহন করে হেঁটে চলে যাই। *তসলিমা নই* এমন ভাব করে। একবার তো এমন হল, নোবেল পুরস্কারের ব্যাংকোয়েট যেখানে হয়, সেই সিটি হলের কাছে, ম্যালারেইন হ্রদের ধারে এক

আইসক্রিমের দোকান থেকে আইসক্রিম কিনছি। আইসক্রিমওয়ালা আমার দিকে হাঁ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, *আপনি কি তসলিমা?*

আমি বললাম, *হ্যাঁ আমি তসলিমা।*

লোকটি হো হো করে হেসে বলল, *আপনি মজা করছেন। আপনি তসলিমা নন।*

আমি হেসে বললাম, *কেন? আমি তসলিমা হতে পারি না? আমি তো তসলিমা।*

--সত্যি?

--সত্যি।

লোকটি আমার দিকে তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, *না না না। আপনি তসলিমার মত দেখতে।*

--আমাকে তসলিমা মনে না হওয়ার কারণ কী আপনার?

--কী বলছেন! তসলিমা হলে অনেক সিকিউরিটি পুলিশ থাকতো। ওর সঙ্গে পুলিশ থাকে। ও তো একা বেরোয় না।

আমাকে আইসক্রিম দিয়ে টাকা নিয়ে লোকটি অন্য ক্রেতার দিকে মন দিল। আমি হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম--আমাকে চেনা চেনা লাগলেও লোকেরা এখন ভাববে, আমি তসলিমার মত দেখতে। এ একরকম ভালোই হল।

কিন্তু মুদির দোকানগুলোয় মাছ মাংস আলু পটলের বড় বাজারে কেউ যদি চেনে তো ভালো, আর না চিনলে কী করে -- সেটি দেখার বিষয়। তখন লিডিঙ্গো থেকে সাতদিনের মাথায় আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। বেরিয়ে শহরে ভাড়া নিয়েছি। স্টকহোম এমন একটি শহর যে শহরে কোনও বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া পেতে গেলে তেরো বছর অপেক্ষা করতে হয়। কিন্তু আমার অত অপেক্ষা করতে হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্যে ক্রিশ্চিনাবার্গে একটি বড় অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া গেছে, খবরটি সুয়ান্তেই আমাকে জানিয়েছিল। অবশ্য তক্ষুনি তক্ষুনি ওটি পাইনি। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আগের ভাড়াটের না সরা পর্যন্ত পাওয়া হবে না, তারা বাড়ি বানিয়েছে, সেই বাড়িতে চলে যাচ্ছে, সেই বাড়ি তৈরি হবে, তারপর তো! সে

পর্যন্ত,   সেই তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আরও একটি আসবাবপত্রওয়ালা অ্যাপার্টমেন্ট আমাকে ভাড়া নিতে হয়েছে। লিলিয়ানার এক বন্ধুর অ্যাপার্টমেন্ট। এমনিতে খালি পড়ে ছিল। খালি অ্যাপার্টমেন্টে   আমি কদিন থেকেছি। তাতেই আট হাজার ক্রাউন ভাড়া নিয়ে নিল। ভালোবেসে আমাকে মরে যাচ্ছে একেকজন। ভাব দেখলে মনে হবে। কেউ কি শহরে এমন নেই যে আমাকে কদিন টাকা পয়সা না খসিয়ে থাকতে দেবে? নাকি যে কটা টাকা   কুর্ট টুখোলস্কি পুরস্কারে দেওয়া হয়েছে, তা না নিঃশেষ করে স্বস্তি নেই ! পুরো জগত জানে *রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আমি আছি। সুইডেন আমাকে লালন পালন করছে। আমাকে আদরে আহ্লাদে আরামে আয়াসে রাখছে। বাড়ি দিচ্ছে। গাড়ি দিচ্ছে। আমার আর একফোঁটা চিন্তা নেই। কেবল বসে বসে লিখব এখন।* তারা কি কোনওদিনই জানবে কী করে আমাকে জীবন যাপন করতে হয়! যারা আমাকে মাথায় তুলে নাচে, তারা কি জানে সামনে আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যত।

ক্রিশ্চিনাবার্গে ঢুকে সেকেন্ড হ্যান্ড দোকান থেকে সাধারণ কিছু আসবাবপত্র কিনে নিই। দুএকটি নতুন ছাড়া বাকি সব আসবাবই পুরোনো। কিছু তো একেবারে ওদের গারবেজ থেকে তুলে নেওয়া। গারবেজে বড়লোকেরা দামি জিনিস মডেল পুরোনো হলেই ফেলে দেয়। আমার তো দামি দামি নতুন আসবাবপত্র কেনার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ আমি তো আর এ দেশে বাস করার জন্য থাকছি না। আমি অপেক্ষা করছি দেশে ফেরার। অনেকটা বাসস্টপে অপেক্ষা করার মতো। আমি কেন সংসার সাজাবো! সুইডেনের অ্যাপার্টগুলোয় ফ্রিজ, ওভেন, দেয়াল আলমারি, কাপড় কাচার যন্ত্র ইত্যাদি থাকেই। সুতরাং কিনতে হলে কিছু চেয়ার টেবিল আর বিছানাপত্র কিনতে হয়। বাড়ি গুছিয়ে নিয়ে নিজের জীবন   যাপন করছি তখন। বাড়ির কাছের দোকানে ঢুকে খাবার দাবার তো কিনতে হবে কিছু, রাঁধতে হবে, খেতে হবে। একা। ভাষা জানিনা। এখন সঙ্গে পুলিশ নেই যে অনুবাদ করে দেবে। তবু দেখলে চিনি এমন জিনিসই কিনি। মুরগি খেতে খেতে আর ভালো লাগে না। কিন্তু করবো কী, সামুদ্রিক মাছে গন্ধ লাগে, ভেড়ার মাংসে গন্ধ লাগে, শুয়োরে গন্ধ লাগে। গরু আকাশ ছোঁয়া দাম। খাবো কী! শাক সবজি বলতে নেই। তবু ওসবের মধ্যে কেনাকাটা সারতে হয়। যখনই ওই দোকানে

যাই, দোকানের কোনও একটি লোক আমার দিকে তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে থাকে। কাজ কর্ম ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে কেন এমন! ওই তাকিয়ে থাকাটি গায়ে এসে তিরের মত বেঁধে। ওই তাকিয়ে থাকাটি আমাকে গা শিরশির করা একটি অস্বস্তি দেয়। ওই তাকিয়ে থাকাটিতে একদলা বমি আছে। যতক্ষণ আমি দোকানে হাঁটছি, জিনিসপত্র দেখছি, একটি লোক আমাকে দেখছে, দেখছে যতক্ষণ না আমি দাম দিয়ে বাইরে বেরোচ্ছি। কেউ আমাকে বলেনি, আমার ভিতরে আমি বুঝতে পারি, লোকটি দেখছে আমি কিছু জিনিস চুরি করি কী না। কারণ নিশ্চিতই আমি গরিব দেশের লোক। নিশ্চিতই আমি নিজে দরিদ্র। নিশ্চিতই আমার অভাব। নিশ্চিতই আমি চোর। এই যে আমার সংশয়টি হল, এই সংশয়টির কারণে আমি কখনও প্যান্টের বা জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাই না যখন আমি কোনও দোকানে যাই। কখনও আমি হাতব্যাগটি খুলি না কিছু বের করতে যখন দোকানে হাঁটি। পছন্দ করে কেনার জন্য জিনিস কেবল দূর থেকে দেখি, ছুঁই না। জীবনে কখনও একটি তিল পরিমাণ কিছু আমি দাম না দিয়ে নিইনি। এ আমার স্বভাবে নেই, চরিত্রে নেই। এ আমার মাথার কোনও কোষের কোনও বিন্দুতে নেই। অথচ আমাকে, আমার রঙের কারণে সন্দেহ করা হচ্ছে। বরং পশ্চিমের মানুষদের দেখেছি, জিনিস নিয়ে দাম না দিয়ে বেরিয়ে যেতে। ইওরোপ সভ্য, আমেরিকার মত দোকানপাটের দরজায় পাহারা বসায় না। কিন্তু সভ্য দোকানে সভ্য লোকেরা ঢুকে দিব্যি জিনিসপত্র চুরি করছে। মেয়েদের ড্রেসিংরুমে গেলেই দেখি পোশাকের লাগানো সীল বোতামগুলো পড়ে আছে মেঝেয়। খবর নিয়ে জেনিছি মেয়েরা ভিতরে ঢুকে পোশাক গায়ে মানাচ্ছে কি না তা দেখার বদলে চাকতি খুলে নিয়ে পোশাক গায়ে পরে বা ব্যাগে ভরে নিয়ে দিব্যি টাকা পয়সা না দিয়ে হেঁটে চলে যায়। কারা করে এসব? কবে সাদা তরুণিরা। সবকিছু এখানে এত চমৎকার। বৈষম্য ঘুচিয়ে সমতার সমাজ তৈরি করেছে। কারওর কোনও অভাব নেই । সকলের জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য। সকলের জন্য ভাত কাপড় বাড়িঘর। এমনকী গাড়িও। এখানে সবাই ধনী। তবে কেন কিছু মানুষ চুরি করে?

--করে। এটা একধরনের আনন্দ। তরুন তরুনিরাই মূলত করে।

--শুধু আনন্দ? লোভ বলে কিছু কি নেই?

--হয়তো আছে। জানি না।

সুইডরা নিজেদের মধ্যে সুইড সম্পর্কে সমালোচনা করতে পারে, কিন্তু বাইরের মানুষের সঙ্গে কিছুতেই করবে না। বাইরের মানুষ। বারো বছর একসঙ্গে বাস করলেও কিন্তু মনে করবে ও বাইরেরই মানুষ। তরুন তরুনিরাই কি শুধু? এক বুড়ির কথা শুনেছি, বুড়ির ধনসম্পদ প্রচুর। সেই বুড়ি বাজারে জিনিসপত্র কিনে দাম দিতে গিয়ে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। তার হ্যাটের তল থেকে বেরিয়ে এল একটি ফ্রোজেন চিকেন। বুড়ি কিনেছে প্রচুর টাকার জিনিস। কিন্তু ওই মুরগিটি চুরি করার তার দরকার কী ছিল! মুরগির দাম, বিশেষ করে বরাফায়িত হলে, খুব সস্তা। পাঁচ দশ টাকায় পাওয়া যায়। একটি শসার দামও তার চেয়ে বেশি। বুড়ি বুঝতে পারেনি যে মুরগির ঠাণ্ডায় তার মাথা এত ঠান্ডা হয়ে যাবে যে সে মুর্ছা যাবে।

--কেন? বুড়ি কেন চুরি করতে গেল? বুড়ির কোনও অভাব ছিল?

মাইব্রিট কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। মাইব্রিট বলেছে, *একটু উত্তেজনার জন্য করেছে। বয়স হয়ে গেলে মানুষ এখানে একা থাকে। জীবনে কোনও উত্তেজনা নেই। তাই তারা অঢেল টাকা থাকা সত্ত্বেও দোকানের ছোট খাটো জিনিস চুরি করে উত্তেজনাময় কিছু করেছে ভেবে তৃপ্তি পায়।*

শুনে আমি হঠাৎ চুপ হয়ে যাই। আমার ভয় হয়। মানুষগুলো ঠাণ্ডা শীতল জীবন নিয়ে একাকী পড়ে থাকে। একসময় আত্মহত্যা করে। কিন্তু তারপরও কখনও স্বীকার করবে না কেউ যে এ দেশে কারও কোনও অভাব আছে, কোনও সমস্যা আছে। সকলেই সুখী। সকলেই চমৎকার আছে। সকলেরই মনে খুব আনন্দ। এরা কষ্টের কথা কাউকে বলে না, নিয়ম নেই। অন্যের কাছে ছোট হওয়া যাবে না। অন্যের কাছে নিজেকে দেখাতে হবে একেবারে পারফেক্ট। দেখায়, এরা বড় বেশি *দেখায়।*

আমার এমন হতে থাকে, যে কোনও দামি দোকান দেখলে ঢুকতে ভয় পাই। দামি দোকানে সাদারা ঢোকে। এশিয়ার কেউ যদি ঢোকে, ঢুকবে জাপানিরা। আমার ঢোকা মানে আমি কোনও জিনিস কিনবো না। আমি এমনি দেখতে এসেছি, অথবা কিছু হাতিয়ে নিতে এসেছি। আমাকে দেখেই হয়ত খুব বিরক্ত চোখ মুখ নিয়ে এগিয়ে আসবে দোকানের কেউ, রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করবে, আমাকে সে কোনও সাহায্য করতে পারে কিনা। যদি বলি যে না তার দরকার হবে না। আমি নিজেই দেখছি। তখন আরও আমার গা সেঁটে থাকবে। তখন কেনার ইচ্ছে থাকলেও আর কিনতে ইচ্ছে হয়না। তখন দোকান থেকে চলে গিয়ে দোকানিদের শান্তি স্বস্তি দিই। যখন জিনিসপত্র দেখে টেখে ভালো মানুষের মত বেরিয়ে যাই, তখন দোকানিরা ভাবে এ যাত্রা সুযোগ পেলাম না, এর পরের বার নিশ্চয়ই সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করবো আর যখন অনেক দামি জিনিস কিনে ফেলি, তাদের ওই বিরক্ত চোখমুখ গুলো ধীরে স্বাভাবিক শুধু নয়, অস্বাভাবিক আনন্দময় হয়ে ওঠে। একটুও লজ্জিত হয় না এই ভেবে যে আমাকে কয়েক মুহূর্ত আগেই যে চোর ঠাউরেছিল। যেন বর্ণ দেখে চরিত্র বিচার করার সব রকমের অধিকার তাদের আছে। এ তাদের *জাতীয় অধিকার।* এ শুধু সুইডেনের চিত্র নয়, ইওরোপের সব দেশেরই একই চিত্র। এ চিত্র তো সে চিত্রের তুলনায় কিছুই নয়, যে চিত্রে দেখি কালো বাদামি মানুষেরা শারীরিক নির্যাতন ভোগ করছে, কারণ তাদের অপরাধ হচ্ছে তারা সাদা নয়। বার্লিনে যখন বাঙালি কিছু মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল, ওরা কথায় কথায় বলল, রাতে ওরা মেট্রো চড়ে না। কেন? বলে, *ন্যাড়ামাথারা, ভারী বুটজুতোওয়ালারা, নয়া-নাৎসিরা মারবে।*

---কেন মারবে?

---মারবে কালো বলে, অনার্য বলে। এ দেশে বাস করছি, অথচ এ আমার দেশ নয়, এ তাদের দেশ। আমি তাদের চাকরি বাকরি ছিনতাই করে বেশ আছি। আমার মত ভিখিরি বিদেশিদের কারণে তাদের দেশে অভাব শুরু হয়েছে। তাদের টাকা আমি পকেটে ভরছি। আমাকে দেখলেই চিৎকার করবে, ও শুয়োর, ও কুকুর, চলে যা নিজের দেশে। আর যদি খালি

দেখে, লোকজন মেট্রো স্টেশনে বেশি নেই, তখন ঝাঁপিয়ে পড়বে। হাতে কিছু না থাকলে খালি হাতেই মারবে, আর ছুরি থাকলে ছুরি চালিয়ে দেবে। পিস্তল থাকলে গুলি করবে।

---এরকম ঘটনা ঘটলে ওদের বিচার হয় না?

---যারা বিচার করবে তারাই কি বর্ণবাদী নয়!

আমার গলা শুকিয়ে যায় আশঙ্কায়।

এমন যখন ঘটতে থাকে তখন আমার মনে হয়, মৌলবাদদিের হাত থেকে বাঁচার জন্য নয়, বর্ণবাদীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আমার দেহরক্ষী বা নিরাপত্তা বাহিনী দরকার। কিন্তু আবারও এ ভেবে হাসি, কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, কিন্তু কুইনিন সারাবে কে? নয়া নাৎসি দেখলে যে কেউ চিনবে যে এরা নাৎসি। এরা বিদেশিবিরোধী। কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বর্ণবাদ হল সুপ্ত বর্ণবাদ। কারও বোঝার উপায় নেই কার হৃদয়ে বর্ণবাদ বিরাজ করছে। ইওরোপের প্রায় প্রতিটি সরকারের মধ্যেই বর্ণবাদী একটি শক্তি আছে, যে শক্তিটি দেশের দরজা বন্ধ করে রাখে, যেন গরিব দেশের লোকেরা এখানে এসে থেকে যাওয়ার মতলব করতে না পারে, করলেও যেন ঘাড় ধরে আবার বের করে দেওয়া যায়। সুপ্ত বর্ণবাদ খুব সুক্ষ্মভাবে বেরিয়ে আসে কোনও না কোনও সময়। যারা এসব দেশে চাকরি বাকরি কামকাজ করে বেঁচে থাকে, তারা বলতে পারে তাদের অভিজ্ঞতার কথা। এই সাদারা মানবাধিকারের নামে কালোদের এ দেশে থাকতে দিয়েছে তা ঠিক, কিন্তু কোনও চাকরি দেবে না, দিলেও কোনও ভাল চাকরি দেবে না।

আমি তো আর এখানে কোনও চাকরি বাকরি করি না। আমার অভিজ্ঞতা অন্যরকম। নানা রকম। আমন্ত্রিত হই বিভিন্ন সংগঠন সংস্থা দ্বারা, বেশ অনেক নারীবাদী সংগঠনের আচরণে কিন্তু স্তম্ভিত না হয়ে পারিনি। একবার এক সেমিনারে আমাকে বলা হল, আমি যেন বাংলাদেশের মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে বলি।

----কেন? বাংলাদেশের মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কেই আমার বলতে হবে কেন?

----ওদের কথা তুমি ভালো জানো তাই।

----তা ঠিক, ওদের কথা আমি ভালো জানি। কিন্তু এতদিনে পশ্চিমে থেকে পশ্চিমের মেয়েরা কেমন আছে তারও তো কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার, তা বলবো না কেন?

----কারণ অল্প দেখেছো তো!

---- এক বছর, দু বছর হয়ে গেল, তাও বলছো অল্প দেখেছি! আর তোমরা তো এশিয়ায় আফ্রিকায় এক সপ্তাহ ঘুরে এসে ঘুরে রীতিমত বিশারদ হিসেবে বই লিখে ফেল। তাই শুধু নয়, বুকে বিশারদের ট্যাগ লাগিয়ে বাকি জীবন দিব্যি কাটিয়ে দাও। বাংলাদেশে বা বেনিনে, ইরাকে বা ইথিওপিয়ায় কোনও বিপর্যয় ঘটলে সেই পশ্চিমি সাদা বিশারদদের ডেকে জানতে চাওয়া হয়, কী হতে পারে, কিসের আশঙ্কা বা কিসের সম্ভাবনা।

ওদিকটা চুপ।

---তবে কি মনে করো, পশ্চিমের চোখের চেয়ে পূবের চোখ একটু ঝাপসা? পশ্চিমের মাথার চেয়ে পূবের মাথা একটু অপরিপকক?

---- না না, কী বলছো কী!

যদিও বলেছে না তা সে বিশ্বাস করে না। আমার বিশ্বাস সে আসলে বিশ্বাস করে। সুপ্ত বর্ণবাদীদের দেখলে বড় বিভ্রান্ত হই। তারা আমার পিঠ চাপড়াবে, বাহবা বলবে, আমার শিক্ষার শ দেখে, সংস্কৃতির স দেখেই আনন্দে হাততালি দেবে। হাততালি দিতে দিতে ঠিক একই রকম মুখভঙ্গি তারা করে যখন একটি বাচ্চার মুখে প্রথম বাক্য ফুটতে শোনে বা একটি পঙ্গুকে দ্যাখে কায়ক্লেশে লাঠিতে বা দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। হাততালিগুলো সবসময় নিচের দিকে তাকিয়ে। হাততালি যিনি দিচ্ছেন, তিনি ওপরে। যাদের জন্য হাততালি দেওয়া, তারা তারা নিম্ন বর্ণ, নিম্নবিত্ত, নিম্ন শ্রেণী, নিম্নমেধা, নিম্নমাথা। তারা যা তা।

পশ্চিমের মেয়েরাও নির্যাতিত এই বাক্যটি বা এই সত্যটি পূবের মেয়ের কাছ থেকে শুনতে পছন্দ করে না। পছন্দ করে পশ্চিমের মেয়ের কাছ থেকে শুনতে। এর কারণ এই নয় যে পশ্চিমের মেয়েরা পরিস্থিতির বর্ণনা পূবের মেয়ের চেয়ে ভালো দিতে পারবে। এর কারণ হচ্ছে পূবের মেয়ের মুখে পশ্চিমের মেয়ের সম্পর্কে মন্তব্য বড় বাড়াবাড়ি লাগে। পূবের অত

আস্পর্ধা পশ্চিমের মেয়েদের সয় না। চাকরানির কি মালকিনকে ধমকালে মানায়! আগে পূবের মেয়েরা নিজেদের সমস্যা সামলাক, তারপর কথা বলতে আসুক অন্য কিছু নিয়ে।

না, সব নারীবাদী এমন নয়। এমনও অনেক হয়েছে যে আমি যদি পূবের সমস্যার কথা বলে শেষ করে দিই, বলবে পশ্চিমেও যে একই জিনিস ঘটছে তা বলছো না কেন? তারা বলতে চায় তুমি আমিতে তফাৎ নেই। পূব পশ্চিমেও খুব একটা কিন্তু তফাৎ নেই। নারী নির্যাতনের বেলায় সব এক। তবে যে যা কিছুই বলুক না কেন, কোনও বর্ণবাদী মৌলবাদীর তোয়াককা না করে যা সত্য তা চিরকাল যেমন বলেছি, এখনও বলি, যে নারী পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে নির্যাতিত। মেয়েরা নির্যাতিত ঘরে, ঘরের বাইরে। নারী নির্যাতিত চুল তার কালো বা সোনালি, চোখ তার বাদামি বা নীল। সে ধর্মে নির্যাতিত, অধর্মেও। সে বিশ্বাসী কী অবিশ্বাসী, নির্যাতিত। সে সৎ কী অসৎ, নির্যাতিত। সে খোঁড়া কী খোঁড়া নয়, সে অন্ধ বা বধির, সুস্থ বা অসুস্থ -- নির্যাতিত। নারী ধনী কী দরিদ্র , নির্যাতিত। সে অশিক্ষিত কী শিক্ষিত, নির্যাতিত। সে শিশু কী বালিকা কী যুবতী কী বৃদ্ধা -- নির্যাতিত। সে আবৃত কী নগ্ন, সে নির্যাতিত। সে মুখরা কী বোবা, নির্যাতিত। সাহসী কী ভীরু, নির্যাতিতই।

নিজের জীবনে বর্ণবাদীদের রোষের শিকার আমাকে সবচেয়ে কম হতে হয়েছে, কিন্তু পদে পদে শিকার হন কালো বাদামি হলুদ যারা পশ্চিম ইওরোপে বাস করেন। শুধু পশ্চিমের কথাই বা বলি কেন, কমিউনিজমের পতনের পর পূর্ব ইওরোপে বর্ণবাদ আগুনের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই বর্ণবাদ, পশ্চিমিরা বলে যে বাড়ে তখনই যখন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হয়। তখনই বেকারত্ব বৃদ্ধি পায় আর শ্রমিক শ্রেণী যে কোনও বিদেশি দেখলেই ফুঁসে ওঠে। *শ্লা আমরা কাজ পাই না, আর তোরা কাজ পেয়ে যাস। রীতিমত গাড়ি হাকাচ্ছিস। নে ধর। ..* ব্যস, দৌড়ে খপ করে ধরলো। এবার বাঁচা মরা তাদের হাতে।

বেকারত্ব কমে গেলে বর্ণবাদ কমে যায়, এ পশ্চিমী আঁতেলদের দাবি। আমার সন্দেহ হয়। ঘৃণা যদি জন্ম নেয়, ঘৃণা সহজে দূর হয় না। চাকরি হলে টাকা হলে ঘৃণা মন থেকে উবে যাবে, এর কোনও যুক্তি নেই। টাকা কাউকে কাউকে উদার করতে পারে, সবাইকে করে না।

বরং আরও সংকীর্ণ করে, আরও লোভী করে, আরও অমানুষও করে। বড় আপিস আদালতের লোকেরা বর্ণবাদকে শ্রমিক শ্রেণীর সমস্যা বলে নিজেদের পৃথক করে রাখতে চায়। যেন তারা বড় ভালোমানুষ। কিন্তু তারাও জানে এটি ছোটলোকের তৈরি সমস্যা নয়, এটি বড়লোকের তৈরি সমস্যা। বাইরে থেকে দেখলে বেশ মনে হবে সবই বুঝি চমৎকার। কেউ বুঝি বর্ণবাদী নয়। নয়া-নাৎসিদের দেখলে চেনা যাবে যে তারা বর্ণবাদী। কিন্তু নয়াগুলো সমস্যা নয়। সবচেয়ে বড় সমস্যা তাদের নিয়ে, যাদের চেনা যায় না। যাদের মধ্যে আছে গোপন বর্ণবাদ। যারা রুই কাতলা। যারা কলকাঠি নাড়ে। যারা দেশের মাথা। যারা নীলনকশা আঁকে।

বিশ্বায়নে কী হল, এ দেশের আলু ও দেশে যাবে, ও দেশের পটল এ দেশে আসবে। কিন্তু এ-দেশের মানুষ ও-দেশে যেতে পারবে না। বেড়াতে যারা যাবে, তাদের কাউকে কাউকে বেজায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনুমতি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কেউ যদি যেতে চায় কাজ করবে বলে, বাস করবে বলে, তাহলে দুয়ার বন্ধ। বিশ্বায়ন এ শুধু পণ্যের বিশ্বায়ন। যার পণ্য বেশি, তাদের লাভের জন্যই নিয়ম। কিন্তু এ বিশ্ব কি কারও একার! মানুষ চিরকালই এক জায়গা থেকে জীবিকার আশায় উন্নততর জীবনলাভের আশায় আরেক জায়গায় গিয়েছে। এ প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকার চিরকালীন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দিচ্ছে বর্ণবাদী এবং শ্রেণীবাদী নীতি। বিশ্বের কোথাও একর একর জায়গা জমি খালি পড়ে আছে, মানুষ নেই, কোথাও এক চিলতে জমির মধ্যে হাজার লোকের ভিড়। অথচ পৃথিবীর সন্তান সবাই। সবার মধ্যে পৃথিবীর সম্পদের সুষম বন্টন হওয়া উচিত। কিন্তু না, নিয়ম করে দিয়েছেন আমাদের হর্তাকর্তারা, কেউ ভোগ করবে, কেউ ভুগবে। কারও অঢেল থাকবে, কারও কিছুই থাকবে না। মানবাধিকার রক্ষার মাতব্বর সাজার জন্য কখনও কখনও দেশের দরজা খোলা হয়েছিল, রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের ক্ষমা ঘেণ্না করে থাকতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে বস্তিতে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। যে গু মুতগুলো সাদারা ফেলবে না, সেগুলো ফেলবে অসাদারা। এই হল বেশির ভাগ অসাদাদের কাজ। খুব হাতে গোনা কিছুকে ওপরতলায় দেখা যায় ইদানীং। হায়, তাদের বেশির ভাগই ওইটুকু উঠে

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চোখ রঙান্ধ, ইংরেজিতে যাকে বলে কালারব্লাইন্ড, করে ফেলে, নিজেদের ত্বকের রঙকে তাদের সাদা বলে ভ্রম হয়।

পশ্চিমের সুন্দরের দিকেই আমার চোখ পড়তো। কিন্তু কুৎসিতের দিকে চোখ যখন গেল, কুৎসিততর এবং তমগুলোতেও চোখ চলে যায়। অসুন্দর সবখানেই আছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন শক্তিমানের অসুন্দর দেখলে বেশি আশঙ্কা হয়। কারণ তারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে। তারা চাইলে না খাইয়ে মারতে পারে মানুষজাতিকে, তারা চাইলে বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে পারে গোটা বিশ্ব। তারা চাইলে আমার যেখানে এক ইঞ্চি কাটতে হয়, অথবা কাটতেই হয় না, কেটে দিতে পারে বারো ইঞ্চি। এবং সেই বারো ইঞ্চি কাটাকে গরু বা চটের বস্তা যে সুইসুতোয় করা হয়, সে সুতোয় সে সুইয়ে সেলাই করা হয়। যদিও আমি জার্মানির একটি নামকরা স্কলারশিপ পাওয়া লেখক, যদিও হাসপাতালের বড় ছোট সব ডাক্তার নার্স জানে আমি কে, হ্যাঁ অনেক বড় আমি, দেশে দেশে আমাকে দেখলে উপচে পড়ে ভিড়, অটোগ্রাফের ভিড়, আমার জন্য লাল গালিচা, ফুলের তোড়া, যা কিছুই হোক, আমি তো সাদা নই। আমি কালো। কালো আমি পরে আবিস্কার করি, যে, ব্লাডারে ডাইভারটিকুলাম হয়েছে কারণ দেখিয়ে যে অপারেশনটি করা হল, সেটি আদৌ করার প্রয়োজন ছিল না। সম্ভবত প্রয়োজন হয়েছিল আমি কালো বলে। কালোর ওপর অন্যায় হলে, কালোর ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা হলে কেউ প্রতিবাদ করে না। কালোকে কেটে টাকা কামানোতেও সুখ আছে, হোক না সে কুৎসিত সুখ। সুখ তো!

এই পাশ্চাত্যে যে হারে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়, যে প্রক্রিয়ায় মানুষের ওপর অত্যাচার চলে, যেভাবে *বাইরে থেকে আসা লোকদের বা বিদেশিদের* প্রতি ভয় এবং ঘৃণা সুপ্ত এবং নগ্নরূপে প্রকাশিত, তা এসব দেশে না বাস করলে বোঝা সম্ভব নয়। আমার পক্ষেও বোঝা সম্ভব হত না যদি না আমি প্রাসাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে না আসতাম,   খালি পায়ে উঠোনে এসে না দাঁড়াতাম।

পশ্চিমিরা নিজেদের উন্নত জাত বলে মনে করে এসেছে, মনে করে, *মনে করে না* বলে ওপরে ওপরে বললেও বা লিখলেও বা ভাবলেও ভিতরে ভিতরে করে। এই দোষটি তাদের দিই অবলীলায়। দোষ কিন্তু নিজেদের দিই না। কালো বা বাদামিরাই কি সাদাদের উন্নতজাতের বলে মনে করি না? আমি নিজেই তো একজন বর্ণবাদী। আমি নিজেই তো মনে করি বিজ্ঞানে, শিল্পে, বাণিজ্যে, গণতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, নীতিতে, রীতিতে এশিয়া আফ্রিকার চেয়ে ইওরোপ অনেক এগিয়ে আছে, নিশ্চয়ই মাথায় আমাদের চেয়ে ইওরোপের লোকেরা বেশি এগিয়ে আছে বলে এগিয়ে আছে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানিতে মানুষের কিচ্ছু ছিল না। রাস্তায় ধুকে ধুকে মরেছে। সেই জার্মানি মাত্র পঞ্চাশ বছরে ইওরোপের সবচেয়ে ধনী দেশ কী করে হয়! স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর ভারতীয় উপমহাদেশের কী হাল! একশ বছর আগে সুইডেনের লোকেরা বার্চ গাছের বাকল খেয়ে বাঁচত। এত অভাব ছিল! একশ বছরে সুইডেন পৃথিবীর অন্যতম একটি ধনী দেশ বনে গেছে। এর পিছনে কি কোনও কারণ নেই? যাদুবলে কিছু হয়নি। উন্নত মস্তিস্ক নিশ্চয়ই ছিল। --- এ কি খুব গোপনে আমি বা আমরা ভাবি না? ভাবি বলেই তো ওদের সম্ভ্রম করি। ভাবি বলেই তো প্রভু বলে মানি। এখনও। আমার এই ভাবনাটিই সামাজিক ডারউইনিজমের পক্ষে যায়। আমি বিশ্বাস করি, আমার মতো আরও অনেক অসাদা মানুষ সামাজিক ডারউইনিজমে বিশ্বাস করে, গোপনে বা অগোপনে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ চিরকালই তাদের যত সমস্যা, সবকিছুর দায় চাপাতে চায় ঔপনিবেশিক শক্তির ঘাড়ে। যেন নিজেদের কোনও ভুল ছিল না! যেন নিজেদের মস্তিস্ক চমৎকার কাজ করেছে। এ কথা কি কেবল সাদারাই বলে, অ-সাদারা বলে না?

ইংরেজ লেখক সংগঠনের আমন্ত্রণে আমি যখন লন্ডনে। ন্যাশনাল থিয়েটারে আমার কবিতা পাঠ করেছিলেন বিখ্যাত হেলেন কেনেডি, টিকিট করে দর্শক এসেছিল শুধু আমাদের কথোপকথন দেখতেই। হৈহল্লা কম হয়নি সেবার। কনওয়ে হলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় বক্তৃতার আয়োজন, বাইরে তখন মুসলমানরা মিছিল করে স্লোগান দিচ্ছে আমার বিরুদ্ধে। মৌলবাদিরা লিফলেট বিলি করছে আমার বিরুদ্ধে। ইংরেজি কবি সাহিত্যিক মানববাদী সব

একজোট হয়ে আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে লাগলো মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে। হাউজ অব কমন্সে বক্তৃতা। সেদিন একটু স্বস্তি পেয়েছিলাম, ওই প্রথম আমি একা বক্তা নই। আমি মধ্যমণি হলেও সঙ্গে আরও কজন বক্তা ছিল । অবশ্য সকলেরই বিষয় ছিল তসলিমা। সেবার লন্ডনে দেখা হয়েছিল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অমৃতার সঙ্গে। অমৃতা উইলসন বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনেও আছে। বিদেশে আসার পর থেকে বাঙালির সান্নিধ্য আমার জোটেনি। অমৃতার সঙ্গে মুখোমুখি বসে বাংলা বলতে পেরে আমার প্রাণ জুড়োয়। অমৃতা তার সাদা স্বামীকে ত্যাগ করে আফ্রিকার বংশোদ্ভূত একটি কালো ছেলের সঙ্গে বাস করছে তখন। আমাকে মাথায় তুলে ইংরেজ লেখক শিল্পীদের নাচানাচি দেখে অমৃতা বলেছিল, *তোমাকে যে এরা এত সম্মান জানাচ্ছে, ভেবো না এ তোমার কথা ভেবে। আসলে সবই করছে নিজেদের স্বার্থে। স্বার্থ ফুরোলেই তোমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।* এই কথাটি খ্যাতির শীর্ষে থাকা অবস্থায় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছিলাম করতে। করেছিলাম বলেই শত শ্যাম্পেন খোলা, শত লাল গালিচা সম্বর্ধনা, শত প্রশংসা, পুরস্কার, সম্মাননার প্রবাহে মাথাটিকে বরবাদ হতে দিইনি। কখনও ভুলে যাইনি কে আমি, কোথায় আমার জন্ম, কোত্থেকে এসেছি।

পুলিশ যখন বন্ধ হল, চলাফেরা একা করতে গিয়ে মোল্লাদের নয়, ভয় পেয়েছি সেই ন্যাড়ামাথাদের, বুটজুতোদের। বার্লিনে ভারি মিলিটারি বুটজুতো আবার তিনধরনের লোক পরে। নয়া নাৎসি, সমকামী পুরুষ, সমাজত্যাগী পাঙ্ক। সমকামীদের চেনা যাবে আঙুলের আংটি আর ত্রিভঙ্গ আকৃতি দেখে, পাঙ্কদের চেনা যাবে গা ভরা উল্কি বা হলুদ সবুজ লাল বেগুনি রঙের চুল বা গায়ে পেঁচানো সাদা ইস্পাতের শেকল- দেখে। বাকি বুটজুতো সে যদি মিলিটারি না হয়, তবে নয়া নাৎসি। বুটজুতোর একশ হাত দূরে থেকেও দেখেছি কুঁকড়ে যাচ্ছি। নাৎসিদের হাত থেকে বাঁচার জন্য নাৎসির প্রতি সহানুভূতি নেই এমন পুলিশ দরকার নিরাপত্তার জন্য। শুধু আমার কেন, বিদেশি মাত্ররই দরকার। এসব দেশে আমরা *বিদেশি।* আমার মত হাজার হাজার মানুষ যারা অসাদা, তাদের বিদেশি বলে গালি দেওয়া

হয়। কিন্তু কোনও সাদা ইংরেজ বা ডেন এলে বা ফরাসি এলে বা ওলন্দাজ এলে তাদের কিন্তু রাস্তাঘাটে কেউ *বিদেশি* বলে গালি দেয় না। যে অসাদা ছেলে মেয়ে এদেশে জন্ম নিয়েছে, তাদেরও বলা হয় *বিদেশি,* সারাজীবনই তাদের *বিদেশি* বলা হবে। তাদের ছেলেমেয়েদেরও বলা হবে। তাদের ছেলেমেয়েদের ছেলেমেয়েদেরও কি বলা হবে!

পশ্চিমের বর্ণবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানার পর ছোটদাকে কত যে ফোন করে কাতর অনুনয় করেছি, *যেও না দেশ ছেড়ে। যেও না বিদেশে বাস করতে। যে-ই যাবে, সেই শিকার হবে বর্ণবাদীদের। জাত বিরোধী বর্ণ বিরোধী, দরিদ্র বিরোধীদের অত্যাচারে মরে যাবে। তার চেয়ে নিজের দেশে মাথা উঁচু করে থাকো।* ছোটদা শোনেনি।

বর্ণবাদ এসব দেশে প্রচণ্ড কিন্তু এও ঠিক যে এখানেও হয় বর্ণবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। এখানেই প্রমাণ করা হয় যে সামাজিক ডারউইনবাদের বা সোশাল ডারউইনিজমের তত্ত্ব ভুল। এখানেও হয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। নারীর সমানাধিকারের পক্ষে আন্দোলন। এখানেও গাওয়া হয় মানবতার গান। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, রক্তপাতের বিরুদ্ধে মিছিলে নামা, সবচেয়ে বেশি এরাই করে, সাদারই।

জাত্যাভিমান সাদা ইওরোপীয়দের মধ্যে প্রচণ্ড। কিন্তু সুক্ষ্মভাবে দেখলে ভারতীয় উপমহাদেশে যে বর্ণবাদ, তার বীভৎসতার কোনও তুলনা হয় না। ওখানের বর্ণবাদ মূলত রঙবাদ। সমাজে কে নিচু জাত কে উঁচু জাত তার বিচার এখনও করা হয় বটে, কিন্তু জাতের নামে কোনও বৈষম্য আইনত অবৈধ। নিচু জাতের লোকও গিয়ে দেশের রাষ্ট্রনায়ক বনে যেতে পারছে। কিন্তু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে আরেক ধরণের বর্ণবাদ বা রঙবাদ প্রচলিত, তা কেবল নারীকেই, নিজের জাতের নারীকে অপমানিত করছে। *মেয়েটার সবই ভালো ছিল, কিন্তু মেয়েটা কালো।* কালো রঙের মেয়েদের সুন্দরী বলে ভাবা হয় না। রঙ কালো হলে, মুখের ভাষায় এটিকে *ময়লা রঙ* বলা হয়। ময়লার আরেক অর্থ আবর্জনা। কালো মেয়েদের

প্রেমে কোনও কুৎসিত পুরুষও পড়ে না, কালো মেয়েকে বিয়ে করতে কেউ চায় না, করলেও কালো বলে তার ওপর অত্যাচার চলে অহোনিশি। কালো মেয়েরা লাঞ্ছনায় গঞ্জনায় অপমানে অবহেলায় আত্মহত্যা করে। প্রসাধনী কোম্পানীগুলো রঙ ফর্সা হওয়ার নানারকম তেল সাবান ক্রিম আবিস্কার করছে, আর বিক্রিও হচ্ছে ওসব হু হু করে। মেয়েরা রঙ পাল্টে সমাজের চোখে *সুন্দর* হতে চায়। তা না হলে মেয়েদের কোনও ঠাঁই নেই কোথাও। ভারতবর্ষের রাস্তাঘাটে লোকেরা কোনও সাদা বিদেশিকে সে চোর ডাকাত হলেও আদর দেবে, আর কোনও কালো বিদেশিকে সে বড় জ্ঞানীগুণী হলেও শ্লেষ করবে। এর কারণ সম্ভবত দুশ বছরের দাসত্ব। দাসত্ব করতে করতে প্রভুর রঙের প্রতি যে শ্রদ্ধা জন্মেছে, সেই শ্রদ্ধা ইংরেজ দূর হল, ইংরেজের যাবতীয় কুকীর্তি ফাঁস হল, তারপরও যায় না।

দাঁড়িয়ে থাকি পৃথিবীর দু প্রান্তের দু ধরনের বর্ণবাদের মাঝখানে। একা এক শ্যামল রঙ নারী। হঠাৎ চোখে স্বপ্ন এসে খেলা করে, যদি পূব আর পশ্চিম পরস্পরকে আলিঙ্গণ করে ভালোবাসায়, যদি জাতে, বর্ণে আর কোনও বিভেদ না থাকে! যদি বর্ণবাদের মতো একটি কুৎসিততম প্রথা ঘুচে যায় জগত থেকে। তবে কী হবে সেই ভবিষ্যৎ! দেশে দেশে বিভেদের কাঁটাতার আর থাকবে না। সাদা কালোয় মিশে ভবিষ্যতের মানুষ দেখতে হবে নাসাদানাকালো, হবে বাদামি বা শ্যামল। শ্যামে এবং সমতায় ছাইবে আগামী।

আমার স্বপ্নাতুর চোখ বার বার ভিজে ওঠে।

দাহ

তোমার ডেভিডকে এবার একটু নামাও তো পাথরের মঞ্চ থেকে
নামিয়ে কোটরে দুটো চমৎকার চোখ বসাও
অস্ত্র ফস্ত্র ফেলতে বলো হাত থেকে, শত্রুরা
মরেছে সব, ভুরুর মাঝখানের কুঞ্চনও সরিয়ে দাও।
এবার ও দুপা হেঁটে আসুক আমার দিকে,
আমি ওকে চুমু খাবো মিকিলেঞ্জেলো।

জীবনের ডালপালা থেকে বয়স পড়ছে খসে,
তবু প্রেম ফুটছে হৃদয়ে, এ কি কোনও বাঁধ মানে আর....
বল্টিকের কোনও জোয়ার ভাটা নেই, আর দেখ তারই তীরে বসে
আমার সর্বাঙ্গে জোয়ার।

দেশে যে জিনিসটা দেখতাম, রাস্তায় হেঁটে গেলে সবাই তাকিয়ে দেখতো। চোখে অপার মুগ্ধতা। বিদেশে হেঁটে দেখেছি কেউ তাকায় না। যে আমি আমার দেশে সুন্দর, সে আমি পশ্চিমে সুন্দর বলে বিবেচিত হই না। না, আমার দিকে ফিরে ফিরে কেউ তাকায় না। যখন পুলিশবেষ্ঠিত হয়ে চলি, সবাই তাকায়, চিনে ফেলে অথবা চিনতে চেষ্টা করে। আর যখন একা আমি বাইরে হাঁটছি, সঙ্গে পুলিশ নেই, কেউ কেউ হয়তো চিনল, ফিরে তাকালো। কিন্তু বেশির ভাগই ফিরে তাকাবে না। আমি সুন্দর এই হিসেবে আমার দিকে তাকাবে না। রেস্তোরাঁয়, ক্যাফেতে বসে আছি, খুব উৎসুক পুরুষও যদি চোখ ঘোরায় কিছু দেখতে, সেও আমাকে দেখেও দেখে না। যদি না আমি কোনও উদ্ভট কান্ড ঘটাচ্ছি, আমি দর্শনের বস্তু নই।

প্রথম প্রথম গ্যাবি যখন আমাকে নিয়ে যেত তার বাড়িতে-- সে নিজে আপিসে যেত না, তার বউ আপিসে, বাড়িতে আমি আর গ্যাবি শুধু। আমার মনে হত গ্যাবির বুঝি আমার সঙ্গে প্রেম করার খুব ইচ্ছে, কিন্তু পরে বুঝতে পেয়েছি সে ইচ্ছে গ্যাবির মত অসুন্দরেরও ছিল না। পথ চলতে অনেককে পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তাদের স্পর্শ করতে পারিনি। বের্নার্ড হেনরি লেভির সঙ্গে ইচ্ছে হয়েছিল প্রেম করি কিন্তু আমি একা চাইলেই তো প্রেম হবে না, তাকেও চাইতে হবে। নোরবার্ট প্ল্যামবেকের সঙ্গে চমৎকার সব হোটেলে পাশাপাশি ঘরে রাত কাটাতে কাটাতে আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, ওর সঙ্গে প্রেম বা কিছু একটা হোক আমার। অন্তত শরীরের প্রেমই হোক। হয়নি। আমি যত সহজে প্রেমের জন্য মন এবং শরীর প্রস্তুত রাখি, ততটা তারা রাখে না। শারীরিক প্রেম অনেক সহজ বাংলাদেশে, ভারতে, অনেক বেশি কঠিন পশ্চিমে। আগে শুনতাম পশ্চিমে নাকি যে কেউ যে কারও সঙ্গে শুতে যায়, আসলে যে কারও সঙ্গে শুতে যাওয়া এবং শুতে পারার ব্যাপারটি পশ্চিমের মানুষের জন্য তত খাটে না, যত খাটে পূবের মানুষের জন্য। কী জানি, হয়ত এ কারণেই কিছু হয় না ঘটে না যেহেতু আমার ইচ্ছেটা মনেই থাকে, যেভাবে তা প্রকাশ করা উচিত, সেভাবে আমি করি না বা করতে পারি না। নোরবার্ট অত্যন্ত সুদর্শন সুপুরুষ। তাকে আমি মনে মনেই কামনা করেছি। সে কি জানে আমি তাকে কামনা করেছি! আমার বিশ্বাস সে জানে না। আমার কাছে যে জিনিসটিকে মনে হয় জানানোর ইঙ্গিত, সেটি তার কাছে কোনও ইঙ্গিতই বহন করে না। এখানেই দুই সংস্কৃতির পার্থক্য। তাছাড়াও, নোরবার্ট একজন বিবাহিত পুরুষ। আমি যখন নোরবার্টের অপরূপ রূপ দেখে ভীষণ মুগ্ধ হয়েছিলাম, তখন সে বিবাহিত কী অবিবাহিত তা আমি জানি না। আর যদি জানতামও যে বিবাহিত, তারপরও আমার মুগ্ধতায় কোনও কমতি হত বলে মনে হয় না। নোরবার্টের সঙ্গে জার্মানি ঘুরে বেড়াবার দুমাস পর জার্মান প্রকাশনী হফমান এণ্ড কাম্পের আমন্ত্রণে যখন আমি হামবুর্গ নামের শহরে, সেখান থেকে নোরবার্টকে ফোন করতেই নোরবার্ট জানি না পৃথিবীর কোন প্রান্তে ছিল, বলল যে সে কালই চলে আসছে। নোরবার্ট কেবল আমাকে একবার দেখবে বলে চলে এল! প্রেম জেগে ওঠে প্রাণে।

সেই রাতটি, যে রাতে আমরা মুখোমুখি বসে কাটিয়েছি প্রায় সারারাত। পূবের মেয়ে বলেই অপেক্ষা করেছি নোরবার্টের কাছ থেকে আসুক যে কোনও আমন্ত্রণ। পুরুষের কাছ থেকে আসুক। আমরা বসে থাকি বারে। মুখোমুখি। চোখে চোখ রেখে অনেকক্ষণ। অনেক রাত অবদি। *বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না* সংস্কৃতিতে বড় হওয়া আমি বলতে পারি না যে *নোরবার্ট চল আজ রাতে প্রেম করে কাটাই, চল শুতে চাই।* পুরুষের কাছ থেকে আমন্ত্রণ না পেয়ে প্রেম নেই বলে পুরুষকে দোষ দিই। ওই আটলান্টিক হোটেলেই আমার পাশের ঘরে রাত কাটিয়ে নোরবার্ট চলে যায়। নোরবার্ট চলে যায় আর আমি একা ঘরে কাগজে হাবিজাবি কাটতে কাটতে লিখি, *হামবুর্গে, আটলান্টিক হোটেলের লবিতে, এক মধ্যরাতে, নোরবার্ট প্ল্যামব্যাকের জন্য আমার শরীর কেমন করে ওঠে, মনও। এক জোড়া নীল চোখের জন্য আমার চোখে তৃষ্ণা জন্মে। সাদা আঙুলগুলোর জন্য আঙুল, আর তার ঠোঁটের তৃষ্ণায় আমার ঠোঁট হয়ে যায় ধুসর মরুভূমি। শ্যাম্পেনের গ্লাসগুলো দুলতে থাকে, মুখাগ্নি হয় প্যাকেট প্যাকেট মার্লবোরোর, ধোঁয়া চুমু খায় চুলে, চোখে, চিবুকে, চোয়ালে, নোরবার্টের নীল চোখ পান করি বাকি রাত, বাকি রাত শ্যাম্পেনের গ্লাসে নীল দুটো তারা পড়ে থাকে, যত পান করি তত ফুটে ওঠে, তত ঝরে নীল নীল মায়া। এসবের বোঝে না কিছু নোরবার্ট, নোরবার্ট মার্সিডিজ বোঝে, ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ বোঝে। বোঝে না হৃদয় যার বারোমাস খরার আগুনে পোড়ে, টাকাকড়ি তার কাছে নিতান্তই খড়কুটো।*

যারা জানে আমি তারকা জাতীয় জিনিস, তারা আমার কাছাকাছি এসেও আমার দিকে কোনও প্রেমের দৃষ্টিতে তাকায় না, বা কোনও একটি আবেগের হাত আমার দিকে বাড়ায় না। হাত বাড়ায় না এই কারণে যে সম্ভবত তারা ভাবে যে আমি ক্ষুব্ধ হতে পারি তাদের স্পর্ধা দেখে। আমার চলাচল ওই তাদের মধ্যেই যারা আমাকে চেনে তারকা হিসেবে। এর বাইরে যেখানে আমি অচেনা, অপরিচিত, সেখানে আমি যে কোনও ক খ গ ঘ। আমার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকানোর চেয়ে আমাকে ধাককা দিয়ে চলে যাওয়াই বেশি ঘটে।   দিন রাত আকাশ

পার, বিদেশ ভ্রমণ, বক্তৃতা, পুরস্কার, সম্বর্ধনা। গিজগিজ করছে মানুষে। অথচ কী ভীষণ একা আমি! আমার দিন দুর্দিন হয়ে ওঠে প্রেমহীনতায়।

হঠাৎ একদিন কায়সার ফোন করে আমাকে। বাড়ি থেকে ফোন নম্বর নিয়েছে। ফোন নম্বর বাড়ি থেকে জানতে চেয়েছিল ওকে দেবে কিনা, বলেছিলাম দিতে। সেই কায়সার। কায়সার ফোন করার পর কিছু কেমন আছো, কিছু ভালো তো সব, কিছু দেশের খবর কী এধরনের মামুলি কথা বলে তাকে বলি চলে আসতে। সত্যি সত্যি সে আসতে রাজি। সুয়ান্তে ভেইলরকে বলে দিই আমার প্রেমিককে ভিসা দেওয়ার কথা যেন সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জানিয়ে দেয়। হ্যাঁ কায়সারকে বলেছি ভিসা নিয়ে সুইডেনে চলে আসতে। কায়সার সুইডেনের দূতাবাসে ভিসা নিতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেছে ভিসা। আমি বলেছি, সেটি একটি কারণ। প্রেমিক সে, এটিও একটি বড় কারণ। আমি যদি প্রেমিক না বলে কায়সারকে বন্ধু বা কাজিন বা মামা কাকা বলতাম, ভিসা সে পেত না। প্রেমকে মর্যাদা দেয় সুইডেন। এ দেশে বিয়ে বা সহ-বাস যা-ই করে দুজন মানুষ, একটিই ভিত্তি তার, প্রেম। প্রেমিক বা প্রেমিকার মূল্য বাবা মা ভাই বোনের চেয়েও বেশি এদেশে। লিভ টুগেদার করা বা সহ-বাস করা প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যদি বিচ্ছেদ হয়, তবে দুজনের যা কিছু সহায় সম্পত্তি, তা আইনে সমান ভাগে ভাগ হয় দুজনের মধ্যে। আত্মীয় স্বজনের কোনও ভূমিকাই নেই এসবে। কায়সারের এক বোন থাকে সুইডেনে। সেই বোনের কাছে বেড়াতে আসার জন্য অনেকবারই সুইডেনের ভিসা চেয়েছিল, মেলেনি। এবার মিলেছে। না, আমি বাবা মা ভাই বোন কারও ভিসার জন্য অনুরোধ করিনি, করেছি কায়সারের জন্য। যে কায়সার আমার খোঁজও একদিনও নেয়নি, দুমাস ধরে যখন পড়েছিলাম এ বাড়ির ও বাড়ির অন্ধকারে। সেই কায়সার এল। সেই কায়সারের সঙ্গে কোথায় যেন আমার মেলে না। সেই দুরন্ত প্রেম যা ছিল একসময়, সেই প্রেমের মানুষকে কাছে নিয়ে এসে দেখলাম, মানুষটা ঠিক আছে, সেই প্রেমই কেবল নেই। প্রেমের অভিনয়টুকু শুধু আছে। রীতিমত উত্থানরহিত হয়ে সে পড়ে আছে। কী হয়েছে? না পেটের অসুখ। আমি সেই শান্তিবাগ আর শান্তিনগরের মেয়ে নই। আমি এখন অচেনা অদ্ভুত

পরিবেশে, সাদা সুপুরুষেরা আমার সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী। সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোয় সে বড় বড় চোখ করে দেখছে যে আমি *তারকা।* না, কোনও অভিনন্দন সে আমাকে জানায় না। তার চোখে কোনও খুশি নেই। বরং, কায়সার আমার সবকিছুকে হিংসে করা শুরু করল। তার ভয় আমি বোধহয় প্রেমে পড়ে যাবো কোনও সুদর্শনের, বিশেষ করে রোনাল্ডের। কায়সারের সংকীর্ণতা বাড়তেই থাকে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, পুরুষ যেখানেই যায়, সেখানে পুরুষের আগে আগে যায় পুরুষের ঈর্ষা। দেখে আমি ক্ষেপে উঠি, ভীষণ ক্ষেপে উঠি। কেন এত ক্ষেপে উঠি! সুইডেনের কারও ওপর ক্ষেপে উঠতে এখানে পারি না বলে! কারও সঙ্গে চিৎকার করতে পারি না বলে! হ্যাঁ তাই করি। মনে যত রাগ ছিল, যত ক্ষোভ ছিল, কায়সারের ওপরই তার বর্ষণ চলে। এসেই সে বলছে বোনের বাড়ি যাবে। দেখি সুটকেস ভরে সে এনেছে তার বোন আর আর বোনের বাচ্চা কাচ্চার জন্য জিনিস। আনতেই পারে। কিন্তু আমার অভিমান হতে থাকে। অভিমানটি অদ্ভুত। মনে হতে থাকে আমার জন্য কায়সারের কোনও ভালোবাসা নেই। ভালোবেসে আমার কাছে সে আসেনি। আমাকে ব্যবহার করে সুইডেনে তার আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আমার আরও মনে হতে থাকে কায়সার এসেছে সুইডেনে থেকে যাওয়ার উদ্দেশে। বাংলাদেশের লোকেরা তো তাই করে। ছলে বলে কৌশলে ইওরোপের কোনও ধনী দেশ অবদি পৌঁছে ব্যস মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। কায়সারও হয়তো তাই করবে। থেকে যাবে, পরে তার বউ বাচ্চাকে আনিয়ে নেবে। এখানে সে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমাকে এ দেশের সরকার নিশ্চয়ই দোষ দেবে। বলবে মিথ্যে কথা বলে প্রেমিককে অতিথি হিসেবে এনে এদেশে তাকে রেখে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছি। দোষ দেবে এ কথাটি ভেবে আমি উদ্বিগ্ন। অস্থিরতা আমার সর্বাঙ্গে। আমি মিথ্যে বলি না। আমি অপরাধ করি না। কিন্তু কায়সারের জন্য এই গ্লানি কেন বইবো! কায়সারও হয়তো বোঝে ওকে আমি ঠিক ভালোবাসতে পারছি না। আমাদের কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। আমরা সেই পুরোনো গানটি আর গাইতে পারছি না। কায়সার তার ভিসা ফুরোলে চলে যায়। ভিসার মেয়াদ বাড়াতে চেয়েছিল, রাজি হইনি। তাকে যে বিমান

বন্দর থেকে নিয়ে এসেছিলাম, সেখানেই রেখে আসি। আমার বাড়ির চেয়ে বেশি সে থেকেছে উপসালায় তার বোনের বাড়িতে। প্রেমের জন্য উতলা হয়ে সহস্র মাইল দূর থেকে প্রেমিককে আনিয়ে আমাকে দেখতে হল প্রেমিকের কাছেও প্রেম নেই। এরপর আর কী রইল আমার? কিছু না। ফাঁকা চারদিক। ব্যক্তিজীবন জুড়ে বড় একটি শূন্য।

নারী পুরুষের প্রেমের মধ্যেই আমার জীবন যাপন ছিল। কিন্তু সোল হেনকে নিলসনের প্রেম আমাকে নাড়া দিল বেশ। সোল সুইডিশ মেয়ে। অর্ধেক সুইডিশ অর্ধেক জার্মান। তার মা জার্মান। বাবা সুইডিশ। জন্ম, বড় হওয়া সব সুইডেনেই। আমি সুইডেনে পৌঁছোনোর পর প্রচুর চিঠি পত্র আমাকে হাতে দেওয়া হয়, সুইডেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। ওখানেই ছিল সোল নিলসনের চিঠি। তার বাড়িতে আমন্ত্রণ, চা কফি খাওয়ার জন্য নয়, থাকার জন্য। যতদিন থাকতে চাই, ততদিন। সারাজীবন হলে সারাজীবন। চিঠিতে কোথাও যেন কী ছিল, স্নেহ, মায়া। আরও চিঠি পেতে থাকি সোল নিলসনের। বড় বড় চিঠি। পাঁচ ছ পাতা করে চিঠি। চিঠিগুলো অন্যরকম। প্রতিদিনই তো কত কারও চিঠি পাই, চিঠির কারও সঙ্গে কোনওদিন যোগাযোগ করার ইচ্ছে হয়নি কোনওদিন। কিন্তু একদিন এক নির্জন বিকেলে হঠাৎই ফোন করি, ফোনের অপর পারে এমন করে সোল নামের মেয়েটি কথা বলে, যেন আমার সে অনেক দিনের আত্মীয়। *চলে এসো,* এ আমার স্বভাব বলে ফেলা। সোল সত্যি সত্যি চলে আসে। আমার চেয়ে এক হাত লম্বায় বেশি। সুন্দর ইংরেজি বলে। ইংরেজি বলার সময় সুইডিশ-সুর   তার একবারেই থাকে না। কোথায় ইংরেজি শিখেছো, শিখেছি ভারতে। এই হল উত্তর। ভারতে সে দুতিন বার গিয়েছে। গাব্রিয়েলার কাছে। গাব্রিয়েলা নামের এক জার্মান সাংবাদিক কাজ করত ভারতে। তার কাছেই সে গিয়েছিল। এই সেই গাব্রিয়েলা জার্মানি থেকে ডাৎজাইটের জন্য যে আমার সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছে। কী করে জানো তুমি তা সোল? সোল জানে, সে নিয়মিত জার্মান পত্রিকা পড়ে, বিশেষ করে গাব্রিয়েলার পত্রিকা। সোল আমার জন্য রসগোল্লার রেসিপি, কাজু বাদাম, জিলিপি বানানোর রেসিপি, একটু গরম মশলা,

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্যাসেট এসব নিয়ে আসে প্যাকেটে করে। সে এসে লিডিঙ্গোর বাড়িতে আমাকে পায়নি প্রথম। জিনিসগুলো দরজার কাছে রেখে সে চলে গেছে, চিঠি লিখে গেছে। রাতে দরজা খুলতে গিয়ে থমকে যাই। জিনিসগুলো দেখে মরমে মরি। ভুলেই গিয়েছিলাম সোল আসবে। একেবারে দক্ষিণের কোনও এক ছোট শহর থেকে সে রেলগাড়িতে করে ছ ঘন্টার পথ পেরিয়ে এসেছে এখানে। সোলকে সে রাতে পাওয়া যায়, নিচতলার বারান্দায় শুয়েছিল, ভোরের ট্রেন ধরবে বলে।

সোল অনেকটা বড় বোনের মত হয়ে ওঠে। সে হয়ে ওঠে অথবা তাকে আমি ওই জায়গায় তার অনুমতি না নিয়েই বসিয়ে দিই। সোল দুতিনবার ভারত ভ্রমণ করেছে বলে সে ভারতীয় হয়ে যায়নি। সে ইওরোপিয়। কিন্তু তুমি যখন যারা তোমার সংস্কৃতির কিছুই জানে না তাদের মধ্যে কাটাতে থাকো দিনভর, মাসভর, তখন কেউ সামান্য জানে তোমার সংস্কৃতির খবর, ঠিক তোমার সংস্কৃতি না হলেও কাছাকাছি কোনও সংস্কৃতি, তাকেও তখন তোমার সবচেয়ে আপন মানুষ, ঘরের মানুষ বলে মনে হবে। সোলকে তাই আমার অত আত্মীয় লাগে। সোল দিব্যি থাকতে থাকে আমার লিডিঙ্গোর বাড়িতে। যেতে থাকে আমার সঙ্গে যেখানেই যাই আমি। ঘরের মানুষের মত অনেকটা। রান্নাঘর পরিস্কার করছে। আমার জন্য চা করে আনছে। আমি লিখছি বা মন দিয়ে কিছু করছি, লেখার অসুবিধে হবে ভেবে সে আমার ধারে কাছে আসছে না। আমি সোলের বাবা মা ভাই বোন সবার কথা জানতে চাই, গল্প শুনতে চাই। জানি না নিজের স্বজন থেকে দূরে আছি বলে, নাকি পূবের পরিবার-প্রথায় বড় হয়ে ওঠার কারণে এই আগ্রহ আমার। সোল বলে কী করে তার মা যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানির দারিদ্রে ভুগতে ভুগতে পালিয়ে এসেছিল সুইডেনে। এখানে এক সুইডিশ লোকের সঙ্গে দেখা। দুজনের বিয়ে। দুটো সন্তান জন্মাবার পর বাবা চলে গেল। কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। মা গতর খেটে একা দুই সন্তানকে, সোলকে আর তার ভাইকে বড় করল। সোলের সঙ্গে এখন বাবার বা ভাইয়ের কোনও যোগাযোগ নেই, এক মায়েরই সে খোঁজ নেয়। মাঝে মাঝে মাকে দক্ষিণের এক ছোট্ট শহরে দেখতে যায়।

সোল বিয়ে করেনি কেন, জিজ্ঞেস করেছি। বিয়ে? কাউকে পছন্দ হয়নি বলে। সোল বলে। আমি মন দিয়ে সোলের জীবনের গল্প শুনি। তার ছোট্ট ঘর, ঘরে বইয়ের স্তূপ, মাঝখানে একটা ছোট্ট টেবিল, তার ওপর টাইপরাইটার। আমাকে যে তোমার বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে, গেলে কোথায় থাকতে দিতে? তোমার জন্য আমার শোবার ঘরটি ছেড়ে দিতাম। আর আমার লেখার ঘরে একটি বিছানা পেতে নিতাম। সোল অনেকটা বোন বোন মা মা। সোলকে মনে হয় একশভাগ অসুইডিশ। এদেশের মানুষ হয়েও এদেশের মানুষের স্বভাব চরিত্র   একেবারেই নেই। আমাদের ছেদ পড়ে।   সোলের ছুটি   শেষ হয়ে যায়। তাকে ফিরে যেতে হয়। সোল কী কাজ করে, তা আমার ভালো করে জানা হয় না। সোল বলে সে খুব ছোট কাজ করে। ছোট কাজ বলতে বুড়ো বুড়িদের বাড়ি গিয়ে তাদের কাজকর্ম করে দেওয়া। সমাজ পরিষেবার কাজ। সোলকে দেখে আমি অবাক বনে যাই। যে কোনও বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে। ফালতু কথা নয়। বেশ বুদ্ধি ওর, অভিজ্ঞতা ওর, লেখাপড়া ওর, কিন্তু ওকে কেন এরকম কাজ দেওয়া হয় না যেখানে ও ওর পাণ্ডিত্য কাজে লাগাতে পারে। এমনকী আমার কিছু বক্তৃতা ও লিখে দিয়েছিল। আমি কী বলতে চাই তা জেনে নিয়ে গুছিয়ে লিখে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার তো সুইডিশ বুদ্ধিজীবি কম দেখা হল না। সোল কারও চেয়ে একফোঁটা কম নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে ওর জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত। আমি ওর জন্য চেষ্টা করি ডগেনস নিহেটোরের মত পত্রিকায় সাংবাদিক যেন ও হতে পারে। আর্নে রুথকে চিঠি লিখে দিই, যে, সোল সাংবাদিক হিসেবে খুব ভালো কাজ করবে। এই প্রতিভা অযত্নে পড়ে আছে। একে নিন। ঠিক বাংলাদেশে যেমন করতাম, কারও প্রতিভার দেখা পেলে পাঠিয়ে দিতাম যেটুকু প্রভাব আছে খাটিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায়। কাজ হত। কিন্তু সুইডেনে সত্যিকার কাজ হয় না। কেন! হয়তো কোনও সাংবাদিকতায় সার্টিফিকেট চাই। তাই কী! এখানে তো এদেশিদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার আগ্রহ খুব নেই। এত যে সাংবাদিক চারদিকে, কজনের আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি! খুব কম মানুষেরই। কয়েক বছর ধরে লেখাপড়া করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র বা বড় কিছু হবার ইচ্ছে খুব বেশি ছেলেমেয়ের নেই।

রাতারাতি নাম কামানোর ইচ্ছে সবার। ভালো গান জানলে কোম্পানী ধরো, একটু বলতে লিখতে পারলে সাংবাদিক হয়ে যাও, টিভিতে চেহারা দেখিয়ে নাম করো। নামের কাঙাল সব। কষ্টহীন কেষ্ট পাওয়ার সাধ সবার। সেই সোল। সেই দিদির মত সোল হঠাৎ এক রাতে চেঁচিয়ে ওঠে ভীষণ। কারণ ফোন বেজেছিল ঘরে, ফোনে কিছুক্ষণ কথা সারার পর কে ফোন করেছে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলাম, আমার প্রেমিক। তক্ষুনি সে ফেটে পড়ে রাগে। প্রেমিক কেন? প্রেমিক কী চায়? তোমাকে কেন সে বিরক্ত করছে এত রাতে? কী হবে প্রেমিক দিয়ে! আমার হৃদপিণ্ড কাঁপলো সে চিৎকারে। কেন এমন করছে সোল! হয়েছে কি ওর? চিৎকারের পর সে কী কান্না সোলের! কাঁদতে কাঁদতে একসময় আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ও বলতে শুরু করলো, আমি যেন ওকে ভুল না বুঝি ওর এই আবেগের জন্য। গাব্রিয়েলাকে ও ভালোবাসতো, ওর সঙ্গে সম্পর্ক আর নেই ওর। সে কারণেও কাঁদলো সোল। গাব্রিয়েলা কী করে ওকে অপমান করে হামবুর্গের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, সে কথাও কাঁদতে কাঁদতে বলল। আমি শ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম। এর আগের দিন গাব্রিয়েলার প্রসঙ্গে সোল বলেছে, গাব্রিয়েলা ওর বন্ধু ছিল। বন্ধু। প্রেমিকা হলে তো বলতো যে সে প্রেমিকা ছিল। আমিও অন্য কিছু অনুমান করিনি। গাব্রিয়েলার জন্য কাঁদলো কেন সোল, আমার ফোনের কথা শুনে চেঁচালো কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর তখন আমার একটু একটু করে পাওয়া হয়। সোল নিশ্চয়ই সমকামী এবং আমাকে সে দারুণ ভালোবাসে। কিন্তু আমাকে সে অনেকবার বলেছে, আমি যেন তার ছোট্ট বোন। এ শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। সে সমকামী হোক, তাতে আমার কোনও অসুবিধে নেই। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লেই হয়। কারণ আমি মানুষটা বড় অসমকামী।

বাংলাদেশে সমকামীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। হয়ত হয়েছে, কিন্তু কেউ তো আর প্রকাশ করে না যে সে সমকামী। এখানে জোর গলায় মেয়েরা বা ছেলেরা বলে যে তারা সমকামী। ভিয়েনায় নারীকল্যাণ মন্ত্রী ইওহানা ডোনালের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলছিলাম,

কথায় কথায় জানতে চেয়েছিলাম, তুমি বিয়ে করেছো? আমাকে চমকে দিয়ে মেয়ে বলে, না। বলি, *কেন, কোনও পুরুষকে পছন্দ হয় না বুঝি?*

মেয়ে সোজা বলল, *আমি সমকামী।*

বল কি?

আমার তখন জানার উচ্ছে টগবগ করছে। --*আচ্ছা কি করে তুমি সমকামী হলে?*

--ছোটবেলা থেকেই। আমার দিদিমার কোলে বসে থাকাকালীন। দিদিমা আমাকে কোলে নিলে আমার গায়ে তার যৌনাঙ্গের ঘর্ষণ পেতাম, তাতে আমার বেশ পুলক লাগত। তারপর বড় হয়ে দেখলাম যে আমি মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছি। মেয়েদের বুকে হাত দিলে আমার শারীরিক আনন্দ হয়। এসব আমাকে বুঝিয়েছে যে আমি সমকামী। এখন আমি প্রেমিকার সঙ্গে সহ-বাস করি।

--ও।

নিজের চোক্ষে সমকামীদের সবচেয়ে বেশি দেখা হয় জার্মানিতে। বার্লিনের ডেআআডের স্কলারশিপ পেয়ে গিয়েছি ওখানে বছর খানিকের জন্য। যাওয়ার দুদিন পরই আলাপ হয় ক্রিশ্চান ইয়নের সঙ্গে। জার্মানির হিউম্যানিস্ট সংগঠনের প্রেসিডেন্ট সে। সে সমকামী। তার বেশ কিছু সমকামী বন্ধুর সঙ্গেও পরিচয় হল। আমরা এমনকী ঘুরে বেড়ালাম বার্লিনের সমকামী বার ক্যাফেতে। সে দেখার বিষয় বটে। বার্লিনের রাস্তায় ওরা কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটছে, বারে বসে আলিঙ্গন করছে, চুমু খাচ্ছে। আমার জন্য এ সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। জীবনে যা দেখিনি, শুনিনি, তাই চোখের সামনে ঘটতে থাকে। ছেলেরা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। হাঁটা চলাগুলো, আমার সঙ্গে যে বন্ধু ছিল, বলে যে, মেয়েদের মতো। এখানে আমি আবার আপত্তি করি। মেয়েদের হাঁটা চলার কোনও নির্দিষ্ট ধারা আছে নাকি! সমকামী পুরুষদের ঢংকে মেয়েলি ঢং বলাটাও আমার পছন্দ নয়। সমকামী পুরুষদের মধ্যে সবাই ঢঙ্গী নয়। কেউ কেউ হাত পা নেড়ে কথা বলে, যাদের বলা হয় *মেয়েলি।* কেউ কেউ আবার শক্তপেশির পুরুষ। ব্যায়াম করে পেশি ফুলিয়ে বেশ *মাচো মাচো* ভাব দেখাচ্ছে সারাক্ষণ। এ

আবার আরেক ধরনের ঢং। ঠিক আগেরটির উল্টো। কেউ তথাকথিত *পুরুষালি* ভাব করে আরাম পাচ্ছে, কেউ তথাকথিত *মেয়েলি* ভাব করে আরাম পাচ্ছে।

মাথার ভেতর নারীপুরুষই লাভারস বা কাপল। মাথা থেকে এই ভাবনা সমূলে দূর না হলে অভিনয় চলবেই সমকামিদের মধ্যে। একজন নরম হও, আরেক জন শক্ত হও। যেন শক্ত মানে পুরুষ, নরম মানে নারী। অভিনয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে ড্র্যাগ-কুইন হওয়া, ড্র্যাগ কুইন, যে ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরে অবিকল মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়ায়। এদিকে সমকামী মেয়েদের অনেকেই চামড়ার পোশাক পরে। এই যে কী পোশাক পরবে না পরবে তা আমার মনে হয় সম্পূর্ণই রাজনৈতিক, অসমকামী থেকে ভিন্ন হওয়ার জন্য, নিজের আলাদা একট পরিচয়ের জন্য, কেউ কেউ অবশ্য পরে *ওরা* পরছে বলে। দলে ভেড়ার জন্য। আমি কিন্তু অনেক সমকামী পুরুষকে দেখেছি সাধারণ যে কোনও পুরুষের মত, সমকামী নারীকে দেখেছি যে কোনও নারীর মতই। দেখে বোঝার উপায় নেই সে কোন যৌনক্রিয়ায় অভ্যস্ত। তা বোঝা তো কারওরই কথা নয়। যৌনতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যপার, একেবারে নিজস্ব। সেটাকে পোশাক পরিচ্ছদে, আচারে ব্যাবহারে, কথায় বার্তায় তুলে আনার প্রয়োজন কী? কারণ যদি রাজনৈতিক হয়, তবে বলবো, যুক্তি আছে। কারণ সমকামীদের অধিকার আদায় করার জন্য তাদের সংগ্রাম অনেকদিন থেকে চলছে। পোশাক, পতাকা, র‍্যালি সবই ওই সংগ্রামের অংশ।

দানিয়েল শারে নামের এক সমকামী মেয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়, সেও আমার স্বভাবগত কৌতূহল থেকে। *ব্যাপারটি কী, দেখিতো* জাতীয় আগ্রহ। এই কৌতূহল আমার হত না যদি না দানিয়েল আমার বাড়িতে এসে হঠাৎ উপস্থিত হত সেদিন। আমার সঙ্গে তার দেখা প্যারিসের অনুষ্ঠানে। আমি মঞ্চে বক্তা, সে দর্শকের সারিতে লিখে নিচ্ছে যা যা বলছি। একাধিক অনুষ্ঠানে তাকে প্রথম দিকের আসনে বসে মন দিয়ে আমার কথা শুনতে আর লিখতে দেখেছি। মেয়েটি একটু দেখতে সাধারনের মত না হওয়ায় আমার নজর পড়ে

মেয়েটির দিকে। হোটেল দ্য ভিলের অনুষ্ঠান শেষে যখন বেরিয়ে আসছি মেয়েটিকে বলেছিলাম, *এই, বেশ তো তুমি। কী নাম তোমার!*

মেয়েটি নামধাম দ্রুত বলে নিয়ে ব্যাগ্র হয়ে বলল, *তোমার কি কোনও ফোন নম্বর দিতে পারো যোগাযোগের?*

কাউকে আমার ফোন নম্বর দেবার নিয়ম নেই। এই নিয়ম পালনে অভ্যস্ত আমি। নিরাপত্তার চোখ এড়িয়ে দ্রুত ফোন নম্বর লিখে দিই আমার বাড়ির। মেয়েটির কণ্ঠস্বর ভারি। তা ঠিক। ভেবেছিলাম মেয়েটি হয়তো কখনও ফোন করে মামুলি কথা বলবে। কিন্তু আমাকে অবাক করে কোনওরকম মামুলিতে না গিয়ে *চলে আসছি* বলে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য সুদূর ফ্রান্স থেকে উড়ে আসে স্টকহোম শহরে। না, আমার বাড়ির ঠিকানা সে পায়নি। রাস্তায় পুঁটলির মত বসেছিল, ওখান থেকে তুলে নিয়ে আসি। সেই দানিয়েল একবার নয়, স্টকহোমে আমার সঙ্গে দেখা করতে দুবার এসেছে। আর বার্লিনে যখন ছিলাম, বেশ অনেকবারই এসেছে। বিমানে না পারলে প্যারিস থেকে রাতের বাসে চলে এসেছে। ওর অত টাকা নেই, একবার আসতে চাইছে, তো আমিই ওকে বিমান খরচের টাকাটা দিই। টাকা দেওয়া বলতে ফরাসি প্রকাশক এডিশন দ্য ফামের কাছ থেকে আমার রয়েলটি তুলে ওকে নিয়ে নিতে বলি। ও টাকা দিয়েই দানিয়েল টিকিট কেটেছিল বিমানের। আমার সঙ্গ পেতে সে কেবল জার্মানিতে আসেনি, স্পেনে গেছে, কানাডা গেছে। বার্লিনে আমার সঙ্গে দানিয়েলের চমৎকার বন্ধুত্বই শুধু গড়ে ওঠে না, আরও কিছু গড়ে ওঠে। সেই গড়ে ওঠা দানিয়েলের দুর্নিবার ইচ্ছেতে। সে নাকি আমার প্রেমে পড়েছে। তাই বারবার সে আমার দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। তুমি যদি দীর্ঘ দীর্ঘ কাল ধরে সঙ্গীহীন দিন কাটাও, রাত কাটাও, একসময় তুমি যে জিনিস জানো না, যে মৈথুন তুমি কখনও করোনি, সেই মৈথুনে তুমি চেষ্টা করো শরীরকে তৃপ্তি দিতে। জীবনে স্বমৈথুন আমি তিরিশোর্ধ জীবনে চর্চা করেছি, তাও পশ্চিমে এসে। আর পশ্চিমের মেয়েরা এই স্বমৈথুন শিখে নেয় অল্প বয়সেই, যে বয়সে পূবের মেয়েরা আতঙ্কে কেঁপে ওঠে নিজেকে ঋতুবতী হতে দেখে। দানিয়েলের সঙ্গে শরীরের যে সম্পর্কটি শেষ পর্যন্ত

আমার হয়, সেটি সমকাম সম্পর্কে অবাধ কৌতূহলের কারণে। এটিকে সে মিথুন বলে সুখ পায়, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে আমার স্বমৈথুনে দানিয়েল আমাকে সাহায্য করছে, এই মাত্র। এটিকে শেষ অবদি মিথুন বলতে আমার বাধে, কারণ দানিয়েল আমার শরীরের প্রতি অঙ্গ যে তৃষ্ণায় চুম্বন করে, সে তৃষ্ণায় আমি তাকে চুম্বন করি না। সে তৃষ্ণায় তাকে স্পর্শও করি না। আমার হাত বা ঠোঁট তার স্তনের নিচে নামতে চায় না, সে যতই আমাকে আবদার করুক বা অভিজ্ঞতা দেবার পণ করুক। চেষ্টা যে করিনি দুএকবার তা নয়, ব্যর্থ হয়ে ফিরেছি। তবে সুখের প্রশ্ন যদি ওঠে, তবে বলবো, একদিনও এমন ঘটেনি যে দানিয়েলের আঙুলে আর জিভে আমি নদী হইনি বা আমি শীর্ষসুখে ভাসিনি। অনেকদিন এও আমার বিশ্বাস ছিল যে, জীবনে কোনও পুরুষই কখনও আমাকে এমন তীব্র আনন্দ দিতে পারেনি। পুরুষ চিরকালই তার ওপর নারীকে নির্ভর করাতে চেয়েছে, বিশেষ করে যৌন সম্পর্কের জন্য। নারী, সে যত সয়ম্ভরই হোক, ভেবেছে, পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পন করতে বাধ্য। নারীর ওপর আধিপত্য করার জন্য পুরুষের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্রটি হল এই, এই সঙ্গম। সঙ্গম অর্থ যদিও মিলন, সত্যিকার অর্থে এটি কোনও মিলন নয়, এটি শর্তের মতো, *আমি তোমাকে এই দিচ্ছি, তুমি আমাকে সেই দেবে। আমি তোমাকে ভাত কাপড় দিচ্ছি, নিরাপত্তা দিচ্ছি, তুমি আমাকে শরীর দেবে, শরীর দেবে আর বাকি যা কিছু আছে তোমার সব দেবে। তুমি আমার সম্পত্তি, তোমার শরীরটা আমি কিনে নিয়েছি সঙ্গমের জন্য। আমি ওপরে তুমি নিচে। তোমার এই শরীরে আর কোনও সাধ আহলাদ থাকতে পারে না। তোমার শরীরটা পুরুষকে প্রার্থণা করবে, আমি সেই পুরুষ। আমার পুরুষাঙ্গকে তুমি চুমু খাও, পুজো কর। এই পুরুষাঙ্গ ছাড়া তুমি অসুখী, তুমি নিঃস্ব, রিক্ত, তুমি কদর্য, তুমি অসহায়, অনাথ। এই পুরুষাঙ্গ তোমাকে পরিচয় দেয়, তোমাকে সংসার দেয়, সন্তান দেয়। তোমাকে নত করে, নম্র করে। কোথায় যাবে তুমি নারী, এই পুরুষাঙ্গের কাছে তোমার ফিরে ফিরে আসতেই হবে। এটিই তোমার জীবন।* ---হ্যাঁ এই কুৎসিত পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে নারীর সমকামিতাই হতে পারে একটি প্রলয়ঙ্করী প্রতিবাদ। এক যৌনতার কারণ ছাড়া পুরুষের ওপর নির্ভরতা আমার

নেই। পুরুষ আর সব কিছুতে হেরে গেলেও এখনও নারীকে নিজের ওপর নির্ভর করাতে পারে এক সঙ্গমের জন্যই। এই একটি জায়গাই আছে তার নারীর ওপর আধিপত্য করার। সবল নারীও হেরে যায় এসে এখানেই, পুরুষাঙ্গের প্রয়োজনের কাছে। এক যৌনতা ছাড়া পুরুষের কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। দানিয়েলকে পেয়ে ওই প্রয়োজনটুকুও উড়ে যায় হাওয়ায়। বলি বেশ জোর দিয়ে, *কাব্যকলা কম করেনি পুরুষ, স্তন যোনি নিতম্ব কম আঁকেনি, গড়েনি। নারীকে দলিত করে অনর্গল আওড়েছে বিচিত্র বয়ান, কে বলে পুরুষ ক্ষমতা রাখে বোঝার নারীর অন্তর্গত ভাষা, কে বলে সে ক্ষমতা রাখে পোড়ার অন্তর্দাহে তার! যেহেতু নারীই দেখতে জানে পালকের মত খুলে খুলে ক্ষত, নারীকেই নামাতে হবে ঠোঁট চুম্বনের জন্য স্তনে, নারীকেই মেলতে হবে যোনিফুল নারীর সজল আঙুলে। নারী ছাড়া কার সাধ্য নারীকে আমূল ভালোবাসে! এই আমি, আমি নারী, নারীর জন্য খুলে দিচ্ছি আমার অন্তর বাহির।*

দানিয়েল আমাকে আনন্দ দিয়েছে, নিপূণ শিল্পীর মতো সে আমার শরীরের প্রতিটি কণা ভিজিয়েছে চুম্বনে, আমি কিন্তু তাকে শীর্ষসুখ কোনওদিন এতটুকু নিতে পারিনি। সমকামী হতে যে যোগ্যতা দরকার, সত্যি বলতে কী সেটি নেই আমার। পুরুষের যৌনাঙ্গে জিভ না ছোঁয়ালেও চলে, সমকামী মেয়েরা অভ্যস্ত জিভে। আমার আড়ষ্ট জিভ। না যায় নারীর যৌনাঙ্গে, না পুরুষের। তবে একসময় পুরুষে অভ্যস্ত হয়েছি। দৈর্ঘে প্রস্থে, আকারে আকৃতিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এমন স্নাত, কামোত্তোজিত শিশ্নকে আমি ভিজিয়েছি জিভের জলে। কেবল শিশ্ন হলেই তো হয় না, শিশ্নের মানুষটির জন্য নিজের সামান্য হলেও প্রেম থাকতে হয়। প্রেম থাকলেই দুর্গম পথে যাত্রা শুরু করতে পারি দ্বিধাহীন।

সমকামী হওয়ার স্বপ্ন ছিল আমার। ভেবেছিলাম, হয়েই গেছি বোধহয়। কিন্তু না, এতকিছুর পরও, এত বোধোদয়ের পরও, দানিয়েলের মত প্রচণ্ড আপোসহীন নারীবাদীর সংস্পর্শে থেকেও, পুরুষকে পরিত্যাগ করতে হলে সমকামি হওয়ার প্রয়োজনিয়তার সমস্ত অ আ ক খ বুঝেও জেনেও শেষ পর্যন্ত আমি সমকামী হইনি। সুদর্শন পুরুষ দেখে কাম জেগেছে আমার।

বার্লিনে গভীর বিষণ্নতায় ভুগেছি দীর্ঘ দিন। এই রোগে ভুগলে উদ্ভ্রান্তের মত হেথা নয় হোথা নয় করে কাটে। আমারও তাই করে কেটেছে। এক পর্যায়ে বাঙালির আড্ডায় গিয়ে পড়লাম। সে সময়ই এক সুদর্শনের সঙ্গে দ্রুত ভাব বিনিময়। কিন্তু সুদর্শন বেচারা নিশ্চিতই উত্থানরহিত। তাকে যে তক্ষুনি দূর করে দিয়েছি তা নয়। শরীরে যখন তোমার নিঃসঙ্গতার দাহ, তুমি কোনও রাস্কেলকেও দূর করে দেবার সাহস করো না। তবে ভাব গড়িয়ে বন্ধুতায় নামে, এবং যখন তুমি এই শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাও, তখন বন্ধুতা গড়িয়ে কোনও অতল সমুদ্রে নেমে টুপ করে পড়ে জন্মের মত হারিয়ে যায়। এ আমি বেশ দেখেছি। আমন্ত্রণ পেয়ে নতুন নতুন শহরে যাচ্ছি, সাতদিনেই গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল কারও কারও সঙ্গে। কত দেশে, কত শহরে কত এলিজাবেথ, কত অ্যান, কত মারিয়া, কত ডায়ানা, কত জন, কত ক্রিশ্চান, কত পিটার, কত প্যাট্রিসিয়া, কত মিশেল, কত মার্গারেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। কত কেউ জড়িয়ে ধরে কাঁদলো বিদায় নেবার সময়। বিদায়ের সময় ভাবি যে সারাজীবন যোগাযোগ থাকবে। কিন্তু যেই ছেড়ে আসি শহর, তার যোগাযোগের সব ঠিকানা কোথাও কাগজের কোন তলে পড়ে হারিয়ে যায়, মাস গেলে মনেও থাকে না তার নাম ধাম কিছু আর। কাগজে বোঝাই হয়ে থাকে ঘর, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন সংগঠনের, সংগ্রামী নারীদের, সেকুলার মানববাদীদের, লেখক কবিদের ঠিকানা। অনেকের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, এর পর তুমি বাড়িতে যখন একা, তুমি বুঝে পাও না কাকে বাদ দিয়ে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তুমি। তুমি কারওর চিঠি খুলে পড়ো না। তুমি ফ্যাক্সে চোখ বুলিয়ে রেখে দাও। তুমি চিঠির উত্তরে চিঠি লেখ না, দূরের সবাইকে তুমি ভুলে যাও। নাগালের মধ্যে যারা আছে, তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়। এ কি অনেকটা অস্তিত্ববাদীদের মত জীবন? কার্পে ডিয়েমে বিশ্বাস করা? নাকি গভীর বিষণ্নতায় যারা ভোগে, তাদের আচরণ এমন? এ জিনিসটি নিয়েও আমি ভাবিনা একফোঁটা। যেন বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষ আসছে যাচ্ছে। আমি কারও কারও সঙ্গে কথা বলছি। আমি অপেক্ষা করছি আমার বাসের জন্য, বাড়ি যাবো, ওখানেই

আমার সত্যিকার বন্ধুরা, সত্যিকার স্বজন আমার ওখানেই। সুয়েনসনের কথাই ধরা যাক। কোনও একদিন তার সঙ্গে একটি রাত কাটানো হয়ে গেল। টানা দু বছর পর প্রথম পুরুষযাপন। সুয়েনসন তার আলতো আঙুলে এমন পরশ বুলিয়েছিল প্রথম রাতে, যেন আঙুল নয়, পালক। বাঙালি কোনও প্রেমিকের কাছ থেকে তা আমার কখনও পাওয়া হয়নি। সে কেবল মিশনারি আসনে ঠাঁয় বসে থাকে না, পশ্চিমের পরম প্রেমিকের মতো না হলেও দুতিনটে যে বিচিত্রাসনের পথ সে আমাকে দেখায়, সে পথে চোখে অজ্ঞানতার অন্ধকার নিয়ে একপা দু পা করে হাঁটি। তার সান্নিধ্যের জন্য আমার ব্যাকুলতা বাড়তে লাগলো। লোকটি দেখতে আর যাই হোক সুদর্শন নয়। যে পুরুষ সুদর্শন নয়, তার প্রতি আমার সামান্য মোহও আমি কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু কল্পনার অতীত এই কাণ্ডটি আমি করি, আমি সুয়েনসনের জন্য ব্যাকুল হই। আমি যত না হই, আমার শরীর হয় তার চেয়ে দ্বিগুন। ব্যাকুল হওয়ার কারণ হল সুয়েনসন অত্যন্ত অসামাজিক, অরসিক, অসুন্দর হতে পারে, অস্বাভাবিক তার আচরণ হতে পারে, মাথায় তার অটিজম নামের রোগ থাকতে পারে, কিন্তু সে উত্থানরহিত নয়। একটি নিশ্চিত যৌন সম্পর্কের আশায় সুয়েনসনের সঙ্গে সেঁটে থাকি। তার সঙ্গে প্রেম ব্যাপারটি ঘটছে ঘটছে মনে হয়, কিন্তু আসলে ঘটছে না, বন্ধুত্ব জাতীয় কিছু একটা ঘটে। আসলে তাও হয়ত ঘটে না, ঘটে বলে মনে হয়। নিজে মনে করি, মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিই। হাঁমুখো নিঃসঙ্গতা থেকে নিজেকে বাঁচাই।

দু বছরে এই জিনিসটি আমি সবচেয়ে বেশি টের পেয়েছি যে আসলে সুয়েনসনের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করাটিই প্রমাণ করেছে যে আমি খুব বিচ্ছিরিরকম একা। আমার একাকী জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চিত্র সম্ভবত ওই একত্রবাসের আপোস। আমি যখন একা বাস করেছি, তখন এত একা ছিলাম না, যত একা আমি সুয়েনসনের সঙ্গে। বিচ্ছিরিরকম একা না হলে, শক্তিহীন না হলে, দুর্বল না হলে, আত্মবিশ্বাসহীন না হলে প্রেম না করে একটি পুরুষের সঙ্গে জীবন কাটানোর কথা কেউ ভাবতে পারে না। যখন একা, অন্তত এ বলা যায় যে একা আছি বেশ আছি, কোনও পুরুষই আমার সঙ্গে বাস করার যোগ্য নয়, অথবা

কোথাও একটি গোপন আশা থাকে যে কোনও একদিন যেদিন কারও সঙ্গে গভীর প্রেম হবে, তার সঙ্গে তীব্র প্যাশনপূর্ণ যৌন-জীবন কাটানো যাবে। মৃত্যর মত কত শীতল একাকীত্ব শরীরে সর্বক্ষণ বহন করলে এইসব স্বপ্ন ও সম্ভাবনার ইতি ঘটাতে পারে মানুষ! কেউ বোঝে না আমার চারদিকের যে নিঃসঙ্গতা, তার তেজ আর তীক্ষ্ণতা। সকলে জানে আমি তারকা। আমার ব্যস্ততার শেষ নেই, সীমা নেই। রাগে অনুরাগে পূর্ণ আমার জীবন। তারা অনুমান করে নেয় আমার জীবন ডুবে থাকে পদ্ম ফোটা প্রেমের পুকুরে। অনুমান করে প্রেমের প্রার্থী অনেক, কেবল বাছাই হওয়ার অপেক্ষায়। আহ, কেউ যদি জানতো আমার নিকোনো উঠোন বারান্দা সব ফাঁকা। কেউ ওখানে বসে নেই প্রার্থী হয়ে। আমিই বরং কাঙালের মত ভিক্ষের হাত পাতি। নিজের জন্য প্রায়ই খুব মায়া হয় আমার। কাউকে এসব বললে নিছক গপ্প বলে উড়িয়ে দেয়।

যৌনতার বেলায়, শেষ অবদি দেখেছি কোনও পুরুষ আমার আশ্রয় নয়। আমি নিজেই আমার আশ্রয় হই। আমিই সহায় হই আমার। স্বমৈথুনেই দেখি সবচেয়ে নিশ্চিত, সবচেয়ে তীব্র তৃপ্তি। আমাকে নির্ভর করতে হয় না অন্য কারওর ওপর। আমাকে চাতক পাখির মত চেয়ে থাকতে হয় না অন্য কারও দিকে।

মনে মনে নিজে হই নিজের প্রেমিক

খুলি অন্তর্বাস, চুমু খাই নাভিমূলে, স্তনে,

শরীর যখন জেগে ওঠে মাঝরাতে, ভোরে

নিজেই মৈথুন সারি।

এই দূর পরবাসে এক বিন্দু জলে সাঁতরে মেটাতে হয় নদীর পিপাসা।

লক্ষ করেছি, তীব্র হতাশা যখন গ্রাস করে নেয় আমাকে, শরীরে জোয়ার ওঠে। একশটি সুঠাম যুবক দিয়েও শান্ত হবো না, এমন। হতাশা যখন কাটে, যৌনতৃষ্ণার তীব্রতাও অনেক কেটে যায়।

বাইরে যখন তারকাখ্যাতির চূড়ান্ত অবস্থা, কেউ জানে না ঘরে আমি ভুগেছি ভয়ঙ্কর বিষণ্নতায়। আমার গভীর বিষণ্নতার পিছনে পুরুষহীনতা যে খুব বড় কারণ নয়, তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি দৈনিক পুরুষ-মিথুনের পরও যখন এটি, এই বিষণ্নতা আমাকে ছেড়ে কোথাও যায়নি।

দেহ রক্ষা

লিডিঙ্গোর বাড়িতে তখন আমি, তুষার পড়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল পুরো শহর। এমন সাদা জগত আমি আর দেখিনি আগে। গাছের সব পাতা সবুজ থেকে হলুদ হল, হলুদ থেকে লাল, লাল পাতা পুরোনো হয়ে ফ্যাকাসে হয়ে ঝরে পড়লো গোটা শরৎ কালের শেষটায়। কালটা উত্তরের দিকে ছোট হয়ে আসে। এখানে শরৎ শেষ করে শীত চলে আসে, আর ওদিকে তখনও দক্ষিণ ইওরোপের দিকে মহাসমারোহে শরৎ চলছে। ভারতীয় উপমহাদেশে, আমি বলি, দুটো কাল, একটি *গরমকাল,* আরেকটি *খুব গরমকাল।* আর এখানে এই উত্তর ইওরোপে দুটো কাল, একটি *শীতকাল,* আরেকটি *খুব শীতকাল।* আমাদের যেমন ছটি ঋতু, এদের চারটে। এদের বর্ষা নেই, হেমন্ত নেই। শীতে গাছের পাতা ঝরে ন্যাংটো হয়ে থাকে গাছ। সেই গাছগুলোয় তুষার পড়ে সাদা হয়ে থাকে। যেন সাদা গাছ জুড়ে সাদা সাদা ফুল। শীতকালে একটি ব্যাপারই আমার অপছন্দ, অন্ধকার। সেই লেখিকা বান্ধবী মাইব্রিট আমাকে একদিন বলল, *চলো তোমাকে একদিন বরফে হাঁটতে নেবো।* আমি মহাখুশি। মাইব্রিট এলে ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

পুলিশকে জানাওনি? মাইব্রিট জিজ্ঞেস করে।

ও কিছু হবে না। কাছেই তো যাচ্ছি।

তা ঠিক, কাছেই গিয়েছি। বাড়ির কাছাকাছি মাঠে। বরফ নিয়ে কতরকমের খেলা আছে তা দেখাচ্ছিল মাইব্রিট।

ওখানেই ওই বরফের মধ্যেই হঠাৎ ভুত দেখার মত চমকে উঠি দেখে দুজন পুলিশকে।

--কী ব্যাপার, তুমি এখানে কেন?

--এলাম।

--এলাম মানে? আমাদের খবর দাওনি কেন?

--কাছে তো। একটু বরফে হাঁটবো.. তাই বলে তোমরা এত কষ্ট করে আসবে!

--এ আমাদের চাকরি। আমাদের কষ্টের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। আর কখনও এই ভুল করবে না, বুঝেছো। আর কখনও আমাদের ছাড়া বাইরে যাবে না।

আমাকে লিডিঙ্গোর ন-তলায় তুলে দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চলে গেল নিরাপত্তা বাহিনী।

কাল রাত্তিরে বরফে খেলেছি খেলা
জ্যোৎস্নায় ভিজে আমি আর মাইব্রিট।
কাল রাত্তিরে ভেসেছে নিবিড় ভেলা
যতদূর নেয় নিতে পারে বল্টিক।

রূপ যে কেবল সবুজের আছে তা নয়,
বরফ থেকেও নির্গত হয় আলো.
নগ্ন গাছেরা বিনিময় করে প্রণয়,
আমরাও খুব বেসেছি নিজেকে ভালো।

অনেক হয়েছে নিজের কবর খোঁড়া,

দাঁড়াবার মাটি নিশ্চিত চায় পা,

আগুনে তো হল বিষম আমার পোড়া,

বরফে এখন না ভেজালে নয় গা।

আমি এর পরও একদিন বেরিয়েছিলাম ওদের না বলে। সেদিন সুয়ান্তে ভেইলরের সঙ্গে। সুয়ান্তে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবে, বাড়ি থেকে যাবে ভোট দিতে। সেই ভোট দেওয়া দেখাতে নিচ্ছে আমাকে। কৌতূহলে আমি কাঁপছি। একটি সত্যিকার গণতন্ত্রে ভোটের দিনটি ঠিক কী রকম, মানুষ কী করে ভোট দেয়, কোথায় দেয়, নিজ চোখে তা দেখা কী কম সৌভাগ্যের ব্যাপার! একটি ইস্কুলে গিয়ে সুয়ান্তে আর তার স্ত্রী ভোট দিল। ভোটকেন্দ্রে আর তার আশেপাশে জনা দশ লোক ছিল। আমি একটি জনবহুল দেশের ভোটকেন্দ্র দেখে অভ্যস্ত। আমার ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছিল, সুইডেনের এই ফাঁকা ইস্কুলবাড়িটি একটি ভোটকেন্দ্র। ভোট দেখা শেষে সুয়ান্তের বাড়িতে বসে খাচ্ছিলাম, তখন পুলিশ এল সুয়ান্তের বাড়িতে। সুয়ান্তে বলেই যে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত হয়েছে তা মানেনি পুলিশ। নিরাপত্তার নিয়মে প্রধানমন্ত্রী আমাকে ডাকলেও সেখানে পুলিশ যেতে পারছি না বলে দিতে হবে। সুয়ান্তেকে ক্ষমা চাইতে হল। রক্ষীরা আমাকে বাড়ি নিয়ে গেল। পথে অ্যান ক্রিষ্টিন আমার সঙ্গে একটিও কথা বলল না, রোনাল্ডও না। এরকম শব্দহীন পথ চলা আমাদের আর হয়নি কখনও। শব্দ ছিল, সে কেবল লিফটে ওঠার পর।

রোনাল্ড গম্ভীর কণ্ঠে বলল, *তসলিমা এটিই তোমার আমাদের ছাড়া শেষ বাইরে যাওয়া। মনে থাকবে?*

আমি মাথা নেড়ে, চোখ নিচের দিকে, বললাম, *হ্যাঁ, মনে থাকবে।*

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, মনে থাকবে। বিষাদ আমাকে ছেয়ে থাকে। এ কী ধরনের জীবন আমাকে যাপন করতে হচ্ছে! নিজের দেশ ছাড়া আত্মীয় স্বজন ছাড়া বন্ধু বান্ধব ছাড়া নিজের চমৎকার জীবন ফেলে, ব্যস্ততার জীবন ফেলে আমি কোথায় পড়ে আছি, কেন পড়ে আছি! কেবল প্রাণে বাঁচার জন্য! প্রাণে বেঁচে কী লাভ! যদি যে কাজ করার জন্য বেঁচে থাকতে চাই, সেই কাজই করা না হয়! আমি তো চেয়েছিলাম নষ্ট সমাজের ক্ষত সারিয়ে সমাজকে সুস্থ করে তুলতে, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার বোধ জাগাতে চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম মানুষ স্বনির্ভর হোক, সচেতন হোক। আমার আন্দোলন ছিল যুক্তির বুদ্ধির মুক্তির পক্ষে, ছিল পুরুষতন্ত্র, মোল্লাতন্ত্র, দুর্নীতি, দুঃশাসনের বিপক্ষে। রক্তে টগবগিয়ে ফুটতো স্বপ্ন। কোথায় সেই স্বপ্ন, কোথায় জীবন! কী করছি এখানে। এখানে আমি তারকা, এ কেমন নিষ্কর্মা তারকা! এ কেমন স্থবিরতা জীবনে! ভাস্কর্যের মতো। দামি। নামি। কিন্তু মৃত। আমি এখন কেবল একটি কণ্ঠস্বর। পাঁচ পাতা বক্তৃতা। আমি এখন কেবল স্মৃতিচারণ। কেবল অতীত। কেবল ভবিষ্যতের আশা। আমি বেরিয়ে পড়া নই। আমি আঘাত করা নই। আমি দুহাতে ভেঙে দেওয়া গুঁড়িয়ে দেওয়া নই। আমি শান্ত। সমাহিত।

জার্মানি যাওয়ার আগে আগে পুলিশ পাহারা ধীরে ধীরে উঠে গেল সুইডেনে, আমাকে হত্যা করার জন্য কোনও লোক ওত পেতে নেই, এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আমাকে নিরাপত্তা বাহিনী থেকে বলা হল, আমি এখন একাই চলতে ফিরতে পারবো, কোনও ভয় নেই। কোনও অসুবিধে বা অস্বস্তি কখনও হলে যেন ওদের খবর দিই, ওরা হাজির হবে। কোনও সভা সমিতিতে গেলে, যেখানে আমজনতার ভিড়, যেন জানাই ওদের। ওরা সঙ্গে থাকবে আমার। সাবধানে যেন চলি, বুঝে শুনে চলি। বাংলাদেশি এবং মুসলমান এলাকাগুলোর ত্রিসীমানা যেন না মাড়াই। আমি বেজায় খুশি। হাঁপিয়ে উঠছিলাম, দু কদম হেঁটে নুন আনতে গেলেও পুলিশ আসতো। পুলিশ তার বাহিনী নিয়ে হাজির হবে, তবেই আমাকে কাছের দোকানে যেতে হবে, নুন কিনতে হবে।

বার্লিনে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, আবারও সেই নিরাপত্তা বাহিনীর উৎসব। নিরাপত্তা নাকি আমাকে ঘিরে থাকবে চব্বিশ ঘন্টা। ২১ নম্বর স্টর্কউইংকলের অ্যাটিক পছন্দ করা হয়েছে আমার জন্য। অথচ একতলা দোতলা তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টগুলোর তুলনা হয় না। ঠিক ময়মনসিংহের বাড়ির মতো, অবকাশের মতো উঁচু সিলিংএর ঘর। ওগুলোয় নাকি নিরাপত্তার অভাব হতে পারে। অ্যাটিকের কাঠের দরজা খুলে ফেলে দিয়ে শক্ত ইস্পাতের নতুন দরজা তৈরি করা হল। ডেআআডে আর সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে যোগসাজসে এসব ঘটে। আমার জন্য বিশেষ নিরাপত্তার দরজার প্রয়োজন আছে বলে তিন হাজার স্কোয়ার ফুটের অ্যাপার্টমেন্ট না পেয়ে পেতে হয়েছে মোটে সাতশ স্কোয়ার ফুটের অ্যাটিক।

প্রতিদিন একই জিনিস ঘটতে থাকে। ২৪ ঘন্টার ব্যাপারটি নাকচ করে দিয়ে আমি বললাম, *দেখ সুইডেনে শেষের দিকে ২৪ ঘন্টার নিরাপত্তা ছিল না, যখন বাইরে যেতাম, তখনই কেবল পুলিশ আসতো আমার জন্য। পুলিশ ছাড়াও আমি পথ চলেছি।*

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই।

পুলিশ বাহিনির কর্তাকে চিঠি লিখতে হল। *মাননীয় বড়কর্তা, আমাকে হত্যা করার জন্য এই বার্লিন শহরে কেউ ওত পেতে নেই। চব্বিশ ঘন্টা পুলিশ পাহারায় থেকে জীবন আমার দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। এই জীবন আমার কাম্য নয়। আমাকে স্বাধীনতা দিন, যে স্বাধীনতা আমার প্রাপ্য।*

এভাবে প্যাঁ পুঁ বন্ধ করলাম। ২৪ ঘন্টা বন্ধ করলাম। সংখ্যা কমিয়ে আনলাম। রইল যা, তা হল আগের দিন বলে দেব কোথায় কোথায় যাবো, সেই মতো তারা আসবে। তাছাড়াও হঠাৎ করেও কোথাও যদি যেতে চাই, তাদের না জানিয়ে না ডাকিয়ে যাওয়া চলবে না। তারা পুলিশ-অফিসে স্ট্যান্ডবাই ডিউটি করবে, ম্যাডাম ডাকলেই আগুনের মতো ছুটে আসবে। পুলিশ ছাড়া বেরোনো নিষেধ।

যে দেশেই ভ্রমণ করি, নিরাপত্তা থাকেই। দুজন হলেও থাকে। তবে দুহাজার থেকে দুজন। এ কম উত্তরণ নয়। একসময় এমন হল, যখন আমন্ত্রণ পত্র পেতে থাকি বিভিন্ন দেশ থেকে, আমি যেতে রাজি, একটিই শর্ত দিই, *নিরাপত্তার ব্যবস্থা* করলে যাবো না। নিরাপত্তার ভয়ংকর ব্যবস্থা ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে আমাকে। এটি এই কারণে নয় যে নিরাপত্তার লোকেরা মন্দ লোক। এই কারণে যে এই ব্যবস্থাটি দিয়ে আমাকে একটি বস্তু করে ফেলা হয়। সবার দৃষ্টি আমার দিকে। সবার কৌতূহল আমি। আমি নিজের কারণে যত মূল্যবান হই, তার চেয়ে বেশি হয়ে উঠি নিরাপত্তার কারণে। এই কৃত্রিমতা আমি আর বইতে পারছিলাম না। তাই নিরাপত্তা দেবে না --এই শর্তে যারা রাজি নয়, তাদের আমি বড় নির্মম কণ্ঠে গুডবাই জানিয়ে দিই।

নিষেধাজ্ঞা আর কদিন মানতে ইচ্ছে করে! একদিন চুপচাপ বেরিয়ে পড়ি। সামনের রাস্তাটিকে বলে কুদাম। পশ্চিম বার্লিনের বিখ্যাত রাস্তা এই কুরফুরস্টানডাম, সংক্ষেপে কুদাম। ওখানে হাঁটতে গিয়েই চোখে পড়ে বাদামি রঙের ছেলেরা ফুল বিক্রি করছে। চেনা লাগে খুব। এই বাদামি মানুষগুলো, আমার বিশ্বাস হতে থাকে বাঙালি। প্রথম প্যারিস ভ্রমণে তো বাঙালিদেরই দেখেছিলাম গোলাপ বিক্রি করতে। নিরাপত্তার বেষ্টনী ভেঙে গোপনে বেরিয়ে কুদামের পথে এই রোমাঞ্চকর পথ-চলা আমাকে অভূতপূর্ব আনন্দ দেয়। বিকেলে নিরাপত্তা রক্ষীরা আমাকে নিয়ে বেরোলো, যে অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে। পথ এবং পথের মানুষ দেখতে দেখতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, *বাংলাদেশের মানুষেরা এখানে কি ফুল বিক্রি করে!* এর উত্তরে পুলিশ জিজ্ঞেস করলো, *ম্যাডাম, আপনি কি একা একা বেরিয়েছিলেন বাইরে?*

--বেরিয়েছিলাম?

--তাই জিজ্ঞেস করছি। আপনি কি বেরিয়েছিলেন রাস্তায়? আমাদের ছাড়া?

--কেন জিজ্ঞেস করছেন?

--জিজ্ঞেস করছি। আপনি উত্তর দিন হ্যাঁ বা না।

--ঠিক..

--ঠিক কী?

--বলছিলাম কী..

--কী বলছিলেন ম্যাডাম, আপনি বলুন বেরিয়েছিলেন কি না..

--হ্যাঁ বেরিয়েছিলাম।

--বেরোনোর তো কথা নয়। জার্মান সরকার আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে। আপনি যদি এই নিরাপত্তাকে মোটে গ্রাহ্য না করেন, এর মানে হচ্ছে আপনি জার্মান সরকারকে অপমান করলেন। গোটা জার্মানিকে অপমান করলেন।

--না, তা কেন..

--আজ যদি আপনার কিছু হত! বাইরে যদি আপনার কোনও অসুবিধে হত, আপনাকে আক্রমণ করা হত! মেরে ফেলা হত!

--নাহ নাহ, কে আমাকে আক্রমণ করবে! এখানে তো আর বাংলাদেশি মোল্লা নেই। জার্মানরা আমাকে মারবে নাকি! কেন? আমার মনে হয় না আমাকে কেউ মারার জন্য জার্মানিতে বসে আছে..

--সাবধানের মার নেই ম্যাডাম....

--আমি তো আর বেশিদূর যাইনি।

--দূরের কথা হচ্ছে না। বেশি দূর গেলেই সে যাওয়ায় ঝুঁকি আছে। কম দূরে ঝুঁকি নেই। একথা ভাববেন না..

--তা অবশ্য ঠিক..

--আমাদের চাকরি যেত ম্যাডাম। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সরকার সব কী করে মুখ দেখাবে পৃথিবীতে! পুরো পৃথিবীর লোকেরা জার্মানিকে দোষ দেবে। বলবে জার্মানি তসলিমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি। তসলিমা যে নিরাপত্তাকে থোড়াই কেয়ার করেনি, তা তো আর জগত জানবে না।

আমি চুপ হয়ে জানালায় তাকিয়ে থাকি। গাড়ির ভেতর আশ্চর্য নীরবতা। যে প্রশ্নটি আমার মাথায়, সেটি করেই ফেলি, *আচ্ছা কী করে জানলেন আমি বাইরে গেছি?*

--জানি আমরা সব।

--কে বলেছে? আপনাদের চর থাকে না কি চারদিকে?

--থাকে।

--আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে কী করে আমার বাইরে বেরোনোর খবর আপনারা জানলেন।

একজন অফিসার বললেন, *আপনি বলেছিলেন, বাংলাদেশের মানুষেরা এখানে কি ফুল বিক্রি করে!*

--এতে তো বোঝা যাওয়ার কথা নয় যে আমি বেরিয়েছি। এই খবরটা আগে থেকেই আমার কাছে থাকতে পারতো।

--কিন্তু এটা শুনেই আমাদের ধারণা হয়েছে আপনি নিশ্চয়ই বেরিয়েছিলেন ম্যাডাম।

--ওহ তা হলে না বললেও চলতো। আমি তো ভেবেছি নিশ্চযই কেউ দেখেছে এখন আমি আর অস্বীকার করতে পারবো না। তাছাড়া....

--তাছাড়া কী?

--তাছাড়া আমি মিথ্যে বলতে পারি না। আমাকে হ্যাঁ না জিজ্ঞেস যখন করেছেন। কিছুতেই আমি বলতে পারতাম না যে না যাইনি। ভেবেছিলাম চেষ্টা করবো বলার, সম্ভব হয় নি।

যখন বাইরে বেরোবো, তখনই কেবল বাহিনী এসে আমাকে ঘর থেকে নিয়ে যাবে, আবার বাইরের কাজ ফুরোলে ঘরে বন্দি করে রেখে যাবে। সুইডেনের শেষদিককার মতো করে এখানেও একই রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা। তবে আমাকে না জানিয়ে আরও কিছু ঘটে বার্লিনে। আমি বাইরে কী ঘরে তাতে কিছু যায় আসে না। একঘন্টা পর পর পুলিশের গাড়ি এসে থামে বাড়ির সামনে। দেখে যায় ঠিকঠিক আছে কিনা সব। বাড়ির ভিতর বাহির। সিঁড়ি, ওপরতলার দরজা। কোনও সন্দেহজনক কিছু পড়ে নেই তো কোথাও, কোনও অচেনা কেউ, আততায়ী!

স্টিভ লেসি আর ইরেন অ্যাবির কাছে শুনি এসব। কী করে পুলিশের লোকেরা বাড়তি চোখ রাখছে এদিকে। শুনে অস্বস্তি হয়। আমার জন্য কয়েক গণ্ডা পুলিশের অকারণ টহল আর অঢেল অপচয় আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে রাখে। বুঝি যা বলতে চাই তা বোঝে না কেউ, না পুলিশ, না অন্য কেউ। আমাকে কেউ কিছু দিচ্ছে বলেই আমাকে কি হাত বাড়িয়ে নিতে হবে! আমার যদি সেই কিছুটির আদৌ কোনও প্রয়োজন না থাকে! আমি কি বলবো না যে না আমার এটির প্রয়োজন নেই! একটি ভুল হচ্ছে কোথাও, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি কি তবে বলবো না যে ভুল হচ্ছে? ভুল শুধরে দেওয়ার তাগিদ আমি অনুভব করি। সিদ্ধান্ত নিই মুখের কথায় না হলে আমি জার্মান সরকারকে জানাবো যে আমার কোনও প্রয়োজন নেই নিরাপত্তা বেষ্টনীর, আমি মনে করছি না কেউ এখানে আমাকে হত্যা করবে। যদি কোনও দেশে আমার জীবনের হুমকি থেকে থাকে, সে বাংলাদেশ, যদি কোথাও আমাকে সত্যি সত্যি মানুষ হত্যা করতে পারে, সে বাংলাদেশ। জার্মানি নয়।

পরদিন সকালে পুলিশ এলেই এই কথা পাড়ি।

--আমার কোনও পুলিশের দরকার নেই।

--কী বলতে চাইছেন?

--বলতে চাইছি, আমি নিজেই চলাফেরা করতে পারবো। আপনাদের এখানে আসার কোনও প্রয়োজন নেই।

--এভাবে তো হয় না। বলুন, অসুবিধেটা কোথায়। আমাদের দিয়ে কি আপনার নিরাপত্তা ঠিকঠাক হচ্ছে না?

--হচ্ছে। আপনারা খুব ভালো মানুষ। আমি খুবই মুগ্ধ আপনাদের ব্যবহারে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিরাপত্তার প্রয়োজন আমার নেই। নিরাপত্তার ব্যাপারগুলো আমার কাছে ফালতু লাগছে।

--একথা তো আমাদের বললে লাভ হবে না। আপনি একটা লিখিত কিছু দিন। জানান আমাদের বড়কর্তাকে। তিনি দেখুন কী সিদ্ধান্ত নেন।

--ঠিক আছে, তাই দিচ্ছি। বলে ঠিকঠিকই আমি লিখে দিলাম একখানা কঠিন কঠোর চিঠি। *আপনারা অনেক দিয়েছেন, থ্যাঙকু ভেরি মাচ। এবার আমাকে একা থাকতে দিন। একা না থাকলে না চললে আমি লেখক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবো না। আমাকে যেমন ইচ্ছে তেমন করে মানুষের সঙ্গে মিশতে দিন। যদি তারপরও আমাকে আগলে আগলে রাখতে চান, তবে আমার লেখালেখি চিরতরেই বন্ধ হবে, বলে দিচ্ছি। এখন যে গর্বটা করছেন আমি লেখক বলে, তখন কিন্তু সেটি করতে পারবেন না। আমি স্বাধীনতা চাই, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আমার ঘাড়ের পেছনে কেউ শ্বাস ফেলবে দিনরাত, এর মতো দুঃসহ জীবন আর হয় না।*

দেহরক্ষীরাও যে মানুষ, তাদের যে হৃদয় আছে, তা আমি সবসময় টের পেয়েছি। এমন কোথাও এমন কোনও দেহরক্ষী পাইনি যে কিনা সামান্য অশ্রদ্ধা করেছে আমাকে। তারাই আমার সবচেয়ে বেশি কাছের মানুষ। তাদের সঙ্গেই আমার দেখা হত প্রতিদিন, মত বিনিময় হত, ওই পুলিশ অফিসারদের থেকেই আমি আহরণ করেছি পশ্চিম সম্পর্কে অনেক জ্ঞান। তাদের সঙ্গেই আমার কেটেছে দীর্ঘ সময়। এত আপন হয়ে উঠেছিল যে তাদের ঘরের খবর আমাকে বলতো। আমাকে নিরাপত্তা দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দেহরক্ষীরা বলেছে তারা খুব আনন্দিত। তাদের কাছে আমি তারকা। আমি খুব মূল্যবান মানুষ। দেহরক্ষীদের কাছ থেকে আমি ছোটখাটো অনেক কিছুও শিখেছি। সুইডেনের দেহরক্ষী আমাকে জুতোয় ফিতে বাঁধা শিখিয়েছে। স্পেনের দেহরক্ষী আমাকে গলায় স্কার্ফ বাধা শিখিয়েছে। ফ্রান্সে যখন সবচেয়ে কঠোর নিরাপত্তা বাহিনী রেইড নেমেছিল আমার নিরাপত্তায়, রেইডএর যে বড়কর্তা, তিনিই আমার প্রধান দেহরক্ষী হওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কখন কোন পোশাকে আমাকে মানাচ্ছে ভালো, চুল ঠিক এভাবে না করে ওভাবে করলে ভালো হয় এসবও বলতেন। তাঁর পরামর্শে আমি চুল ঠিক করতাম, পোশাক পাল্টাতাম। ফ্রান্সের নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় প্রত্যেকে আমার বই কিনে তুমুল আনন্দে আমার সই নিয়েছে। অনেকেই বইয়ে তাদের স্ত্রীর বা প্রেমিকার বা মেয়ের নামটি লিখিয়ে নিয়েছে। তারা আমার সঙ্গে যত

সহজভাবে মিশেছে, তারা নিজেরাই বলে, অন্য কোনও তারকার সঙ্গে মিশতে পারেনি। তারকাদের অহংকার থাকে, কেবল আমারই নেই। আমি যেন তাদের একেবারেই ঘরের মানুষের মতো, বড় আপন।

বার্লিনের নিরাপত্তা একসময় উঠেছে, কিন্তু পুরোটা কখনও ওঠেনি। সেমিনার হচ্ছে, কনফারেন্স হচ্ছে , আমি যাচ্ছি বলতে বা পড়তে। নিরাপত্তা কর্মীরা তখন শুধু থাকে সঙ্গে। এই ভালো, সারাক্ষণ ছায়ার মতো থাকার চেয়ে, সত্যিকার প্রয়োজনে সঙ্গে থাকা। কোনও অনুষ্ঠানে আমি আছি বলে নাম প্রচার হয়ে গেলে সেখানে যে কোনও মৌলবাদীই ঢুকে যেতে পারে আমার অনিষ্ট করার জন্য। এই ঝুঁকি আছে বলেই পুলিশ আমার যে কোনও পাবলিক অনুষ্ঠানেই থাকে। আমাকে ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য বাংলাদেশের মৌলবাদির মতোই অন্যান্য মুসলিম দেশের মৌলবাদী অথবা ধার্মিক গোষ্ঠী এক পায়ে খাড়া।

নিরাপত্তা সব দেশেই নিরাপদ নয়। ইতালিতে নিরাপত্তা নিয়ে সে কী কাণ্ড! প্রথম যখন আমি দক্ষিণ ইতালির পালেরমো বিমান বন্দরে অবতরণ করি, এক ঝাঁক মস্তান দাঁড়িয়ে ছিল অদূরে, আমাকে আড়ে আড়ে দেখছিল। ভয়ে আমি এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছি। ওরাও পেছনে ছুটছে আমার। আমি চাইছি বন্দরের মানুষের সাহায্য। তখনই মস্তানগুলো আমাকে খপ করে ধরে প্রায় টেনে বার করলো বন্দরের বাইরে। এরা নাকি পুলিশ। আমার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ। ওদের গাড়িতে করে আমাকে নিয়ে দুশ কিলোমিটার বেগে চালালো। গাড়ির জানালা দিয়ে বের করে রাখলো স্টেনগানের মুখ। রাস্তার লোকের দিকে তাক করা। হোটেলে ঢুকে রুমের দরজা লাথি মেরে খুলে ঠিক যেভাবে পুলিশ ঢোকে কোনও অপরাধীকে পাকড়াও করার জন্য, সেভাবে। দেখে ভীষণ রাগ হল আমার। পারলে এদের সবকটাকে লাথি মেরে তাড়াই আমি। হাতের আঙুলে রিভলভার নিয়ে আমাকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটে তালি দেওয়া ফ্যাশনের জিনস পরা মস্তান পুলিশগুলো। পরে শুনেছি পুলিশের মধ্যেও নাকি আছে মাফিয়ার লোক। কী জানি আমার নিরাপত্তারক্ষীদের কয়েকটা হয়তো মাফিয়াতে ছিল। অবশ্য

দিন কয়েক পার হওয়ার পর ওদের সঙ্গে খুব ভাবও হয়ে গিয়েছিল। যদিও পুলিশদের একজনও ইংরেজি কোনও শব্দ জানে না। ওরা আমার সঙ্গে প্রাণ ভরে ইতালিয়ান বলেছে, যার কিছুই আমি বুঝিনি, আম প্রাণভরে ইংরেজি। পরস্পরের ভাষা না বুঝেও কিন্তু সহমর্মী হওয়া যায়। এই পুলিশগুলোই পরে টেনে টেনে আমাকে নিয়ে ছবি তুলেছে। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে, সমুদ্রে অর্ধেক নেমে। এরা স্টেনগান আর উঁচু করে রাস্তার লোকের দিকে ধরেনি। জার্মানির বিআটেকে তো রাগিয়ে দিয়েছিলাম ভীষণ। সেই লালচুলো মেয়ে-পুলিশ কথায় কথায় একদিন বললো, তার আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, বাড়িতে সাপেরা তার জন্য অপেক্ষা করছে, কাঁদছে। আমার ভয় ভয় চোখ।

সাপ?

হ্যাঁ সাপ।

আমি ছিটকে সরে আসি।

তুমি সাপ পোষো?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

বল কী? তোমার ভয় করে না?

ভয় করবে কেন?

কী করো সাপ নিয়ে?

--আমার দুটো সাপ। ওরা আমাকে খুব ভালোবাসে। আমিও খুব ভালোবাসি ওদের। আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোয়। বাড়ি ফিরতে আমার দেরি হলে ওরা খুব মন খারাপ করে।

--তোমাকে কামড়ায় না যখন জড়িয়ে ধরো? ছোবল দেয় না? সাপের বিষ নেই?

আমার প্রশ্ন বিআটের পছন্দ হয় না। এর কোনও উত্তর সে দেয় না। অনেকক্ষণ পর এদিক ওদিক উদাসিন তাকিয়ে থেকে শান্ত স্বরে বলে *--সাপ খুব ভালো।*

আমি উত্তেজিত। বলতে থাকি, *পৃথিবীতে একটি প্রাণীকেই আমি খুব ভয় পাই, আমি খুব ঘৃণা করি। সে হল সাপ।*

বিআটে ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় আমার দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলে, *তোমার মাথা খারাপ।* সেদিন সে আর আমার সঙ্গে থাকেনি। চলে যায়। এরপর আমার ডিউটিই ছেড়ে দেয়। বড়কর্তাকে বলে কয়ে অন্য জায়গায় কাজ নেয়। আমার মতো অপদার্থ যে মেয়ে সাপ ভালোবাসে না, তাকে নিরাপত্তা দেওয়া বিআটের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দেশে দেশে আমার দেহটি রক্ষা করার আয়োজন হয়েছে। আমার এই দেহটি কি এতই মূল্যবান যে একে রক্ষা করতে হবে? অনেকবারই প্রশ্ন করেছি। উত্তর দিয়েছি, না। আমার মতো লক্ষ লক্ষ দেহ এই পৃথিবীতে নিরাপত্তাহীন বেঁচে আছে। আমার জন্য কেন আলাদা নিয়ম হবে! আমার এই দেহকে নিশ্চিহ্ন করা, এই দেহকে নিরাপত্তা দেওয়া --দুইই এই দুনিয়ার রাজনীতি। যে পশ্চিমী দুনিয়া আমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছে, সে পশ্চিমী দুনিয়ার কাছে আমার মতো তৃতীয় বিশ্বের এক ক্ষুদ্র লেখিকার মূল্য এক বিন্দু নেই। কিন্তু নিরাপত্তা দিচ্ছে এই দেখাতে যে তারা মানবাধিকারে বিশ্বাস করে। নিজেদের ভালোমানুষত্ব দেখানোর জন্য আমাকে ব্যবহার। যে-ই ভালোমানুষত্ব দেখানোর আর প্রয়োজন হবে না, তখন আমাকে লাত্থি দিতে এদের পা এতটুকু কাঁপবে না। এরা কি ফিরে তাকায় যখন আমার দেশের মতো দরিদ্র দেশের মেয়েরা দাসিবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়? যখন না খেয়ে মরে? যখন খুন হয়? ধর্ষিতা হয়? যখন তাদের শেয়াল শকুনে খায়? যখন পুরুষে খায়? যখন ধর্মে খায়? যখন আমার মতো রঙের মানুষ লাখে লাখে মরে যায়, শুধু আমার রঙের মতো তাদের রঙ বলে? তাদের তো সাদারা চিরকালই খানিকটা কম-মানুষ ভেবেইছে।

কী করছি আমি এখানে? বিদেশ বিভুঁইয়ে? আমাকে প্রয়োজন সবখানে, কিন্তু আমার কি প্রয়োজন আছে কাউকে? আমি কি সত্যিই কোন কাজে লাগছি কোথাও? এ অবদি ভ্রমণ করেছি, বাস করেছি অনেকগুলো দেশে। নির্বাসিত জীবনের দুবছরের মধ্যে প্রচুর দেশ দেখা হয়ে গেছে। সবগুলো দেশ আমাকে নিয়ে উৎসব করে, করছে। আমার মনে হচ্ছে একধরনের আধুনিক যাত্রা বা সার্কাস শুরু হয়েছে আমাকে ঘিরে। ভাড়া করে আমাকে নিয়ে

যাচ্ছে দেশে দেশে। হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে আমাকে দেখতে আসছে। সবখানে আমি আত্মত্যাগ এবং আদর্শের কথা, সংগ্রামের কথা এবং আমার স্বপ্নের কথা বলছি। যারা নিপীড়িত নির্যাতিত, তাদের উদ্ধার করতে চাইছি। যে পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ায় মানুষ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, সেই পদ্ধতিকে চাইছি অকেজো করতে। মানুষে মানুষে, নারী পুরুষে, ধনী দরিদ্রে, সাদা কালোয়, উচু জাতে নিচু জাতে, এই ধর্ম সেই ধর্মে যে বৈষম্য প্রকট, প্রবল, সেসবকে দূর করার জন্য লোকে হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু আমার কি এইই কাজ যে বড় বড় জায়গায় বড় বড় মানুষের সামনে বক্তৃতা করবো, তারা আমাকে বাহবা দেবে, দাঁড়িয়ে করতালি দেবে, মাথা নুইয়ে সম্মান দেবে, আর বড় বড় পুরস্কার দেবে এবং পুরস্কারের স্তূপের মধ্যে বাড়ি গিয়ে অতল স্তব্ধতার মধ্যে নিজের উল্টোদিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকবো, চুপচাপ বসে থাকবো যতক্ষণ না কেউ এসে ধাককা মেরে আমাকে সজাগ করে, আমার চেতন ফেরায়! এই জীবন কি আমি চেয়েছি কখনও? এই বিভৎস বিকট জীবন! এই মূল্যহীন জীবন! নারী পুরুষের যে সমানাধিকারের কথা বলছি, ধর্মহীন যে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কথা বলছি, যে গণতন্ত্রের কথা বলছি, যে মানবতা ও মানবাধিকারের কথা --- তা পশ্চিমের দেশগুলোয় বহু আগেই অর্জিত হয়েছে। এসবের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য আমাকে দরকার নেই কারওর। যদিও অনেকে বলে সত্যের পথে চলার জন্য আমার জীবনের গল্প তাদের সাহস জোগায়। যদিও নারীবাদীরা বলে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আমি তাদের শক্তি জোগাই, যদিও মানববাদীরা বলে আমার আপসহীন সংগ্রাম তাদের জন্য বড় প্রেরণা। তাদের কারও কথা কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যে বলে। এসব দেশে এসব কথা বলার মানুষ অনেক আগেই এসেছে, ওরা ওদের কাজও হাসিল করেছে। দেশগুলো এখন তৃপ্ত, তুষ্ট। দেশগুলো এখন কচ্ছপের মতো রোদ তাপাবে শুয়ে শুয়ে। কারওর কোনও অধিকার নেই, আমারও নেই, ওদের আরামে ব্যাঘাত ঘটাবার। এসব দেশের কোনও প্রয়োজন আমাকে নেই। এবং আমার প্রয়োজন নেই এসব দেশকে। এখানে আমাকে কী রকম মাথায় তোলা হয়, কী রকম সম্মান করা হয়, তা আমার দেশের

কেউই জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমি পৃথিবী নামক গ্রহটির বাইরে কোথাও। দেশে কারও সঙ্গে কথা হলে যখন বলতে নিই এখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে, কণ্ঠস্বরটি নিরুত্তাপ শুনি। বিশেষ করে ছোটদার, যার সঙ্গে ফোনে আমার সবচেয়ে বেশি কথা হয়। আমি ফোন করি বলেই অবশ্য হয়। আমার কথা ছোটদা ঠিক বুঝতে পারে না, অথবা বুঝতে চায় না। আমাকে নিয়ে কখন কোথায় কী হচ্ছে, এসবে কোনও উৎসাহ তার নেই। তার উৎসাহ ওদেশের মৌলবাদী কাগজে প্রকাশিত আমাকে নিয়ে রসের কেচ্ছা কাহিনীতে। যদি বলি, *ফ্রান্সে আমাকে শাখারাভ প্রাইজ দেওয়া হইল, ইওরোপিয়ান পার্লামেন্ট থেকে। খুব বড় পুরস্কার। বুঝতে পারলা? সবাইরে জানাইয়া দিও।*

আমার উচ্ছাসে একতাল গোবর ছিটিয়ে দিয়ে ছোটদা উত্তেজিত কণ্ঠে বলবে, *এইখানে তো খারাপ অবস্থা। সংগ্রাম পত্রিকায় তো তোর সম্পর্কে খুব বাজে কথা লেখছে। লেখছে তুই নাকি পাঁচটা বিয়া করছস।*

--শোনো, আমার লেকচার আছে আজকে ইতালিতে। ইতালির লেখকরা আয়োজন করছে লেকচার। রোম থেকে আবার পরশু চলে যাবো মাদ্রিদে, মাদ্রিদে আমার পাবলিশার বড় অনুষ্ঠান করতাছে আমার জন্য, ওইখান থেকে সুইৎজারল্যান্ডে .... ।

--সংগ্রাম পত্রিকায় তো তর সম্পর্কে ধারাবাহিক ছাপা হইব। লেখার শিরোনাম হইল তসলিমার গুমর ফাঁস। মানুষ তরে ছি ছি করতাছে।

--কোন মানুষ?

--সব মানুষ।

--সংগ্রামের   সার্কুলেশন সবচেয়ে কম। ওইটা জামাতি ইসলামির মুখপত্র। আমার সম্পর্কে এইরকম কুৎসা তো নতুন না। সবসময় লেখতাছে। তুমি হঠাৎ ওদের লেখা নিয়া এত মাথা ঘামাইতাছ কেন! জানো তো মিছা কথা লেখে ওরা!

ছোটদার ছি ছি আরও অনেকক্ষণ শোনার পর ফোন রেখে দিতে বাধ্য হই। তার কণ্ঠস্বরে একধরনের শ্লেষ মেশানো উচ্ছলতা ছিল। কেন? আমার কোনও প্রাপ্তির দিকে না তাকিয়ে সে কেন পচা পুরোনো মিথ্যেকে নিয়ে মজা করছিল! মজা করছিল তাদের হয়ে যারা আমাকে হত্যা করার জন্য লাফিয়েছে বছর ভর। আমি ছোটদাকে চিনতে পারি না। চিনতে পারি না আমাকেও, যে আমি রেখে দেওয়া ফোনটি সামনে নিয়ে মধ্যরাত পার হয়ে যায়, ভোর হতে থাকে, বসে থাকি। সামনে জানালার ওপারে মৃত্যুর মতো অন্ধকার, অন্ধকারে স্থির হয়ে থাকে নিথর কালো জল, কালো জলে বাণিজ্যিক কিছু নৌকো। আকাশে এককোঁটা আলো নেই। দুএকটি কৃত্রিম আলো এখানে ওখানে। খানিক পরেই কৃত্রিমতা মহাসমারোহে রাজত্ব শুরু করে দেবে, যেখানে আমার কোনও অস্তিত্ব নেই। আমি আমার ছোট্ট শরীর নিয়ে পড়ে থাকবো সবকিছু থেকে দূরে, এই শহরের, এই দেশের কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি একটি প্রাণী অহেতুক খাচ্ছি দাচ্ছি শুচ্ছি হাঁটছি বসছি দাঁড়াচ্ছি। এই সমাজ এবং এই সমাজের মানুষের সঙ্গে আমার শৈশব কৈশোর যৌবনের কিছুই, কোনও তুচ্ছ কুটোও জড়িত নয়। আমার জীবনবোধ, আমার লেখালেখি, আমার লড়াই, আমার স্বপ্নের সঙ্গে এখানের কোনও কিছুর কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ এই আমাকেই পুলিশ বাহিনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কাকে দেখাতে? যেদিন কাউকে আর দেখানোর প্রয়োজন হবে না কিছু? সকলের তো অবশ্য ইতিমধ্যে জানাই হয়ে গেছে যে *ইসলামি মৌলবাদীরা যে মেয়েটিকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, সুইডেনের মতো উদার মানবতাবাদী রাষ্ট্র প্রাণ বাঁচিয়েছে তার, তাকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় রাষ্ট্রীয় আদর যত্নে মাথায় তুলে রেখেছে।* মাথায় তুলে নাকি মাচায় তুলে! আমি এই মাচা থেকে, মাচার খাঁচা থেকে যে মুক্তি চাই। নিরাপত্তার এই নির্লজ্জতা থেকে নিস্কৃতি চাই, তা কি জানে কেউ!

সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, আমাকে এবার নিস্কৃতি দাও

ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে শম্ভুগঞ্জ, তার দক্ষিণে সোয়া মাইল হেঁটে একটি

জামগাছতলা, পেছনে কুঁড়েঘর, ওখানে যাবো আমি। ওটিই পার্বতীদের বাড়ি।

পার্বতী কে জানো? দুবেলা ভাত ফোটে না চুলোয়, ফুটো চাল চুইয়ে বর্ষার জল
নামে যার ঘরে।
আমাকে নিঃস্কৃতি দাও নিউ ক্যাসেল, নটিংহাম, বেলফাস্ট,
নিস্কৃতি দাও ব্রাসেলস, বন, ড্রেসডেন, মিউনিখ,
আমি আর বক্তৃতা করতে চাই না তোমাদের উঁচু উঁচু মঞ্চে, মানুষের হাততালি
ফুলের তোড়ায় আমার মোটে শখ নেই,
আমাকে ক্ষমা করো চার্লস ব্রিজ, ক্ষমা করো কুকসহেভেনের পাব, ক্ষমা করো
ইওরোপিয়ান পার্লামেন্ট ..
স্বপ্নের চারাগাছে পার্বতী আর জল ঢালে না, আমি যাব পার্বতীদের বাড়ি
আমার তো আছে জল, চোখে।

--এটুকু লিখে ঘুমিয়ে পড়েছি, ওই লেখার টেবিলেই মাথা রেখে। গালে সেঁটে থাকে ভেজা কাগজ। একা আমি, কেউ নেই কোথাও। একটুও শব্দ নেই। এমন নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে বাস আমি কখনও করিনি। আমার মা ছিল, বাবা ছিল, দাদারা ছিল, বোন ছিল। ঘর ভর্তি মানুষ ছিল। বন্ধুরা ছিল। ওদের কোলাহলে আমি যে যাপন করেছিলাম জীবন, সে কি আমার আগের জীবন? ওই জীবনের সঙ্গে কেন তবে আমার আর দেখা হয় না!

একার জীবন

সকলেরই দু-একজন আত্মীয়, সংসার, ঘরে ফেরা ইত্যাদি কিছু না কিছু থাকে
কেবল আমারই বিছু নেই, কেউ নেই,
কেবল আমারই খরায় ফাটা বুকে নির্লজ্জ পড়ে থাকে শূন্য কলস।
সকলেরই জল থাকে, দল থাকে, ফুল ফল থাকেই,
আমারই কিছু নেই, সমস্ত জীবন জুড়ে ধু ধু এক পরবাস ছাড়া।

চারদিকে হাজার মানুষ। কিন্তু সত্য এই, আমি একা। একা ঘরে পড়ে থাকলেই কেউ একা হয় না, কিন্তু আমি একা। বন্ধুরা বলে, *তুমি যে লড়াই করেছো, তা করতে গেলে একাই*

হয়ে যেতে হয়। সুতরাং একাকিত্ব আমার নিত্যদিনের সঙ্গী হবে, এই নাকি স্বাভাবিক। যে যাই বলুক, একাকীত্বকে আমি কোনও যুক্তিতেই কোনও ভাবেই উপভোগ করি না। একাকীত্ব-বোধ নিয়ে আমার কোনও অহংকার নেই।

দেশ থেকে কোনও ফোন আসে না। কেবল আমিই ফোন করি। যারা বন্ধু ছিল, একবারও তারা দায়িত্ব অনুভব করে না আমার খবর নেবার। দায়িত্ব বলবো নাকি ভালোবাসা বলবো? ভালোবাসাই বলবো। তারা ভালোবাসা অনুভব করে না আমার খবর নেবার, জানার কেমন আছি, ভালো আছি কি না। ভালোবাসা হঠাৎ ফুরিয়ে কী করে যায়। ফুরিয়েছে নাকি ছিলই না ওরকম কিছু। ছিলাম যখন ছিলাম। নেই যখন নেই। এরকমই কি তাহলে তাদের হিসেব? আমার না থাকা নিয়ে কারও কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমার হিসেব তো তাদের মতো নয়।

অবকাশে এত ফোন করি। বাবা রাজ্যির খবরাখবর নেন আমার। কই নিজে তো ফোন করে কিছু জানতে চান না। এই যে ছোটদাকে এত করি, কই ছোটদাও তো ভুলেও একবার ফোন করে না। সবাই কি ভেবেছে তাদের কোনও দায়িত্ব নেই। যোগাযেগের দায়িত্ব কেবল আমার! ভেবেছে অঢেল টাকা আমি কামিয়ে ফেলেছি! সুতরাং সবাইকে ভালোবাসার দায়িত্বও আমার। টাকা যার নেই, তার ভালোবাসারও দায় নেই। তবে কি এমনই তাদের হিসেব? আমি এভাবে হিসেব করতে শিখিনি। বাবা যে কত চিঠি লিখতেন, পাতার পর পাতা চিঠি! এখন কেন আধ পাতারও একটি চিঠি তিনি লেখেন না আমাকে? আমি বড় হয়ে গেছি বলে? বড় হলেও তো লিখেছেন। নাকি দেশে নেই বলে? দেশে নেই বলে তো আরও লিখবেন আমাকে। যেহেতু চাইলেই আমার সঙ্গে তিনি আর দেখা করতে পারছেন না। যেহেতু দূরে আমি। নাকি দূরে বলেই আমাকে তিনি লেখেন না। যেহেতু দূরে চলে গেলে মন থেকেও দূরে চলে যায় মানুষ! মা কেন লেখে না? মাও কি ভালোবাসে না। নাকি শত কাজে ব্যস্ত মা। মার সময় নেই আমাকে ভাবার! অভিমানে কণ্ঠ আমার বুজে আসে। ভাবি আর কখনও ফোন করবো না। কারও সঙ্গে যোগাযোগের কোনও প্রয়োজন আমার নেই। কিন্তু কদিন পর কষ্ট এমন কুরে খায় আমাকে যে ফোন করি, না করে পারি না। অভিমান করে যে কদিন আমি কথা বলিনি,

তা বোঝার ক্ষমতাও ওপাশের মানুষের থাকে না। আমার অভিমান, আমার রাগ ক্ষোভ আমার কষ্ট দুঃখের কোনও মূল্য কারও কাছে নেই। যে যার মতো আছে সবাই। কেবল আমিই আমার মতো নেই। আমার সব কিছু উল্টেপাল্টে গেছে। অতীত ছাড়া আর কোথাও বাস করতে পারছি না।

আমি খুব ধন গড়েছি, এই ভাবনা অনেকের। অথচ কেউ জানে না আর যা কিছুর মোহ আমার আছে, এই ধনেরই মোহ নেই। টাকা কুটোর মতো পড়ে আছে। জানিনা কত টাকা জমেছে কোথায়, গুনিনি কখনও। টাকা জলের মতো নেবে যায়। অঢেল ঢেলে দিই, আফশোস করি না। টাকা চুরি হয়, ডাকাতি হয় -- খানিক পর ভুলে যাই। অগ্রিম টাকা পাঠিয়েছে প্রকাশকেরা। জার্মান প্রকাশক পঞ্চাশ হাজার ডলার। ইতালির স্পেনের আইসল্যান্ডের নরওয়ের প্রকাশক ওরকম না হলেও কাছাকাছি। ব্যংক একাউন্টে প্রকাশকরা টাকা পাঠিয়ে দেয়। কিছু চেক আবার আমার ঠিকানায় পাঠায় কোনও কোনও প্রকাশক। ডুবে যায় কাগজপত্রের তলায়। হঠাৎ হঠাৎ কিছু খুঁজতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ওগুলোর কোনও সদগতি করাও সবসময় হয়ে ওঠে না। পুরস্কারের চেক অবহেলায় এদিক ওদিক পড়ে থাকে। একদিন তো এক লাখ ডলারের একটি চেক হাতব্যাগের চিরুনি, পয়সা, বাদাম, কলম, লিপস্টিক, নেইলকাটার আর হাবিজাবি কাগজে মিশে গিয়েছিল, ওখানেই ভেঙে ছিঁড়ে পড়েছিল কয়েক মাস। ধনীদের এমন স্বভাব কিনা জানি না। ধনকে হেলা করে কি ধনী হওয়া যায়, মনে হয় না। তবে ধনী না হয়েও ধনকে হেলা করতে বুকের পাটার চেয়েও বোধহয় জিনের কারণটিই বড়। আমি সন্ন্যাসী নই, আরাম আয়েশ আমার অপছন্দ নয়। তবে ধনের জন্য টনটনে মন আমার কোনওকালেই ছিল না। বিদেশ বিঁভুইএর চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েও টাকা পয়সার খবর নিই না। এ স্বভাব সম্ভবত আমার রক্তে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। আমার মার কোনও স্বপ্ন নেই ধন দৌলত নিয়ে। মা চান সুখ, স্বস্তি। চান ভালোবাসা। আমি

তো মনে মনে তা-ই চেয়ে বেড়াই। পাঁচ তারা হোটেল-ঘর থেকে দূরের দেশে ফোন করলে ম্যালা টাকা খরচ হয়। সেদিকেও ফিরে দেখি না। দেশে ফোন করে করে প্রতিবারই কয়েক হাজার করে ডলার, ডয়েচেমার্ক, পাউণ্ড, ফ্রাঁ, কয়েক লাখ করে পেসেতা, লিরা বিল দিয়েছি। না, আফশোস করিনি। উড্ডীন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বিমানের ভেতর থেকে ক্রেডিট কার্ডে ফোন করেছি পৃথিবীর মাটিতে। ইওরোপের ধনীরাও এ কাজ করে না। যাকে ফোন করেছিলাম সেও খুব অবাক হয়েছিল কেন আমি আকাশ থেকে ফোন করছি, কেন কোনও বিমান বন্দর থেকে নয়। বিমানের সবকটি মানুষ আমাকে বিস্ময় চোখে দেখছিল। আমাকে আস্ত পাগল বা আস্ত নির্বোধ এরকম কিছু একটা ভেবেছে। কিন্তু আমার যদি ইচ্ছে হয় কারও সঙ্গে কথা বলতে, হোক না যুক্তিহীন, আমি কেন ইচ্ছের মূল্য দেব না! বেরিয়ে গেছে লক্ষ টাকা? তাতে কী! টাকা পয়সা কার জন্য জমাবো! কেন! কী করতে! ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যদি ফতুর হয়ে যেতে হয়, হব। ভালোবাসা আহরণ করতে যদি জীবন যায়, যাবে। এরকম। একটু যে স্নেহের ভালোবাসার ছোঁয়া পাই ফোনের ওপার থেকে, এর মূল্য কোনও ধনে বা কোনও দৌলতে হিসেব করা যায় না। টাকা যখন নিতান্তই কাগজ হয়ে উঠলো, দেশে টাকা পাঠানো, কলকাতায় উপহার পাঠানো, দামি রেস্তোরাঁয় বন্ধুদের খাওয়ানো, যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে বেড়ানো, যা খুশি তাই কিনে ফেলা -- এগুলো বিদেশিদের চোখেও বিস্ময়কর। ওরা হিসেব করে চলে, ধনীরাও। আমি ধনী না হয়েও আমার হিসেব নেই।

টাকা যখন ধীরে ধীরে আমার কাছে মূল্যহীন কাগজ হয়ে ওঠে, তখন জামা জুতোতে আমার ঘর ভরতে থাকে। এত যে পশ্চিমী পোশাক পরা, তারপরও কী আর পশ্চিমী হওয়া যায়! না যায় না। পশ্চিমীরা আকারে ইঙ্গিতে আচারে আচরণে বুঝিয়ে দেবে আমি তাদের সমাজে বিলং করি না। বিলং কোথায় করি! আদৌ কি করি কোথাও!

হ্যাঁ আমার বই বেরোচ্ছে ইওরোপের দেশগুলো থেকে। খুশির খবর। কিন্তু আমি চাইনি লজ্জা নির্লজ্জভাবে বের হোক। ভালো বই যদি লিখতে পারি কোনওদিন তবে প্রকাশ করবো, এসব বলে নিজের মাথা খারাপ করে ফেলেছি। বলে কোনও লাভ হয়নি। কেউ শোনেনি আমাকে। জোঁকের মতো আঁকড়ে ধরেছে লজ্জা। যেহেতু খবর বেরিয়েছে যে আমি নারীবাদী, নারীর স্বাধীনতার জন্য বলতে গিয়ে আমি ইসলাম নিয়ে মন্দ কথা বলেছি, যেহেতু খবর বেরিয়েছে আমার মাথার মূল্য ধার্য হয়েছে, আমার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হয়েছে, যেহেতু খবর বেরিয়েছে যে আমার লেখা লজ্জা উপন্যাসটি আমার দেশের সরকার বিক্রির জন্য পাঠের জন্য সংরক্ষণের জন্য নিষিদ্ধ করেছে, তাই পশ্চিমের বুদ্ধিমানেরা লজ্জার ভিতরেই ধর্মবিরোধিতা, পুরুষবিরোধিতা, নারীবাদ, আদর্শবাদ ইত্যাদি নানা বাদ প্রতিবাদ দেখবেন ভেবেই নিয়েছেন। হিন্দুর ওপর মুসলমান মৌলবাদীর অত্যাচার, ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার গল্প, তথ্যভিত্তিক এই গল্পটি নিয়ে নানা রকম আশা আকাঙ্খা কল্পনার শিকার হয়েছে মানুষ। কারও তর সয়নি। দেশে দেশে লজ্জার অনুবাদ কে করবে? প্রকাশকদের পক্ষে সম্ভব হয়নি বাংলা জানা কাউকে খুঁজে বার করা। বাংলা গরিব দেশের ভাষা। গরিব দেশের ভাষা শিখতে আগ্রহী কে হবে! খুব হাতে গোনা দুএকজন কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হয়তো। ওদের খুঁজে বের করার সাধ্য প্রকাশকদের নেই। এদিকে লজ্জার জন্য অস্থিরতা বাড়ছে বাজারে। অতএত বাংলা থেকে ইওরোপের ভাষায় অনুবাদের জন্য কেউ আর অপেক্ষা করেনি, অনুবাদ করে নিয়েছে লজ্জার ইংরেজি অনুবাদ থেকে। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ালো? বাংলা থেকে ইংরেজি, ইংরেজি থেকে ফরাসি, ফরাসি থেকে সুইডিশ, সুইডিশ থেকে নরওয়েজিয়ান, নরওয়েজিয়ান থেকে আইসল্যান্ডিক। আইসল্যান্ডিক বইটিতে আমার লেখা লজ্জার কতটুকু কী অবশিষ্ট আছে, এতে আমার সত্যিই সন্দেহ হয়। কিন্তু লজ্জা পড়ার পর মানুষ কি আগ্রহ হবে আমার অন্য বই পড়ার জন্য? আমার মনে হয়নি। ফ্রান্সে যদিও ঘটনা অন্যরকম ঘটেছে। ক্রিশ্চান বেস একের পর এক আমার বাকি যত বই আছে, অনুবাদ করে ছাপাতে শুরু করেছে। প্রথম দিকে অনুবাদক নিয়ে যে সমস্যা হয়েছিল, আমার অনুরোধে

এক বাঙালিকে নিয়োগ করেছিল, পরে হাড়ে মজ্জায় বুঝেছে যে বাঙালি ফরাসি দেশে তিরিশ বছর কাটিয়েছে হয়তো, কিন্তু ফরাসি এক লাইন শুদ্ধ করে লিখতে জানে না। পরে পার্থ প্রতীম মজুমদারের পরামর্শে যে প্রলয় রায়কে অনুবাদক হিসেবে নেওয়ার জন্য আমি চাপ দিয়েছিলাম, সেই প্রলয়কে আমার প্রশ্রয় সত্ত্বেও বিদেয় করতে বাধ্য হল ক্রিশ্চান। সরবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষক ফিলিপ বেনোয়ার সন্ধান অবশেষে মিলল। ফিলিপ বেনোয়া ফরাসি যুবক। ওকে আমার অনুবাদক হিসেবে এরপর প্রায় স্থায়ীভাবেই কব্জা করে নিল ক্রিশ্চান। ফিলিপ টাকা হাঁকালো অনেক। এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদ করতে এত টাকা কোনও অনুবাদকই দাবি করে না। প্রতিযোগিতার কোনও ব্যাপার না থাকলে এই হয়। ফিলিপ ছাড়া গতি নেই প্রকাশকের। ফরাসি ভাষার যত অনুবাদক আছে, সবার চেয়ে বেশি দিয়েই ফিলিপকে নিতে হল। ফিলিপ কলকাতায় দুবছর কাটিয়েছিল, আলিয়ঁসে কাজ করতো। বাংলা ভালোই শিখেছে। বাক্যালংকারগুলোও মন্দ ব্যবহার করে না। দেখতে সাদাসিধে, বামপন্থী, উদাসিন, মৃদুভাষী, হয়তো সমকামী হয়তো নয় ধরনের একটি রহস্যের আড়াল আছে তার। ফরাসির সমাধান না হয় হল। সমাধান কি আদৌ হয়েছে! কোনও প্রকাশক কবিতার বই প্রকাশ করতে চায় না, অথচ আমার প্রকাশক গোঁ ধরেছে আমার কবিতার বইও তারা করবে। ফিলিপ জানিয়ে দিল কবিতার অনুবাদ সে করতে পারবে না। তার পরামর্শে ফ্রান্স ভট্টাচার্য পাটাতনে পা দিলেন। ফ্রান্সও বাংলার শিক্ষক, সরবর্নে। প্রবাসি বাঙালি কবি লোকনাথ ভট্টাচার্যের স্ত্রী। ফ্রান্স আমার কবিতার অনুবাদ করলেন, উন অত্রে ভি, অন্য জীবন নামে কবিতার বইও বেরিয়ে গেল স্টক থেকে। বইটি বের হওয়ার পর পর মাঝে মাঝে দানিয়েল যখন পড়তো, ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাতো কী লিখেছি। তখনই চমকে গিয়েছি একটি অনুবাদ শুনে। -- *তোমাকে আঁচলে গিঁট দিয়ে ভালো বেঁধেছি। বার বার তবু তুমিহীনতায় কেঁদেছি।* এর ফরাসি অনুবাদ হল, তোমাকে আমার চুলে গিঁট দিয়ে বেঁধেছি, তারপরও তুমি যে কত হীন, সে জেনে আমি কেঁদেছি। অনুবাদ বিষয়ে সেদিনই আমার আগ্রহ উৎসাহ সব উবে গেছে। কেবল মনে হয়েছে, ভুল অনুবাদের চেয়ে

অনুবাদ না হওয়াই ভালো। পরে ফিলিপ বেনেয়াকে কথায় কথায় একবার বলেছিলাম, ফ্রান্স ভট্টাচার্য বোধহয় আমার বাংলাটা ভালো বুঝতে পারেননি। এত বিনয়ের স্বর আমার ছিল না যখন দেশে ছিলাম, বিনয়ের এই অতি নরম অতি বিচ্ছিরি স্বরটি পশ্চিমে এসে রপ্ত করতে হয়েছে। রপ্ত করা স্বরে *বোধহয় হয়তো সম্ভবত* থাকতে হয়, শুনতে ভালো লাগে। রপ্ত করা স্বরে এবং সুরে নিজের সামান্য দ্বিধা প্রকাশ করতে হয়, কোনও কঠিন কঠোর কিছু নয়।। কোনও সিদ্ধান্ত নয়। কিন্তু নরম জিনিসটিরও একসময় দেখলাম কঠিন প্রতিক্রিয়া। ফিলিপ জানি না আমার কথার কী অনুবাদ করেছে ফ্রান্সের কাছে, ফ্রান্স রেগে আগুন হয়ে ক্রিশ্চানকে জানিয়েছে আমি নাকি তার অনুবাদ পছন্দ করেনি, আর ক্রিশ্চান ততোধিক আগুন হয়ে আমাকে জানিয়েছে ফ্রান্স এত যত্ন করে অনুবাদ করেছে, আমার এমন নিন্দা করা উচিত হয়নি। এরপর আমার ভয় ধরে গেছে অনুবাদ এবং অনুবাদক নিয়ে কোনও টুঁ শব্দ করার ব্যাপারে।

কিন্তু অন্য ভাষায় আজও সম্ভব হয়নি বাংলার অনুবাদক পাওয়া। আজ তারা হয় ইংরেজি নয় ফরাসি নয় অন্য কোনও ইওরোপীয় ভাষা থেকে অনুবাদক করেন। কিন্তু লজ্জার পর সেই আগ্রহও আর নেই। ফরাসি আর জার্মান ছাড়া ইওরোপের অন্য ভাষার প্রকাশকরা আমার খোঁজ করেছে, তবে খুব কম। আমাকে প্রায় আকাশে উঠিয়েছিল। আকাশ থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়লে খুব অল্পের মধ্যে কাজ সারা হয়। হয় মরে গেল নয় মিশে গেল মানুষের ভিড়ে, আলাদা করে তাকে আর চেনা গেল না। কিন্তু আকাশ থেকে ধীরে ধীরে মাটিতে নামতে থাকলে নানা কিছুতে আঘাত পেতে পেতে রক্তাক্ত হতে হয় অনেক। একা হয়ে যেতে হয় অনেক। চারদিকে তখন কি আর কেউ থাকে! হ্যাঁ থাকে হয়তো দেখার যে নামছি। যারাই আমাকে নিয়ে বড় বড় স্বপ্ন দেখেছিল, তারা এখন অন্যদিকে ফিরে অন্য আলাপে ব্যস্ত। ওদের স্বপ্ন আমাকে সংক্রামিত যদি সামান্যও করে থাকে, তা ভাঙার বেদনা সহনীয় হলেও হতে পারে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা দুঃসহ। একটু একটু করে হতাশারা

ডানা মেলে একশ বাদুরের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। চারদিক খুব আঁধার আঁধার।

বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে, এখনও যে দেশে থাকছি, সে দেশের ভাষা আমি শিখছি না। শেখার কোনও আগ্রহ আমার নেই। এর কারণ কী, কেউ জানতে চাইলে বলে দিই কারণ। কারণ আমি তো আর বিদেশে বাস করতে আসিনি। এসেছি অতিথি হিশেবে কিছুদিনের জন্য। দেশের দুয়োর খুলে গেলেই ফিরে যাবো দেশে। নিজের ভাষাটিই ভালো করে শেখা হল না, অন্যের ভাষা শিখবো কেন! দিন যেতে থাকে, দেশে আমার ফেরা হয় না। বিদেশের মাটিতে আমি বিদেশি হয়েই কাটাতে থাকি। অতিথি হয়ে যত না, তার চেয়ে বেশি আগন্তুক হয়ে। ভাষা জানি না। রাস্তাঘাটে দোকানপাটে আমি ঘরের নই, বাইরের কেউ। ভাষা বুঝি না। সামান্য যেটুকু সৌজন্যবাক্য তাও শিখিনি। কেমন আছো ভালো আছির মতো অতি সহজ সোজা বাক্য তিন বছরে শেখা হয়না আমার। এই অনীহা কোত্থেকে এল? অবজ্ঞা থেকে নাকি ভয় থেকে! ভয় থেকে যদি না আবার আমার মনে হয়, ভাষা শেখা মানে এ সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া, পরিবেশের সঙ্গে সাচ্ছন্দ্য বোধ করা। ভয় হয় ভাষা শিখতে। না শিখি সুইডিশ, না শিখি জার্মান, না শিখি ফরাসি। ইংরেজিটাও যে ভালো শিখে নেব, সেও করি না। সামান্য যেটুকু জানি, সেটুকু দিয়েই যদি দিন চলে, তবে আর কী দরকার। বরং বাংলা উচ্চারিত না হতে হতে বাংলা কোথায় কোন নরকে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তা নিয়ে যত দুশ্চিন্তা। কাগজ কলম নিয়ে, কমপিউটার সামনে নিয়ে দিনের পর দিন বসে থাকি, লিখতে পারি না কিছু। প্রকাশকের আবদার ওই লুকিয়ে থাকার ষাট দিনের বর্ণনা যেন লিখি। অঙ্কুরের প্রকাশক আমার ষাট দিন নামে একটি প্রচ্ছদও করে ফেলেছে। কিন্তু না, আমার পক্ষে আর সব সম্ভব হয়, লেখা সম্ভব হয় না। ষাট দিনের ওই ভয়াবহ স্মৃতি আমাকে তিরতির করে কাঁপায়, তারপর স্তব্ধ করে রাখে। আমাকে দিয়ে একটি অক্ষরও লেখাতে পারে না। যে কোনও অলেখকের মতো জীবন যাপন করতে থাকি। খাই দাই ঘুরি ফিরি নাটক সিনেমা দেখি আড্ডা দিই ঘুমোই সেমিনারে কনফারেন্সে যোগ দিই। কোনওকালে কোনও দেশে লেখক

ছিলাম আমি, মাঝে মাঝে আমিও যেন ভুলে যাই। দাদা একটা ফাইল পাঠিয়ে দিয়েছে পত্রিকার অংশ কেটে কেটে। সবই মেয়েদের ওপর অত্যাচারের খবর। নিজেই অতি উৎসাহে নাম দিয়ে দেয় বইয়ের, *হুইপ অন উইমেন।* হুইপ ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকে অন্য কাগজের ঢেউএর তোড়ে।

আমি অনেক সময় ভুলে যেতে থাকি আমার কোনও আত্মীয় বন্ধু আছে বা ছিল। আমার যে একটি অতীত ছিল, তা মাঝে মাঝে এমন হয় যে মনে হয় ভুলে গেছি। ছোটদাকে যখন এসেছিল, তখন হঠাৎ এত তুড়িতে জীবন সেই অতীতে গিয়ে পৌঁছেছিল। তখন বর্তমানে দাঁড়িয়ে থেকেও মনে হয়নি বর্তমান আমার ধারে কাছে কোথাও আছে। বাবা যখন এসেছিলেন, হঠাৎ কটা দিন অন্যরকম কেটেছে। না দাদা, না ছোটদা, না আত্মীয়দের অন্য কেউ, এক বাবাই দেখেছেন আমার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন। বাবা এক শীতের মধ্য রাতে এসে পৌঁছোলেন অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ডে সেই সন্ধেয় আমার বক্তৃতা হয়ে গেছে। বাবাকে নিয়ে অল সোলস কলেজের অতিথি ভবনে ছিলাম। পরের রাতে অল সোলস কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক আর ফেলোদের সঙ্গে ফরমাল ডিনার। সেই ডিনারে বাবার দিকে নজর আমার। না পারছিলেন কারও প্রশ্নের উত্তর দিতে, ফ্যালফ্যাল করে কেবল তাকাচ্ছিলেন চারদিকে। আমার ইংরেজি জানা বাবা ইংরেজদের একটি বাক্যও বুঝতে পারছিলেন না, সুতরাং তসলিমার বাবা হয়ে তাঁর লজ্জার শেষ ছিল না। লজ্জা কি আমারও কম হয়নি। গর্ব করে পরিচয় করিয়ে দিই বাবার সঙ্গে সবার, বলি তিনি ডাক্তার। কিন্তু বাবা তো আমার বোবা হয়ে থাকেন। আমার রাগ হয় ভেতরে ভেতরে। লজ্জা হয়। বাবা আরও বেশি লজ্জায় মিইয়ে যান। কিন্তু বুঝতে দেন না আমাকে যে তিনি আমার লজ্জার কারণ হচ্ছেন।

বাবাকে নিয়ে অক্সফোর্ড থেকে চলে এলাম সুইডেনে। সুইডেনে তখন আমি আমার নতুন অ্যাপার্টমেন্টে। স্টকহোমের ক্রিস্টিনাবার্গভ্যাগেন-এ। শহরে কোনও অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া পেতে তেরো চৌদ্দ বছর অপেক্ষা করতে হয়। আর আমার ভাগ্য এমন, যে চাইতে না চাইতেই পেয়ে গেছি। ভাড়া খুব বেশি নয়। সুইডেনে বাড়িভাড়ার ওপর একধরনের আইন আছে।

সরকারই বলে দেয় কীরকম বাড়ির কীরকম ভাড়া হবে। বাড়িঅলার কোনও স্বাধীনতা নেই ভাড়া ইচ্ছেমতো রাখা। সেটি কোনওরকম সাজিয়ে বসেছি। কোনও দামি কিছুই কিনছি না। অস্থায়ী বাসের জন্য বাস সাজানো যায়, সংসার তো যায় না। সংসার তো আছেই আমার ঢাকার শান্তিনগরে। বাবা এসে থিতু হয়ে না বসতেই শুরু হয়ে যায় বিদেশের আমন্ত্রণ। চিঠি এসেছে বেলজিয়ামের গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর জানিয়েছেন, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট দেওয়া হবে। ডক্টরেট যে এমন কথা নেই বার্তা নেই, কাউকে দেওয়া যেতে পারে তা আমার জানা ছিল না। উঠ ছেরি তো বিয়া লাইগাছের মতো। ব্রাসেলস থেকে আবার প্রধানমন্ত্রীরও আমন্ত্রণ। এ তো গেল বেলজিয়াম। এদিকে জার্মানির প্রকাশকও প্রায় একই সময়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ওদিকে ডেনমার্ক থেকেও আমন্ত্রণ। রাষ্ট্রপুঞ্জের বা জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোপেনহেগেন এ। ওখানে আমাকে বক্তৃতা করতে হবে। কোপেনহেগেনের লেখক গোষ্ঠী এবং বড় পত্রিকা থেকে আমন্ত্রণ। এর মধ্যে বাবা এসে উপস্থিত। সবগুলো দেশকে জানিয়ে দিলাম হ্যাঁ যাবো তোমাদের অনুষ্ঠানে, তবে একা যাবো না, সঙ্গে বাবা যাবেন। সকলেই দুটো প্রথম শ্রেণীর টিকিট পাঠিয়ে দিলেন দুজনের জন্য। বেশি বিনয় করে জার্মান প্রকাশককে বলেছিলাম হোটেলের একটা ঘরেই বাপ মেয়ে থাকতে পারবো। শুনে আকাশ থেকে পড়লেন হফম্যান এণ্ড ক্যাম্পের জার্মান প্রকাশক। সবাই তো সহযোগিতা করলো। করলো না কেবল সাবেনা। সাবেনা বেলজিয়ামের বিমান। সাবেনা জানিয়ে দিল আমাকে তারা নেবে না বিমানে। কেন? ভয়। যদি মুসলমান মৌলবাদী আমি বিমানে আছি এই সংবাদ জানার পর পুরো বিমানই বোমায় উড়িয়ে দেয়! সাবেনা আমাকে নেবে না শুনে আবারও ইওরোপের প্রচার মাধ্যম ঝাঁপিয়ে পড়লো আমর আর সাবেনার ওপর। সাবেনাকে অতিষ্ঠ করে ফেলেছে জ্বালিয়ে, কেন কী কারণ, তসলিমাকে নিচ্ছেন না কেন? সাবেনা তার যুক্তি দিল। আমার বিশেষ কিছু বলার ছিল না। সাবেনার যুক্তিতে কারও মন ভরছে না। ওদিকে রুশদিকেও কদিন আগে লুফথানসা বিমান জানিয়ে দিয়েছে তাকে নেবে না। ইওরোপ এ নিয়ে উত্তেজিত। এদিকে আমি নতুন টিকিটে অন্য

বিমানে চড়ে ব্রাসেলসএ। ব্রাসেলসএ নামছি, যেন সম্রাট নামছি কোথাকার, এমন ভাবে পাইক পেয়াদা ক্যামেরা বন্দুক সহ হাজার লোক হাজির। লুফথানসা আর সাবেনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেরা করা হচ্ছে। আমার কী! আমি সুবোধ বালিকার মতো অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি। সাবেনার ঝামেলা সাবেনা সামলাবে।

গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি কাণ্ডও ঘটিয়ে ফেললেন বাবা। প্রোটোকল ভেঙে বক্তৃতা দিতে উঠলেন মঞ্চে এবং বক্তৃতা দিলেন। পুরো গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় হাঁ হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বেলজিয়ামের সবচেয়ে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়। অপূর্ব সুন্দর অনুষ্ঠান ডক্টরেট প্রদানের। সেই প্রাচীন কালের মতো করেই ডক্টরেট দেওয়া হয়। ডক্টরেট পেয়েছেন রসায়নে, পদার্থবিজ্ঞানে, বিজ্ঞানের নানা শাখায় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মানুষেরা। কেবল একা আমিই নোবেল না পাওয়া মেয়ে ওদের সঙ্গে। আমাকে দেওয়া হল সাম্মানিক ডক্টরেট এবং আমাকেই করা হল ডক্টরেটপ্রাপকদের মধ্য থেকে প্রথম এবং একমাত্র বক্তা। আমার বক্তব্যের পর রেক্টর যখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন, আমার বাবাকেও আলাদা করে ধন্যবাদ জানালেন। বাবা ধন্যবাদের মর্মার্থ বুঝতে পারবেন না, এমন নয়। কিন্তু তিনি নিজের আসন থেকে হেঁটে চলে গেলেন মঞ্চে। বাবাকে আমি চোখের শাসনে, দাঁত চেপে বলতে চেয়েছি, ওহে মূর্খ,নিজ আসনে গিয়ে বসো। না কাজ হয়নি। তিনি ভেবেছেন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাকা হচ্ছে বক্তৃতা করতে। তিনি মাইকের সামনে ঋজু দাঁড়িয়ে, সবাইকে, যারা তাঁর মেয়েকে এই বিরল সম্মান জানালেন, ধন্যবাদ জানালেন। জানানো শেষে নেমেও এলেন গটগট করে। আমি মাথা নিচু করে বসে ছিলাম। মাথা আর তুলিনি। অনুষ্ঠানের পর বাবাকে তিরস্কার করতে কোনও দেরি করিনি। বলেছি, বাবা আমার সম্মানের বারোটা বাজিয়েছেন। শুনে তিনি একটি যে কমলার রসের গ্লাস দুহাত দিয়ে ধরে রেখেছিলেন, সেটি শক্ত করে ধরে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে উচ্চশিক্ষিত অভ্যাগতদের ভিড়ের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে রইলেন। রেক্টরের কাছে ক্ষমা চাইলাম বাবার ওই নিয়ম ভেঙে বক্তৃতা দিতে ওঠার মতো অপরাধের জন্য। রেক্টর বললেন, *না না ও কিছু নয়। ও বরং তোমার বাবার মেয়ের প্রতি আবেগকে স্পষ্ট করেছে। এখনও*

আবেগ বলতে কিছু অবশিষ্ট আছে পূবে। পশ্চিমে তো সবাই আমরা নিয়মের চাকর হয়ে বসে আছি। একটু অন্যরকম দেখলে, নিয়ম ভাঙা দেখলে, আবেগের প্রকাশ দেখলে বরং আমাদের ভালো লাগে। মানবিক লাগে সবকিছু। বাবাকে রেক্টরের এ কথা আমি আর বলি না। তিনি হোটেলের ঘরে সারারাত না ঘুমিয়ে কাটালেন। সকালে তাঁর রুমে গিয়ে দেখি তিনি বসে আছেন চেয়ারে, বিছানা বিছানার মতো নিভাঁজ। ঘুমেয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, *খুব খারাপ কাজ করে ফেলেছি, তাই না? ওভাবে নিয়ম ভেঙে? তোমাকে কি খুব মন্দ বলবে ওরা?* বাবার নির্বুদ্ধিতা দেখে আমার খুব রাগ হয়। রেক্টরের কথা বলি। কিন্তু তাঁর বিষন্নতা দূর হয় না। বাবা ডেনমার্কে গিয়েও একই অবস্থা করলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের শীর্ষ সম্মেলনের পাশে এনজিওদেরও ছিল সম্মেলন। সেই সম্মেলনে বক্তৃতা করতে হল আমাকে। বারো হাজার মানুষের সামনে। সেই তখন আমার দেখা সবচেয়ে বড় জনসভা। সভায় কিছু উত্তর আফ্রিকার মেয়ে প্রতিবাদ জানালো ইসলামের নিন্দা করেছি এই অভিযোগ করে। ওই দুএকটি মুসলমান মেয়ে ছাড়া বাকিরা যে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানালো, সেটি বাবা দেখেও দেখলেন না। সারারাত তিনি হোটেলের রুমে বসে রাত পার করলেন। আমার এদিকে সিগারেটের নেশা হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গেও খুব বেশিক্ষণ কাটাতে পারি না। আমাকে আড়ালে গিয়ে সিগারেট খেতে হয়। সামনে খেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাবা লজ্জা পাবেন বলে বাবার থেকে দূরে থাকি। জার্মানিতেও এই ঘুমহীন রোগে তাঁকে ধরেছে। জার্মানিতে তিনি নিজের রুমে না থেকে আমার রুমেই বসে রইলেন রাতে। লক্ষ করেছি বারবারই তিনি হোটেলের রুম থেকে দেশে ফোন করতে চান। দামি হোটেল রুম থেকে দূর বিদেশে ফোন করলে কুৎসিত যে বিল আসে। সেটি বাবাকে বারবার বুঝিয়ে কোনও লাভ হয়নি। তিনি দাদার কাছে অবকাশ, আরোগ্য বিতান, রোগীপত্র তো আছেই, গ্রামের জমির ফসল ওঠা ফসল কাটা ইত্যাদি নিয়েও প্রচুর সময় ব্যয় করতে লাগলেন। ফোনের বিল কয়েক হাজার জার্মান মার্ক। এই টাকাটা আমি প্রকাশককে দিতে দিইনি। নিজেই দিয়েছি। বাবার কাছে পাঁচহাজার মার্ক আর পাঁচটাকায় তখন কোনও পার্থক্য নেই। বাবা উম্মাদ হয়ে উঠলেন দেশে ফেরার জন্য। তাঁর

উন্মাদনা রোধ করার কোনও শক্তি আমার আর রইল না। আমার ছিল পুরো ইংলণ্ড ট্যুর। ব্ল্যাকপুলে শ্রমিকনেতাদের সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে ওখানেও বাবাকে নিয়ে যাই, ওখানেও তিনি মনমরা। চাঙ্গা হয়ে উঠলেন যখন হিথরোতে নিয়ে গেলাম তাঁকে বিমানে তুলে দিতে। বাবার বিমান একদিকে চলে গেল, আমার বিমান দাঁড়িয়ে ছিল অন্যদিকে যাবার। বাবা চলে গেলে আমি হিথরোর একটি একলা চেয়ারে বসে আকুল হয়ে কাঁদলাম। এই কান্না কি বাবা অনুভব করতে পারেন সামান্য! নাকি তাঁর ওই দেশ, দেশের বাড়ি, তাঁর ডাক্তারি, তাঁর জমিজমা, তাঁর টাকাপয়সার মূল্যই সবচেয়ে বেশি। বাবাকে বেঁধে রাখতে পারিনি। এই নির্জন জীবনে কে আসে মরতে। আমি কদিন কৃত্রিম জীবনের বোঝা বইবো? কেউ কোনও উত্তর জানেনা।

দাদা এসেছে আমাকে দেখতে জার্মানিতে। বৈধ ভিসা নিয়ে এসেছে। অথচ তাকে ঢুকতেই দিচ্ছিল না এদেশে। তাকে নাকি ফের যেখান থেকে এসেছে, সেখানেই পাঠিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র চলছিল। ভিসা আছে, তারপরও কেন এই ব্যবহার? জিজ্ঞেস করেও কোনও সদুত্তর পায়নি দাদা। আমি যখন তলিয়ে যাচ্ছি কোনও এক অচেনা হতাশায়, তখনই দাদা এল। এসে আমার অঢেল খরচ থামালো। তার স্বভাবগত কৃপণতার চর্চা আমার বাড়িতেও চলতে লাগলো। আমিও সংক্রামিত হলাম যথেষ্ট। রান্নাবান্না দাদাই করতে লাগলো। সংসার দাদার হাতে। সংসারের খরচা কমতে কমতে প্রায় শূন্যতে এসে পৌঁছল। দাদা থাকাকালীনই আমার ব্লাডারে অপারেশন হল। ইউরিনারি ইনফেকশন এত কেন হয়, তা দেখতে গিয়ে ইওরোলজিস্ট পেলেন ব্লাডারের এককোনে গজিয়ে ওঠা একটি ছোট থলে, থলের ইংরেজি নাম ডাইভারটিকুল্যাম। ডাইভারটিকুল্যামটি কেটে ফেলে দেবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন ডাক্তার। যেমন ইচ্ছে, তেমন অপারেশন। ফেলা হল। ফেললে বলা হয়েছিল ইনফেকশন জন্মের মতো বিদেয় হবে। অথচ এক মাসও পেরোয়নি, আবার সেই আগের মতোই ইনফেকশন। না। অপারেশনের কোনও নাকি দরকারই ছিল না। চোখে আলো ফুটলে পরে বুঝেছি। পা কেন ফোলে? ফোলের কারণ জানা যাচ্ছেনা। হৃদপিণ্ড ঠিক আছে, কিডনি ঠিক

আছে, ঠিক তবে নেই কী? বলে দেওয়া হল লিম্ফোএডেমা হতে পারে। এত বেশি আকাশে থাকতে থাকতে লিম্ফোএডেমা হয়ে গেছে। আকাশে বেশি কাটালে বায়ুর চাপ যেহেতু ওপরে কম থাকে, তাই পা ফোলে। পা ফোলা চলতেই থাকলে মাসাজের ব্যবস্থা করতে হবে। বলা হল, আঁটো মোজা পরে থাকতে। কিন্তু সে আর হয়নি আমার দ্বারা। মাসাজও দুদিনের বেশি করা হয়নি, মোজাও পরা হয়নি। এদিকে সারা শরীর এক্সরে করে দেখে ডাক্তার বলে দিয়েছে, আমার মেরুদণ্ড সোজা, সোজা বলেই গায়ের সব চাপ এসে পড়ছে পায়ে, পায়ের হাড়ে আর পায়ের পাতা হয়ে যাচ্ছে সমান। সুতরাং জুতোর মধ্যে পায়ের পাতার আকারে মাঝের দিকে উঁচু করে একটি চামড়ার একটা সাপোর্ট বানাতে হবে। সেও বানানো হল। কিন্তু পরবেটা কে? মোজাও যেমন দুদিন পরে ফেলে দিলাম, জুতোর সাপোর্টও দুদিন পরে রেখে দিলাম। দাদাকে দেশ দেখানোর ইচ্ছে। অল্প পয়সায় স্পেন আর পর্তুগাল দেখিয়ে আনলাম। মাদ্রিদ, গ্রানাডা, করডোবা, সিবিলি, লিসবন। পুলিশের কোনও প্যাঁ পুঁর ধারে কাছে আমি থাকিনি। ফ্রান্স যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল দাদার, যাইনি। যাইনি কারণ যদি ক্রিশ্চান বেস জানতে পারে আমি চুপি চুপি ফ্রান্সে এসেছি, পুলিশ ছাড়া দিব্যি ঘুরে বেড়িয়েছি ফ্রান্সে, শুনে রেগে আগুন হবেন। ভেবেছি রেগে আগুন হবেন, আসলে হয়তো জানতেও পারতেন না, জানলেও রেগে মোটেও আগুন হতেন না বরং খুশি হতেন। দাদার ফ্রান্স দেখা হলো না। দাদা সস্তার কিছু জিনিসপাতি কিনে দেশে ফিরে গেল। দাদা চলে গেলে খুব একা হয়ে গেলাম। বাবা দাদা ছোটদা সবাই কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে চলে গেল যে যার জীবনের দিকে। আমারই কোনও দিক নেই, আমারই কোনও দেশ নেই যাবার। পড়ে থাকি একা। নিজের সঙ্গে বসে থাকি, শুয়ে থাকি। সবাই যে চলে যায়,জানে কি আমাকে কোথায় কার কাছে ফেলে যায় ! জানে না। আমি এখানে পড়ে থাকলে আমার কী লাভ, কারই বা কী লাভ! হয়তো কোনও না কোনও একদিন দেশে ফেরা হবে --এরকম একটি আশা আর আশ্বাস দিয়ে মানুষগুলো দ্রুত আমার কাছ থেকে বিদেয় নেয়। কাচের জারে বন্দি আমি একটি

মূল্যবান দর্শনীয় বস্তু। জাদুঘরে এসে আমাকে দেখে দেখে যায় দর্শণার্থীরা, কেউ বাড়ি নিয়ে যায় না। কেউ আমার জন্য খুব একটা দুঃখও করে না।

কানাডা যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়ে প্রথমবার নিউ ইয়র্কে গিয়েছি নিজের ইমিগ্রেন্ট আত্মীয়দের দেখতে। সুহৃদকে আর মিলনকে আমার ম্যানহাটনের হোটেলে এনে রেখেছিলাম। গীতা মিলনকে সহ্য করতে পারছে না। ও মিলনের আমেরিকায় প্রবাসী হওয়ার বিরোধী। শুধু সে চেয়েছে আমেরিকায় থাকতে। পরিবারের অন্য কেউ নয়। সোনার হরিণ সে শুধু ধরবে, অন্য কেউ নয়। মিলন গীতার দৃষ্টি থেকে দূরে দূরে থাকে। গীতার বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমি ম্যানহাটনের হোটেলে কাটাই। বই প্রকাশের উৎসব হল। দ্য গেইম ইন রিভার্স। নিউইয়র্কের প্রকাশনী জর্জ ব্রাজিলিয়ার থেকে বেরিয়েছে ইংরেজি অনুবাদ কবিতার বই। এর পরের সফরে ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা হয়। ইয়াসমিন ভালোবাসকে নিয়ে নিউইয়র্ক চলে এসেছে। ইয়াসমিন অন্য কারও অ্যাপার্টমেন্টে ছোট একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। কতদিন পর ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখা। যে ছিল আমার ছায়াসঙ্গী। সেই ইয়াসমিন। যাকে নিয়ে অফুরন্ত স্বপ্ন ছিল আমার। এই অবেলায় ঝাঁক ঝাঁক স্মৃতি এসে যখন আমাকে কাতর করে ফেলছে, আমি চোখের জল লুকোই ভালোবাসার খেলনার মধ্যে ডুবে। কী করবি তোরা এই বিদেশ বিভুঁইএ? দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এক ঘিঞ্জি বস্তিতে কেন তুই বাস করতে এসেছিস? আত্মীয় নেই, স্বজন নেই, বন্ধু নেই, বান্ধব নেই। কেন? মিলনের মতো আমার এই প্রিয় বোনটিও কি রেস্তোরাঁর বাসন মাজবে? মাজবেই তো। এই-ই তো করে গরিব দেশ থেকে ভাগ্যের সন্ধানে চলে আসা মানুষেরা। ইয়াসমিনের জন্য আমার খুব মায়া হয়। কেবল আমার বোন হওয়ার অপরাধে ওকে দেশ ছাড়তে হল। দেশে তবে রইলো কী! দেশে মাকে একলা রেখে আমরা সবাই যদি চলে আসি, তবে মা-ই বা কী করে কী নিয়ে বাঁচবেন। বাবাই বা ওখানে একা একা কী করবেন! আমি ফিরে যাবো দেশে, আমাকে থাকতে হবে

ইয়াসমিন আর সুহৃদকে পৃথিবীর ওইপারে ফেলে? খুব একা লাগে আমার। ইয়াসমিনকে বলার জন্য আমি কোনও শব্দ খুঁজে পাই না।

ফিরে আসি ইওরোপে। একা ঘরে। একার জীবনে। স্বপ্ন ভেঙে পড়ে থাকে যে জীবনের উঠোনে, সেই জীবনে।

আবার একসময় ভাঙা স্বপ্নগুলো জড়ো করি। জড়ো করি আর বলি,

বাক্স পেটরা গোছাচ্ছি গো, যাব দেশে
যাব ঢাকায়, কলকাতায়।
বন্ধু বা আত্মীয় যে কারও দরজায় কড়া নাড়লে
কেউ না কেউ খুলে দেবে,
বসতে দেবে, খেতে দেবে মাছভাত, খিলিপান।
বিদেশ বিভুঁই আর সয় কত
সয় কত বাড়ি আর বাজার! যন্ত্রফন্ত্র, কড়ার গণ্ডার হিসেব
কেউ নেই এখানে কারও জন্য অপেক্ষা করে, কাঁদে
একা একা মরে পচে থাকে ঘরে মানুষ।
যাব ঢাকায় কলকাতায়
ভিড়ের রাস্তায় যাব ট্রামে বাসে রিক্সায় অথবা হনহন হেঁটে কোথাও
কেউ একজন ঝুল বারান্দায় বুকে ভর রেখে খুঁজবে গলির মোড়
কেউ একজন ঘাম মুছে দেবে আঁচলে
ভালো আছি কিনা জানতে চেয়ে ঝরঝর কাঁদবে কোনও বুড়ো।
বাক্স পেটরা গোছাচ্ছি, যাব দেশে
ঝাড়ে জঙ্গলে জলে ডাঙায় হৃদয়খানা রাখা
যাব ঢাকায় কলকাতায়
চৌরঙ্গী থেকে চিৎপুর, শ্যামলি থেকে শান্তিবাগ চষে

কোনও দুঃখবতীর শরীরে ধরানো আগুন নেবাতে

একদিন ঝাঁপ দেব, মরি তো মরবো।

কান পেতে রই

ডালবি থেকে সোল নিলসন নামের এক মেয়ে মাসে দুবার আমার দেখতে আসে, ছ ঘন্টা পথ পেরিয়ে, ট্রেনে। মেয়েটি সঙ্গে করে নিয়ে আসে পাঁপড়, কাজুবাদাম, তেঁতুল, আমের আচার, রসগোল্লার রেসিপি, ভাবে এগুলো আমাকে দেশের স্বাদ বা গন্ধ কিছু হলেও দেবে।

মেয়েটি আমার কাপড় চোপড়, বইপত্র, থাল বাসন গুছিয়ে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালিয়ে সাফ করে সিগারেটের ছাই ফেলা মেঝে, সন্ধে হবার আগেই জানালায় সাজিয়ে রাখে মোমবাতি। দৌড়ে যায় কনসামে, ফুল কেনে, কেনে ঝুড়ি ভরে মাছ মাংস প্যাপ্রিকা কমলালেবু ইত্যাদি, রেঁধে বেড়ে খেতে ডাকে, ব্যস্ত টেবিলে ঘন ঘন চা দেয়, মেয়েটি অনেকটা মায়ের মতো। আমার মা উড়োজাহাজের শব্দ শুনলে আকাশে তাকিয়ে ভাবেন আমি ফিরছি দেশে। আমার দুঃখিনী মা গুছিয়ে রাখেন দেশে ফেলে আসা আমার ঘরদোর বিছানা বালিশ। জল গড়াতে গড়াতে তাঁর চোখের নিচে ঘা হচ্ছে --- একদিন যখন সত্যিই ফিরে যাবো দেশে, ডালবির বরফ ছাওয়া পথে হাঁটতে হাঁটতে কাঁদবে সোল নিলসন, আমার স্মৃতিগুলোই তাকে দুবেলা গুছোতে হবে, একদিন সেও আকাশে উড়োজাহাজের শব্দ শুনে ভাববে ওই বুঝি আমি।

দেশ বলে কিছু থাকতে নেই কারও। মানুষের হৃদয়ই হতে পারে এক একটি নিরাপদ স্বদেশ। আমার মায়ের আঁচল থেকে যেমন দেশ দেশ গন্ধ ভেসে আসে, সোল নিলসনের জামা থেকেও।

সোল জানিয়েছিল ওর মার অসুখ। ওকে দেখতে গিয়েছিলাম সেই তিনশ মাইল দূরের এক শহরে। আমি যাওয়ার পাঁচ ছ মিনিট আগে ওর মা মারা গেছে। অথচ আমাকে নিয়ে চা খেতে গেল। চা খেতে খেতে হাসল। কথা বলল অনেক কথা, খুব কম কথাই ওর মা নিয়ে। আমার উপস্থিতি কি ওকে ওর মার মৃত্যু ভুলিয়ে দিয়েছিল! সম্ভবত দিয়েছিল। ভেবে গা আমার শিউরে উঠেছে। সোলকে পাষণ্ড নাকি পরম-হৃদয়বতী বলে ভাববো! বাবা মার সঙ্গে এ

দেশের মানুষ লেপ্টে থাকে না। তারা বেঁচে থাকে, মারা যায়। এগুলোকে জগতের নিয়ম হিসেবেই নেয়। কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারী বাবা মার মৃত্যুতে এ দেশে অসহায় হয় না। জীবন যার যার, তার তার। সোলের হয়তো তাই মনে হয়েছে, যে, যে যাবার, সে গেছে। যে আছে, তাকে দেখ। তাকে ভালোবাসো। তার সঙ্গে দেওয়া নেওয়া কর। সোলের বেলায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে সে। অন্যের বেলায় হয়তো তা বোঝা যায় না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাই তো করে। যা পুরোনো, যা গত, যা অতীত, তা নিয়ে পড়ে আসলে থাকে না। আমার প্রতি সোলের ভালোবাসা বারবারই উপচে উঠতে দেখেছি। মায়ের মৃত্যুর দিনেও এই ভালোবাসা প্রকাশে সোল কোনও সংকোচ করেনি।

সুইডেন থেকে জার্মানি চলে যাবার আগে সোল আমাকে অনেকবার ফোন করেছে, আমি বাড়ি নেই, কিন্তু শ্রুতিযন্ত্রে সে যে ফোন করেছে তার খবরটা দিয়েছে। কিন্তু তারপরও একটি দিন তাকে আমি ফোন করিনি। ফোন করিনি, তাকে ভালোবাসি না বলে নয়। না করার কোনও কারণ নেই। এরকম আছে অনেক কিছু, যেগুলোর কোনও কারণ থাকে না। যেদিন চলে যাচ্ছি, সেদিনই তার ফোন আমিই ধরি। ওপারে কাঁদালো সোল। কাঁদতে কাঁদতে অভিযোগ করলো, আমি খুব হৃদয়হীন মানুষ। আমি একটা যা তা। সোলের ব্যবহার আমাকে খুব অবাক করেছিল। পরে আমি দেখেছি, আসলে সোল সেদিন বড় সুইডিশ চরিত্রে দেখা দিয়েছিল। এখানে মানুষ এমনই, নিজে যদি অপমানিত বোধ করে, অপমানের প্রতিশোধ খুব ভয়ঙ্কর ভাবে নেয়। বাইরে থেকে শান্তিপ্রিয় সহনশীল বলে মনে হলেও ভিতরে এরা খুব প্রতিশোধ পরায়ন জাতি। *এরা* শব্দটি এখানে সঠিক শব্দ নয় জানি। আমার বলা উচিত এদের অনেকে অথবা এদের কেউ কেউ। এমন সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া উচিত নয় জানি, তারপরও যেটুকু জেনেছি দেখেছি, আমার তাই মনে হয়েছে। এরা খুব সহজে নিজের দোষ ঢাকতে অন্যকে নির্বিবাদে দোষী সাব্যস্ত করে। যাকে গালাগাল করলে নিজের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধির আশংকা নেই, তাকে পেলে আর রক্ষে নেই। আসলে এটিই চরিত্র। স্বাভাবিক রাগ বিরাগ

উচ্ছলতা উদ্দামতা সব জোর করে ঢেকে রাখো, কারও বিরুদ্ধে কিছু বলো না, কারওর সমালোচনা করো না, যেন তোমার মতো ভালো আর মানুষ হয় না, ভাব একটি সবসময় থাকা চাই। ছাই চাপা দিয়ে আগুন আর কতদিন কতবছর রাখা যায়, বেরিয়ে আসে আগুন সামান্য হাওয়া পেলেই। অনেকে হয়তো বলবে, এ ঠিক সুইডিশ আচরণ নয়। নয়! আসলে ওই বেরিয়ে আসা ক্রোধটিই সত্যিকার সুইডিশ। অতি শান্ত, অতি শিষ্ট, অতি ভালোর ঠিক পিছনেই কদর্যতা। ঝলমলে আলোর পিছনেই নিকষ আঁধার।

তারপরও, সোল যেটুকু ভালোবাসা আমাকে দিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। সোলকে অনেক খুঁজেছি। টেলিফোন বই থেকে সাধারণত সবার ঠিকানা খুঁজে বের করা যায়। তন্ন তন্ন করে দেখেছি সবাই আছে, সোল নেই। কেউ যদি এ দেশে না চায় প্রকাশিত হতে, তার প্রকাশিত না হওয়ার জন্য সব ব্যবস্থাই করা হয়। কেউ নির্জনতা চাইলে এই রাষ্ট্র বাধ্য তাকে নির্জনতা দিতে। গাদা গাদা ভালো নিয়ম। ভালোর তলে মন্দ যে নেই তা নয়। সোলের ভালোবাসা পেতে একটি বিষণ্ন বিধুর মুখ বসে থাকে। কেউ বোঝে না যে বসে থাকে। একবার শিশু হতে চায় কারও কাছে। সোল ছাড়া আর কাউকে এদেশে দেখিনি আবেগের মূল্য দিতে। সোল জানে কষ্ট কোথায় হয়, কীভাবে হয়। কষ্ট যারা পায়, তারা জানে। সোলের ভালোবাসার ধরণ আর তীব্র ভাবের প্রকাশ পূবে খাটে, পশ্চিমে ঠিক খাটে না। তাই, আমার ধারনা, সোলের তেমন বন্ধু নেই এ দেশে। হ্যাঁ দেখে মনে হয় অনেক বন্ধু, কিন্তু আসলে কি কোনও সত্যিকার বন্ধু আমার আছে! কোনও একটি দেশে জন্ম নিলেই কি সে দেশের মানুষের মতো স্বভাব চরিত্র গড়ে ওঠে মানুষের! তাহলে একই দেশে মানুষে মানুষে এত ফারাক কেন! একজন দরদী, আরেকজন খুনী। উদার নিঃস্বার্থ সব দেশেই মেলে, স্বার্থান্ধ, হিংসুক ও খুনীও মেলে সব দেশে।

বুঝি যে আমি ভালোবাসার কাঙাল। সোলের মতো সাধারণ নিরীহ নির্জন একটি মানুষকে খুব অল্পতেই আমার খুব আপন বলে মনে হয়। যেন সোলের সঙ্গে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি

আমি। যেন তাকে অবজ্ঞা করেও কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ভালোবাসা যা পাবার তা পেয়েই যেতে থাকবো। যে বেহিসেবি ভালোবাসা বাংলাদেশের সংসারে চলে, তা সুইডেনে চলবে কেন, সোলকে যতই আমার আপন মনে হোক, মা মা মনে হোক, বোন বোন মনে হোক! দুটো সমাজের রীতিনীতি, ধ্যানধারনা, বড় হওয়া বেড়ে ওঠা, মূল্যবোধ ইত্যাদি কিছু হলেও তো আলাদা। এখানে কেউ ক্রীতদাসী হয়ে এখন আর বেঁচে থাকতে চায় না। কেউ চায় না যে সে কেবল দেবে, দিয়েই যাবে, কিছু না পেলেও তার চলবে। না, কিছু না পেলে এখানে মানুষের চলে না। বুদ্ধি হওয়ার পর হিসেব করে জীবন চালাতে হয় এদের। বাবা মার কোল ছেড়েই শিখে নেয় স্বনির্ভর হওয়ার পদ্ধতি। কিশোর বয়সেই পৃথক অন্নবস্ত্রবাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যেতে হয়। এরাই যদি হিসেব করে না চলে, তবে চলবে কে! মায়ের কোলে বাবার ঘাড়ে জীবনভর চেপে যে ছেলেমেয়েরা জীবন প্রায় সবটা কাটিয়ে দেয়, তারা? হিসেবি না হলে এখানকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে এত বড় দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হবে না। বেহিসেবি হওয়ার কোনও পথ খোলা নেই এদের সামনে। দান দক্ষিণা যারা করে, তারা করে। কিন্তু ভালোবাসা যে খয়রাতি মাল নয়, তা এরা খুব ভালো করে জানে। ভালোবাসা দেওয়া নেওয়ার জিনিস। ত্যাগী হওয়ার শিক্ষা এরা জন্ম থেকে পায়নি। সোল যখন টের পায় যে আমি তাকে ভালোবাসি না, সে রুখে ওঠে। বিসর্জন আমাকে সে অনায়াসেই দিয়ে দেয়, তার হিসেবের খাতা থেকে আমার নামটি কালো করে কেটে। এই হিসেব কিন্তু টাকা পয়সার হিসেব নয়। ভালোবাসার হিসেব। আমি তোমাকে দু মণ প্রেম দেব, আর তুমি বিনিময়ে আমাকে তিন ছটাক শ্রদ্ধা দেবে তা হবে না।

বাড়ি নেই। ঘর নেই। কোন দেশে বাস করবো তার ঠিক নেই। কোন ভাষায় কথা বলবো, সে জানি না। জীবিকা কী, জীবন কিভাবে, কিছুই বোধগম্য নয়। কবে দেশে ফিরবো, কবে ঘরে! যারা আমাকে ঘটা করে এনেছিল, তারা কেউ এ নিয়ে ভাবছে না। আমি কোথায় আছি, কী করছি, মরে আছি নাকি বেঁচে তা নিয়েও কারওর কোনও ভাবনা নেই। আমার নিজের ভাবনাগুলো দিনদিন নিঃসঙ্গ নিথর, ঝরা পাতার মতো, শুকনো ফুলের মতো। টাকা

পয়সা এই যে জলের মতো ফুরোচ্ছে। ফুরোতে ফুরোতে একসময় শূন্যতে যখন পৌঁছোবো, তখন কী হবে, ভেবে, আমার মাথার ভেতর একটি অদৃশ্য সূঁচ ঢুকে যায়। সোলকে হারিয়েছি, বুঝি। জার্মানি থেকে সুইডেনে ফিরে এসে দেখি আমার রেখে যাওয়া অ্যাপার্টমেন্ট পাল্টে ছোট একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছে মাইব্রিট। বলেছিল, আমার নাকি অত বড় কোনও বাড়ির দরকার নেই, একা মানুষ ছোট খাটো কিছু একটা হলেই চলবে। বলেছিলাম, *হ্যাঁ তাই তো।* আসলে স্টকহোম শহরে ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্টের প্রয়োজন ছিল মাইব্রিটের, যত না মাইব্রিটের, তার চেয়ে বেশি পের-এর। পের এর জন্য এই কাজটি সে করলো, ব্যবহার করলো আমার বিশ্বাসকে। এতে লাভ আমার হয়নি, হয়েছে ওর। একটি ছোট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়েছে, যেটিতে পের এর মাঝে মধ্যের বসবাস সম্ভব, আমার নয়। স্টকহোম শহরে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিতে মানুষের অপেক্ষা করতে হয় পনেরো বছর, সেটি আমি পেয়েছিলাম পনেরো দিনে। এবং সেটিই আমি হেলায় হারালাম। আমার আর স্টকহোম শহরে থাকা সম্ভব হয়নি, শহর থেকে দূরে সুয়েনসনের বাড়িতে আমাকে উঠতে হয়েছে, থাকতে হয়েছে। ছোট অ্যাপার্টমেন্টটি একসময় ছেড়ে দিই। কে আর শখ করে খরচ বাঁচাতে ভালোবাসে। আমার স্পেস দরকার হয়। তা না হলে দম বন্ধ দম বন্ধ লাগে। সুয়েনসন আমাকে স্পেস দিয়েছিল, ভালোবাসা কি দিয়েছিল? একধরনের হিসেব দিয়েছিল, যে হিসেবের মধ্যে বাস করে আমি ভিতরে ভিতরে হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

ভালোবাসা জন্ম থেকে চাই। সোনালি চুলে সাদা ত্বকে যদি না থাকে, তবে কালো চুলে, বাদামি ত্বকে ভালোবাসা আছে! ভালোবাসা যে চুল আর ত্বকের রঙে থাকে না, তা তখনও জানি না। ইতালীয় স্পেনীয় বা পূর্ব ইওরোপীয় পুরুষদের দেখে আত্মীয় মনে হয়েছে, পরে দেখেছি মনে হওয়াটি ভুল। আত্মীয় হওয়ার জন্য চুল ত্বকের রঙ বা কথা বলা চলাফেরার ভঙ্গি নির্ভর করে না। ভালোবাসা উজাড় করে সাদা সোনালিদের দিয়ে দেখেছি। কিন্তু তারপরও মন হেথা নয় হোথা নয় করেছে। আকুল হয়ে আমি বাঙালি খুঁজেছি। যেন বাংলা এবং বাঙালিই আমাকে উদ্ধার করবে পরবাসের দুঃসহবাস থেকে। বাঙালিই আমাকে বাবার

স্নেহ দেবে, মার আদর দেবে, দাদাদের আহ্লাদ দেবে, বোনের ভালোবাসা দেবে। বাঙালির খোঁজ পাওয়া সহজ ছিল না আমার জন্য। বহিরাগতদের ত্রীসামানায় আমাকে যেতে দেওয়া হয়নি। নিরাপত্তার কারণে। সুইডিশ পুলিশের কাছে সুইডেনে বাসু আলম নামের এক ভদ্রলোক চিঠির পর চিঠি লিখে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে, লেখক সংগঠনে বন্যা বইয়ে দিয়েছে। অনর্গল অনুরোধ আবদার আসতে থাকে যেন একবার দেখা করি। কার সঙ্গে দেখা!   যে বাঙালি বুদ্ধিজীবিরা থাকেন সুইডেনে তাদের সঙ্গে দেখা যেন করি। বুদ্ধিজীবীর কথা উঠতেই আর্নে রুথ নামের সুইডিশ বুদ্ধিজীবীকে বলেছিলাম, *সুইডেনে বাঙালি কোনও বুদ্ধিজীবী বাস করে তা তো শুনিনি।* আর্নে আকাশ থেকে পড়েন। আর্নের আবদার এবং বাংলার জন্য আমার তীব্রতা বাসু আলমের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেল নেমন্তন্ন খেতে। বাংলাদেশের লোক, নিজে সেজেগুজে ফিন-বউ আর বাং-ফিন ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে   দাঁড় করিয়ে রেখেছিল আমার অপেক্ষায়। বিরাট বাঙালি খাবারের আয়োজন, দেখে আমার জিভে জল। সুইডেনে এসে অবদি এই জিনিসের স্বাদ পাইনি। পুলিশ দেখে পুলকিত বাসু অনর্গল বলে যাচ্ছেন, তিনি ইমিগ্রেশনের বড় পদে কাজ করেন, তিনি বুদ্ধিজীবী, ফোল্ক পার্টির সদস্য, তাঁর এই বাড়িতে সুইডিশ মন্ত্রী, লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের আনাগোনা। দেখে শুনে মানুষটি আদৌ শিক্ষিত কিনা এ নিয়ে আমার সংশয় হয়।

বাঙালির তৃষ্ণা এরপরও কমেনি আমার। প্রায় প্রতিদিনই ঢাকা কলকাতায় ফোন করা ছাড়াও, যখন বার্লিনে, বাঙালির রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে দেখা হয় কিছু ইমিগ্রেন্ট যুবকের সঙ্গে। আমার তো আকণ্ঠ পিপাসা জানার কে কী করছে এখানে, জানার। রেস্তোরাঁয় থালাবাসন মাজা, অফিসঘরের জানালার কাচ মোছা এসব কাজ ছাড়াও কেউ হয়তো বাঙালি খাবারের রেস্তোরাঁ শুরু করেছে। এক ছেলে জার্মান বিয়ে করেছে। ছবি আঁকে। সে আবার সকলের নমস্য। জার্মান মেয়েদের বিয়ে করা খুব সোজাই। ফটাফট বিয়ে করে ফেলতে পারে। এরপর জার্মান বউ এর কল্যাণে জার্মানিতে থাকার কাগজপত্র জুটে গেলে ব্যস ডিভোর্স করে দেশে গিয়ে একটি কচি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে আসে। আঁতকে উঠি শুনে।   হ্যাঁ এই হচ্ছে,

এই হয়। জার্মান মেয়েগুলো এই ফাঁদে পড়েই বা কেন! তাদেরও *হেথা নয় হোথা নয়* এর সমস্যা আছে নিশ্চয়ই। পূবের ছেলেরা নরম সরম, প্রেমিক হয় ভালো, পূবের ছেলেরা পোষ মানে, পঞ্চাশ পঞ্চাশ হিসেব কষে না সবকিছুতে, এরকম একটি ধারনা কাজ করে মেয়েদের মধ্যে। এখানে বাঙালি ছেলে আর জার্মান মেয়েদের কিছু বিয়ে প্রেম করে হয়, কিছু বিয়ে অবশ্য চুক্তির বিয়ে। চুক্তির বিয়েই বেশি, মেয়েরা টাকা পয়সা নিয়ে বিয়ের কাগজে সই করে। এরও উপার্জন হল, ওরও পরবাসের বাস বৈধ হল। পিপাসা আমার বাঙালির জন্য হঠাৎ এমন বৃদ্ধি পেল, যে, এদের, কপালে বদলে ফেলার জন্য আসা এই বাঙালি যুবকদের কোনও একজনের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠি। নিজের জীবনটি ক্রমশ আমাকে এত গভীর হতাশার দিকে টেনে নিচ্ছিল যে কিছু একটার আড়াল চাইছিলাম নিজেকে লুকোনোর জন্য। প্রেম হল সেই গর্ত যেখানে আশ্রয় নিলে নিজের চেহারাকে দেখা যায় না, যৌনতার জন্য আকুলতা ওই গর্তের কাদায় নিজেকে ডুবিয়ে ফেলে অদৃশ্য হওয়ার কৌশল। উত্থানরহিত, হৃদয়রহিত বাঙালি পুরুষে আমার হতাশা আরও আগুনের মতো বেড়ে ওঠে। তবে সামান্য ওই যাতায়াত বাঙালির জীবনযাপনের কিছু অন্তত আমাকে দেখতে দেয় বিদেশে, যে জীবনের সঙ্গে আমার সহস্র মাইলের ব্যবধান। আমি চেষ্টা করি তাদের কাতারে নেমে এসে তাদের জানতে, তসলিমা পরিচয়টিকে ঠেলে সরিয়ে। দেশে হয়তো তাদের সঙ্গে আমার মেলার মেশার কোনও সুযোগ এবং প্রশ্ন কোনওটাই উঠতো না। আমার আন্তরিকতার কিন্তু অন্য অর্থ হয়। দু চারজন বাংলাদেশের বাঙালি যাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছিল, যারা দাউদ হায়দার নামের এক লোক সম্পর্কে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে, দাউদ কিভাবে টাকা ধার নিয়ে আর ফেরত দেয় না, কিভাবে নির্লজ্জভাবে মিথ্যে কথা বলে জীবন চালাচ্ছে, এই তারাই মুখে কুলুপ এটেঁ বসে থাকে যখন সেই একই দাউদ হায়দার আমার বিরুদ্ধে আগাগোড়া মিথ্যেয় মুড়ে কলকাতার কাগজে একটি লেখা ছাপায়। এই সেই দাউদ হায়দার, সত্তর দশকের প্রথম দিকে মুসলমানের পয়গম্বর মুহম্মদকে গালি দিয়ে কবিতা লেখার অপরাধে যাকে বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল। মানুষটির প্রতি আমার সহানুভূতি

ছিল। আমাকে সে, জানি না কোত্থেকে ফোন নম্বর যোগাড় করে, ফোনও করেছিল দুদিন সুইডেনে। তাকে আমি তখনও দেখিনি, সামনাসামনি আলাপ হয়নি। প্রথম দেখি গুন্টার গ্রাসের নতুন বই পাঠের অনুষ্ঠানে, বার্লিনে। একটি বেটে বাদামি লোক এসে বললো, আমি দাউদ হায়দার। ও আচ্ছা। আমি আর এক জার্মান বান্ধবী রেনাটে ক্লাউস শুনতে গিয়েছিলাম গুন্টার গ্রাসকে। রেনাটে জার্মান মানববাদী দলের মেয়ে। আমরা চা খেতে গেলাম, সঙ্গে এলো দাউদ। চা খাওয়ার পর রেনাটে যখন আমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেবে, দাউদ হায়দার রেনাটের গাড়িতে ঝাঁপিয়ে ওঠে। পথে নাকি সে কোথাও নেমে পড়বে। যেতে যেতে কৌশলী কণ্ঠ ঠিকানার খোঁজ করে আমার। সেটি তাকে না আমি দিই, না রেনাটে দেয়। একসময় পথে তাকে নামতেই বলে রেনাটে। আমার ঠিকানা যে কাউকে জানানো নিষেধ রেনাটে জানে। *আমার বাড়িতে উমবার্তো একো ঘুমোচ্ছে, ইতালি থেকে সাতদিন আগে আমার সঙ্গে কটা দিন কাটাবার জন্য চলে এসেছে একো। কাল ইয়েভশেঙ্কো এসেছিল আমার কাছে, আমার সময় হয়নি তাকে সময় দেওয়ার, মস্কোয় ফিরে গেছে।* এসব শুনতে শুনতে রেনাটে কুঞ্চিত চোখে আমার দিকে তাকায়। নিজের সম্পর্কে দাউদের আজগুবি গপ্পগাঁথা রেনাটেকেও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। নেমে যাবার পর রেনাটে বলল, *লোকটির সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার।* দাউদ হায়দারের সঙ্গে ওই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। হলে কী হবে, একদিন হঠাৎ শুনি আমার নাকি দাউদ হায়দার নামের এক লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। খবরটি জগতের সব পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়ে গেছে, আমি জানিও না। জেনেছি   ইতালিতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ট্যুর শেষ করে যখন জার্মানিতে নেমেছি, তখন। অভিনন্দন জানাচ্ছে মানুষ আমাকে। কেন অভিনন্দন, বিয়ে হয়েছে, তাই। ইওরোপীয় বন্ধুরা প্রচুর উপহারও ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছে। খবরটি রয়টার করেছে। কিন্তু রয়টার কোত্থেকে এই মিথ্যে খবর পেল আমার জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যে মানুষ জীবনভর মিথ্যে রটনা আর অপপ্রচারের শিকার হয়ে হয়ে অভ্যস্ত হয়েছে, সে কেন উতলা হবে! আমি উতলা হই না। তবে বিস্ময় আমার ঠিকই ছিল, ছিল কারণ এসব বাংলাদেশি মোল্লাদের ইনকিলাব আর সংগ্রাম নামের

পত্রিকা নয়। রীতিমত ল মন্দ, রীতিমত গার্ডিয়ান, রীতিমত ডগেনস নিহেটার, রীতিমত ডার টাগেস্পিগাল, ডাই জাইট। পরে আবদুল গাফফার চৌধুরি আমার বিস্ময় কাটিয়েছেন জানিয়ে যে দাউদ হায়দার নিজেই রয়টারকে জানিয়েছে। ---*জানিয়েছে যে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে।*

--কেন এই মিথ্যে খবর সে জানাবে?

--কারণ সোজা।

--কী রকম।

--দেশ ছাড়তে হয়েছিল ওকেও। তোমাকেও। কিন্তু বিদেশে তোমার নাম হয়েছে, ওর নাম হয়নি। তাই সে যে করেই হোক নাম কামাতে চায়। তার নাম তো যে কোনও কারণে লেখা হল, তুমি যাকে বিয়ে করছো, কায়দা করে তার সম্পর্কে এও জানিয়ে দেওয়া গেল, তাকেও একই কারণে দেশ ছাড়তে হয়েছিল।

এসব চতুরতা দেখে আমার গা কাঁপে। মানুষ কী করে পারে এত অসৎ হতে! দীর্ঘ অনেকগুলো মাস আমাকে যন্ত্রণা সইতে হয়েছে। মিথ্যের অনেক বীভৎস চেহারা দেখেছি জীবনে, এমন বীভৎস দেখিনি। দাউদ হায়দারের আত্মার আরাম হয়েছে, অনুমান করি।

বাঙালির মিথ্যের কোপে আমাকে আরও পড়তে হয়েছে। মিতালি মুখার্জির দিদি শ্যামলী সুইডেনে থাকেন, একবার দেখাও করেছিলেন ঢাকায় গিয়ে। আমার লেখা ভালোবাসেন খুব। তিনি সুইডিশ পেন ক্লাবের মাধ্যমে যোগাযোগ করে আমার সঙ্গে দেখা করার একটি ব্যবস্থা করেন। আমি নিশ্চিতই আহলাদিত। কিন্তু তাঁর আবদার, তাঁর ছোটভাই দিলিপ রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছে সুইডেনে, কিন্তু পাচ্ছে না, এখন একমাত্র আমি যদি বলে দিই যে হ্যাঁ আমি দিলিপকে চিনি জানি, হিন্দু বলে তার অসুবিধে হচ্ছে বাংলাদেশে, তাহলেই সে এ দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে যাবে। কদিন পর ফোন সাংবাদিকের, ফোন উকিলের।

--দিলিপকে কি বাংলাদেশে ফেরত গেলে মেরে ফেলবে? সে আমি জানি না। হিন্দু বলে তার জীবনের ওপর কি কোনও হুমকি আছে?

-- হিন্দুদের ওপর হচ্ছে অত্যাচার। তবে সবাই ভুগছে, এমন নয়।

--আমি কি দিলিপকে চিনি?

-- চিনি।

--ওর মাকে নিয়ে কলাম লিখেছি?

--লিখেছি।

--লজ্জায় ওদের কথা উল্লেখ করেছি?

--অনেকদিনের কথা, ঠিক মনে নেই। হয়তো করেছি।

এরপর দিলিপের হয়ে যায় রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়া। কিন্তু রতন, আমার সেই শৈশবের বন্ধু রতন, বাবার বন্ধুর ছেলে, ও আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল সুইডেনে, ঠিকানা যথারীতি পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় নয়ত সুইডিশ পেন ক্লাব। চিঠিতে লম্বা গল্প, আমার জন্য নাকি সে আন্দোলন করেছে, রাস্তায় নেমেছে টাঙ্গাইলে, মোল্লারা তাই দেখে তার ওপর ক্ষেপে আগুন, তাকে খুন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। অবশেষে সে প্রাণ বাঁচাতে জার্মানিতে এসেছে। এখন রতনের আবদার, আমি তার উকিলকে যেন বলি যে রতনের গল্প সত্যি গল্প। রতনের উকিল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানিয়ে দিই, *রতনের গল্পটি আমার মনে হচ্ছে বানানো।* তাকে কি আমি চিনি? *হ্যাঁ চিনি, ছোটবেলায় দেখেছি। বাবার বন্ধুর ছেলে।* তার কর্মকাণ্ড, আমার পক্ষে আন্দোলন? *না, তার কিছুই আমি জানি না।* মৌলবাদীরা তাকে মেরে ফেলতে চাইছে। আমার জানার বাইরে এসব ঘটনা। আর? যদি রাস্তায় মিছিলই সে বের করতো আমার পক্ষে, দেশে থাকাকালীন কোনওদিন তো যোগাযোগ করেনি! মনে হচ্ছে না কাহিনী সত্য। আমার অতি সততা রতনকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেয়নি।

যে আমি কোনওদিন মিথ্যে বলিনি, যে না-মিথ্যের জন্য রতনকে জার্মানি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই আমাকে একসময় মিথ্যে বলতে বাধ্য করেছিল দুজন। এক আমার ফরাসি অনুবাদক ফিলিপ বেনোয়া, দুই আবদুল গাফফার চৌধুরী। ফিলিপ বেনোয়া বিকাশ সরকার নামে তার এক বাঙালি বন্ধুর জন্য আবেদন করলো। বিকাশ রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিল ফ্রান্সে, কিন্তু হয়নি, এখন ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে ফরাসি সরকার। ফিলিপ নিজে একটি মিথ্যে গল্প লিখে পাঠালো আমার কাছে, অনুরোধ, ওটিতে সই করে দিতে হবে। গল্পটি ফরাসি ভাষায় লেখা, আমার বোঝার কোনও কথা নয়।

--*কী লিখেছেন ফিলিপ?*

--*লিখেছি বিকাশ আপনার সমর্থক ছিল, আপনার সঙ্গে থেকে ও মৌলবাদবিরোধী আন্দোলন করেছে। তাই মৌলভীরা ওকে মেরে ফেলার জন্য খুঁজছে, বাংলাদেশে এখন যদি ফিরে যায়, ওকে মেরে ফেলবে।*

--*কিন্তু ফিলিপ। আমি তো বিকাশ সরকার নামে কাউকে চিনি না।*

ফরাসি যুবক ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে। না চিনলেও আমাকে লিখতে হবে যে চিনি। যুক্তি একটি দাঁড় করানো যায়, কারও ভালোর জন্য মিথ্যে যদি বলার দরকার হয়, মিথ্যে বলা উচিত। এই মিথ্যেয় তো আমার কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। মিথ্যেটি বলতে হচ্ছে ইওরোপের বর্ণবিরোধী আইনের কারণে। যেহেতু ইওরোপে গরিব দেশের মানুষদের স্বাগত জানানো হয় না, তাই ফাঁকির প্রশ্ন ওঠে। না হলে উঠতো না। হ্যাঁ এক দেশ থেকে আরেক দেশে শেকড় গাড়া তো পৃথিবীতে চিরকাল হয়ে আসছে উন্নততর জীবিকা এবং জীবনযাপনের প্রয়োজনে। এখন মানব চরিত্র হঠাৎ পাল্টাতে হবে কেন! যতদিন না অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবীর দেশগুলো সমান না হচ্ছে, ততদিন চলবেই এই মাইগ্রেশন। অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপায় ছিল না আমার অস্বীকার করা যেদিন স্বয়ং আবদুল গাফফার চৌধুরী আমাকে লন্ডন থেকে ফোন করে অনুরোধ করলেন এক মেয়েকে বাঁচাতে, যাকে আমি জীবনে চিনি না জানি না, তার সম্পর্কে বলতে যে সে আমার সহকর্মী ছিল বা আমার বই ছাপিয়েছে, আমার জন্য

মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আন্দোলন করে ফতোয়ার শিকার হয়ে এখন দেশ থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। গাফফার চৌধুরী বললেন, *আমরা অনেক চেষ্টা করেছি মেয়েটাকে লন্ডন রাখতে, কোনও চেষ্টাই সফল হয়নি। ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছে ব্রিটিশ সরকার। ডিপোর্টেশন হয়ে যাচ্ছে। তুমি এখন শেষ ভরসা। আমরা জানি তুমি বললেই হয়ে যাবে, ও বেঁচে যাবে। মেয়েটা বড় অসহায়, একটা পাকিস্তানিকে বিয়ে করেছিল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তুমি ওকে বাঁচাও।*

---কি করে বাঁচাবো!

---তুমি লিখে দাও যে তুমি মাসুদা ভাট্টিকে, ওর নাম মাসুদা ভাট্টি, ওকে তুমি চেনো, তোমার বই টই ছাপিয়েছে। তারপর দেশে তাকে মেরে ফেলার জন্য মোল্লারা ঘুরছে। এখন দেশে ফিরে গেলে তার নির্ঘাত মরণ হবে।

---কিন্তু গাফফার ভাই আমি তো ওকে চিনি না। সে তো আমার বই ছাপায়নি। ওকে তো মোল্লারা মেরে ফেলবে না। মিথ্যে কথা কেন বলবো!

গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে বাংলাদেশে থাকাকালীন কোনওদিন দেখা হয়নি। তিনি আমার প্রশংসা করে বেশ কিছু লেখা লিখেছেন দেশের পত্রিকায়। বিশেষ করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতার পর। লন্ডন থেকে তিনি অক্সফোর্ড শহরে কেবল ওই বক্তৃতা শুনতেই গিয়েছিলেন, কিন্তু হলের ভেতর ঢুকতে পারেননি। বাদামি লোকদের নাকি ভেতরে ঢুকতে দেয়নি নিরাপত্তাকর্মীরা। অথবা ভিতরে বসার আর জায়গা ছিল না বলে ঢুকতে দেয়নি। বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। গাফফার চৌধুরী জার্মানিতে তার আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন আমিও জার্মানিতে, আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করার পর আমি তাঁকে আমার ভিলা বালবের্তায় অতিথি করি কয়েকদিনের জন্য। ভিলা বালবের্তা একটি অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ, মিউনিখের অদূরে ফেল্ডাফিঙ নামের এক স্বপ্নময় গ্রামে, এককালে যাই ছিল, এখন এটি লেখক শিল্পীদের নিরিবিলি নিজের কাজ করার জায়গা। যখন ওই ভিলায় আমন্ত্রণ পেয়ে তিন মাসের জন্য গিয়েছি, আমি ওপরতলায় আর পূর্ব জার্মানির বিখ্যাত লেখিকা ক্রিস্টা উলফ নিচতলায়। সুয়েনসন তখন বেড়াতে গিয়েছে আমার ভিলায়,

গাফফার চৌধুরী যখন অতিথি। সুয়েনসন আর আমি দক্ষিণ-জার্মানির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছি আমার সেই অতিথিকে, সেইসব পাহাড়, পুকুর আর ঘন অরণ্যের রহস্যময়তা। প্রকৃতি আমাকে বরাবরই খুব টানে। পশ্চিমের দেশগুলোর আনাচ কানাচ না ঘুরলে আমি কোনওদিন হয়তো জানতেও পেতাম না প্রকৃতির রূপ যে কী অসাধারণ! গাফফার চৌধূরী খুব বড় মানুষ। তাঁর লেখা *আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি* গাইছি শৈশব থেকে। লেখালেখি শুরু করার পর যে সমর্থন সহমর্মিতা আমার জুটেছে হাতে গোণা বুদ্ধিজীবীর মধ্য থেকে, তাঁকে তার মধ্যে অবশ্যই ধরতে পারি। আমাকে ভালোবাসেন বা স্নেহ করেন বলে নয়, তাঁর মুক্তবুদ্ধি, স্বচ্ছ চিন্তা, তাঁর লেখার গভীরতার কারণেই তাঁর প্রতি আমার অফুরন্ত শ্রদ্ধা। তাঁর কাছ থেকে এই মিথ্যে বলার আবদার আমি আশা করিনি। বড় অসহায় লাগে নিজেকে। মাসুদা ভাট্টি নামের অচেনা মেয়েটিও ফোন করে আমার লেখার সাংঘাতিক ভক্ত সে, এবং কাঁদতে কাঁদতে *আমাকে বাঁচান* জাতীয় বাক্যাবলী বহুক্ষণ আওড়ালো। আমাকে মিথ্যে বলতে হল। যে মেয়েকে চিনি না জানি না, তাকে, লিখতে হল, চিনি। ব্রিটিশ সরকারকে লিখে দিলাম যে মাসুদা ভাট্টি নামের মেয়েকে আমি চিনি, আমি তসলিমা, ও আমার সমর্থক, আমার পক্ষে আন্দোলন করেছে বাংলাদেশে, বাংলাদেশে ফিরে গেলে ওকে মৌলবাদীরা মেরে ফেলবে। ব্যস। হয়ে গেল। পাকিস্তানির প্রাক্তন স্ত্রী বহাল হয়ে গেল লন্ডনে। তারপর, গাফফার চৌধুরী তাকে সাংবাদিক বানালেন। এবং সেই মেয়েই পরে আমার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে কলাম লিখেছে বাংলাদেশের পত্রিকায়। আমার ক নামের আত্মজীবনীটি বেরোনোর পর বাংলাদেশে যখন আমাকে গালাগাল দিয়ে লেখালেখি চলছে, তখন সবচেয়ে কুৎসিত ভাষায় যে আমাকে গালি দিয়ে লেখা লিখেছিল, সে মাসুদা ভাট্টি। লেখা পাঠিয়েছিল লন্ডন থেকে, যে লণ্ডনে আমার কল্যাণেই তার বসবাস। আমি নাকি বুড়ি বেশ্যার মতো ল্যাম্পপোস্টের আলোয় বসে বসে আত্মরতির গল্প লিখছি! না, তাকে আমি কোনওদিন চোখে দেখিনি। আমি শুধু মাথা পেতে তার প্রতিদান গ্রহণ করেছি। ফ্রান্সে ইতিমধ্যে নাগরিকত্ব পেয়ে যাওয়া বিকাশ সরকারও প্রতিদান দিয়েছিল আমাকে। প্যারিসে

এক বছর থাকার পর প্যারিসের পাট চুকিয়ে যখন সুইডেনে ফিরে আসছিলাম, আমার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভরে বড় বড় কিছু বাক্স ভালো করে সিল করে ফিলিপ বেনোয়ার বাড়িতে রেখে এসেছিলাম, পরে প্যারিসে এলে নিয়ে নেবো ওসব। পরে প্যারিস গিয়ে দেখি বাক্স আছে, বাক্সের ভিতরে কিছু নেই। কী হল? বিকাশ সরকার বাক্স খুলে ভিতরের জিনিসপত্র ব্যবহার করতে শুরু করেছে, আর প্রয়োজনীয় দলিল ডকুমেন্টস ক্লিপিংস খাতাপত্র কোথায়! বিকাশ ঠিক বলতে পারবে না কী করেছে সে! কেন বলতে পারবে না! বলতে পারবে না কারণ সে ভুলে গেছে কী করেছে। নাগরিকত্ব পেয়ে গেলে মানুষ সম্ভবত নিজের অনেক কিছুই ভুলেই যায়। অসহায় আমি অনেকক্ষণ বিকাশের সামনে বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে চলে এসেছি। তবে যে যাই করুক, যত অবহেলা অবজ্ঞা অপমান, মাসুদা ভাট্টির শত্রুতার কিন্তু কোনও তুলনা হয় না। এই ঘটনাগুলো না ঘটলে আমি হয়তো জানতেই পেতাম না কৃতঘ্ন শব্দের যথার্থ মানে। জানতেই পেতাম না যে অন্যের উপকার মানুষকে সংকুচিত করে, তাই প্রসারিত হতে উপকারীর উপকার অস্বীকার করতে বা উপকারীর অপকার করতে মানুষ কীকরে মরিয়া হয়ে ওঠে। আমার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য এদের কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

নির্বাসিত জীবনে হাতে গোনা কয়েকজন বাঙালির সংস্পর্শে এসেছি। পশ্চিমীদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বিরতিহীন পেয়েই যাচ্ছি। যে জিনিস পাইনি, সে জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব। যে বাঙালি, অধিকাংশই, আমাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে, সেই বাঙালির ভালোবাসা কখনও কি আর পাওয়া হবে! আমাকে *ইসলাম বিরোধী, পুরুষ বিদ্বেষী* হিসেবে বেশির ভাগ মানুষ জানে, নাক সিটকোয়। তাদের কাছ থেকে আমাকে গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। এই পশ্চিমে যতদূর দেখেছি এবং শুনেছি, বাঙালি যারা বাস করে তারা বাংলাদেশের বাঙালির চেয়েও বেশি রক্ষণশীল। লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেট-- যেখানে অগুনতি বাঙালির বাস, ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল লন্ডন ইন্টারন্যাশনাল পেন ক্লাবের সেক্রেটারি সারা হোয়াইট। গাড়ি করে।

গাড়িকে থামায়নি কোথাও। ভয়, আবার কে ধরে ফেলে, মেরে ফেলে। সেই লন্ডনের রাস্তায় বাঙালির বাচ্চা মেয়েদের দেখেছি ইস্কুলে যাচ্ছে দল বেঁধে, সবার মাথা ওড়নায় ঢাকা। বাংলাদেশের কোনও ইস্কুলে এত মেয়ে মাথা ঢেকে চলে না। দেশ ছেড়ে বিদেশ এলে আরও বৃহৎ পরিসরে এলে মনকে বড় করবে, উদার করবে তা নয়, করে ঠিক উল্টোটি। মানুষ কোথায় বিদেশি সংস্কৃতির ভালো কিছু গ্রহণ করে নিজেদের সমৃদ্ধ করবে, তা নয়, নিজেদের ভালোটাও ত্যাগ করে, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকার কুয়োর মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। কলকাতার এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে হয়েছিল, ওখানে নিজেদের আর ছেলেমেয়ের ঘরের বাইরে আরও একটি ঘর আছে, সাজানো গোছানো, সেটি পুজোর ঘর। ঘটা করে বিদেশে পুজো হয়, ঈদ হয়। ঘটা করে যাবতীয় কুসংস্কার পালন করা হয়। এদের দেখে আমার মনে হয় বুঝি দেশ থেকে এই ইওরোপ আমেরিকায় এসে পিছল খেয়ে হাজার বছর পিছনে চলে যায়। বাংলায় হয়তো বিবর্তন ঘটে, কিন্তু যারা বিদেশের মাটিতে মিনি বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তুলেছে, সেইসব মিনিতে কোনও বিবর্তন ঘটে না। ষাট দশকে ইওরোপ পাড়ি দিয়েছিল যে মাথার যে মস্তিস্ক নিয়ে, আজও সব একই রয়ে গেছে। ঘিলুর কোনও এদিক ওদিক হয়নি। কেবল স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে পড়ে থেকে থেকে ঘিলুতে ফাঙ্গাস ধরেছে।

কানাডায়, টরোন্টোর ন্যাশনাল লাইব্রেরির অডিটোরিয়ামে আমার বক্তৃতা হচ্ছে। অডিটোরিয়ামে একটি চেয়ারও খালি নেই। মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালে সেঁটে। আমার বক্তৃতার যারা আয়োজক তারা যেমন পশ্চিমের সাদা মানুষ, দর্শক শ্রোতারাও স্বাভাবিক কারণেই সাদা পশ্চিমী। বাদামি বা কালো যদি কিছু থাকে, তবে তারা হয় আমেরিকান আফ্রিকান, নয়তো ইওরোপীয়ান আফ্রিকান। ফ্রান্সে যেমন সাদা ফরাসির সঙ্গে আলজেরিয়ান, তিউনেশিয়ান, মরককান কিছু থাকে। মাগরেব দেশ বলা হয় আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলকে। সাদা আফ্রিকাও বলা হয়। ওখানের ধর্ম ইসলাম। ওখানেও মৌলবাদের প্রতাপ

খুব। ওসব দেশ থেকে অনেকে মৌলবাদীদের অত্যাচারে ইওরোপে আশ্রয় নিয়েছে, বিশেষ করে ফ্রান্সে। ওদের মধ্যেও পাওয়া যায় মৌলবাদ বিরোধী ক্ষুরধার কণ্ঠ। খোমিনির অত্যাচারে ইরান ছেড়ে নির্বাসনে চলে আসা অনেক ছেলেমেয়েও ইসলামের গা থেকে আলখাল্লা খুলে নেয় টেনে। সাদা ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট বা ইহুদিদের মুখের ফাঁকে ফাঁকে এইসব মুখ আমাকে প্রগাঢ় বিস্ময় দিয়েছে, প্রাণিতও করেছে। হ্যাঁ ওই কানাডায়, ওই টরোন্টোর ন্যাশনাল বিবলিওটেকের দেয়ালে দাঁড়িয়ে থাকা মুখ বাদামি, কিন্তু টের পাই মুখগুলো উত্তর আফ্রিকার নয়, মুখগুলো ভারতীয় উপমহাদেশের, মুখগুলো বাংলাদেশের। আমার বক্তৃতা শেষে যখন মানুষের প্রশ্ন বা মন্তব্য করার সময়, মাইক্রোফোন এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যারা কথা বলতে চায় তাদের দিকে। শেষের দিকে, আমাকে অবাক করে একজন নয়, দুজন বাঙালি বললো, আমার লেখা তাদের খুব ভালো লাগে, তারা আমাকে চিরকালই সমর্থন করে এসেছে, আমি নারীমুক্তির জন্য যে আন্দোলন করছি,তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, আমি তাদের গৌরব, ইত্যাদি ইত্যাদি। বলে, অনুরোধ করলো আমি যেন অনুগ্রহ করে রাজি হই তাদের সঙ্গে একটি ফটো তুলতে। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার স্মৃতি তারা স্বর্ণাক্ষরে বাঁধিয়ে রাখবে। কানাডার নিরাপত্তারক্ষীরা একবাক্যে নাকচ করে দিল অনুরোধ। আয়োজকরাও বলে দিল, নাগালের কাছে আসা নিরাপত্তার কারণেই বারণ। কানাডার অগুনতি নিরাপত্তারক্ষী আমাকে ঘিরে আছে চারদিক থেকে। ত্রিসীমানায় কারও প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু ব্যূহ ভেদ করে আমি দাঁড়াই। নিজের মানুষের জন্য আবেগ এমন উথলে ওঠে আমার যে রক্ষীদের নিষেধ অমান্য করে আমি ঘোষণা করি যে, বাংলাদেশ আমার দেশ, ওরা আমার দেশের মানুষ, আমার আত্মীয়-মতো, ওরা আমার সমর্থক, ওরা কাছে আসুক, কথা বলবো, ওরা ছবি তুলতে ইচ্ছে করেছে, তুলুক। আমার দুর্দমনীয় ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করলো নিরপত্তা কর্মীরা। অগত্যা বাঙালি যারা এসেছিল তাদের অনুমতি দেওয়া হল ছবি তোলার। হুড়মুড়িয়ে সব এলো। দেখে আমার কী যে ভালো লাগছিল যে এত বাঙালি আমাকে ভালোবাসে, আমার আদর্শ আর বিশ্বাসকে মূল্যবান বলে মনে করছে। সহসা এমন

ঘটে না। দীর্ঘ বছর এমন ঘটেনি খোদ বাংলাদেশেও। সাধারণ মানুষ যারা একসময় আমাকে সমর্থন করতো, তারাও গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেদের। আমি *ইসলাম বিরোধী,* আমি *বিজেপির টাকা নিয়ে লজ্জা লিখেছি,* আমি *রএর চর,* আমি *পুরুষবিদ্বেষী,* আমি *বাজে,* আমি *মন্দ,* আমি *অনেকগুলো বিয়ে করেছি,* আমার *চরিত্র খারাপ।* বাংলাদেশের প্রচারমাধ্যম এসব মিথ্যে প্রচার এমন নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে যে দেখেছি সাধারণ মানুষও কেমন দ্রুত আমার কাছ থেকে সরে গেল, যারা একসময় ছিল আমার সবচেয়ে বড় শক্তি, যখন রাষ্ট্রযন্ত্র আমাকে খুবলে খাচ্ছে আর মাঝারি মাপের লেখক কবিরা ঈর্ষায় আক্রান্ত। কানাডায় বাস করা দেশি কজন মানুষ আমাকে বিষম পুলকিত, উত্তেজিত এবং আনন্দিত করে। কিন্তু ওরা যখন কাছে আসে আমার, মঞ্চের কাছে, আমার দুকিনারে দাঁড়িয়ে কোনও কথা নেই, কোনও সম্ভাষণ নেই, শুভেচ্ছা নেই, কুশল জিজ্ঞাসা নেই, উন্মাদের মতো বোতাম টিপতে থাকে ক্যামেরার। আমার সঙ্গে দাঁড় করিয়ে আলাদা করে এক একজনের ছবি নেওয়া হয় । রীতিমতো হুড়োহুড়ি লুটোপুটি। আমি ঠিক বুঝে পাই না কী হচ্ছে। একজন সাদাসিধে মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক কেবল ফিসফিস করে বললেন, *এগুলো আমাদের পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম পাওয়ার জন্য কাজে লাগবে।* শুনে আমার সারা শরীরে নিথর শীতলতা তার সুঁচ ফোটাতে লাগল। ছবি তোলা শেষ হলে সব চলে গেল, মুহূর্তে ফাঁকা সব, আমি অনেকক্ষন বিমূঢ় দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁড়িয়েই হয়তো ওভাবে থাকতাম, যদি না আয়োজক বা পুলিশ বাহিনীর কেউ এসে আমাকে সরিয়ে নিয়ে যেত।

গোটাটাই মরীচিকার মতো। হঠাৎ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম, চোখ রগড়ে বুঝি যা দেখেছিলাম, ভুল দেখেছিলাম। যেখানে ছিলাম, সেখানেই ফিরে আসি। আমি টের পাই, খুব ভেতরে কোথাও টের পাই, যারা আমার এই সভায় গুণগান করে গেল, থোকা থোকা স্তুতি ছড়িয়ে গেল, তারাই হয়তো আড়ালে আমাকে নোংরা ভাষায় গালি দেয়। তারাই হয়তো একা পেলে আমাকে খুন করবে। তাদের নাম তারা চাইছে লেখা হয়ে যাক কানাডার খাতায়, মানবতার পক্ষের কণ্ঠস্বর হিসেবে, যোগচিহ্ন সহযোগে। আজ যে ছবি তুলে নিয়ে গেল আমার

পাশে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়ে যে দরখাস্তটি করেছে বা নতুন করে করবে তাতে জুড়ে দেবে প্রমাণ হিসেবে যে তারা আমার কাকাতো মামাতো ফুপাতো ভাই, অথবা বন্ধু, অথবা ভক্ত, আমার আদর্শ মেনে রাস্তায় নেমেছে, মৌলবাদীদের রোষানলের শিকার হয়েছে, তাই দেশে মৃত্যুর হুমকি। তাই কানাডাকে দিতেই হবে তাদের আশ্রয়। কারণ জেনেভা কনভেনশনই বলে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাদের, যাদের নিজ দেশে মৃত্যুর হুমকি। রাষ্ট্রপুঞ্জের বা জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর জেনেভা কনভেনশন মেনে চলা কর্তব্য। জুটে যাবে, রাজনৈতিক আশ্রয় এদের জুটে যাবে। শুনেছি আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশে লজ্জা বইটি দেখিয়ে নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে মুসলমান ছেলেরা রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়ে গেছে। দেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, হিন্দুদের মেরে ফেলা হচ্ছে, তার প্রমাণ হল *লজ্জা।* যারা *লজ্জা* বইটি দেখাচ্ছে নিজেদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য, সেই মুসলমান ছেলেরা, আমি জানি, যে, লজ্জা লেখার জন্য আমার বাপ মা তুলে গালি দেয়। হ্যাঁ তারাই। যারা আমার সমর্থক বা ভক্ত বলে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছে এবং পেয়ে গেছে, হয়তো তাদের একজনও মানবতায়, বা মানবাধিকারে বা নারী স্বাধীনতায় বা মত প্রকাশের অধিকারে বিশ্বাস করে না, এবং আমাকে ভীষণ-ভীষণভাবে ঘৃণা করে।

খুব একা লাগে আমার। কেউ কি আছে আমার মতো একা! এত কিছু পেয়েছি জীবনে, এত নাম যশ খ্যাতি, তারপরও এত খালি খালি লাগে কেন! বিষাদ কেন আমাকে ছেড়ে একবারের জন্য এক পাও দূরে যায় না !

নির্বাসিত নারীর কবিতা

মা কী করছেন এবারের শীতে? কী করছেন মা? করছেন কী মা, আমি ঠিক ঠিক অনুভব করি। চোখ বুজলেই দেখি মাকে।

শীত আসছে, উঠোনে শীতলপাটি বিছিয়ে লেপ রোদ দেবার সময়।
মা আমার লেপ কম্বল রোদে দিচ্ছেন, ওশার লাগাচ্ছেন, কোলবালিশের তুলো ভরছেন
উঠোনে তুলে ধুনচে ধুনুরিরা..
শীত এলেই মার এমন দম না ফেলা ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়।
এবারের শীতেও রোদে শুকোনো লেপ এনে বিছানায় গুছিয়ে রেখেছেন মা।
এবারের শীতেও আচারের বয়াম রোদে দিচ্ছেন,
এবারের শীতেও ভাপা পিঠে বানাবার হাঁড়ি ন্যাকড়া যোগাড় করছেন।
কার জন্য? কে আছে বাড়িতে যে কিনা সারা শীত লেপের তলায় গুটি মেরে,
মনে মনে চমৎকার চাঁদের আলোয়, অরণ্যে, কাঠখড় কুড়িয়ে আগুন তাপায়,
আমি ছাড়া?
কে আছে বাড়িতে যার জন্য খানিক পর পর ধোঁয়া ওঠা চা, মুড়ি ভাজা আর
দুপুর হতেই আম বা জলপাইএর আচার --
ভোরের খেঁজুর রস ভোরের খেজুররস আর পিঠেপুলি -- কার জন্য!

এবারের শীতে আমি স্ক্যানডিনেভিয়ায়, বরফে আর অন্ধকারে ডুবে আছি
জানি, ফেরা হবে না আমার, মাও তো জানেন ফেরা হবে না, রোদ পড়া উঠোন
আর নকশি কাঁথায় ন্যাপথলিনের ঘ্রাণের ওপর পাশের বাড়ির বেড়াল এসে শোবে।
এত জেনেও মা কেন রোদে দিচ্ছেন আমার কাঁথা কাপড়, লেপ, কাপাস তুলোর বালিশ!
এত জেনেও মা কেন ডুকরে কেঁদে ওঠেন ফোনে, যখন আমি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে
সুখবর দিই -- *ভালো আছি!*

অবুঝ আমার মা, আঙুলের কড়ায় গোনেন দিন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন অপেক্ষায়।
আর আচমকা প্রশ্ন করেন কখন আসছো তুমি? তুমি তো ঘুমোবে এখানে,
তোমার বিছানায়, গল্প শুনতে শুনতে নন্দীবাড়ির ভুতের আর বনের কাঠুরের
আর ব্যাং রাজকুমারের আর.....।
মা কি আগামি শীতেও আমার জন্য আবার রোদে দেবেন লেপ তোশক, আচারের বয়াম, আর দরজায় টোকা পড়লে বঁটিতে মাছ রেখেই দৌড়ে দেখবেন আমি কি না!

যাকেই দেখি, তাকেই বলি, বাড়ি ফিরবো। কেউ বোঝে না কি বলতে চাইছি। মানুষকে বলি। পাখিকে বলি। ভূমধ্যসাগরের পাড়ে উদাসিন বসে ছিলাম, সি-গালগুলো উড়ছিল। সি-গাল উড়ে চলে যাচ্ছিল, ফিরে আসছিল। সি-গাল যেখানে খুশি যেতে পারে, আমি পারি না। নিজেকে একটি ক্ষুদ্র সি-গালের চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র মনে হয়।

পৃথিবীতে সকলেই নিজস্ব একটি নদী বা সমুদ্র থাকে,
আমার বাড়ির পাশে একটি নদী
আর আমার দেশের দক্ষিণে একটি সমুদ্র এখনও আছে
এখনও তারা ফুঁসে ওঠে, তেড়ে আসে, পোষ মানে
আর পোষ মানা জলে ঝাঁপিয়ে খেলে গ্রামের কিশোর।
ভূমধ্যসাগরে সি-গালের সাঁতার দেখতে দেখতে
আজকাল বড় পাখি হতে ইচ্ছে করে, ভাসতে ইচ্ছে করে জলে হাওয়ায়

ভাসতে ভাসতে একদিন ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের কাদায় উপুড় হতে ইচ্ছে করে কাটা ঘুড়ির মতো --
ভাসতে ভাসতে আমাদের গোলপুকুরপাড়ের বাড়ির কলতলায়
শিমুল তুলোর মতো একদিন।
সি-গাল, তোমার ডানায় করে নেবে আমাকে?
আমার একটি বড় চেনা সমুদ্র আছে ওইপারে
বড় চেনা একটি নদীও।
আমার একটি বড় চেনা জীবন আছে এক দেশে
একটি হৃদয় আমি ফেলে এসেছি ধু ধু মাঠে, আম কাঁঠালের বনে, লিচুতলায়।
একটি হৃদয় আমি ফেলে এসেছি বস্তিতে ডোবায় ঘিঞ্জি গলিতে,
যেখানে কালো কালো শিশুরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাকের থালায়,
যেখানে ঝাঁক ঝাঁক মানুষের বুকের ওপর ঝুঁকে থাকে নীল মৃত্যু,
যেখানে আবার দোলন চাঁপাও ফুটে ওঠে মড়ার খুলি থেকে।

সি-গাল, তোমার ডানায় করে একদিন খুব ভোরে, চুপ চুপ করে, কেউ জানবে না,
নেবে আমাকে ভূমধ্যসাগর থেকে আমার বঙ্গোপসাগরে একদিন?

আমার দিকে আমি অনুভব করি এগিয়ে আসছে অসংখ্য লোক তলোয়ার হাতে, ছুরি, দা, কুড়োল হাতে। আমি দৌড়ে পালাতে চাইছি কিন্তু পারছি না। পারছি না কারণ ওরা আমাকে ধরে ফেলছে। ধরে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে ওরা কেটে ছিঁড়ে চলে গেল।

ওরা প্রথম আমার উরু কেটে নিল, এক থাক মাংস ছাড়া কিছু নেই।
শিরা কাটল হাতের, পায়ের, স্রেফ ফিনকি ওঠা রক্ত।
চোখের মণি, ফুসফুস, পাকস্থলি টেনে বার করলো,
আগপাশতলা দেখলো যকৃতের, পিত্তথলির,
খাবলে তুললো জরায়ু, না কিছু নেই।

কিছু নেই মস্তিস্কে, শিরদাঁড়ায়, পিঠে, পেটে,
দুটো বৃকক পড়ে ছিল উদাস দুদিকে,
খুলে মেলে ও দুটিও দেখা গেল ফাঁকা।

কিন্তু হৃদপিণ্ডে হাত পড়তেই হ্যাঁ হৃদপিণ্ডে হাত পড়তেই
স্পষ্ট বুঝলো ওরা, কিছু আছে এতে।
রাক্ষুসে দাঁতে নখে ছিঁড়ে দেখলো ভেতরে একটি দেশ, বাংলাদেশ নাম।

বিপণ্ন রক্তাক্ত আমি চিৎকার করে ওদের ডাকি, যেন শুনতে পায়। কেউ শুনতে পায় না। আমার বাংলাদেশ নামের দেশটিও শুনতে পায় না। গোঙাতে থাকি একা একা। পালাতে ইচ্ছে করে।

একবার খুব ইচ্ছে করে পালাই
বার্চ বিচ ওক আর পাইনের চমৎকার অরণ্য আর
শীতল শান্ত বল্টিক সমুদ্র ঘেরা সাজানো নগর থেকে
কোথায় পালাবো? কোথায় নগর আছে আর আমার অপেক্ষা করে এই পৃথিবীতে?

আমার সর্বাঙ্গ এরা ঢেকে রাখে উষ্ণ চাদরে
হাত বাড়াবার আগে নুয়ে আসে হাতে থোকা থোকা প্রেমার্দ্র হৃদয়,
সব ফেলে ইচ্ছে করে পালাতে কোথাও।
কোথায় পালাবো? কোথায় মানুষ আছে আর আমার অপেক্ষা করে এই পৃথিবীতে?

কত শহরে যাই, ঘুরি ফিরি। কত শহরের কত কিছু দেখি। আসলেই কি দেখি? দেখি, সেই দেখার মধ্যেও অন্য একটি চোখ থাকে অন্য কিছু দেখার।

সারারাত তুমি কত কী দেখালে --
পিকাডেলি সার্কাস, বার্কিংহাম প্যালেস, ট্রাফালগার স্কোয়ার,

আমার আসলে কিছুই হয়নি দেখা ঘাস আর ঘাসফুল ছাড়া।

ঙারারাত দেখালে টাওয়ার ব্রিজ, চায়না টাউন, হাউজ অব কমনস

নিঃসঙ্গ আকাশ ছাড়া আমি আসলে দেখিনি কিছুই।

শহর ঘুমিয়ে যায়, জেগে থাকি সারারাত

উত্তরের সমুদ্র থেকে ঝড় বৃষ্টি কাঁধে হাওয়া আসে বিষম আর

সারারাত অপ্রকৃতস্থ বালিকার মতো ভিজি টেমস নদীর জলে,

আসলে, কেউ বোঝে না, মনে মনে ভিজি আমি বহু দূরে রেখে আসা গহন ব্রক্ষপুত্রে।

যেখানেই থাকি, যেখানেই যাই, মন পড়ে থাকে দেশে, মনকে কিছুতে আমি তুলে এনে নিজের কাছে রাখতে পারি না। মন এই নিঃস্ব জীবনে কিছুতে থাকতে চায় না।   আমার মধ্যরাতগুলোয় বোবা কিছু শেয়াল ডাকে। আমার রাতগুলোর চোখের পাতা রাতভর খোলা।

মধ্যরাতের ফোন, তুমি বেজো না।

তোমাকে বালিশ দিচ্ছি, কাঁথা কম্বল, ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি,

তুমি ঘুমোও।

শহর এখন মরা কাঠ, আকাশও তারা নিবিয়ে ঘুমিয়ে গেছে।

তুমি বাজলে শিরদাঁড়া বেয়ে তাল তাল বরফ নেমে আমাকে পাথর করে রাখে,

কাল বৈশাখিতে শীর্ণ খেজুরপাতা যেমন কাঁপে, তেমন কাঁপে

আমার সর্বাঙ্গ। নিমেষে পঙ্গপাল নেমে আসে আমার ধানদুব্বায়..

স্বজন বন্ধুহীন পড়ে আছি একা, দূর বরফের দেশে।

হঠাৎ হঠাৎ খবর আসে রাজনীতির কাদা মাঠে আকাট মূর্খরা বিষম

দৌড়োচ্ছে, আর ফাঁক পেলেই উঠোনে মাঠে ধানখেতে বুনছে ধর্মের বীজ।

বস্তি উঠছে, গ্রাম ছেয়ে যাচ্ছে পতিতায়, পিরে, ভিক্ষুকে --

বাবার বুকের ব্যথাটি শুনেছি আজকাল আরও বেড়েছে, চোখেও কম দেখেন,

বন্ধুরা এক একজন দুম করে কোথায় পালাচ্ছে কে জানে

মধ্যরাতের ফোন, বেজো না। এত রাতে কেউ জেগে নেই,

রাতের মাতালগুলো এক এক করে ঘুমিয়ে গেছে, তুমিও ঘুমোও।

এই জীবন নিয়ে ঠিক কোথায় যাবো, কী করবো, আমি জানি না। এই জীবন, আমি বুঝি যে ঝরে যাচ্ছে। বুঝি যে এতে সেই আগের প্রাণ নেই। জীবনে, বুঝি, যে, আগের জীবন নেই।

কেউ জানে না

জীবন ঝরে যায় বার্চের পাতার মতো,

আর পায়ে মাড়িয়ে যে যার গন্তব্যে চলে যায়, পেছন ফেরে না,

গরীরে জমতে থাকে বরফের চাঁই, পাথর।

চিৎপুরে কিম্বা আরমানিটোলার গলি হলে কেউ নিশ্চয় আহা বলতো

পলাশির রাস্তায় ভিড় হত, গাড়িঘোড়া শ্লথ হত শ্যামবাজারে, নীলক্ষেতে।

জীবন উড়ে যায় দুরন্ত সিগালের মতো, কেউ জানে না কোথায়,

পেছনে কেউ হাত নাড়ে না, কেউ জল মোছে না আঁচলে বা শার্টের হাতায়,

কেউ মাথার দিব্যি দিয়ে বলে না ফিরে এসো।

জীবন পড়ে থাকে ফুটপাতে শুকনো ফুলের মতো, সিগারেটের ফিল্টারের মতো,

কাগজের ঠোঙার মতো,

পেছন ফেরে না কেউ শরীরে জমতে থাকে শ্যাওলা, ব্যাঙের ছাতা।

ঝরে যেতে থাকি বার্চের পাতার মতো, পড়ে থাকি ঘোর অন্ধকারে

কে আর আলো জ্বেলে বলবে -- বাঁচো!

এ তো আর বোলপুর নয়, বনানী বা বঙ্গবাজারের মোড় নয়।

একা আমি। ভয়ঙ্কর একা। আমাকে ঘিরে হাজার মানুষের ভিড়। অথচ আমার মতো একা আর কেউ নেই। না, এই জগতে কেউ নেই এত একা। বাড়ির সব জিনিসই ভিনদেশি, সবকিছুর শরীরে অচেনা অচেনা গন্ধ, আমি নিজেও নিজের কাছে অচেনা হয়ে যাচ্ছি। উন্মাদের মতো, হ্যাঁ উন্মাদের মতোই আমি রান্নাঘরে ঢুকি দিনে রাতে মধ্যরাতে। থালায় ভাত নিই। জন্মের চেনা এই ভাত।

ভাত মাছ নিয়ে আজকাল ঘন ঘন বসি খাবার টেবিলে
কবজি ডুবিয়ে ডাল নিই, মাখি, মাছি তাড়াবার মত
বাঁ হাতখানা মাঝে মাঝে দুলে ওঠে স্ক্যানডিনেভিয়ার শীত নিয়ন্ত্রিত ঘরে
পোকামাকড়ের বংশ নেই, তবু কী যেন তাড়াই মনে মনে।
দুঃখ?

মাছের মলিন টুকরো, সবজি, থালার কিনারের নুন
আর ঘন ঝোল মাখা ভাত থেকে সরতে চায় না মোটে হাত
ইচ্ছে করে সারাদিন ভাত নিয়ে মাখামাখি করি, খাই
খুব গোপনে কি বুঝি না আমি কেন সোনার চামচ ফেলে ভাতের স্বাদ গন্ধ এত চাই!
আসলে ভাত স্পর্শ করলে ভাত নয়, হাতের মুঠোয় থোকা থোকা বাংলাদেশ উঠে আসে।

আমি ভালো নেই

আজ ষোলই ডিসেম্বর। প্রতি বছর ষোলই ডিসেম্বর এলে খুব ভোরবেলা বাড়ির ছাদে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিতাম। পতাকা ওড়াবার কাজটি আমার জন্য বাধা ছিল। ওড়াবার আগে পতাকাটির ঘ্রাণ শুঁকে নিতাম অনেকক্ষণ। ঘ্রাণ পেতাম সুখের, স্বস্তির। পতাকা উড়ত, আর আমার মনও উড়ত পাখির মত স্বাধীন আকাশে। স্বাধীনতা ব্যাপারটি যে কী অসম্ভব আনন্দের! ষোলই ডিসেম্বর তো ঘুরে ঘুরে আসে আবারও এসেছে। দিনটি এলে

বাঙালি উৎসবে মাতে, দল বেঁধে সাভারের স্মৃতিসৌধে ফুল দিতে যায়, শহরের পথে পথে নাটক হয়, নাচ হয়। শেরে বাংলা নগরে কুচকাওয়াজ হয়। ধানমণ্ডির মাঠে কুটিরশিল্পের মেলা বসে, রমনায় হয় গানের উৎসব, কত কী! এবারও সারা দেশ জুড়ে বিজয়ের উৎসব হবে। বাড়ির ছাদগুলোয় পতাকা উড়বে। আমাদের বাড়ির ছাদে কেউ কি পতাকা ওড়াবে এ বছর? কে ওড়াবে! আমার মা তো সেই কবে থেকে কেঁদে কেঁদে কেমন যেন হয়ে গেছেন, শুনেছি আজকাল তিনি ঘরের বাতি দিনের বেলায়ও জ্বেলে রাখেন, বলেন চারদিকে নাকি ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আবোল তাবোল বকেনও। বাবাও কেমন যেন নুয়ে গেছেন। সমাজে একঘরে হলে যা হয়। আগের মত আত্মীয়রা আসে না খবর নিতে। বন্ধুরাও ছায়া মাড়ায় না বাড়ির। মেয়ে দোষ করেছে বলে বাপমায়ের ওপর শোধ। কেবল কি তাই, ছোটবোনের চাকরিও হুট করে একদিন চলে গেল, আপিসের কর্তা বললেন, *মাইনেটাইনে নিয়ে চলে যাও, কাল থেকে তোমাকে আর আসতে হবে না। তুমি কার বোন, তা লোকে জেনে গেলে বড্ড বিপদ।* আর আমি! দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এক নিঝুম অন্ধকার দেশে বসে আছি, কেউ নেই যার সঙ্গে কথা বলতে পারি নিজের ভাষায়। কেউ নেই যার কাঁধে মাথা রেখে দুদণ্ড কাঁদতে পারি। কী দোষ আমি করেছি যে দেশে ফিরে স্বাধীনতার গান আমি গাইতে পারি না, আবৃত্তি করতে পারি না প্রিয় সেই কবিতা আমার, *বাংলা ভাষায় জয় বাংলার মত প্রাণবাণ শব্দ আর নেই, যে জিহ্বা জয় বাংলা উচ্চারণ করে, সে জিহ্বা কোনও মিথ্যের সঙ্গে আপোস করে না।* কেন আমি আর সবার মত বিজয়দিবসের আনন্দমিছিলে নামতে পারি না। কেন এত অসহ্য দূরত্ব নিজেরই দেশ থেকে, যে দেশে আমার জন্ম, বড় হওয়া, একত্রিশ বছর যাপন, যে দেশ আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিল পঁচিশ বছর আগে নিজের ভাষায় যেমন খুশি কথা বলার, পথেঘাটে নিশ্চিন্তে চলার, নিরাপদে বাঁচার। কেন সেই দেশ হঠাৎ করে এমন বদলে গেল যে দেশের মেয়ে দেশে ফিরবে শুনে লোকে ক্ষেপে ওঠে, কল্লা চাই মুণ্ডু চাই বলে মিছিল করে? এ কি আমার দেশ নয় তবে? পশ্চিমা বিশ্ব আমাকে নানা পুরস্কারে, সম্মানে মাথায় তুলে রাখছে। কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। মনে মনে দুপুরের রোদে

শাপলা পুকুরে ঝাঁপ দিই, হইচই করে সাঁতার কাটি। মন পড়ে থাকে সাদা ভাতে, ইলিশে আর কই মাছের ঝোলে। মন পড়ে থাকে বাউলের একতারায়, হাডুডুর মাঠে, পালের নৌকোয়। প্রতিদিন হৃদয় ভরে ওঠে অসম্ভব শূন্যতায়। এখানে আমার শরীরখানা আছে, কিন্তু মন চলে যায় মেঘের সঙ্গে ভেসে পশ্চিম থেকে পূবে, সীগালের ডানায় করে উড়ে বঙ্গোপসাগরে। আমার লেখা অনেকের পছন্দ নয়, খালেদা-সরকারেরও পছন্দ ছিল না বলে মামলা ঠুকে দিয়েছে। বই বাজেয়াপ্ত করেছে। মামলাটি এখনও মাথার ওপর ঝুলছে। কবে এর নিস্পত্তি হবে কে জানে। শুনেছি হাসিনা- সরকারও বাকস্বাধীনতা-বিরোধী মামলাটি না খারিজ করে চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আর এদিকে নৈরাশ্য আমাকে তিনবেলা হাভাতের মত খেয়ে যাচ্ছে, আরও বেশি অন্ধকার নেমে আসছে চারদিক থেকে, আমি কুঁকড়ে যাচ্ছি, জমে যাচ্ছি, ডুবে যাচ্ছি চাঁই চাঁই বরফের তলে, কলমের নিবও জমে পাথর হয়ে গেছে। আগের সেই দামাল মেয়েটি ঝরে যাচ্ছে একটু একটু করে।

দেশ স্বাধীন হবার পর ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি ভালো ভালো শব্দ পুরে গঠনতন্ত্র তৈরি করেছিলেন আমাদের নেতারা। গণতন্ত্রের নিয়মই কিন্তু এই, ভিন্ন যেমন রাজনৈতিক মতবাদ থাকে, মানুষেরও ভিন্ন মতামত থাকে যে কোনও বিষয়ে। কোনও এক বিষয়ে সকলে একমত হয় না। আর, সবারই স্বাধীনতা থাকে মত প্রকাশের। আমার মত না হয় আর সবার চেয়ে ভিন্ন হয়েছিল, তাই বলে আমার বাড়িতে হামলা হবে কেন! কেন আমার শরীরে পাথর ছোঁড়া হবে, কেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে মাথার দাম! আমাকে কেনই বা ছাড়তে হবে নিজের দেশ! পঁচিশ বছরের স্বাধীনতা তবে আমাদের কারুকেই সত্যিকার স্বাধীন করেনি!

দেশটি গরিব, সকলের খাবার জোগাতে পারে না, সকলের মাথার ওপর ছাদ নেই, গায়ে কাপড়জামা নেই, সকলের লেখাপড়ার সুযোগ হয় না। গৌরব করার টাকাকড়ি না থাক, কিছু ইতিহাস তো আছে আমাদের! ভাষা আন্দোলনের, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস! যে জাতি নিজের ভাষা আর সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্য মিছিল করেছে আর তাদের রক্তে ভিজে গেছে রাজপথ, যে জাতি ধর্মের বাঁধন তুচ্ছ করে যুদ্ধে নেমেছে -- এমন শুদ্ধ জাতি কেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দিন

দিন! ধর্ম তাঁর দাঁত বসাচ্ছে রাজনীতিতে, সংসদে, সমাজে। স্কুল না বেড়ে বাড়ছে মসজিদ মাদ্রাসা। বই পোড়ানো-যজ্ঞ হচ্ছে। লেখক-হত্যার পণ করছে অসভ্য কিছু লোক, আর সকলে দিব্যি চোখ বুজে আছে। এসব হবে বলে তো ষোলই ডিসেম্বর নয়। পাকিস্তানি স্বৈর শাসকদের আমলে এমন হত। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া চলবে না, রাধাকৃষ্ণ, ভগবান ইত্যাদি শব্দওয়ালা গান প্রচার করা বন্ধ, মতে মেলে না এমন কিছু লিখলে বা করলে সে কবি হোক কী রাজনীতিবিদ হোক, গায়ক হোক কী মুদির দোকানি হোক, পেটে দড়ি বেঁধে ধরে আনো, জেলে পোরো। ছোটবেলায় দাদাদের গাইতে শুনেছি -- *ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়। ওরা কথায় কথায় শেকল পরায় আমার হাতে পায়।* তখনকার এবং এখনকার শাসকে তবে পার্থক্য কোথায়! এসব হবে বলে কি নমাস যুদ্ধ হয়েছিল? মা বলেছিলেন, *এবার থেকে আমরা ইচ্ছেমত মনের কথা বলতে পারবো। পথেঘাটে হাঁটতে পারবো। নিশ্চিন্তে বাঁচব। আমাদের আর পালিয়ে থাকতে হবে না।* আমাকে তো পালিয়ে থাকতে হয়। তবে কি মা ভুল বলেছিলেন? নিশ্চয়ই ভুল বলেছিলেন। আসলে একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরে নিজেদের জন্য একটি দেশ পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু একে ঠিক মনের মত গড়তে পারিনি। একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন আমি দেখি যেখানে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সব বঙ্গই এসে মিলবে। ধর্মে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, নারী ও পুরুষ একইরকম অধিকার নিয়ে বাঁচবে। ইচ্ছেমত, হোক না সে অন্যরকম, কথা বললে জেল জরিমানা হবে না, দেশে বা দেশের বাইরে কাউকে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। এমন একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন আমি দেখি যেখানে কষ্ট বা সুখের কথা বলবে মানুষ দ্বিধাহীন। যেখানে মানুষ খেয়ে পরে, সুখে স্বস্তিতে বাঁচবে। যেখানে এই আমিও চলতে ফিরতে পারবো যেমন ইচ্ছে, বইমেলার আড্ডায়, মানুষের ভিড়ে। একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরে ফুল দিতে পারবো শহিদ মিনারে। পঁচিশে মার্চে আর ষোলই ডিসেম্বরে আমিও আবৃত্তি করতে পারবো কবিতা, মঞ্চে, মিছিলে, মাঠে। ওড়াতে পারবো পতাকা আমাদের বাড়ির ছাদে।

একটি একটি করে বছর পেরোচ্ছে। আমার আজও ফেরা হয়নি দেশে, আমার নিজের দেশে, আমার নিজের ঘরে। ফিরতে চাই সেই ঘরে, ফিরতে চাই দুঃখিনী মার কোলে। আহা কতদিন মাকে দেখি না। সেই তাকে শেষ দেখা যে রাতে সারা গা কালো চাদরে মুড়ে আমাকে বিমান বন্দরে যেতে হয়েছিল, মা আমার মেঝেয় গড়িয়ে কাঁদছিলেন, নিঝুম রাত ফুঁড়ে মার বুক ফাটা কান্না যেন শত্তুরেরা শুনতে না পায়, টের না পায় কেউ আমার চলে যাওয়া, কেউ একজন চেপে ধরেছিল তাঁর মুখ। মার বুক খালি করে মানুষ কেবল গেলই। নিরুদ্দেশে গেল। মা এখন একা, হাত বাড়ালে শূন্যতার দীর্ঘদেহ, আর কিছু নেই। যখন মা চিৎকার করে কাঁদেন আর দেয়ালে কপাল ভাঙেন, পড়শি শোনে, শত্তুরেরা শোনে, কেউ নেই আশ্বাসের একখানা হাত রাখে তাঁর পিঠে।

বাংলাদেশে আমি জীবনের একত্রিশ বছর কাটিয়েছি। ওই একত্রিশ বছরে অনেক কষ্ট পেয়েছি, অনেক দুঃখ। মন খারাপ হয়েছে অনেক কিছুতে, চিৎকার করে কেঁদেছি। কিন্তু কখনও মনে হয়নি সময় থেমে আছে। কখনও মনে হয়নি, আমার কিছু করার নেই, কখনও আমার গোটা জীবনটা পিছলে অতীতে পড়ে যায়নি। এখন এমন, এখন আমার সামনে পিছনে অতীত ছাড়া কোনও জীবন নেই। আমি অতীত যাপন করি, আমি অতীত যাপন করবো। কোনও বর্তমান আমি অনুভব করি না। এই জীবনটিতে আছি, কিন্তু নেই। আমাকে নিয়ে উৎসব চলছে দেশে দেশে। সেই উৎসবে আমি যোগ দিচ্ছি। দেশ দেখছি দুচোখ মেলে। পরদিন কী দেখেছি মনে করতে পারি না, মনে করতে যদি পারি, কেন দেখেছি তার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। অনেক বলেছে, *এত যে ঘুরে বেড়াচ্ছো, এত দেখছো জানছো, কিছু লিখে রাখো অভিজ্ঞতার কথা।* আমার একফোঁটা ইচ্ছে হয়নি। ইচ্ছে না হলেও *লিখতে হবে, লেখা উচিত* বলে অনেকসময় লিখতে বসেছি, একটি শব্দও আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি লেখা। কখনও আবার হঠাৎ ইচ্ছের দেখা মিলেছে, কিন্তু সামনে কাগজ কলম নিয়ে, কমপিউটার নিয়ে বসে থেকেছি সারাদিন, একটি বাক্যও লিখতে পারিনি। আমার কমপিউটার পড়ে আছে এক টেবিলে। আমি জানালায় বসে আছি বা শুয়ে আছি। চারদিকের নৈঃশব্দের মধ্যে নিজের

নৈঃশব্দ একাকার হয়ে মৃত্যুর মত শৈত্য তৈরি করে। আমি মানুষ কী যন্ত্র, জ্যান্ত কী মৃত অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। কোথায় নির্বাসিত জীবনকে ধীরে ধীরে মেনে নেব, এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবো, এই জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য গ্রহণ করবো, নিজেকে সমৃদ্ধ করবো। প্রাপ্তিটুকু প্রসন্নতা দেবে। তা নয়, দিন দিন দেখি   আশ্চর্য এক নিস্পৃহতা সবকিছুতে। ছিঁড়ে ফেলছি মাথার মুকুট, দুহাতে সরিয়ে দিচ্ছি জীবনে দ্বিতীয়বার হবে না এমন আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ। পরোয়া করছি না শ্রদ্ধা, সম্মান। বই ছাপাতে চাইছে। আবেদনপত্র এদিক ওদিক উড়ে জানালা গলে চলে গেছে। পুরস্কার দিচ্ছে। না, নেবো না। বক্তৃতা করবে এসো, করবো না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা বলবে এসো, না। প্রতিবাদ করবে, বিপ্লব করবে, মিছিলে নামবে, এসো। না। নারীবাদের কথা বলবে, নাস্তিকতার কথা। না। মানববাদের কথা। মানবতার কথা। না। মানুষ অপেক্ষা করছে। করুক। কাঁদছে। কাঁদুক। কিছুই ইচ্ছে করছে না। কিছুই ইচ্ছে করে না। ছাইদানিতে ছাই উপচে পড়ছে। চায়ের কাপগুলোয় ছাই। জলের গ্লাসে ছাই। বড় থালায় ছাই, ছোট থালায় ছাই। চামচে ছাই। টেবিলে ছাই, চেয়ারে ছাই। বিছানায় ছাই। রান্নাঘরে ছাই। টয়লেটে ছাই। মেঝেয় ছাই। কার্পেটে ছাই। এত ছাইয়ের মধ্যে আমি উড়ছি। ছাইগুলো আমাকে উড়িয়ে নিচ্ছে কোথায়, তা ছাই-ই কেবল জানে। আমার জানার সাধ্য নেই। সুযোগ নেই। পুরো ঘর একটি বিরাট ছাইদানি হয়ে উঠছে। আমি নিজেই আস্ত একটি ছাইদানি হয়ে উঠছি। আমার ভিতরে যা কিছু আছে, সব ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যাচ্ছে। মস্তিস্ক, গলনালী, ফুসফুস, হৃদপিণ্ড, বৃকক, যকৃত, অগ্নাশয়, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, মুত্রাশয়, জরায়ু সব ছাই।

নিস্পৃহতা যখন, তখন নোংরায় আবর্জনায় এলোমেলোতে ফাঙ্গাসে ব্যাকটেরিয়ায় দুর্গন্ধে পড়ে থাকি। ভেসে থাকি, ডুবে থাকি। ফোন বাজে। ফোন ধরি না। চিঠির স্তূপ। একটি চিঠিও খুলি না। ঘরের বাইরে বেরোই না। শুধু সিগারেট আর খাবার ফুরিয়ে গেলে বেরোই। টেলিভিশনের সামনে বসে থাকি। সব জার্মান ভাষায়, কিছুই বুঝি না। কিন্তু তাকিয়ে থাকি। সোফায় শুয়ে শুয়ে যত খাবার আছে, খাই আর সিগারেট ফুঁকি। জানালায় বসে সিগারেট

ফুঁকি। গান শুনি না। কবিতা পড়ি না। কোনও বই হাতে নিই না। যখন একটি থালাও আর পরিস্কার নেই, একটি চামচও নেই খালি। তখন বন্ধুদের কাউকে বলে একটি কাজের মানুষ রাখি। পূর্ব জার্মানির মেয়ে। ঘন্টায় পঞ্চাশ মার্কে কাজ করতে শুরু করে। আপিসের কাজ শেষ করে বিকেলে চলে আসে আমার বাড়িতে। উরসুলা, মেয়ের নাম। এক অক্ষর ইংরেজি জানে না। মুখ বুজে প্রতিদিন তিন ঘন্টা কাজ করে যায়।

নিস্পৃহতা যখন, তখন আমি ব্যাংকের চিঠি একটিও খুলে দেখি না। মাসের পর মাস ব্যাংকের জরুরি কাগজ আখোলা পড়ে থাকে। একসময় সব চিঠি না খুলেই ফেলে দিই ময়লা ফেলার বাক্সে। অথবা আখোলাই তারা তলিয়ে যায় কাগজের স্তূপে। নিস্পৃহতা এলে, আমি বাসে চড়ি না, ট্রামে না, মেট্রোয় না, চড়ি ট্যাক্সিতে। মুঠো করে টাকা দিয়ে দিই যেখানে সেখানে। টাকা কত আছে, টাকা কত গেছে, হিসেব রাখি না। জগতে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা জানার কোনও ইচ্ছে নেই।

নিস্পৃহতা যখন, তখন ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা খামোকা কথা বলি ঢাকায়, ময়মনসিংহে, কলকাতায়। নিস্পৃহতা যখন, ছোটদাকে বলি ব্রাসেলস থেকে বার্লিন চলে আসতে। ছোটদাকে নিয়ে সারা শহর পরমানন্দে ঘুরে বেড়াই। তাকে জামা জুতো কিনে দিই। যা চায় তাও দিই, যা চায় না তাও দিই। টাকা কাগজের মত ওড়াই। টাকা এখন আমার কাছে অনেকটা কাগজ। কী হবে টাকা দিয়ে! যখন তখন টাকা হারিয়ে ফেলি পথে ঘাটে। ডেআআডে আমাকে সবচেয়ে চমৎকার একটি এলাকার চমৎকার একটি বাড়ির একটি অ্যাপার্টমেন্ট দিচ্ছে আর মাসের খরচা আড়াইহাজার ডয়েচেমার্ক দিচ্ছে। সেই আড়াইহাজার ডয়েচেমার্ক আমার দেখা হয়নি নিজ চোখে। কারণ উল্টে আমাকেই দিতে হয় ডেআআডেকে। কারণ ফোনের বিল। মাসে মাসে ফোন বিল আসছে সাড়ে চার হাজার, পাঁচ হাজার মার্ক। দেড়দুলক্ষ টাকা। ডেআআডে বিল দিয়ে দিচ্ছে, কেটে নিচ্ছে স্কলারশিপের আড়াই হাজার মার্ক, বাকিটা বিল করে আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আমি মিটিয়ে দিচ্ছি। পকেটে আমার ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড। কার্ডে কত টাকা খরচ করছি, তার কোনওদিনও আমার কোনও হিসেব

ছিল না, নেইও। আমার আশেপাশের মানুষ আমার ভিতরের নিস্পৃহতার কিছুই টের পায় না। ছোটদাও টের পায় না। ছোটদার কাছে দিয়ে দিই আমার যা কিছু সম্বল যা কিছু অর্জন উপার্জন সব । বইপত্র, কাপড় চোপড়, , ফটোর অ্যালবাম, উপহার সামগ্রি। ভেনিসের চাবি, বারসেলোনার চাবি, ভলতেয়ারের পাঁচ খণ্ড বই, যত সোনার মেডেল পেয়েছি সব। কিছুই রাখি না নিজের কাছে।

ছোটদা হাঁ হয়ে যায়, এইগুলা তো দরকারি জিনিস, দিয়া দিতাছস কেন?

--*সব গিয়া আমার বাড়িতে রাখবা।* শান্ত গলায় বলি।

--*তুই চলবি কেমনে?*

--*আমার অনেক চলা হইছে। তুমি গিয়া কথা কও কামাল হোসেনের সাথে। কও, যে কইরাই হোক আমি ফিরতে চাই দেশে।*

ছোটদা বোঝে যে সে কারণেই আমি আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে দিয়েছি, কারণ আমি যাচ্ছি দেশে, যে করেই হোক। ছোটদা ফিরে যায় দেশে, কিন্তু কোনও আশার খবর শোনায় না। কেউই শোনায় না।

বাংলাদেশে এখন না যেতে পারি, কিন্তু কলকাতায় তো যেতে পারি! নিখিল সরকার আছেন, আরও কত নাম জানা এবং না-জানা শুভানুধ্যায়ী আছেন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। দেশের আত্মীয়দের জানিয়ে দিই, তোমরা সবাই কলকাতায় চলে এসো, ওখানে দেখা হবে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটি সুইডেনের ভারতীয় দূতাবাসে। ভিসার জন্য দরখাস্ত করি। ওরা আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখে, বসিয়ে রাখে, পরে জানিয়ে দেয়, পরদিন আসতে। পরদিন যাই, দাঁড়িয়ে থাকি, বসে থাকি। দু তিন ঘন্টা কেটে গেলে ভিতর থেকে খবর পাঠানো হয়, আজ হচ্ছে না, অন্যদিন। অন্যদিন গিয়ে শুনি অন্যদিন। মরিয়া হয়ে উঠলে আমাকে রাষ্ট্রদূত জানিয়ে দিলেন, দিল্লিতে আমার দরখাস্ত পাঠানো হয়েছে, দিল্লি থেকে কোনও উত্তর আসেনি। দিল্লি যদি ভিসা দাও বলে তার পাঠায়, তবেই আমি ভিসা পাবো, নতুবা নয়। কবে দিল্লি থেকে খবর আসবে তা জানতে ফোন ফ্যাক্স করি, সশরীরে হাজির হয়ে ওদের অস্বস্তির কারণ

হই। মাস দুমাস তিনমাস কেটে গেলে ওরা জানিয়ে দেয় হচ্ছে না ভিসা। কেন হচ্ছে না? আমার এই সরল সোজা প্রশ্নের সরল সোজা তো নয়ই, কোনও কঠিন উত্তরও পাই না। কেন ভিসা আমি পাবো না, তা জানার অধিকারও আমার নেই। না, তারপরও আমি আশা ছেড়ে দিই না। কমাস পর পরই আবার ভিসার জন্য দরখাস্ত করেছি। আবারও একই আচরণ করা হয় আমার সঙ্গে। আমার ভিসা হবে না। আমাকে ভারতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আমি কোনও কি অপরাধ করেছি? আমি শুধু আমার আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাবো, আমাকে যেতে দিন, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে, আর পারছি না বেঁচে থাকতে। আমাকে আমার মাটির, আমার মানুষের কাছে যেতে দিন, আমাকে শ্বাস নিতে দিন! নাহ, আমার কোনও আবেদন কোনও আবেগ কাউকে সামান্যও ছুঁয়ে যায় না। যে যার মতো নিজের কর্তব্য পালন করে যায়। কারও কারও হয়তো দুঃখ হয় আমার জন্য, আমার দুর্ভাগ্যকে দায়ি করে পাশ ফেরে, অথবা ভারত বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের জটজটলার ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেরা স্বস্তির সন্ধানে মনেনিবেশ করে। চুরানব্বই, পঁচানব্বই, ছিয়ানব্বই করে বছর পার হয়, আর আমি পড়ে থাকি একা, ভিনদেশে। সবুজ একটি বৃক্ষকে নিজ মাটি থেকে উপড়ে নিয়ে বরফের চাঁইয়ে কেউ যেন ছুঁড়ে দিয়ে গেছে। আমি টের পাচ্ছি কী করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার ডালপালা, আমার ফুলফল, কী করে পচন ধরছে আমার শিকড়ে, কী করে দেখতে আমি ছোট্ট এতটুকুন হয়ে যাচ্ছি, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের লেখক বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে যোগাযোগ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে। দিন দিন তাঁরা আমার নাগালের বাইরে যেতে যেতে আকাশের দূর দূর নক্ষত্র হয়ে বসে আছেন। আমি কি একাই যোগাযোগ রক্ষা করবো! আর কেউ তো কখনও দায়িত্ব অনুভব করেন না আমাকে একটি চিরকুট লেখার বা একটি ফোন করার! আমিও বুঝি, তাঁদের নতুন আড্ডায়-আলোচনার মধ্যে আমি নেই। তাদের জীবন যাপনের কোথাও নেই আমি। ভাবনা চিন্তা থেকে আমি হাওয়া। শুনেছি আমার মা আমার সঙ্গে যে লেখক সাহিত্যিক ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের অনুরোধ করেছেন, আমাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু যেন কেউ বলেন, করেন, কেউ

মার দিকে ফিরেও তাকাননি। অভিমান আমাকে আরও বরফের তলায় ঢুকিয়ে দেয়। অভিমানের ধারালো শীতল ছুরি জীবনে যত উষ্ণতা আমার ছিল, সেসবকে চাক চাক করে কাটতে থাকে।

অনেক লেখকই নিজের দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। অনেকেই নির্বাসন জীবন কাটিয়েছেন। আমি একা নই। তাঁরা বেশ ছিলেন। আমি কেন বেশ থাকতে পারি না! আমার কেন কষ্ট হয়! আমাকে বলা হচ্ছে এখানে বড় হতে। কিন্তু এখানের আলো হাওয়া তো আমার জন্য নয়। এখানে বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমি আমার দেশ চাই, মাটি চাই, আমার ঘর চাই। ঘরের উষ্ণতা চাই। যে জীবন আমি যাপন করেছি, ঠিক সেই জীবনটি ফিরে পাওয়ার জন্য একটি অবোধ আকুলতা অনুভব করি। আমার জীবনটি আমার কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কোথাও, একটি অচেনা জীবন আমাকে দিয়ে বলা হচ্ছে যে যাপন কর। কিন্তু এ জীবন তো আমার নয়, এ জীবন আমি ঠিক চিনি না, এ জীবন আমি যাপন করতে জানি না। আমাকে ছিঁড়ে খেতে থাকে কোথাকার কোন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। ক্ষুধা যত তেড়ে আসে, শ্বাসকষ্ট তত লাফিয়ে লাফিয়ে মেঘ ছুতে থাকে। মেঘকে স্পর্শ করলে মেঘ সরে যায়। একটি ব্যর্থ শীতার্ত হাত পড়ে থাকে শুধু। হাতটি থেকে ধীরে ধীরে একটি অকথ্য যন্ত্রণা সারা শরীরে ছড়িয়ে যায়। কাতরাতে থাকে শুধু আমার শরীর নয়, মন নয়, আরও অনেক কিছু।

আমাকে নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটানো হচ্ছে প্রতিটি দেশেই। আমি হচ্ছি *পলিটিক্যালি কারেক্ট* জিনিস। আমাকে মঞ্চে তুলে দাও। নিজেরা নাম কামাও। আমি মঞ্চ থেকে নেমে আসবো। আমাকে ধন্যবাদ বলে দেবে। ব্যস আমি একা। পুরো এই জগতটাতে আমি তখন একা। দরজা বন্ধ করে বসে আছি। আমি মরে গেছি না বেঁচে আছি কেউ জানবে না। কেউ জানতে চাইবেও না। তীব্র একাকীত্বে আমি সিগারেট ফুঁকতে থাকি ঘনঘন। কাশতে থাকি। নুয়ে পড়তে থাকি। কাঁধে একটি আলতো হাত রাখার কেউ নেই। অনেক সময় ইচ্ছে হয় আত্মহত্যা করি।

একটি জিনিস আমি খুব বুঝি যে আমি ভালো নেই। দেশের খবর যেটুকু জোটে, তাতে কোনও আশা দেখি না আমার ফেরার। শুনি যে ছোটদা তার বউ বাচ্চাকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এত যে ছোটদাকে বলেছি যে আমি ফিরে আসছি একসঙ্গে থাকবো সবাই, কেউ যেন দেশের বাইরে না যায়, শোনেনি। এক এক করে সে তার নিজের বউ বাচ্চাকে পাঠিয়েছে। মিলনকে পাঠিয়েছে। আমেরিকায় মিলন একটু থিতু হলেই ইয়াসমিনকে পাঠাবে। এসব খবর যখন পাই, একটি একটি করে ধসে পড়ে আমার স্বপ্নের দালানকোঠা। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ কী করে বাঁচে! বুঝি না, বেঁচে আছি কী না। বুকের ভিতরটা খাঁ খাঁ করে। যেন কিছু নেই ভিতরে। শ্বাস নিতে গেলে ভয় লাগে। যেন ভিতরে বাতাস গিয়ে শূন্যে হারিয়ে যাবে। সবাই যদি ওরকম এক এক করে চলে যায়, তবে কার কাছে ফিরবো আমি! ওরা কি কেউ সুখে থাকবে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে গিয়ে? বড় একা লাগে। এই জীবন যে জীবনটি আমি যাপন করছি, বড় অর্থহীন বলে মনে হয়। এই জীবনের দিনগুলোকে রাতগুলোকে গুনি না, সকালগুলো দুপুরগুলো বিকেলগুলো সন্ধ্যাগুলো রাতমধ্যরাত নিশুতরাত গভীররাতভোররাতগুলোকে মোটেও নিজের মনে হয় না, এদের থেকে যেন যোজন যোজন দূরে আমি। মনে হয়, এই সময়গুলো আমার নয়, অন্য কারও। অন্য কারও অলিন্দে এসে অন্য কারও সময়ের মধ্যে আমি অনাহূত দাঁড়িয়ে গিয়েছি। আর, যে জীবনটি যাপন করছি এখন, সেটি ঠিক জীবন নয়, জীবন পার করার পর সেটি বাড়তি জীবন, বাড়তি জিনিস, অদরকারি।

একটি মৃত্যু দেখি সামনে। সেই মৃত্যুর মধ্যে নিজের গোঙানোর শব্দ শুনতে থাকি। না, চমকে উঠি না। মৃত শরীরে যেমন কোনও কিছুর চমক লাগে না, আমার শরীরেও লাগে না। শরীর কেমন পাথরের মতো শক্ত হয়ে আছে। মন নেমে যাচ্ছে শরীর বেয়ে, নেমে কোথায় যাচ্ছে, তা মনই জানে। মনের পথ রোধ করে দাঁড়াই না। অভিমান হয় সবার ওপর। একটি দেশ আমাকে নির্বাসন দণ্ড দিল। আর কী চমৎকার করে এই দণ্ডটি মেনে নিয়েছে দেশের সব কবি লেখক বুদ্ধিজীবী নারীবাদী! মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে যারা লড়াই

করছে, একবারও তো উচ্চারণ করে না আমার নাম! কেউ তো বলে না, *দেশের মেয়ে দেশে ফিরে আসুক।* কেউ তো সরকারের কাছে একবারও সামান্য দাবিটি জানায়নি! দাবি কি আর জানাচ্ছে না তারা! নানান কিছুর দাবি! প্রতিবাদ কি করছে না মানুষ যে কোনও অন্যায়ের, যে কোনও অনাচারের! কেবল একটি অনাচারের কোনও প্রতিবাদ নেই। কী করে তারা পারে এভাবে একটি মানুষকে ভুলে যেতে, যে মানুষ তাদের খুব কাছের মানুষ ছিল বলে তারাই এতকাল বলেছে! দেশে আমি কবে ফিরবো, আমি জানি না। দেশের সবকিছু থেকে তসলিমা নামটিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এ নামে ও দেশে কেউ কখনও ছিল না, নেই। এ নামের কাউকে নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথাও নেই। না থাক, তবু আমি আমার শৈশব, কৈশোর, আমার তারুণ্য, আমার যৌবনের কাছে ফিরতে চাই। আমি ফিরতে চাই আমার মায়ের কাছে। মায়ের কোলে। আমি নাম চাই না, নিরাপত্তা চাই না। কিচ্ছু চাই না আমার, আমি শুধু আমার জীবনের কাছে যে করেই হোক ফিরতে চাই।

কিন্তু চাইলেও আমি কোথাও ফিরতে পারছি না। নিজের দেশটির কাছে পৌঁছুতে পারছি না। ভয় হয়, দেশটি বুঝি আমার থেকে এমন দূরে চলে যাচ্ছে, যে, এর আঁচলের একটি কোণাও আমি আর স্পর্শ করতে পারবো না। পারবো না কোনওদিন। দেশ দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে জানি না। পিছনে আমিও দৌড়োচ্ছি, দৌড়োচ্ছি আর ডাকছি, ডাকছি আর বলছি, বকছি ..

আমার জন্য অপেক্ষা করো মধুপুর নেত্রকোনা
অপেক্ষা করো জয়দেবপুরের চৌরাস্তা
আমি ফিরব। ফিরব ভিড়ে হট্টগোলে, খরায় বন্যায়
অপেক্ষা করো চৌচালা ঘর, উঠোন, লেবুতলা, গোল্লাছুটের মাঠ
আমি ফিরব। পূর্ণিমায় গান গাইতে, দোলনায় দুলতে, ছিপ ফেলতে বাঁশবনের পুকুরে ---
অপেক্ষা করো আফজাল হোসেন, খায়রুননেসা, অপেক্ষা করো ঈদুল আরা,

আমি ফিরব। ফিরব ভালবাসতে, হাসতে, জীবনের সুতোয় আবার স্বপ্ন গাঁথতে --

অপেক্ষা করো মতিঝিল, শান্তিনগর, অপেক্ষা করো ফেব্রুয়ারির বইমেলা

আমি ফিরব।

মেঘ উড়ে যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে, তাকে কফোঁটা জল দিয়ে দিচ্ছি চোখের,

যেন গোলপুকুর পাড়ের বাড়ির টিনের চালে বৃষ্টি হয়ে ঝরে।

শীতের পাখিরা যাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূবে, ওরা একটি করে পালক ফেলে আসবে

শাপলা পুকুরে, শীতলক্ষায়, বঙ্গোপসাগরে।

ব্রহ্মপুত্র শোনো, আমি ফিরব।

শোনো শালবন বিহার, মহাস্থানগড়, সীতাকুণ্ড পাহাড় -- আমি ফিরব।

যদি মানুষ হয়ে না পারি, পাখি হয়েও ফিরব একদিন।